ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

# এবং প্রান্তিক

*Ebong Prantik*

An International Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Journal

Vol. 8th Issue 16th, January, 2021

## অভিনবত্ব

সম্পাদক

আশিস রায়

# এবং প্রান্তিক

*An International Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Journal*
*Vol. 8th Issue 16th, January, 2021*

সম্পাদক

**আশিস রায়**

**এবং প্রান্তিক**
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik

*An International Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Journal [ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)], Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150, Vol. 8th Issue 16th, January 2021, Rs. 450/-*

E-mail : ashis.jibonda.roy@gmail.com

Website : www.ebongprantik.in

**প্রকাশ**

৮ম বর্ষ ও ১৬ তম সংখ্যা

২০ জানুয়ারি, ২০২১

ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)



**কপিরাইট**

সম্পাদক, এবং প্রান্তিক



**প্রকাশক**

এবং প্রান্তিক

আশিস রায়

রেজিষ্টার্ড অফিস

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২

ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২

সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন

ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

**মুদ্রণ**

অনন্যা

বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০

ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

**মূল্য**

৪৫০ টাকা

# এবং প্রান্তিক


**উপদেষ্টামণ্ডলী**

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী,

ড. বিকাশ রায়, ড. মোনালিসা দাস, ড. মনোজ মণ্ডল

**প্রধান সম্পাদক**

ড. আশিস রায়

**সহ-সম্পাদক**

ড. টুম্পা ব্যাপারী

**সম্পাদনা সহযোগী**

ড. অচিন্ত্য চ্যাটার্জি (ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়),

ড. অলকেশ দত্ত রায় (বৈজ্ঞানিক, ফার্মাসিউটিক্যাল, বোস্টন),

ড. তানিয়া হোসেন (ওয়েসদা বিশ্ববিদ্যালয়),

ড. সৌমিত্র বসু ( রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়),

ড. হোসনে আরা জলী (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়),

ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়),

ড. চন্দন আনোয়ার ( নোয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়),

ড. দীপঙ্কর মল্লিক (রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)

## লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। অনধিক ৪০০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।

২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডি এফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।

৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।

৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।

৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

## লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২
ফোন: ৯৮০৪৯২৩১৮২

**Registered Address**
Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 9804923182
E-mail : ashis.jibonda.roy@gmail.com

**ব্রাঞ্চ অফিস**
ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৬০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

**প্রাপ্তিস্থান**

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

# সূচিপত্র


মৃত্যু ও মুক্তির অনন্য সমন্বয় : রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’

মোনালিসা দাস ১১

রবীন্দ্র গল্পে নারী চরিত্রের বিশিষ্টতা

অচিন্ত্য দে ১৭

মঙ্গলকাব্যে অভিনবত্ব প্রসঙ্গ ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’

নিরু বর্মন ২৫

বারমাস্যা : নারী মনস্তত্ত্ব ও বিষণ্ণতার অনন্য কাব্যরূপ

অজয় কুমার দাস ৩৬

মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁসা শিল্প ও কংসবণিক সম্প্রদায়ের ইতিহাস

সুমিত কুমার মন্ডল ৫০

লীলা মজুমদারের উপন্যাসে একাকিনীর আত্মনির্ভরতা : সময়ের নিরিখে অভিনবত্বের দাবিদার

কৃষ্টিশ্রী ভট্টাচার্য ৬৪

আঞ্চলিক পরিবেশ রচনায় বনফুলের অভিনবত্ব

রাজকুমার দে ৭৩

শিশু সাহিত্যে ঐতিহ্যবাহী মহাভারতের পরম্পরার অভিনবত্ব

সৌমিতা মুখার্জ্জী ৮১

অভিনব ভাবনায় "আজকের দ্রৌপদী"

রচনা রায় ৯২

আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় ‘শ্রুতি’কবিতার অভিনবত্ব

শিউলি বসাক ১০১

চিত্রকল্পের আলোকে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার অভিনবত্ব

সীমা পুরকাইত ১১৪

বেগম রোকেয়া: সাহিত্যে ও নারীমুক্তির ইতিহাসে এক বীরাঙ্গনা নারী

ইরাবতী মণ্ডল ১২৯

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর অভিনবত্ব

কৈলাশপতি সাহা ১৩৪

স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজ বাস্তবতা : বাদল সরকারের একাঙ্ক নাটক
অশোক মণ্ডল ১৪২
আফগানিস্তানে নারীদের অবস্থা: অতীতের আলোকে বর্তমানকে বিশ্লেষণ
সৌতিক নন্দী ১৪৯
জীবনানন্দের বনলতা সেন কবিতায় চিত্রকল্প ব্যবহারের অনন্যতা
অন্তিমা ভট্টাচার্য ১৫৫
কিন্নর রায়ের ভাবনার অভিনবত্বে দেশ-কাল-সময় ও সমাজ
কালিপদ বর্মন ১৬২
কাব্য সৃষ্টির ধারায় গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী : অভিনবত্বের বারান্দা
উত্তম বিশ্বাস ১৭০
নারী পাচার- সামাজিক সমস্যা : বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে
অভিজিৎ সেনের উপন্যাস
সুশীল মালিক ১৭৮
বার্ধক্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এক অভিনব মননশীল দৃষ্টিভঙ্গী
শর্মিষ্ঠা ঘোষ ১৮৭
রবীন্দ্র-চেতনায় সমবায় ভাবনা ও পল্লিউন্নয়ন : চিঠিপত্রের আলোকে
প্রহ্লাদ রায় ১৯৬
অভিনবত্বের আঙ্গিকে বাদল সরকারের 'সারারাত্তির' নাটক
বিপ্লব কুমার দে ২০৩
উত্তর পূর্ব ভারতের কোচ জনজাতির লোকগান
কৃষ্ণকান্ত রায় ২১২
জীবনস্মৃতির অভিনবত্ব
দেবাশিস ঘোষ ২২৪
সুন্দরবন অঞ্চলের লৌকিক দেব-দেবী
দীপঙ্কর ঘোষ ২৩৯
প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাবনার আলোয় সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসচর্চা
সাথী নন্দী ২৪৯

মানদা দেবীর ‘শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত’ : প্রসঙ্গ পতিতা নারীর
চোখে নারী বিশ্বের অন্তর্মুখী চিত্রায়ন
মানিক মৈত্র ২৫৮
অভিনবত্ব : প্রসঙ্গ মধ্যযুগীয় সাহিত্য
শ্রেয়া মণ্ডল ২৭২
শৈলজানন্দের গল্পে খনি-অঞ্চল কেন্দ্রিক অন্ত্যজ শ্রেণির চিত্রায়ণে অভিনবত্ব
রাজু মণ্ডল ২৮৪
নদিয়া জেলার শর্করাশিল্প
চায়না দেবনাথ ২৯১
একটি কবিতা : মানবাধিকার ও নারীর অধিকার কথায় মুখর
অসিত রঞ্জন সাঁতরা ২৯৯
পৃথিবীতে আদি সময়ের জনস্বাস্থ্য ও লোক চিকিৎসা পদ্ধতি
জিতেশ চন্দ্র রায়
প্রসেনজিৎ নায়েক ৩০৮
অতিবাস্তবতা ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প (নির্বাচিত)
শিখা হালদার ৩১৪
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাস্তুভিটা’ নাটকে সাম্প্রদায়িক ঐক্য
টুম্পা রায় ব্যাপারী ৩২২
দেশভাগ পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে ক্যাম্পে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের করুণ
প্রতিচ্ছবির এক ইতিহাসমূলক পর্যালোচনা : প্রসঙ্গ—মনোরঞ্জন ব্যাপারীর
‘ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন’
সঞ্জু সরকার ৩২৮
জন্মদিনে’র ‘ঐকতান’ : সামগ্রিকতার সন্ধানে
প্রণব নস্কর ৩৩৮
পশ্চিমবঙ্গের লালগড় আন্দোলনে আদিবাসী নারী (২০০৮-২০১১)
মধুমিতা সেতুয়া ৩৫৬
দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে ব্রিটিশ বিরোধী জনমতের উত্থানে
সামাজিক ও ধর্মনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ
বিদ্যুৎ মিশ্র ৩৬৫

একজন চেনা কবিকে নতুনভাবে খুঁজতে গিয়ে
দীপঙ্কর সরদার ৩৭৩
The physical and scientific interpretation of 'AZU' and the awareness of the Muslim people in India: A case study of West Bengal
Md. Rabiul Mallick
Deben Ch. Kalita ৩৮২
CONSTRUCTION OF GENDER IDENTITY AND GENDER TROUBLE IN NAGARKIRTAN AND SAMANTARAL
Amiya Mondal ৩৯২
A Study of Madhesis in Nepal
Sarbari Dey Sarkar ৩৯৭
A COMPARATIVE STUDY ON THE FEATURES OF "NATIONAL POLICY ON EDUCATION" (NPE-1986) AND "NATIONAL EDUCATION POLICY" (NEP-2020)
Sk Parvej Ahammed
Lalkrishna Khanra ৪১১
Online Learning: The Cure-all in the Time of Covid-19 Pandemic
Sujan Sarkar
Laxmi Sarkar ৪২০
ATTITUDE OF TEACHERS TOWARDS TEACHING PROFESSION
Sanghamitra Roy ৪৩১
AGHOREKAMINI ROY---- A "GRIHASTHA BRAMHACHARINI" AND EDUCATIONAL REFORMER OF THE 19th C. BENGAL
Oindrila Mitra ৪৪৪
A study on The East Kolkata Wetlands: Ecology, Sustainable development and People's resistance- 1990s onwards
Mohammad Masud Akhtar ৪৫২

# সম্পাদকীয়

প্রতিটি শব্দ তার নিজস্বতায় স্বতন্ত্র। বাক্য নিজেই তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হয়ে ওঠে শব্দের বুননে। সৃষ্টি করে চমকপ্রদ ঘটনা। ঘটনা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শব্দ গুচ্ছের ভিন্নতর সুরের সন্ধান মেলে। সুরের মেলবন্ধনই লেখনীতে ঐক্যতানের নিদর্শন হয়ে ওঠে। নিজস্বায়নের ভাবনায় ভাবিত বাক্যগুলি নিজেদের গল্প পরিবেশন করে। স্পষ্ট হয়ে ওঠে কাহিনি বিন্যাস বা ঘটনা পরিবেশনের দিক থেকে সে কতটা স্বতন্ত্র, কতটা পরিপক্ক। এই পরিবেশিত ঘটনা বা কাহিনিতেই অনুসন্ধান চালান গবেষকরা। প্রকাশ করেন বিষয়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অভিনবত্ব। পাঠকের সামনে তুলে ধরেন অভিনবত্বের ভাবনায় বিষয়টি কতটা রঞ্জিত হয়ে আছে অথবা রাঙায়িত হওয়ার দাবি রাখে।

# মৃত্যু ও মুক্তির অনন্য সমন্বয় : রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'

মোনালিসা দাস
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ

**সংক্ষিপ্তসার :**
'ডাকঘর' এককভাবে মৃত্যুর বা মুক্তির নাটক নয়। 'ডাকঘর'-এ রয়েছে মৃত্যু ও মুক্তির সমীকরণ। রবীন্দ্রদশর্নের মুক্তিচেতনা ও মৃত্যুচেতনার গভীর রূপায়ণ 'ডাকঘর' নাটকে। এতে উপনিষদের প্রভাবও বতর্মান। মুক্তির ব্যঞ্জনা নিমার্ণের জন্য সমস্ত নাটক জুড়ে মৃত্যুর প্রেক্ষাপট ও বর্ণনা রচিত হয়েছে। শিশু অমলের কল্পনা বিলাসী মন বদ্ধজীবন থেকে মুক্তি পেতে চায় সুদূরের পথে, নিরুদ্দেশের পথে। মুক্ত জীবন তাকে বারেবারে হাতছানি দেয় 'দইওয়ালা', 'ছেলেরদল', 'পথিক' রূপে। প্রহরী আসে মৃত্যুর অনুষঙ্গ নিয়ে। 'ডাকঘর', 'ডাকহরকরা', 'রাজার চিঠি' বিশেষভাবে ব্যঞ্জনাবাহী; সাংকেতিকতার আড়ালে ঈশ্বরের দূত, ঈশ্বরের আহ্বানের কথা বলা হয়েছে। মুক্তিলাভের মাধ্যম মৃত্যু। যে যাত্রাপথে ক্ষণিকের জন্য প্রাণবেগের তরঙ্গকে নাড়িয়ে দেয় সুধা। অমলের হৃদয়ে জাগে অনুরণন। অবশেষে অমলের মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রদশর্নে মৃত্যু ইতিবাচক। তাই অমলের মৃত্যু নবজীবনের দ্বার উদঘাটন। মৃত্যুতেই শেষ কথা নয়। মৃত্যু কেবল বদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি। মৃত্যু হয়ে প্রাণ চিরকাল বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে অমলও।

**মূলশব্দ :** ডাকঘরে রবীন্দ্রদশর্ন, মৃত্যুচেতনা, মুক্তিচেতনা, সীমা-অসীম তত্ত্ব, সুদূরের আহ্বান, মৃত্যু-মুক্তির সমীকরণ , নবজীবনের বার্তা।

**মৃত্যু ও মুক্তির অনন্য সমন্বয় : রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'**

সুধা যেমন অমলকে ভোলেনি, বলেছিল 'সুধা তোমাকে ভোলেনি'; ডাকঘর-এর পাঠকও অমলকে ভোলেনা। নিছক সাহিত্যপ্রীতির কারণেই নয়। হয়তো রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'(১৯১২ প্রকাশিত) পরিসরে ছোটো, কিন্তু সীমিত পরিসরেও স্বল্পক্ষণে পাঠক অনুভব করে এক গভীরতম দশর্নকে। যে দশর্নের মূলে রয়েছে মৃত্যু ও মুক্তি। মৃত্যু ও মুক্তি এই দুই শব্দ বা তত্ত্ব যাই বলিনা কেন তা মানবহৃদয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে সম্পকির্ত। তাই 'ডাকঘর' মুক্তির নাটক। আমরা বলব 'ডাকঘর' মুক্তি ও মৃত্যুর সমীকরণের নাটক। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে অমৃত করে মুক্তিপিপাসু মানবসত্তার

ব্যাকুলতাকে অমলের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। অমলের নবজীবনে মুক্তির পথে মাধ্যম হয়েছে মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুতেই শেষ কথা নয়।

উপনিষদে বলা হয়েছে "মৃত্যোমার্মৃতংগময়"[১] অর্থাৎ "মৃত্যু থেকে আমাদেরকে অমরত্বে নিয়ে চলো"।[২] উপনিষদের ঋষিরা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আত্মার অমৃতলোকে যাত্রার কথা বলেছেন। রবীন্দ্রদশর্নেও আমরা তার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই "আজি লয়ে যাও/ মৃত্যুর সংগ্রাম শেষে নবতর বিজয় যাত্রার/"।[৩] মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সুতীব্র বাসনা ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পর্বে ও সমসাময়িক সাহিত্যে মৃত্যুস্নানে জীবনকে শুচিতা দান করার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রসাহিত্যে বহুস্থানে দেখতে পাই। রবীন্দ্রকাব্যে-গানে-নাটকে বারবার নবজীবনের বার্তা নিয়ে এসেছে মৃত্যু--

"মরণ স্নানে ডুবিয়ে শেষে
সাজাও তব মিলন বেশে
সকল বাধা ঘুচিয়ে ফেলে
বাঁধো বাহুর ডোরে।"[৪]

মৃত্যুতে মানবাত্মা অসীম অনন্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ অনুভব করে।

মৃত্যুর সমগোত্রীয় মুক্তি। 'ডাকঘর' নাটকে মুক্তি এসেছে মৃত্যুর হাত ধরেই। রবীন্দ্রদশর্নে মুক্তিতত্ত্বের মূল সুরটি হল 'সীমার মাঝে অসীমের সাধনা'। এই সাধনার মূল ক্ষেত্রগুলি হল বিশ্বপ্রকৃতি-মানবপ্রকৃতি-সমাজপ্রকৃতি। এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবি হৃদয়ের মিলনের আকাঙ্ক্ষা আবাল্য। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "সে ছিল মুক্ত,আমি ছিলাম বদ্ধ-মিলনের উপায় ছিলনা,সেই জন্য প্রণয়ের আকষর্ন ছিল প্রবল"।[৫] ঠাকুরবাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্টো রবির মতো ডাকঘরের অমলকেও আকষর্ণ করত শ্যামলী নদী, পাঁচমুড়া পাহাড়, দইওয়ালার ডাক। এত গীতি, এত ছন্দ মুখের সামনে দিয়ে বয়ে যায় কিন্তু মুক্তিকামী মন তাকে মমর্চক্ষুতে অনুভব করে, চমর্চক্ষুতে নয়। সৌন্দয্যর্ময় রহস্যময় বিশ্বপ্রকৃতি শত লক্ষ বাহু প্রসার করে আকুল আহ্বান জানায়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অমল বলছে-"আমি চঞ্চল হে/আমি সূদূরের পিয়াসী/আমি আনমনে তার আশায় চেয়ে থাকি বাতায়নে"।[৬] শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাসীদের বক্তৃতা দেওয়ার সময় (১৩২২,৪ঠা পৌষ) রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন- "কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয়ে মিলে, খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে ডাকঘরে কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম"।[৭]

ডাকঘর তিনটি দৃশ্যে বিভক্ত। নাটকটির সূচনা রুগ্ন অমলের চিকিৎসার জন্য পিসেমশাই মাধব দত্তের কবিরাজ ডেকে আনার মধ্যে। মাধব দত্ত ঘোরতর সংসারী। তাই কবিরাজের পুথি পড়া বিদ্যেকে সে বিশ্বাস করে অমলকে একটি ঘরে রুদ্ধ করে রাখে। শরৎ এর মেঘ-রৌদ্র থেকে লুকিয়ে রাখে অমলকে। তাই অমলকে আরও বেশি করে আকষর্ণ করে বিশ্বপ্রকৃতি। দূরের পাহাড়ের ঝরনার জলকে পথচারীর চোখ দিয়ে সে দেখতে পায়। নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দেবার এক বাসনা ব্যক্ত হয় একটি উক্তিতে— "ভালো হলেই কিন্তু আমি চলে যাবো।"[৮] কাজের সঙ্গে জীবনের চলার গতির অসীমতাকে বিশ্বপ্রকৃতির ছন্দ ও সুরে মেলাতে চায় অমল।

অমলের কল্পলোকের যাত্রাপথে মাঝে মাঝে হাতছানি দেয় দইওয়ালা, প্রহরী, ঠাকুরদা, সুধার ডাক। বিশ্বের সবকিছুর মধ্যেই অমল তখন শুনতে পাচ্ছে সীমা-অসীমের সুর। এই ব্যাকুল বাঁশরীর সুর ভেসে এসেছে দইওয়ালার ডাকে। 'দই-দই-ভালো দই'-এর সুর এক মুহূর্তে রচনা করে ফেলে পাঁচমুড়া পাহাড়, শ্যামলী নদীর পারে লালমাটির রাস্তা। রবীন্দ্রমন রোমান্টিক। "হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে" ('বলাকা'/রবীন্দ্রনাথ) ছুটে চলাতেই তাঁর আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ মুক্তির এই ব্যঞ্জনা নির্মাণ করার জন্য মৃত্যুর বার্তার বা মৃত্যুর পটভূমি নিমার্ণ করেছেন সমস্ত নাটক জুড়ে। দইওয়ালা মুক্তির বার্তা দিয়ে চলে যায়। প্রহরী আসে মৃত্যুর অনুষঙ্গ নিয়ে। প্রহরী ঘন্টা বাজায় আর তার ঘন্টা এমন এক দেশে আমাদের নিয়ে যায় সে দেশে আমাদের সকলকে যেতে হবে। প্রহরীর সঙ্গে অমলের কথোপকথনে দেখি অমল বলছে, 'আমার ভারি ইচ্ছে করছে এই সময়ের সঙ্গে চলে যাই........আমার যে বসে থাকতে ভালো লাগছেনা'। আর তখনই প্রহরী ডাকঘর, রাজা, রাজার চিঠি, আসার খবর দিয়ে অমলের মনকে রাজ অভিমুখী করে তুলেছে। অমলকে জানিয়েছে- 'দেখো একদিন তোমার নামেও চিঠি আসবে'। অর্থাৎ মৃত্যুর আগমন ধ্বনি তার ঘন্টায়। হয়তো সে কারনেই রবীন্দ্রনাথ প্রহরীর মুখে 'আমাকে ভয় কর না তুমি' সংলাপটি দিয়েছেন। কিন্তু অমল মৃত্যুভয়হীন। হাউপট ম্যান এর নাটকের হান্নেলও চতুদর্শী কিশোরীর মৃত্যুকে মুক্তি জেনেও বলেছিল-"But now-now I am afraid"[৯] কিন্তু মৃত্যু বা দুঃখের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ ইতিবাচক রূপে দেখেছেন। অমলও মুক্তিব্যাকুল, কিন্তু সে ভীত সন্ত্রস্ত নয়। মৃত্যুকে 'ভুবনমোহন স্বপন' রূপে দেখতে চেয়েছেন হয়তো রবীন্দ্রনাথ।

'ডাকঘর'-এর চিঠির প্রত্যাশায় অমলের হৃদয় উন্মুখ হয়ে থাকে। ডাক হরকরা তো চিঠি বয়ে আনে আর চিঠি পেতে সকলেরই ভালো লাগে। তাই অমলও চায় চিঠি পেতে মোড়লের সঙ্গে পরিচয় করে ডেকে। এই ডাক হরকরা তো রাজার বার্তা তথা ঈশ্বরের বার্তা বয়ে আনবে অমলের কাছে। তাই সে এত তৎপর। ডাকঘরের প্রসঙ্গে ছেলেদের ডেকে ডাক হরকরাদের নাম জেনে নেয় অমল। মৃত্যু দুয়ারের যাত্রাপথে যেমন বিরল মুহূর্তও থাকে, তেমনি থাকে কিছু মানুষের ক্ষণিকের সাক্ষাৎ। ডাকঘর-এর সুধাও তেমনি অসীমের হাতছানি দিয়ে চলে যায়। 'সকাল বেলাকার তারা' অমলের পৃথিবী থেকে মুছে যাওয়ার পূবে তার আগ্রহ ও প্রাণবেগের তরঙ্গকে সুধা নাড়া দিয়ে গিয়েছে। ক্ষণিকের আতিথ্যে চিরত্বের দাবি নিয়ে প্রস্তুত হয় সুধা। হৃদয়ে জাগে মাথুরের ঢেউ। সুধার বৈচিত্র্য কম।  তবে সে রেখে যায় চিরায়ত মুক্তির আকর্ষণ অমলের কাছে। তাই সুধা চলে যায়, কিন্তু অমলের মনে রেখে যায় তার পায়ের মলের ঝমঝম অনুরণন।

নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে দেখি অমল শয্যাগত। অমল ও ফকিররূপী ঠাকুরদার কথোপকথনে মৃত্যুর আগমনকে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিতরূপে বিচ্ছুরিত করেছেন। অমল বলেছে, "আমি যেন দূরের কথাও শুনতে পাচ্ছি"।[১০] একে একে নাটকের শেষ দৃশ্যে উপনীত হয়েছে মোড়ল যার হাত দিয়ে এসেছে রাজার চিঠি। অর্থাৎ মৃত্যুর ছাড়পত্র। এসেছেন রাজ কবিরাজ যিনি মৃত্যুর পরিবেশটিকে রচনা করে দিয়েছেন "প্রদীপের আলো নিভিয়ে দাও-এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক, ওর ঘুম এসেছে"।[১১] সমালোচকদের মতে-"প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়ার তাৎপর্য এই যে, আত্মা নির্বাণ লাভ করেছে.....অমলের ঘুম সংসারের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তির প্রতীক। সে আবার জেগে উঠবে।"[১২] রবীন্দ্রনাথ অমলের মৃত্যুতে অবিশ্বাসী। তাই সুধা ফুল নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করছে-

"ও কখন জাগবে?,

রাজ কবিরাজ এখনই যখন রাজা এসে ডাকবেন"।[১৩]  ঈশ্বরের আহ্বানে তা সম্ভব। এখন আর অমল কোনো বালক নয়, সে ঈশ্বরের দূত। বস্তুত পক্ষে অমলের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সে মৃত্যু আসলে মুক্তি। অমলের মৃত্যুর প্রেক্ষাপট রবীন্দ্রনাথ নাটকে পরিস্ফুটিত করেছেন। অমলের মৃত্যুকালীন চিত্রে সাধারণের মৃত্যুর ছবিই ধরা পড়ে অমলের একটি সংলাপে-"আমার মনে হচ্ছে আমার মা, আমার বাবা যেন শিয়রের

কাছে কথা কচ্ছেন”।[১৪] সাধারণত মৃত্যুকালীন লোকের মুখেই আমরা এই কথাগুলি শুনতে পাই।

আসলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যে এবং ‘ডাকঘর’ নাটকে মৃত্যুকে শুধু জীবনের সমাপ্তি হিসেবে দেখতে চাননি-দেখাতেও চাননি। মৃত্যুর সঙ্গে মুক্তির সমীকরণটি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। মৃত্যুর পর অমল ডাক হরকরার কাজ নিয়ে যাবে। “ঈশ্বরের ডাকহরকরা”—-যার আরেক নাম ঈশ্বরের দূত। অর্থাৎ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবন যেন চিরন্তন হয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেন জীবনের চিরমুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়।

তথ্যসূত্র :

১. স্বামী আত্মশ্রদ্ধানন্দ (সম্পাদক), ‘ছাত্রজীবনে উপনিষদ,’ উদ্বোধন কাযার্লয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৪, ১লা জুন, পৃ. ৪০।

২. তদেব পৃ. ৪০।

৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’ ২২তম খন্ড’ বিশ্বভারতী, ‘প্রান্তিক’ ৭ সংখ্যক কবিতা।

৪. ভট্টাচার্য পিয়ালী, ‘ডাকঘর, সুদূরের ডাকে মুক্তির আনন্দ’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, শ্রাবন, ১৪১৮, পৃ.৬১।

৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘জীবনস্মৃতি’, বিশ্বভারতী, গ্রন্থন বিভাগ, ১৩১৯ গ্রন্থ প্রকাশ, পৃ. ১৬।

৬. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান’, শুভম প্রকাশনা, কলকাতা, প্রকাশ ২০০৮, ৩য় সংস্করণ ২০১৩ জানুয়ারী, পৃ. ৪৭০।

৭. ভট্টাচার্য পিয়ালী, ‘ডাকঘর, সুদূরের ডাকে মুক্তির আনন্দ’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রকাশ শ্রাবণ, ১৪১৮,পৃ.৬২।

৮. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’ (একাদশ খণ্ড) বিশ্বভারতী, ‘কলকাতা, প্রকাশ ১৩৪৯, আষাঢ়, পৃ. ৩৮৫।

৯. দাস পুলিন, ‘মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ’, উদ্দালক পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, প্রকাশ ১৩৯৮, ২৫শে বৈশাখ; পৃ. ১০৪।

১০. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’,একাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী,কলকাতা,প্রকাশ ১৩৯৮, আষাঢ় পৃ. ৪০২।

১১. তদেব, পৃ. ৪০৫।

১২. বিশ্বাস দেবব্রত ও বিশ্বাস আশুতোষ, 'ডাকঘর অনন্ত জীবনবীক্ষা', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৪, পৃ. ১৩৬।

১৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' একাদশ খন্ড' বিশ্বভারতী, 'কলকাতা, প্রকাশ ১৩৪৯, আষাঢ়, পৃ. ৪০৬।

১৪. তদেব, পৃ. ৪০২।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বিশ্বাস দেবব্রত ও বিশ্বাস আশুতোষ, 'ডাকঘর অনন্ত জীবনবীক্ষা', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রথম ও সংস্করণ ২০১৪ মার্চ।

২. সরকার পবিত্র, 'নাট্যমঞ্চ ও নাট্যরূপ', (অখণ্ড সংস্করণ), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৮ ( ফাল্গুন, ১৪১৪)।

# রবীন্দ্র গল্পে নারী চরিত্রের বিশিষ্টতা

অচিন্ত্য দে

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,

করীমপুর পান্না দেবী কলেজ

**সারসংক্ষেপ :**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের পাঠক্রম গ্রহণ করলে পাওয়াযাবে আটান্ন বছরের ইতিহাস। দীর্ঘ এই পরিসরে আমরা শতাধিক রবীন্দ্র গল্পে অসংখ্য চরিত্র পাব। স্বাভাবিকভাবেই যার এক ভাগ নারী । যে নারীরা কন্যা , জায়া , জননী এই তিন রূপেই সমকালের সমাজ সংসারের সঙ্গে সম্পর্কিত । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আদর্শে নারীর উক্ত তিন রূপের বন্ধন স্বীকৃত নয় । তার কাছে নারী – 'নহ মাতা , নহ কন্যা, নহ বঁধু' । সে কেবল নারী রূপেই মহিয়সী হয়ে উঠুক এই তার কাম্য । সুতরাং তার ছোট গল্পের পরিসর তার এই ইপ্সা পূরণের ক্ষেত্র হতেই পারত । কিন্তু গল্পকে সমাজের বাস্তবতাও মানতে হয় । তার সেই ইপ্সার সঙ্গে বাস্তবতার সংঘাত তার ছোট গল্পের নারী চরিত্রগুলিকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল বিবর্তনের মধ্যদিয়ে।

**সূচক শব্দ:** নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বঁধু, বাস্তবতা, সংঘাত, বিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পঞ্চভূত' রচনার 'নরনারী' প্রবন্ধে লিখেছিলেন –

> *'বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নায়িকারই প্রাধান্য। কুন্দ-নন্দিনী এবং সূর্যমুখীর নিকট নগেন্দ্র ম্লান হইয়া আছে। রোহিনী এবং ভ্রমরের নিকট গোবিন্দলাল অদৃশ্য প্রায়। জ্যোতির্ময়ী কপাকুন্ডলার পাশে নবকুমার ক্ষীণ উপগ্রহের ন্যায় .... বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চলভাবে ধূলি-শয়ান এবং রমণী তাহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্তভাবে বিরাজমান।'*

--- বঙ্কিম সাহিত্য পর্যন্ত পর্যালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন । কিন্তু সেই পর্যালোচনার ক্ষেত্রটিকে বাড়িয়ে আমরা যদি রবীন্দ্র সাহিত্য পর্যন্ত চলে আসি , তাহলেও এই মন্তব্যের মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় না । রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ধারার সাহিত্যে নারীর ব্যাপক উপস্থিতি এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এর প্রমান দেয় । যার মধ্যে অন্যতম হল ছোটগল্প । সারা জীবনে তিনি শাতাধিক ছোট গল্প লিখেছিলেন ( মোট – ১১৯ সূত্র – রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : প্রমথনাথ বিশী ) সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই

চরিত্রের উপস্থিতি অসংখ্য। এবং তার একটা বৃহৎ অংশই হল নারী । বিভিন্ন বয়েসের, বিভিন্ন শ্রেনির সেই সব নারীরা তাদের কার্যকারিতা ব্যক্ত করে রবীন্দ্র ছোট গল্পকে বিশিষ্ট করে তুলেছিলেন । অথবা অন্য ভাবে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ তার গল্পের মধ্যদিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন নারী জীবন ও সমজের বহু বিশিষ্ট দিক । নারী সমাজের সেই বিশিষ্টতাই আমাদের আলোচ্য ।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম গল্পটি লিখেছিলেন **১৮৭৭** সালে । গল্পের নাম 'ভিক্ষারিণী', আর শেষ গল্প লিখেছিলেন – **১৯৩৫** সালে যার নাম 'মুসলমানীর'র গল্প । সুতরাং ছোট গল্পের লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সময়কাল আটান্ন বছর । এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের বাংলা তথা ভারতবর্ষের সমাজ জীবনে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিলো । যেমন – সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপরে চড়ে বসেছিলো ধনতান্ত্রিক কাঠামো । জাতীয়তাবোধে আপ্লুত হয়েছিলো শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনন । আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বোধেও উদ্বুদ্ধ ছিলো সেই মনন । সেইসঙ্গে সঞ্চারিত হয়েছিলো বিজ্ঞান এবং শিল্প-কলা -নিষ্ঠা । পাশাপাশি এই সময়কালের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন তীব্র ও নানামুখী আকার নিতে দেখা যায় । আর ঘটেছিলো স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার । এই রকম বাতাবরণে দারুণ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলো এই দেশের নারী সমাজ । রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সূত্রে উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে পরিচিত তো ছিলেনই । উপরন্ত বঙ্গদেশের গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে ছিলো যে বিস্তৃত নারী সমাজ তাদের খবরও তিনি রাখতেন । শিলাইদহের জমিদরিত্ত্ব তাকে সেই সুযোগ দিয়েছিলো । এর ফলে সেই কালের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে গড়ে ওঠা নারী সমাজ সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা রবীন্দ্রনাথের তৈরী হয়ে গিয়েছিলো । তাই তার রচনার মধ্যে নারীদের কথা বলতে গিয়ে কোন রকমের কথার ফানুস সাজিয়ে লোক ঠকানোর প্রয়োজন তার হয় নি। বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং গভীর পর্যবেক্ষণের আলোকে তিনি তার গল্পে প্রকাশ করেছিলেন নারী সমাজের বিচিত্র এবং বিশিষ্ট দিক ।

**লাঞ্ছিত গৃহবধূ :** এই ক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য গল্প 'দেনাপাওনা' । সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের কন্যা 'মস্ত' রায়বাহাদুরের গৃহবঁধূ হয়ে এসে নতুন পারিবারীক সমীকরণের মধ্যে নিজের বেমানান সত্তা টিকিয়ে রাখতে পারেন নি । উচ্চবিত্তের নির্দয় আঘাতে আঘাতে জর্জতিত হয়ে প্রান ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন । এখানে 'গৃহবঁধূ' নিরুপমার মূল অপরাধ তার নিম্ন স্ট্যাটাস । পিতা রামসুন্দরের পণ দিতে পারার

অপারগতা তার প্রতি দুর্ব্যবহারের ইন্ধন হিসাবে কাজ করেছিলো । সেইযুগে সামাজিক বৈষম্যের ফলে তৈরী হওয়া নারীদের বিষময় অবস্থা এই গল্পের মূল ভাষ্য ।
লাঞ্ছিত গৃহবঁধূর দ্বিতীয় নির্দশন 'হৈমন্তী' । এখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রবল ছিলো না । বৈষম্য ছিলো রুচি সংস্কৃতির। যার বিচারে কন্যাকুলের কাছে শ্বশুরকুলকে পঙ্ক-নিমজ্জিত বলে মনে হত । আর সেই পঙ্কের যৎপরনাস্তি নিক্ষেপের দ্বারা পীড়ন চলত গৃহবঁধূর প্রতি । পরিণামে হৈমন্তীর মৃত্যু। অর্থাৎ প্রমাণ হল সামাজিক বৈষম্যের ন্যায় সংস্কৃতিক বৈষম্যও বিষময় করতে পারে হৈমন্তীদের জীবন ।

এছাড়া লাঞ্ছিত বঁধূর সংবাদ আছে 'সুভা' এবং 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে । পশুপ্রেমী মূক কন্যা সুভার বধিরতা গোপন করে বিবাহ দেওয়া হয়েছিলো। স্বাভাবিক ভাবেই শ্বশুর কুলের মূক বঁধূর অস্বাভাবিক আচরণ সহ্য হয়নি। পরিণামে লাঞ্ছনা এবং শ্বশুর গৃহ থেকে বিতারণ। আর পিতৃ- মাতৃহীন কন্যা বিন্দুকে অপ্রকৃতিস্থ পুরুষের সাথে বিবাহ দিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিলো তার সুষ্ঠভাবে বেঁচে থাকার অধিকার । দুই জনেরই দুর্দশার মূল কারণ , তারা পিতৃগৃহের গলগ্রহ হয়েছিলেন ।

এই চার গৃহবঁধূর জীবন চিত্র গল্পের নিরিখে ভিন্ন রূপে প্রকাশ পেলেও আসলে এইগুলি সমকালে একই সমাজ-পটে অঙ্কিত নারী-লাঞ্ছনার বিচিত্র চিত্র । সেই সমাজ যা সামন্ততন্ত্রের চালক শক্তি পুষতন্ত্রের দাপট এবং সদ্য আবির্ভূত ধন্তন্ত্রের অর্থ নির্ভরতার যৌথ উপাদানের দ্বারা কিম্ভুত ভাবে গড়ে উঠেছিলো । নারীরা সেখানে সম্পত্তি বই কিছু না । সেই সম্পত্তির সন্মান এবং স্বাধীনতা পুরুষ ইচ্ছানুসারে প্রাপ্ত বা পরিত্যাজ্য হয় । রবীন্দ্র গল্পে উক্ত নারীরা এই সমাজব্য বস্থার বিষন্ন প্রতিনিধি ।

কর্তব্য পরায়ণা নারী :- রবীন্দ্র গল্পে আবার কয়েকজন এমন বঁধুর দেখা পাওয়া যায় যারা কর্তব্য পরায়ণা , সহনশীলা , সেবাপরায়না - এক কথায় আর্দশ গৃহবঁধূ । যেমন 'প্রতিহিংসা' গল্পের ইন্দ্রানী , 'রাসমনি ছেলে' গল্পের রাসমনি , 'মহামায়া' গল্পের মহামায়া , 'এক রাত্রি' গল্পের সুরবালা , 'নিশিথে' গল্পের দক্ষিণারঞ্জন বাবুর প্রথম পক্ষ বরোদাসুন্দরী দেবী , 'মধ্য বর্তিনী' গল্পের হরসুন্দরী প্রমুখ । এদের জীবনে পতি কিংবা পিতৃ গৃহের আপাত লাঞ্ছনা নেই । স্বামী-সন্তান সহ সংসার জীবনে প্রতক্ষ্য ভাবে কোন জটিলতয় তাদের পড়তে দেখা যায় নি । এদের জীবনে সঙ্কট যা এসেছে তা বাইরের প্রাদুর্ভাব । সে ব্যধি জনিত সঙ্কট হতে পারে , আবার আর্থিক সঙ্কটও হতে পারে । দেখা গেছে সেই সঙ্কটে তারা পীরিত তো হনইনি উপরন্তু সঙ্কট মোচনে তারা স্বামীর প্রধান সহায়ক হয়ে উঠেছিলেন।

লক্ষণীয় নারীর এইরূপ অবস্থা রবীন্দ্রনাথ সেই সমাজ পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতেই নির্মাণ করেছিলেন যে সমাজ পটভূমিতে নিরুপমা, সুভারা নির্মিত হয়েছিলো । এক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই সমকালের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী সমাজের উপর পুরুষতান্ত্রিকতার নিষ্পেষণের যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে । কিন্তু গল্পগুলি ভালোভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যায় এইসব গল্পের নারীদের আপাত সাংসারিক দুর্দশাহীন জীবন আসলে পুরুষদেরই ইচ্ছানুসারে নির্মিত । সেক্ষেত্রে শর্ত হল নারীকে পুরুষের চাহিদা পূরণ করতে হবে এবং পুরুষ সামাজের উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে। উক্ত নারীরা সকলেই সেই শর্তের অনুগামী হয়ে নিজেদের সেবা , কর্তব্য, সহনশীলতা ইত্যাদি দিয়ে গৃহপতিকে আয়েস এবং সুরক্ষা দিয়েগেছে । এমনকি 'মধ্যবর্তিনী' এবং 'নিশিথে' গল্পের দুই মৃত্যু পথযাত্রী স্ত্রী যথাক্রমে বরদাসুন্দরী এবং হরসুন্দরী দেবী নিজেদের অবর্তমানে পতির সুখ-স্বাচ্ছন্দের কথা চিন্তা করে তাদের দ্বিতীয় বিবাহের বন্দোবস্তও করে গিয়েছিলেন । আবার শাস্তি গল্পে দেখা গেছে বাড়ির গৃহকর্তাকে খুনের দায় থেকে মুক্ত করবার দায়িত্ত কাঁধে নিতে হয়েছিলো গৃহবঁধু চন্দরাকে । অর্থাৎ নারীর আপাত লাঞ্ছনাহীন সত্তা আসলে পুরুষতন্ত্রের নিষ্পেষণে নির্বিবাদী নারীর অবদমিত রূপ ।

নারীর আত্মরতি – তবে নিজের অন্তরাত্মাকে অবদমিত করে পুরুষ সমাজের চাহিদাসর্বস্ব জীবনকে চিরকাল সব নারী বয়ে নিয়ে চলেছিলো এমন নয়। তার আকাঙ্ক্ষা , প্রেম , যৌনতা ইত্যাদি যা সে নিজের মতকরে অনুভব করতেন তার সঙ্গে সংসারের চাহিদার সামঞ্জস্য এবং সমর্থন না থাকলেও তারা তার প্রকাশ ঘটিয়ে ছিলেন স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট ভাবে । 'একরাত্রি' গল্পের সুরবালার কথাই ধরা যাক । বিবাহের বহুকাল পরে স্বামী গৃহে অতীতের প্রেমাস্পদ সেকেন্ড মাস্টারের কাছে নিজের উপস্থিতি জানান দেয় শাড়ীর খসখস , গহনার টুং টাং ইত্যাদি নানান কৌশলে। এমনকি ঝড় বাদলের রাতে এই সেকেন্ড মাস্টারের সামনে তার একাকি উপস্থিতির মধ্যে কোন সঙ্কোচ ছিলো না । তিনি যেন সেখানে নীরব অভিব্যক্তি দিয়ে প্রকাশ করছিলেন অতীতের প্রেম-সুধার প্রতি তার নিবিড় আকাঙ্ক্ষা। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের গিরিবালার মধ্যেও ছিলো এমন ভালোবাসার টান । কিন্তু তিনি সুরবালার মতন নীরব অভিব্যক্তিতেই আবদ্ধ থাকেন নি । তাকে জেল ফেরৎ প্রেমিক শশীভূষণের সন্মুখে ভালোবাসার সুভ্র ডালি নিয়ে উপস্থিত থাকতে দেখাযায় । তবে এখানেও তার অন্তরের

আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্থ গোপনই থেকে গেছে । এদের এই অনুভূতি ভাষারূপ পেয়েছিলো ‘কঙ্কাল’ গল্পের কঙ্কাল রূপী মৃত মহিলার আত্ম কথনে।

অবশ্য এদের এই অবচেতন প্রেম বাঙ্ময় করবার অবকাশ রবীন্দ্রনাথ প্রতক্ষ্যভাবে গ্রহণ করেছিলেন অন্য একটি অনবদ্য গল্পে , সেইটি হল ‘নষ্টনীড়’ । এখানে গৃহবঁধূ চারুলতাকে স্পষ্ট ভাবে নিজের প্রণয় চাহিদা প্রকাশ করতে দেখা যায় । দেবর অমলের প্রতি তার টান এতটাই প্রতক্ষ্য হয়ে উঠেছিলো যে স্বামী ভূপতির কাছেও তা অধরা থাকে নি। নারীর এই আপাত অবৈধ প্রেমের উন্মোচন সংসারে যে জটিলতা বহন করে আনে তা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না । রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যে সেইরকম জটিল আবর্তের স্মারক এই গল্পে দেখাও গিয়েছিলো –

> *‘যে নারী অন্তরের মধ্যে মৃত প্রেমের মাধুরীকে বহন করে সংসার তার পক্ষে কত দুঃসহ , স্বামী তার পক্ষে কত বড় বন্ধন , আর সেই নিস্তব্ধ শোকপরায়ণা নারীকে ভালোবাসা স্বামীর পক্ষে কত কঠিন’*

কিন্তু সেই বিচারের নিরিখে নারীকে অপরাধী বানিয়ে তার আত্ম চাহিদার অবদমন ঘটানোর পুরুষতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জারি থাকুক এটাও কাম্য নয় । অন্তত আধুনিক সমাজ তা চায় নি। রবীন্দ্রনাথ সমাজের সেই ভাব ধারা অনুভব করে ‘মনুষ্যত্ত্ব’ প্রবন্ধে লিখে ছিলেন –

> *“ .. বলার সময় এসেছে যে সমগ্র মানুষটির মধ্যে থেকে স্ত্রী লোকটিকে ছেঁটে তাকে বিশেষ অধিকারীর জিম্মায় কুলুপ দিয়ে রাখলে সমস্ত মানব জগতকে বঞ্চিত করা হয় । সেই ফাঁকি যে সমাজে যত বেশি , সেই সমাজে পুরুষেরই তত বেশি দুর্বলতা । সেই সমাজে মেয়েরা বিষম ভার , তাদের জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তাদের জন্ম গ্রহণ পরিবারের পক্ষে সঙ্কট ।’*

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষীয় সমাজ ব্যাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলো বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে । বিশ্বজুড়ে সেই সময় নারীদের স্বাধীকার বোধ উদাত্ত হয়ে ওঠে , পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বদ্ধকুঠুরী থেকে নিজেদের বেরকরে মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় মেলে ধরবার প্রয়াস শুরু হয় তখন থেকে । হেনরিক ইবসেনের ‘ফরসাইট সাগার’ , বার্নাড শ’র ‘আইরিন’ , ইবসনেরই ‘ডল’স হাউস’ – ইত্যাদি রচনাতে সেই পরিস্থিতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা গিয়েছিলো । এই

নব জাগরণের ঢেউ এসে ধাক্কা দিয়েছিলো কলকাতা তথা বঙ্গের সমাজ ভূমিতেও । সেই সময়কালে শিক্ষা , সংস্কৃতি সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারী প্রতিভার উত্থান ছিলো ইতিহাসের স্বাভাবিক ফলস্রুতি । সেই উত্থিত চেতন সত্তা থেকে জন্মলাভ করেছিলো নারীর স্বাধিকার বোধ এবং আত্মস্বতন্ত্রতা । এই সবই রবীন্দ্রনাথের মননশীল অন্তরাত্মায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল । এবং সেই সূত্রে তিনি নারী সমাজের এই বিকাশ-বিবর্তনকে এক সজীব আলেখ্যে ধরে রাখতে তাড়িত হচ্ছিলেন । সেই সময় তারই অনুপ্রেরণাতে সমকালের ভাবভূমীর বাহক রূপে উঠে এসেছিলো 'সবুজপত্র' পত্রিকা । সবুজ পত্রের পৃষ্ঠা আর রবীন্দ্রনাথের শিল্পসত্তা সমকালের নব জাগ্রত ভাব ধারারর প্রেক্ষাপটে এক নতুন মেলবন্ধন । এই বন্ধনেই ধরা দিল সেই যুগের স্বাধিকার বোধে প্রমত্ত আত্ম স্বাতন্ত্রময়ী নারীরা ।

আত্ম স্বাতন্ত্রবোধে উদ্বুদ্ধ নারী :- এই পর্বের প্রথম উদাহরণ হল 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণাল । সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল স্ট্রীটের মেজ বৌ - এই ছিলো তার প্রথম পরিচয়। কিন্তু তিনি তার সেই পরিচিতিকে চ্যালেঞ্জ জানালেন অসহায়া নারী বিন্দুকে সামনে রেখে। তিনি বিন্দুর রক্ষাকর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্বামী ভাশুর সহ গোটা পারিপার্শ্বের প্রতিপক্ষে । স্বাভাবিক ভাবেই সেই অসম লড়াইতে তিনি জয়ী হতে পারে নি । কিন্তু বিষন্ন চিত্তে সেই পরাজয় তিনি মেনেও নেন নি । প্রতিশোধ নিয়েছিলেন প্রতিপক্ষ পুরুষ সমাজকে প্রত্যাখ্যান করে । গল্পে দেখা যায় '২৭ নম্বর মাখন বড়াল স্ট্রিটের' পরিচিতিকে ছিন্ন করে শুধু 'মৃণাল' পরিচয় নিয়ে তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন নতুন এক জগতে যেখানে ঈশ্বর ব্যতিত কারুর কাছে নিজেকে নত করবার দরকার পড়ে না।

'পয়লা নম্বর' গল্পের অনিলা আর একভাবে নিজের স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন । স্বামী অদ্বৈতচরণ এবং প্রেমিক সিতাংশু মৌলি কেউই তাকে প্রকৃত নারী হিসাবে মর্যাদা দিতে পারেননি কিংবা চাননি । উভয়েই অনিলাকে দেখেছিলেন নিজস্ব পৌরুষের গন্ডি থেকে । অনিলাও সেই পুরুষতান্ত্রিক ভাবধারাকে প্রাত্যাঘাত করেছেন নিজেকে উভয়ের ধরা ছোঁয়ার বাইরে নিয়ে গিয়ে ।

'বোষ্টমী' গল্পের মধ্যেও দেখতে পাই নারীর আত্মস্বাতন্ত্র বোধের প্রাধান্য। বোষ্টমী দেখেছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ গুরুদেব তার স্নান- সিক্ত শরীরের প্রতি কামাসক্ত দৃষ্টিতে নিবিষ্ট । সেই দর্শনই গুরুদেবের প্রতি ভক্তির বন্ধন ছিন্ন করে তাকে সরিয়ে আনে দূর নির্বাসনে ।

এইভাবেই নারী চরিত্রগুলি আত্ম স্বাধীকারকে প্রাধান্য দিয়ে পুরুষ সমাজের নিরাপদ আশ্রয় থেকে নিজেদের বেরকরে এনেছিলেন । কিন্তু এদের এই আত্মবোধ মর্যাদার দিক থেকে গুরুত্তপূর্ণ হলেও আদতে তা অসম্পূর্ণ এবং পরিণাম শূন্য । কেননা একাকী জীবন বেছে নেওয়ার পরে এদেরকে মূলত সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে দেখা যায় । মৃণাল এবং বোষ্টমী পরম পুরুষের সাধনাতে আত্ম নিমগ্ন, আর অনিলা নিরুদ্দেশী । রবীন্দ্রনাথ পরিণামের এই দুর্বলতা ঘুচিয়ে ছিলেন 'অপরিচিতা'গল্পের কল্যানী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে । বিবাহের যৌতুককে কেন্দ্র করে তার বিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিলো । কিন্তু তার বিবাহভ্রষ্ট জীবনে শূন্যতা তো আসেইনি উপরন্তু সামাজিক কর্মে তাকে প্রীত চিত্তে সংযুক্ত হতে দেখাযায় । আরো এক ধাপ এগিয়ে ছিলেন 'বদনাম' গল্পের সৌদামিনী । তিনি পুলিশের বড় কর্তার গৃহিনী হয়েও ব্রিটিশ শাসনের শাসানি উপেক্ষা করে সখ্যতা রেখেগেছেন স্বদেশী যুবক অনিল মিত্রের সঙ্গে । নিষিদ্ধ যুবকের সঙ্গে তার এই সংযোগ আসলে আত্ম স্বাতন্ত্রবোধের পরিপ্রেক্ষিতে এক গোপন বিদ্রোহ।

নারী স্বাধীকার বোধের অন্তিম উদাহরণ 'তিন সঙ্গী'র কন্যা ত্রয় । 'ল্যাবরেটরী'র সোহিনী , 'রবিবারে'র বিভা আর ' শেষ কথা'র অচিরা । সোহিনীকে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছিলেন একেবারে অন্য ধাতুর মানুষ করে । কন্যা ,প্রেয়সী এবং জননী – এই তিন পরিচয়ের দ্বারা নারীর যে বন্ধন সেই বন্ধনকে দুই পায়ে ডলে দিয়েছিলেন সোহিনী । তিনি শুধুই নারী । তার কাছে বিবাহ কোন সংস্কার নয় এবং বয়স বা জাত-পাত এই বিবাহ সম্পর্কের কোনরূপ নির্ণায়ক বিষয় হিসাবে বিবেচিতও নয় । অতএব পিতার বয়সী বাঙালি ধন্যাঢ নন্দকিশোর তার মতন পাঞ্জাবী নারীর পতি হতে পারে । তার কাছে যৌনতা নিয়েও কোন সংস্কার নেই । তাই সন্তান জন্ম দেবার জন্য তার স্বামীকে প্রয়োজন হয়না । আবার সন্তানও তার কাছে কোন আবেগের বন্ধন নয় । তাই সন্তান তার উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিবন্ধক হলেই খুনের হুমকি পায় । এইভাবে সোহিনী সামাজিক বন্ধন , রক্তের সম্পর্ক ইত্যাদি তুচ্ছ করে প্রমান করে নারী হিসাবে নিজের মূল্যই শেষ কথা তার কাছে । গল্পে ল্যাবরেটরীকে উপলক্ষ করে কেবল এই মুল্যটুকু রক্ষা করতেই তিনি দিনপাত করেছিলেন। অচিরার মধ্যে অবশ্য এতটা 'ক্যারেকটারের' তেজ ছিলো না । কিন্তু তিনিও স্বাধিকার বোধে প্রমত্ত্ব নারী । তাই ভালোবাসার পুরুষ ভবতোষ তার কাছথেকে দূরে চলে গেলেও তিনি ভেঙ্গেতো পরেনই নি বরং ভালোবাসার আদর্শকে বুকে নিয়ে খুঁজে নিয়েছিলেন জীবনের নতুন ছন্দ । সেখানে না আছে প্রেমিক ভবতোষ না আছে অনুরক্ত পুরুষ নবীন মাধব। সেই

ছন্দবদ্ধ জীবন তাকে দিয়ে বলায় – ‘ ..সে( ভবতোষ ) আর আমার জীবনের প্রথম ভালোবাসা এক নয় । এখন আমার কাছে সেই ভালোবাসা ইম্পার্সোনাল। কোন আধারের দরকার নেই ’ । আর এক কন্যা বিভার আত্ম স্বাতন্ত্রবোধ প্রকাশ পেয়েছিলো বিজ্ঞান সাধক অমর বাবুর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার মধ্য দিয়ে । যদিও তার ভালোবাসার পুরুষ ছিলেন অন্য । কিন্তু তিনি সেই খামখেয়ালী প্রেমিক অভির ইচ্ছাকে গুরুত্ব না দিয়ে বিজ্ঞান নিষ্ঠ অমরনাথ বাবুকে সহায়তা দান করেছিলেন তার অর্থ-সম্পত্তির সদর্থক ব্যবহারের সম্ভবনার কথা চিন্তা করে। তার ভাবনার এই স্বকীয়তা তাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বোধে উজ্জ্বল করে তোলে ।

এই ভাবে দীর্ঘ আটান্নবছরের ববীন্দ্র সাধনাকে অধ্যয়ন করে দেখতে পাই নারী সমাজ তার সৃষ্টিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । নারীর নানা রূপ বহু বিচিত্র ভাবে তার রচনা তে ধরা দিয়েছে । সেই রূপের পাথারে এসেছে বিবর্তনের ঢেউ । যে নারী ছিলো সামাজ-সংসারের হাতে বন্দিনী এবং নিষ্পাষিতা , কালের নিয়মে সেই নারীকেই সমাজের উপর প্রবল ভাবে কর্তৃত্ব করতে দেখাগেল । পুরুষ চরিত্র সেখানে একেবারেই ম্লান । আসলে নারী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটা মৌলিক আদর্শ ছিলো এই – ‘ নহ মাতা, নহ কন্য, নহ বঁধূ’ – সে হবে শুধুই নারী । পুরুষ সমাজ নির্দেশিত কোন পরিচয়েই সে আবদ্ধ থাকবে না । যদিও কালের নিয়মকে মান্যতা দিতে গিয়ে নিরুপমা থেকে চারুলতা - এর মধ্যে প্রায় কোন নারীকেই তিনি এই মর্যাদায় দাঁড় করাতে পারেন নি । মৃণাল থেকে তার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছিলো । পূর্ণাতা পেয়েছিলো সোহিনীতে এসে। বিবর্তনের পথে বাহিত হয়ে এমন পূর্ণতা লাভেই রবীন্দ্র গল্পের নারী চরিত্রগুলি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলো । প্রমথনাথ বিশী মহাশয় যর্থই লিখেছিলেন –

> *‘ছোট খাটো কর্তব্য সামাধা এবং ছোট খাটো সুখ দুঃখের চক্রাবর্ত পালনের দ্বারা তাহারা এমন একটি সম্পূর্ণতা ও সৌসম্য লাভ করিয়াছে যাহা পুরুষ চরিত্রে একান্ত বিরল । পুরুষ চরিত্রগুলি হয়তো বৃহত্তর কিন্তু নারী চরিত্রগুলি পূর্ণতর ।’*

**সহায়ক গ্রন্থ :**

রবীন্দ্ররচনাবলী – বিশ্বভারতী প্রকাশনা

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প – প্রমথ নাথ বিশী - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স ।

# মঙ্গলকাব্যে অভিনবত্ব প্রসঙ্গ ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’

নিরু বর্মন

গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

**সারসংক্ষেপ:**

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে প্রধান ত্রিধারা, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান শাখা হল মঙ্গলকাব্য। বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনই এই মঙ্গলকাব্যগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তবে সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্যও ভিন্ন হতে থাকে। যেমন মঙ্গলকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ট লেখক ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের রচিত ‘অন্নদামঙ্গল’ (১৭৫২) কাব্যটিতে আমরা দেখি দেবীমাহাত্ম্য গৌণ্য হয়ে পৃষ্টপোষক রাজার প্রশস্তি কীর্তনই মুখ্য হয়ে উঠেছে। ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত আদর্শ ও রীতি মেনেই রচিত। তবে তাঁর কাব্যে যেন পুরাতন বস্তুকে নতুন আঁধারে নতুন ভঙ্গীতে পরিবেশণ করা হয়েছে। তাঁর কাব্য পাঠ করে মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক কাহিনির মধ্যেও বহিঃরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয় দিক থেকে আমরা পাই নতুনত্বের স্বাদ।

**সূচকশব্দ:** ত্রিধারা, মঙ্গলকাব্য, মাহাত্ম্য, প্রশস্তি, পৃষ্টপোষক, ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, গতানুগতিক, অভিনবত্ব, বহিঃরঙ্গ, অন্তরঙ্গ, পরিবেশন ইত্যাদি।

“নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।।”[১]

মঙ্গলকাব্যের অন্তিম পর্বের শ্রেষ্ঠতম কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে বারবার ধ্বনিত হয়েছে ‘নূতন মঙ্গল’ এর বার্তা। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক ধারায় অভিনবত্বে ভরপুর এই ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য। তবে প্রথানুসরণ থেকে সরে আসা কোন কালেই সহজ কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন পড়ে অসাধারণ কবিত্ব শক্তির। প্রয়োজন হয় কবির দৃঢ় প্রত্যয়ের। প্রতিভাধর এই কবি তাঁর অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যে পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলেছেন ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে। আর তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম প্রতিভাধর কবি ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য মঙ্গলকাব্যের আদলে লেখা হলেও আমাদের কাছে রসাবেদনে ভিন্ন হয়ে ধরা দেয়।

ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। কাব্যে তিনি রচনাকাল জ্ঞাপক পদের উল্লেখও করেছেন-

"বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।।"[২]

অর্থাৎ ১৬৭৪ শকাব্দ বা ১৭৫২-৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর কাব্য রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব কাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক আছে, তাঁর মৃত্যু হয় ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি তাঁর পরিণত বয়সেরই (৪০) রচনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একটু একটু করে পাল্টে যাওয়া বাংলার জাতীয় জীবনকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি। তাই তাঁর কাব্যের পরতে পরতে দেখি সমকালের গভীর ছাপ। আসলে ভারতচন্দ্রের কাব্যের অভিনবত্ব প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে কবির জীবন ও সমকালের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারনা থাকা প্রয়োজন। কেননা সমকালের দাবি মেনেই যেমন তাঁর কাব্যটি রচিত হয়েছিল, আবার ব্যাক্তিগত জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতকে সেইসূত্রে তিনি কাব্য রচনায় হাতিয়ার করেছিলেন। ভাগ্য বিড়ম্বিত এই কবির আবির্ভাব হয়েছিল এক অবক্ষয় কবলিত অস্থির জাতীয় জীবনের প্রেক্ষাপটে। রাজনৈতিক গোলযোগ, বর্গী আক্রমণে অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনা, বিদেশী বণিক গোষ্ঠীর সংস্পর্শে বাংলায় তখন পরিবর্তনের হাওয়া ভাসছিল। দেবতার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি মানুষের বিশ্বাসে কোথায় যেন একটা সংশয়ের আবহ কাজ করছিল। বাংলা সাহিত্যেও যার প্রতিফলন ঘটতে থাকে। এই সময়ের সাহিত্য নিয়ে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন-

*"সাহিত্যেও যে আধুনিকতার খোলা হাওয়ার হালকা ছোঁওয়া লাগে নাই তাহা নয়। সে হাওয়ার স্পর্শ যে লেখকরা পাইয়াছিলেন তাঁহারা দেবদেবীর মঙ্গল পাঞ্চালিকা লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের রচনায় পূর্বতন লেখকের ভক্তিরস অর্থাৎ দৃঢ়-সবল আস্থা নাই, যেটুকু আছে তাহা অনেকটাই গতানুগতিক।"*[৩]

ভারতচন্দ্রের মত যুগন্ধর কবি পাল্টে যাওয়া এই যুগের হাওয়ায় যে গভীরভাবে আলোড়িত হবেন তা বলাইবাহুল্য। যুগ সচেতন এই কবির কাব্যে সেই যুগের লক্ষণ গুলি বরং বেশি করে ধরা দিয়েছিল। তাঁর কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' হয়ে উঠেছে সেই যুগের প্রতিবিম্ব। সমকালীন সময়ের সাধারণ মানুষের আর্থিক দীনতার চিত্র এবং একই সঙ্গে সামন্তপ্রভুদের রুচিহীন ভোগবিলাস কোনটাই কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। একথা সত্য যে

রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রকে রাজসভার আলোকউজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো পরিবেশে কাব্য রচনা করতে হয়েছিল। আশ্রয়দাতা রাজার মনোরঞ্জন করতে হয়েছিল তাঁকে। আর তাই সমাজবাস্তবতার খুঁটিনাটি তথ্য তুলে না ধরে বরং অন্য এক কৌশলে সমকালকে তুলে ধরলেন তাঁর কাব্যে। যেখানে সমাজমানব অপেক্ষা অধিক প্রাধান্য পেল সমাজমানস।

অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের জীবনপথ কিন্তু মোটেও মসৃণ ছিল না। 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংগ্রহ 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৫৫) থেকে ভারতচন্দ্রের নানা ঘটনাবহুল জীবনের কথা আমরা জানতে পারি। ধনী ভূস্বামীর সন্তান হয়েও তাঁকে বারবার ভাগ্যবিড়ম্বনার কবলে পড়তে হয়েছিল। অবশ্য মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কল্যাণেই তাঁর ভাগ্যচক্রের গতি পরিবর্তন হয়। মহারাজা তাঁর অন্নসংস্থান ও আশ্রয়ের ব্যাবস্থা করে দেন। মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় কৃতবিদ্য এই কবিকে সভাকবি নিযুক্ত করেন।[৪] সরস্বতীর বরপুত্র এই কবি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ অন্নদামঙ্গল কাব্যে তাই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর পরিবারের প্রশস্তি কীর্তন করে দায়মুক্ত হতে চেয়েছেন। কিন্তু এই বাধ্যবাধকতায় তাঁর বহুমুখী পাণ্ডিত্যের দীপ্তি স্থিমিত হয়ে যায়নি। রাজ প্রশস্তির মধ্যেও ভারতচন্দ্রের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সজাগ ছিল। আর তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাঙ্গন ধরা ধর্মীয় সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির অন্তঃসারশূন্য ফাঁপা আড়ম্বরকে ব্যঙ্গের কষাঘাতে তুলে ধরা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়নি।

## ২

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত আদর্শ ও রীতি মেনেই রচিত। তবে তাঁর কাব্যে যেন পুরাতন বস্তুকে নতুন আঁধারে নতুন ভঙ্গীতে পরিবেশণ করা হয়েছে। তাঁর কাব্য পাঠ করে মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক কাহিনির মধ্যেও বহিঃরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয় দিক থেকে আমরা পাই নতুনত্বের স্বাদ। প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের চতুরঙ্গ কাহিনি কাঠামোয় তিনি অভিনবত্ব নিয়ে আসলেন। বন্দনা খণ্ড, গ্রন্থোৎপত্তির কাহিনি সহ তাঁর কাব্য তিন খণ্ডে বিভক্ত। যথা অন্নদামঙ্গল বা দেবখণ্ড, বিদ্যাসুন্দর বা নরখণ্ডের আঁধারে লৌকিক প্রণয় কাহিনি, অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ অর্থাৎ ঐতিহাসিক কাহিনি। এই তিন কাহিনির মধ্যে যে সূক্ষ্ম যোগসূত্র তা হল দেবী অন্নদার প্রসঙ্গ। এই অন্নদাই আবার পরের দুই খণ্ডে দেবী কালিকা ও দেবী অন্নপূর্ণা। তবে এই সামান্য যোগসূত্রটি বাদ দিলে তাঁর কাব্যের তিনটি অংশকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রই বলা যায়। তবে কাব্য নাম যেহেতু 'অন্নদামঙ্গল', তাই মঙ্গলকাব্যের প্রথাসিদ্ধ রীতি অনুসারে কবির মূল লক্ষ্য হয়া উচিত

ছিল দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য কীর্তন। কিন্তু অন্নদামঙ্গল পাঠ করে আমরা অনুভব করি দেবী অন্নদা নয় বরং আশ্রয়দাতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গুণকীর্তন ও তাঁর বংশের প্রতি দেবীর অপার কৃপাদৃষ্টির বর্ণনাই যেন কবির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে যেখানে কবিরা দেবতার স্বপ্নাদেশ পেয়ে কাব্য রচনার কথা বলেছেন, ভারতচন্দ্র এই জায়গাতে কিছুটা অভিনবত্ব নিয়ে আসলেন। অন্নদামঙ্গলে দেখি প্রথমে স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন কবির পৃষ্টপোষক-

“অন্নপূর্ণা ভগবতী মূর্তি ধরিয়া।
স্বপন কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া।।

.... ..... .....

তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও।।”[৫]

স্বপ্নাদেশের মধ্য দিয়েও কবি যেন নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করতে চেয়েছেন। তাই স্বপ্নাদেশ পাওয়ার কৃতিত্বও তিনি আশ্রয়দাতা রাজাকেই দিতে চাইলেন। কেননা ‘রায় গুণাকর’এর মূল লক্ষ্য ছিল রাজার গুনকীর্তন করা, দেবী মাহাত্ম্য সেখানে গৌণ। পরে অবশ্য দেবী অন্নপূর্ণা কবিকেও স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন-

“অন্নপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে।
স্বপন কহিলা মাতা তাঁর মাতৃবেশে।।
অরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী।
তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী।।
কৃষ্ণ চন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে।
মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোষহ আমারে।।”[৬]

দেবী অন্নদা এখানে স্বরূপে নয়, কবির পরলোকগতা জননীর রূপ ধরে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। দেবীর এই রূপে স্বপ্নাদেশ দেওয়ার বর্ণনা তাঁর পূর্বের আর কোন মঙ্গলকাব্যে ব্যবহৃত হয়নি। অলৌকিক দেবী নয় বরং কবি স্বপ্নে বাস্তবের জননীকে দেখতে পেলেন। মঙ্গলকাব্য ধারায় এ এক অভিনব ঘটনা।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে সমসাময়িক বাংলা তথা ভারতবর্ষের নানা অনুষঙ্গ প্রবল ভাবেই উঠে এসেছে। ইতিহাসের নানা ঘটনাবলিকে মঙ্গলকাব্যের বিষয়ভূত করে নেওয়ার প্রবণতা কবির ইতিহাস সচেতনতারই পরিচয় দেয়। তাঁর পূর্বের মঙ্গলকাব্যগুলিতেও ইতিহাসের উপাদান ছিল, তবে তা অন্নদামঙ্গলের মত সুস্পষ্ট

তথ্যযুক্ত ছিল না। বাংলাদেশে চণ্ডীমঙ্গলের গুজরাট নগর ও সিংহল রাজ্যের খোঁজ আজও মেলেনি বা মনসামঙ্গলের চম্পকনগর ও উজানীনগর শুধু গ্রামের নাম হিসাবেই রয়ে গেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সত্যতা শুধু মেলে কবির ব্যাক্তিগত আত্মপরিচয় অংশ থেকে। কবির বংশ পরিচয়, বাসস্থান, আশ্রয়দাতা রাজা বা জমিদারের নাম ছাড়া বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার কথা জানা যায় না। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রথম খণ্ডে বর্ণিত নবাব আলীবর্দী খাঁ কর্তৃক কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে বারো লক্ষ টাকা নজরানা দাবী করা এবং অনাদায়ে মহারাজকে কারারুদ্ধ করা, বর্গী হাঙ্গামা ও তার ফলে দেশবাসীর ব্যাপক দূর্দশার চিত্র ঐতিহাসিক সত্য। “আলিবর্দীর সময় বর্গীর আক্রমণ বছরে বছরে হ’ত। কবি ভারতচন্দ্র তখন অন্নদামঙ্গল লিখছেন। তিনি নিজে বর্গীর হাঙ্গামার পরোক্ষ ভূক্তভোগী। অন্নদামঙ্গলে তাঁর বিখ্যাত উক্তি ‘নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়’ বর্গীর হাঙ্গামা-প্রসঙ্গে।”[৭] কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ ‘বিদ্যাসুন্দর’ এ বর্ধমান তালুকাটির যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন তার বাস্তব সত্যতা বর্তমানের বর্ধমান শহরের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমন করলেই বোঝা যায়। ভারতচন্দ্রের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায় রাজবাড়ির সৌন্দর্যময় পরিকাঠামো। আবার এই কাব্যের তৃতীয় ভাগ ‘মানসিংহ’ ঐতিহাসিক আখ্যান। বাংলার অন্যতম বারোভুঁইয়া প্রতাপাদিত্য ও মুঘল সুবাদার মানসিংহের বিরোধ কাহিনি অবলম্বনে রচিত। তবে প্রতাপাদিত্যের পরাভব ও মানসিংহের বিজয় অংশটুকুই শুধু ইতিহাস সমর্থিত। কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপিতামহ ভবানন্দ মজুমদারের সহযোগিতা, প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করে বাদশার কাছে নিয়ে যাওয়া সহ কাব্যের বাকি অংশ কবির কল্পনাপ্রসূত, ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন। একথা সত্য যে ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্য রচনা করতে গিয়ে সচেতন ভাবেই অনেক সময় ইতিহাসের বাস্তব ঘটনাবলীকে পৌরাণিকতার আঁধারে পরিবেশণ করেছিলেন। তবু বলতেই হয় মঙ্গলকাব্যের ধারায় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেই প্রথম দেশকালের ছাপ সুনির্দিষ্ট ভাবে পড়েছিল।

মঙ্গলকাব্য সূচনালগ্ন থেকেই ছিল দেবদেবী কেন্দ্রিক। দেবতার মাহাত্ম কীর্তন করাই এই জাতীয় কাব্য গুলির মূখ্য উদ্দেশ্য। সেই সূত্রে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও দেবতার প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু এই কাব্যে ধর্মের বন্ধন শিথিল। ধর্মের আবরণ ভেদ করে মানব জীবনের ব্যাক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আসলে ভারতচন্দ্র ছিলেন অবক্ষয় কবলিত অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ। এই সময়ের জাতীয় জীবনে দেবতার প্রতি সংশয়ের প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হতে থাকে। কেননা স্বৈরাচারী শাসকের

শোষনে অর্থনৈতিক সংকটে ভুগতে থাকা দেশবাসীর প্রতি দেবতার দয়া বর্ষিত হয়নি। আবার বিদেশী বণিক গোষ্ঠীর সংস্পর্শও দেবতার প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গ হওয়ার কারন হতে পারে। দেশকাল সচেতন কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যেও এই আধুনিক মানস লক্ষণের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই তাঁর কাব্যে দেখি গ্রাম্য বালকেরা ভিখারীরূপী দেবাদিদেব মহাদেবকে উপহাস করেছে-

"কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া বাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।।
........ ........ ........
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেওহ গায় দেয় ফেলাইয়া।।"[৮]

দেবতা এখানে চরমতম উপহাসের পাত্র হয়েছে। দেবতার উপরে মানুষের আস্তা যে ক্রমেই কমে আসছিল তা দেবাদিবের উপর ছাই মাটি নিক্ষেপ থেকেই বোঝা যায়। আবার দেবী অন্নপূর্ণার পাদস্পর্শে কাঠের সেঁউতী সোনার সেঁউতীতে রূপান্তরিত হলে ঈশ্বরী পাটনীর অভিমত 'এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।' দেবতা অথচ সংশয়! ঈশ্বরীর ভাবনাতে কোথায় যেন একটা ক্ষীণ অবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়েছে। গোটা কাব্য জুড়েই দেবতার প্রতি ভক্তিতে মানুষের অবিশ্বাসের ছায়া। তাই তো তাঁর কাব্যে মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক ধারার ভক্তিরস নয় প্রাধান্য পেয়েছে আদিরস ও হাস্যরস।

মঙ্গলকাব্যে সুরের একঘেয়েমি দূর করার জন্য পরিচ্ছেদ বা পালার শীর্ষদেশে স্বতন্ত্র ধুয়া বা ধ্রুবপদ ব্যবহার করা হত। ভারতচন্দ্র এই ধ্রুবপদের ব্যাবহারে চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করেছেন। আধুনিক কালের গীতিকবিতার পূর্বাভাস অন্নদামঙ্গলে ব্যবহৃত ধ্রুবপদে লক্ষ্য করা যায়। কাব্যে এমন অনেক পদ আছে যেখানে কবির ব্যক্তি হৃদয়ের আর্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

"কে তোমা চিনিতে পারে গো মা।
বেদে সীমা দিতে নারে।।
কত মায়া কর কত মায়া ধর।
হেরি হরি হর হারে।।
জিতজরামর হয় সেই নর
তুমি দয়া কর যারে।।"[৯]

এই পদটিতে দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে কবির ব্যক্তি হৃদয়ের গভীর আকুতিও প্রকাশ পেয়েছে। অন্নদামঙ্গলে এমন অনেক খণ্ড কবিতা যেগুলিকে অনায়াসে গীতিকবিতার পর্যায় ভুক্ত করা চলে। তাই প্রখ্যাত সমালোচক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –'ব্যক্তিভাব প্রধান গীতিকবিতার রূপ ও রস আধুনিক কালের ব্যাপার। দেবভাব-প্রধান মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিনিষ্ঠ গীতিকবিতার ততটা প্রচলন না হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু ভারতচন্দ্র আপনার অজ্ঞাতসারে গীতিকবিতার পথ খনন করিয়া গিয়াছেন।"[১০] আবার কোন কোন খণ্ড কবিতায় দেবতার সামনে কবির ব্যক্তি অধিকার আদায়ের দাবি প্রস্ফুটিত হয়েছে-

"ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে।।

......... ....... ..... ..........

নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।"[১১]

দেবতার খামখেয়ালিপনার বিরূদ্ধে কবির এই অধিকার আদায়ের দাবি যেন আধুনিক কালের প্রতিবাদের ভাষাকেই ব্যক্ত করেছে। এভাবেই কবির ব্যক্তি অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলেই অন্নদামঙ্গল কাব্য অন্তরধর্মে হয়ে উঠেছে 'নূতন মঙ্গল'।

রাজসভা কবি ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল রচনা করতে গিয়ে অসাধারণ শিল্প দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এবিষয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সচেতন শিল্পী। শব্দ নির্বাচন ও তার যথাযথ প্রয়োগ তাঁর শিল্প দক্ষতার অন্যতম প্রধান গুণ। চরিত্র ধর্ম বজায় রেখেই তিনি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। পৌরানিক প্রসঙ্গ উত্থাপনে তৎসম শব্দ, দরবারের ভাষার ক্ষেত্রে তৎকালীন প্রচলিত আরবী, ফারসি শব্দ আবার পারিবারিক কাহিনি বর্ণনায় প্রতিদিনের ব্যবহার্য ও সর্বজনের বোধগম্য ভাষাই ব্যবহার করেছেন। শব্দ সহযোগে ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগে আশ্চর্য কুশলতা দেখিয়েছেন তিনি। "ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে সচেতনভাবে শিল্পীরীতির অনুসরন করিয়াছেন।"[১২] বহুভাষাবিদ এই কবি বাংলা, সংস্কৃতের পাশাপাশি আরবি, ফারসী থেকে শব্দ গ্রহণ করে কাব্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। আর সরস ভাষায় কাব্য রচনা করার অভিপ্রায় তো কবির নিজের কথাতেই ব্যক্ত হয়েছে-

"পড়িয়াছি সেই মতো বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।।

না রবে প্রসাদগুন না হবে রসাল।
অতএব কহিভাষা যাবনী মিশাল।।"[১৩]

অর্থাৎ রাজসভার নাগরিক সভাসদদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে তাঁর কাব্যকে 'রসাল' করার জন্য কাব্যের 'প্রসাদগুন' বৃদ্ধি করে ভারতচন্দ্র একজন সচেতন শিল্পীর দায়িত্ব নিভিয়েছেন। মঙ্গলকাব্য ধারার অপর কোন কবির রচনায় আমরা এই শিল্প সচেতনতার পরিচয় পাই না।

ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে ছন্দ ও অলংকারের প্রয়োগ নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। আর এক্ষেত্রে গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে তিনি যে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা শুধু মঙ্গলকাব্যে নতুন নয়, পরবর্তী কালের অনেক আধুনিক কবিকেই মার্গ দর্শন করেছিল। তাঁর কাব্যের বৈচিত্র্য সাধনে এই ছন্দ-অলংকারগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের বৈচিত্র্য সাধনের পাশাপাশি বহু সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপ দান করেছিলেন তিনি। যেমন- দক্ষালয়ে সতীর দেহত্যাগের পর ভূতনাথের অনুচর ভূতপ্রেতগণ দক্ষ যজ্ঞনাশে উদ্যত হয়ে দক্ষের বিনাশ সাধন করে। তাদের সেই উদ্দমতাকে কবি সংস্কৃত তুনক ছন্দের ধ্বনি ঝংকারে ফুটিয়ে তুলেছেন-

"মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহ নাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের ছন্দ বন্ধ বাড়িছে।।"[১৪]

আবার সতীর অকাল মৃত্যুতে বিরহী শিবের অন্তরে যে ধ্বংসাত্মক চেতনা জাগ্রত হয়েছিল কবি সেই ব্যাপারটিকে ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে প্রকাশ করেছেন-

"মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম ভভম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে।।"[১৫]

রাজসভার এই কবি নাগরিক সভাসদবর্গকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করার জন্য কাব্যের বহিরঙ্গ প্রসাধন কলার দিকে অত্যধিক মনোযোগ দিয়েছিলেন। এই কারণে তাঁর কাব্যে অলংকারের বাহুল্য ঘটেছে। শব্দালংকার ও অর্থালংকার উভয় প্রকার অলংকার তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। কাব্যের রূপসৌন্দর্য বৃদ্ধিতে এই অলংকারগুলি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর কাব্যের কয়টি উৎকৃষ্ট অলংকারের উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে-

ক. অতিবড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুন।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন।।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।

কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ অহর্নিশ।।[১৬] (শ্লেষ)

খ. বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির। [১৭](উপমা)

গ. আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।।[১৮](যমক)

মঙ্গলকাব্যে শুধু নয় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আর কোন কবির কাব্যে আমরা অলংকারের এত প্রাচুর্য দেখতে পাই না। বাংলা অলংকার গ্রন্থগুলি রচনার সময় দৃষ্টান্ত হিসেবে ভারতচন্দ্রের কাব্য থেকেই সবথেকে বেশি অলংকার গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

মঙ্গলকাব্যের অন্তিম পর্বের এই কবি তাঁর মণিমুক্ত খচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যের জন্য একদিকে যেমন প্রশংসিত হয়েছেন, আবার একই সঙ্গে তাঁকে নিন্দার ভাগীদারও হতে হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ তিনি তাঁর কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর অংশে অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। অবশ্য পরবর্তী কালে অনেক যুক্তিবাদী চিন্তাবিদেরা ভারতচন্দ্রের কাব্যশৈলীর গুণকীর্তন করেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধের অন্যতম প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) ভারতচন্দ্রের কাব্যের অশ্লীলতার প্রসঙ্গকে আমল না দিয়ে পূর্ববর্তী খ্যাতনামা কবিদের কাব্যেও যে আদিরস ছিল সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য-

> *"যে দোষে প্রাচীন কবিরা প্রায় সকলেই সমান দোষী, সে দোষের জন্য একা ভারতচন্দ্রকে তিরস্কার করবার কারণ কি? এর প্রথম কারণ, ভারতচন্দ্রের কাব্য যতটা সুপরিচিত অপর কারো তত নয়। আর দ্বিতীয় কারণ, ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর art আছে অপরের আছে nature। ভারতচন্দ্র যা দিয়ে তা ঢাকা দিতে গিয়েছিলেন তাতেই তা ফুটে উঠেছে।"*[১৯]

অশ্লীল বিষয়ও যে শিল্প-সৌষ্ঠবের অংশ হতে পারে ভারতচন্দ্রই তা প্রথম অনুভব করেন। আসলে উনিশ শতকে এসে বাংলার শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষার মাপকাঠিতে বাংলা সাহিত্য গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। সেই সূত্রে তারা ভারতচন্দ্রের রচনায় অশ্লীলতা খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু আমরা যদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য রাখি তাহলে দেখব অনেক কবিই তাঁদের কাব্যে আদিরস ব্যাবহার করেছিলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্য সম্পর্কেই শুধু এই অভিযোগের কারণ সম্ভবত অন্নদামঙ্গল কাব্যেই সর্বপ্রথম ভক্তিরসকে ছাপিয়ে আদিরস বড় হয়ে দেখা দিল।

সবশেষে বলা যায় যে ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে শুধু ‘নূতন’ মঙ্গলের বার্তাই ধ্বনিত হয়নি বাস্তবেও তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন কবি। বিষয় পরিকল্পনা, চরিত্র নির্মাণ, শিল্প ভাবনার অভিনবত্বে এই কাব্য মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্য ও আঙ্গিক বজায় রেখেও হয়ে উঠেছে নতুন মঙ্গল।

**তথ্যসূত্র :**

১. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত (সম্পাদিত), ‘ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী’, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পঞ্চম সংস্করণ, মাঘ ১৪১৯, পৃ-১৩।

২. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৪১।

৩. সেন সুকুমার, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭৫, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১লা বৈশাখ,১৩৯৮, পৃ-৩০৯।

৪. দত্ত ভবতোষ (সম্পাদিত), ‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, মে, ১৯৯৮, পৃ-১৭।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত (সম্পাদিত), ‘ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী’, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৬-১৭।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ-২১।

৭. মুখোপাধ্যায় অণিমা, ‘আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ’ সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ- শ্রাবণ ১৩৯৪, আগষ্ট ১৯৮৭, ভূমিকাংশ থেকে।

৮. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত (সম্পাদিত), ‘ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী’, প্রাগুক্ত,পৃ- ৯০।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৬৬।

১০. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’ তৃতীয় খণ্ড,দ্বিতীয় পর্ব, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মার্জিত সংস্করণ, ২০০১, পৃ-১৮৫।

১১. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত (সম্পাদিত), ‘ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী’, প্রাগুক্ত, পৃ-২১৫।

১২. ভট্টাচার্য আশুতোষ, ‘বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস’, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ- সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ-৬৬৫।

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত (সম্পাদিত), ‘ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী’, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৭৬।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৭।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ-২০১।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৯।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ-২২৬।

১৯. চৌধুরী প্রমথ, ‘প্রবন্ধসংগ্রহ’, ‘ভারতচন্দ্র’ প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৭৪, পৃ-২১৯।

# বারমাস্যা : নারী মনস্তত্ত্ব ও বিষণ্ণতার অনন্য কাব্যরূপ

অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়
চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্বমেদিনীপুর

।। এক ।।

"বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্"।।[১]

রমণী কখনোই স্বাধীনভাবে থাকবে না। বাল্যে পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে, স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রের অধীনে, পুত্র না থাকলে রাজার বশবর্তী থাকবেন। কিন্তু কোনভাবেই স্বাধীনতা লাভ করতে পারবেন না। একথা মনুর কথা। মনুর অনুশাসন।

দার্শনিক শোপেনহাওয়ার তাঁর 'parerga and paralipomena' প্রবন্ধগ্রন্থের 'On Women' প্রবন্ধে অনুরূপ নারীবিদ্বেষী ধারণা পোষণ করেছেন। তাঁর মতে, নারী সারাজীবন বৃহৎ শিশু হয়েই থাকেন। তাদের যুক্তিবোধ কম। নারী কেবল মানব-সমাজের বৃদ্ধির জন্যই টিকে থাকেন। নারী সম্ভ্রম শ্রদ্ধার যোগ্য নন, পুরুষের সমান সম্মানের দাবীদারও হতে পারেন না। সবসময় নারীর একজন পরিচালক বা প্রভুর প্রয়োজন হয়। যিনি নারী, তিনি যদি একজন তরুণী হন, তবে তিনি প্রেমিকের, যদি তিনি বৃদ্ধা হন, তবে তিনি একজন পুরোহিতের আশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। দার্শনিক শোপেনহাওয়ার লিখেছেন –

১. They are big children all their life long.
২. Their reasoning power is weak.
৩. Women exists in the main solely for the propagation of the species.
৪. Women is by no means fit to be the object of our honour and veneration, or to hold her head higher then men be no equal terms with him.
৫. She needs a lord and master, is she is young, it will be a lover, if she is old a priest.[২]

পুরুষতন্ত্রের নারীকে এমনভাবে পীড়ন তাঁর স্বাভাবিক অধিকার বলেই মনে করছিল। নারী যেমন অসহায় হতে হতে নিজেকে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করেছে, পুরুষকে তার নিয়তি বা নিয়ন্তা বলে মনে করেছে, তেমনি পুরুষও নারীকে তাঁর নিজস্ব সম্পদ বলেই মনে করেছেন। মনু থেকে সোপেনহাওয়ার – পুরুষতন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের স্পর্ধিতরূপ মুহূর্তে আয়নায় বিম্বিত হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের বারমাসী বর্ণনায় কবির কলম কিছুটা হলেও করুণাবিন্দু রেখে গেছে এই মাত্র।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 'বারমাস্যা'। 'বারমাস্যা'কে 'বারমাসী'ও বলা হয়। স্বর্গভ্রষ্ট দেবদেবী যখন মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন, তখন মানবজীবনের অংশভাগ রূপে নায়িকার বারমাসের সুখ দুঃখের বর্ণনা হল 'বারমাস্যা'। 'বারমাস্যা' কেবল নারীর যন্ত্রণারই অংশ। প্রাচীনকালেই ভারতীয় নারী পুরুষতন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কাছে স্বাধীনতা হারিয়েছিল। সেটা ছিল নারীর ঐতিহাসিক পরাজয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীর অবস্থানের সেই পরম্পরা মধ্যযুগে আরো বেশি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। সেই আচ্ছন্ন কালো মেঘলা আকাশে নারী ছিল একান্তই অসহায়।

মাসের গণনায় বছর, বছরের আধারে প্রকৃতি ও মানবজীবনকে চিহ্নিত করেছে ভারতীয় সাহিত্য। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের এই পরম্পরা উত্তরকালের বাংলা সাহিত্য বহন করেছে। মাস-ঋতু-বছরের গণনায় সমাজ-সংস্কৃতি-প্রকৃতির পটভূমিতে নরনারীর জীবন-যন্ত্রণা, সুখ-দুঃখের বর্ণশতকিয়া-বিচিত্র সাহিত্য সৌন্দর্যের রূপ নিয়েছে সেই প্রাচীনকাল থেকে। কবিদের কলম কথা বলে উঠেছে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের নায়িকাদের 'বারোমাসী' বর্ণনাও সেই প্রাণবন্ত প্রবহমান ঐতিহ্যের সারাৎসার। কবি কালিদাস তাঁর 'ঋতুসংহারম্' কাব্যে ঋতুতে ঋতুতে নরনারীর প্রকৃতির পটভূমিতে উন্মোচিত মানসলোকের স্বচ্ছ নির্মল বর্ণনা দিয়েছেন। হেমন্ত সমাগত। শস্যসমূহ নব পল্লবে উন্মোচিত। শালী ধান পরিপক্ক। এখন শীতকাল। কালিদাস লিখেছেন, এ সময়ে 'পীনোন্নতস্তনী' বিলাসিনীদের বাহুযুগলে বলয় ও অঙ্গদ, নিতম্বদেশে 'নবীন দুকূল' (পট্টবস্ত্র) এবং 'পীনপয়োধরে' সূক্ষ্মবসন স্থান পাচ্ছে না –

"ন বাহুযুগ্মেষু বিলাসিনীনাং প্রয়ান্তি সঙ্গ বলয়াঙ্গদানি।
নিতম্বদেশেষু নবং দুকুলং, তন্বংশুকং পীনপয়োধরেষু।"[৩]

মঙ্গলকাব্যের কবিরা সামাজিক প্রথা ও সংস্কারের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন বেশী। পুরুষতন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের উৎপীড়ন ছিল সেকালে। নারীকেই সমস্ত অত্যাচার পোয়াতে হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র আপন প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করেছে।

ব্রাত্য – অবহেলিত, অপাংক্তেয় পুরুষ ও রমণী ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজের কাছে অসহায়ভাবে নমিত হয়েছে। স্বভাবতই ভক্তিকে আশ্রয় করে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র উৎপীড়ন, অন্যায় এবং অত্যাচারকে দিয়েছে দেবমর্যাদা। রমণী হারিয়েছে স্বাধীনতা। তাঁর হৃদয়বৃত্তির মুক্ত উল্লাস ছিল না। এক অবক্ষয়িত মৃতযুগের শুকনো কঙ্কাল তাকে বহন করতে হয়েছে। নারী সমাজ জীবনের মুক্তক্ষেত্রে পদাপর্ণ করতে পারে নি। নারী অযাচিতভাবে লাভ করেছে কেবল গভীর যন্ত্রণা ও বেদনা। অবরুদ্ধ হৃদয় ডানা ঝাপটানো পাখির মত গভীর রক্তক্ষরণে কঁকিয়ে উঠেছে। 'বারমাস্যা' মধ্যযুগের নারী মনস্তত্ত্বের সেই বিষণ্নতা ও একাকীত্বের সাহিত্যরূপ।

বারমাসীর বর্ণনায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মধ্যযুগের সাহিত্যে অমরতা দাবী করতে পারেন। আখেটিক খণ্ডে ফুল্লরার বারমাস্যা যেমন কবি লিখেছেন, ঠিক তেমনি বণিকখণ্ডে খুল্লনার বারমাসী দুঃখের বর্ণনা শুনিয়েছেন কবি। মঙ্গলকাব্যের পাশাপাশি 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় বারমাসী বর্ণনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় 'কমলা' পালায় কমলা বারমাসের আত্মযন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলেছেন। কমলার বারমাসের বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমগ্র জীবনের আত্মকথন।

সরল অনার্য রমণী ফুল্লরা। স্বামী ব্যাধযুবক কালকেতু। নির্লোভ ফুল্লরা দেবী চণ্ডীর কাছে বারমাসের দুঃখ বর্ণনা করছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"বারমাসী দুঃখ রামা করে নিবেদন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।" (৪)

বৈশাখ মাস। খরতর রৌদ্র তাপে পুড়ে যায় মানুষ, প্রকৃতি। ফুল্লরা পরেন খুঞার বসন। খুঞার বসন হল, খুঞা গাছের পাতা থেকে তৈরি সুতোয় বোনা কাপড়। নিকৃষ্ট মানের পরিধেয় বস্ত্র খুঞার কাপড়। অনার্য বধূ ফুল্লরা খুঞার কাপড় মাথায় দিলেও বোশেখের সূর্যের খর কিরণকে প্রতিহত করতে পারে না – " শিরে দিলে নাহি আঁটে খুঞার বসন"।(৫) আর বোশেখ মাসে পরিশীলিত সমাজে কেউ মাংস খায় না। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"বৈশাখ হইল মোরে বিষ
মাঁস না বিকায় সভে করে নিরামীষ।" (৬)

সামন্ততান্ত্রিক সমাজেও অর্থনীতিই ছিল মানস স্বাস্থ্যের নিয়ন্তা। বিপন্ন অর্থনীতি ফুল্লরাকে খাঁচাবন্দী করে ফেলে। আত্মযন্ত্রণায়, দারিদ্র্যের অসহ পীড়নে দগ্ধ হতে থাকেন ফুল্লরা। আর কালিদাসের কাব্যে বৈশাখের এমন দহনে পরিশীলিত উন্নত স্তনী

যুবতী রমণীরা মোটা বস্ত্র ত্যাগ করে সূক্ষ্ম বস্ত্র দিয়ে বক্ষদেশ ঢেকে রেখেছেন। মহাকবি লিখেছেন –

“সমুদ্‌গতস্বেতাচিতাঙ্গসন্ধয়ো, বিমুচ্য বাসাংসি গুরূনি সাম্প্রতম্।”
স্তনেষু তন্বংশুকমুন্নতস্তনা, নিবেশয়ন্তি প্রমদা সযৌবনাঃ”।। (৭)

আর্য সমাজ – অনার্য সমাজের অন্যভূমি অসমতা, অর্থনীতির বৈপরীত্য দুই কবির দুই কাব্যের রমণীকে পৃথক করে তুলেছে।

রবীন্দ্র কবিতায় বৈশাখের সে ভীষণ রুদ্রমূর্তি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বৈশাখ’ কবিতায় লিখেছেন –

“বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা মৃত্যু ক্ষুধাতৃষ্ণা, লক্ষকোটি নরনারী-হিয়া
চিন্তায় বিকল।
দাও পাতি গেরুয়া অঞ্চল।” (৮)

‘নটরাজ’ (ঋতুনৃত্য) কাব্যের ‘বৈশাখ’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন –

“রসহীন তরু, নির্জীব মরু
পবনে গর্জে রুদ্র ডমরু,
..... ...... ..... ....
ইন্দ্রের মেঘ, নাহি তার বেগ,
বরুণ করুণ শান্ত।” (৯)

‘নটরাজ’ কাব্যের ‘সম্বোধন’ কবিতায় কবি বৈশাখের উদ্দেশ্যে লিখলেন – ‘শুষে নিতে চাও হাসি ও অশ্রু’ (১০) ‘খেয়া’ কাব্যের ‘বৈশাখে’ কবিতায় কবি লিখলেন – ‘আজিকার এই তপ্ত দিনে কাটল বেলা এমনি করে।’ (১১) লক্ষণীয়, কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ এই দুই মহান স্রষ্টার বৈশাখের ভয়ঙ্কর রূপ বর্ণনার সঙ্গে বাস্তব রসের কবি মুকুন্দরামের বর্ণনার বৈপরীত্য অনেকখানি পৃথক। ফুল্লরার গরমের তাপে পা পুড়ে যায়, তিনি পসরা করতে পারেন না। অনার্য ব্রাত্য রমণীর মাটির পৃথিবীতে জীবন যুদ্ধের খবর দিয়েছেন মুকুন্দরাম। আর সেই জ্যৈষ্ঠ মাস, কবিকঙ্কণের কথায় ‘পাপিষ্ঠ’। তাপে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় ফুল্লরার পরণের খুঞ্রার বসন। ফুল্লরা জল খেতে পারে না, আকাশে সারি সারি চিল ওড়ে। ফুল্লরা ‘বেঙচের ফল’ (বৈঁছি গাছের ফল) খেয়ে জীবন ধারণ করেন, নয়তো উপবাসে থাকেন। ভাবনার এই বাস্তববাদী অনন্যতা মুকুন্দরামের সৃষ্টিকে অসাধারণ করেছে। অনার্য রমণী ফুল্লরার মুখ থেকে কবিকঙ্কণ শুনিয়েছেন অর্থনৈতিক বিষমতার

কথা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারীর ছিল। প্রাচীনকালেই পুরুষতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কাছে নারী সে অধিকার হারিয়েছিল। মহামনীষী কার্ল মার্কস তাঁর 'Das capital' গ্রন্থের 'The General Formula for Capital' অংশে লিখেছেন – " The circulation of commodities is the starting point of Capital. The production of commodities, Their circulation, and that more developed form of their circulation called commerce, these form the historical ground – work from which it rises." (১২)

খাদ্য বা সম্পদের উদবৃত্ত অংশ যখন কিছু মানুষের কুক্ষিগত হয়ে যায়, তখনই অর্থনৈতিক অসমতা প্রকট হয়। ব্রাত্য অনার্য রমণী ফুল্লরা যে অনুশাসনে অবরুদ্ধ ছিলেন, তা কবি মুকুন্দরাম ফুল্লরার বারমাসীতে স্পষ্ট করেছেন।

এরপর পায়ে পায়ে আসে বর্ষাকাল। আসে আষাঢ়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি কালিদাসের মত নববর্ষার কাব্য লেখেন নি। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' জল ভারাক্রান্ত মেঘের আনাগোনা দেখান নি। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'মেঘদূত' কাব্যে লিখেছেন –

"আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং।
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।।" (১৩)

আর রবীন্দ্রকাব্যের বর্ষা বর্ণনা তো প্রকৃতি-সৌন্দর্যের অসীম রহস্য – বন্দনা। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল' শতেক যুগের শতেক কবিদের সঙ্গীত, শতেক যুগের গীতিকা। 'শতশত গীত মুখরিত বনবীথিকা'। (১৪)

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

"কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া
স্মিত বিকশিত বয়নে,
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে।" (১৫)

কবি শেলীও প্রকৃতির মধ্যে এমনি সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করেছেন। তিনি তাঁর 'Hymn to Intellectual Beauty' কবিতায় লিখেছেন –

"The awful shadow of some unseen power
Floats tho' unseen amongst us, - Visiting
This Various world with us insconstant wing
As summer winds that creep from flower to flower,
Like moonbeams that behind some piny mountain shower,
It visits with inconstant glance
Each human heart and countenance." (১৬)

কবিকঙ্কণ আষাঢ়ের বর্ণনায় এই রূপের সৌন্দর্য সন্ধান করতে পারেন নি। দুরন্ত বর্ষাকাল। দেবী চণ্ডীর কাছে ফুল্লরার আত্মকথন শুনিয়েছেন মুকুন্দরাম –

"মাঁসের পসরা লৈয়া ভ্রমি ঘরে ঘরে
কিছু খুদ কুড়া মিলে উদর না পুরে
বড় অভাগ্য মনে গুনি বড় অভাগ্য মনে গুনি
কত কত খায় জোঁক নাঞি খায় ফণী
ভাদ্রপদ মাসে রামা দুরন্ত বাদল
নদনদী একাকার আট দিকে জল।
মাঁসের পসরা লৈয়া ফিরি ঘরে ঘরে
আনলে পোড়ত্র অঙ্গ ভিতরে বাহিরে।" (১৭)

একই ঋতু বর্ষা। কিন্তু কবির দৃষ্টিতে সে রাবীন্দ্রিক উচ্ছ্বাস নেই। স্বর্গ কিন্তু স্বর্গের সিঁড়ি নয়। বরং স্বর্গ থেকে পৃথিবীবাসীকে মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনি শুনিয়েছেন কবি।

আশ্বিন কার্তিক মাস। আসে শরৎ। গেরস্থের বাড়ির ধান ফুরিয়ে যায়। প্রকৃতিতে শিউলী ফুলের সুবাস। অম্বিকা পুজো। কার্তিক মাসে হিমের জন্ম হয়। এই পর্যন্ত। বর্ণনায় আছে নিখুঁত বাস্তবতা। কবি কীটস তাঁর 'To Autumn' কবিতায় লিখেছেন –

"SEASON of mists and mellow fruitfulness
Close bosom – friend of the maturing sun ;
Conspiring with him how to load and bless." (১৮)

আর ফুল্লরা পরিশীলিত সমাজের রমণীর সঙ্গে নিজের অবস্থা-বৈপরীত্যের তুলনা করেছেন। সরলভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজকে নিজের সংকটপূর্ণ সমস্যার কথা জানিয়ে দেয় –

"আশ্বিনে অম্বিকা পূজা প্রতি ঘরে ঘরে
মহিষ ছাগল মেষ দিআ উপচারে
উত্তম বসন বেশ করয়ে বনিতা
অভাগি ফুল্লরা করে সম্বলের চিন্তা।
মাঁস কেহ না আদরে মাঁস কেহ না আদরে
দেবীর প্রসাদ মাঁস সবাকার ঘরে (১৯)

আর পায়ে পায়ে আসে শীত। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন –

"এবার বুঝি কুয়াশাতে
লুকিয়ে তারা পোউষ-রাতে
ধুলার ডাকে সাড়া দিতে চলে-
যেথায় ভূমিতলে
একলা তুমি, প্রিয়ে,
বসে আছ আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে? (২০)

শীতের হাওয়ার এক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন কীটস তাঁর 'O thou whose face hath felt the winter's wind' কবিতায় –

"O thou whose face hath felt the winter's wind
Whose eye has seen the snow-clouds hung, in mist,
And the black elm tops mong the freezing stars!" (২১)

প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখার অবকাশ ছিল না মুকুন্দরামের। সৌন্দর্য সাধনায় পৃথিবীর দুই মহান কবির ভাবনার সঙ্গে একেবারেই মেলে না মুকুন্দের ভাবনা। তাঁর ফুল্লরার শোনিতে বইতে থাকে মাটির রক্ত দাগ। শীত আসে, শীত যায় – ফুল্লরার দুঃখ থেকে যায় –

"নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়
অভাগি ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।
দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ

.......................................................

পুরাণ দোপাটা গায় দিতে করে টানি।

........................................................

তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ।
হরিণ বদলে পাইল পুরাণ খোসলা
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিসত্র ধুলা।" [২২]

এরপর আসে ফাল্গুন। আসে ঋতুরাজ বসন্ত। এই বৈপরীত্যের পৃথিবীতে ফুল্লরার জীবনে বসন্ত কোন মাঙ্গলিক আশীর্বাদ বহন করে না। অবশ্য ' সে সব কবির বেলা, - শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা',[২২.ক] - মুকুন্দরাম এমনভাবে সে সব কবির মত হতে পারলেন না। কবির কবিতায় নেই জয়দেবীয় 'মদনোদ্দীপক' মলয়সমীরের প্রবহ। কৃষ্ণের অবসন্নতা, বিরহীর ব্যথার ফুল তবু ফোটে –

"বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায়।।
সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী।" [২৩]

আর কালিদাস তাঁর 'ঋতুসংহারম্' কাব্যে বসন্তবর্ণনায় লিখলেন এ সময়ে গাছে গাছে ফুল ফোটে। পুকুরে ফোটে পদ্ম। রমণীরা কামপূর্ণ। বাতাস সুগন্ধ ছড়ায়। আর বসন্ত নানা রূপে রমণীদেহে অবস্থান করে। মৌমাছি ফুলে ফুলে চুম্বন করে, আর তা দেখে রমণীর চিত্ত উৎসুক –

"মত্তদ্বিরেফপরিচুম্বিতচারুপুষ্পা,
মন্দানিলাকুলিতনম্রমৃদুপ্রবালাঃ।
কুর্ব্বন্তি কামিমনসঃ সহসোৎসুকত্বম,
বালাতিমুক্তলতিকাং সমবেক্ষ্যমানাঃ।। [২৪]

আর বিদ্যাপতির রাধা বসন্তে কামনামদির হয়ে ওঠেন। চাঁপা নাগেশ্বর ফুল ফোটে। কোকিলের ঘনবর শোনা যায়। বিদ্যাপতি লিখেছেন –

"মদন – খর – শরে দেহ জরজর
চাঁপা নাগেশ্বর কি ফুল ফুটল
কোকিল ঘন করে রাও।" [২৫]

আর 'The Green Linnet' কবিতায় সবুজ বর্ণ লিনেট পাখির ব্যাকুলপক্ষ বনে বিচরণের সময়ে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ শোনালেন নির্মেঘ বাসন্তী সমাবেশের কথা—'Of spring's unclouded weather' [২৬] আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কল্পনা' কাব্যের 'বসন্ত' কবিতায় লিখলেন—

"তোমার কুসুমগন্ধে বর্ষে বর্ষে শূন্যে জলে স্থলে
হইবে প্রকাশ।

...................................................................

অমর বেদনা মোর হে বসন্ত, রহি গেল তব
মর্মরনিশ্বাসে ----
উত্তপ্ত যৌবনমোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্র সন্ধ্যাকাশে।" (২৭)

আর এ হেন ফাল্গুন মাসে অভাবে অনটনে জর্জর ফুল্লরা—'খুদ সেরে বান্ধা দিল মাটিয়া পাথরা' (২৮) মাটি খুঁড়ে আমানি খাবার গর্ত করেন তিনি। দেবী চণ্ডীকে সেই গর্ত দেখিয়ে দেন—'আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।'(২৯) আর সেই মধুমাস ফাল্গুনে ফুল্লরার অন্তর্গূঢ় বেদনাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন কবিকঙ্কণ—

"মধুমাসে মলয়মারুত মন্দ মন্দ
মালতিয়ে মধুপান করে মকরন্দ
বনিতা পুরুষ অঙ্গ পিড়ত্র মদন
আমার পীড়িত অঙ্গ উদর দহন।
দুঃখ কহিব কাহারে দুঃখ কহিব কাহারে
স্বামী সনে একশয্যা কোসেক অন্তরে।" (৩০)

ফুল্লরার বারমাস্যা শুধু বারমাসের নিছক বর্ণনা নয়, প্রকৃতির পটভূমিতে অনার্য দরিদ্র রমণীর মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের বণিক খণ্ড পরিশীলিত আর্য বণিক রমণী খুল্লনার বারমাসের দুঃখের বর্ণনা। খুল্লনা সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক সমাজের অপেক্ষাকৃত প্রাগ্রসর গন্ধবণিক কন্যা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

'বারমাসী দুঃখ রামা করে নিবেদন।'(৩১)

সেই নিবেদনের মধ্যে আছে সপত্নী কলহ। শত শত বৎসর পোষিত, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র লালিত বহু বিবাহের কুফল। খুল্লনার প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে শুরু হল সেই অত্যাচার পর্ব—'কেশে ধর্‌যা লহনা মারিল কিল লাথি।' (৩২) ধনপতি দত্তের অবর্তমানে লহনার খুল্লনার প্রতি এমন অত্যাচার। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে সব জলে ভরে যায়। খুল্লনা ছাগল চরানোর জায়গা পায় না। বনের মধ্যে ছাগল রেখে গাছের পাতা মাথায় দিয়ে খুল্লনা একাকিনী ঘোরেন। আর ভাদ্র মাসে খুল্লনা মাথায় তিন দিন অন্তর তেল দিতে

পারেন। আশ্বিনেও অবস্থার বদল হয় না। তেলের অভাবে চুলে জটা লাগে। আর কার্তিক মাসে ফুল্লরার মতই লহনা শীত নিবারণ করেন একইভাবে—‘জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।’ (৩৩) আর অগ্রহায়ণের প্রবল শীতে খুল্লনার শয়ন ঘর হয় ‘অজাশাল’ (ছাগল রাখার স্থান)। পরনের কাপড়ও মেলে না। ‘খোসলা ওড়ন’ই শীত নিবারণের উপায়—

“অজাশালে আমার শয়ন অজাশালে আমার শয়ন।” (৩৪)

আর পৌষে পুরানো খোসলাই খুল্লনার সম্বল। মাঘের ঘন কুয়াশায় শৃগালে খুল্লনার ছাগল টেনে নেয়। পরিণামে লহনার কিল চড় লাথি তো আছেই। ফাল্গুন মাসে খুল্লনার পরিধেয় খুঞ্ার বসন ভেঙে যায়। গভীর অরণ্য থেকে কাঠ সংগ্রহ করেন তিনি। রাত্রিতে ঘরের মধ্যে তাঁর স্থান হয় না। খুল্লনার শয়নস্থল ঢেঁকিশাল। আর খুদে পিপীলিকার অন্তর্জালে তাঁর ঘুম আসে না। আবার বসন্ত বাতাসে ফুল্লরার মতই খুল্লনা কামনা জর্জর হয়ে ওঠেন।অবশেষে বৈশাখে ধনপতি দত্তের আগমনে খুল্লনার দুঃখ দূর হয়।

‘মৈমনসিংহ-গীতিকা’ চৈতি-বৈশাখীর ফুলের গন্ধে ভরপুর। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন ও চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত পালাগুলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। সংগৃহীত গীতিকার ‘কমলা’ পালাটির রচয়িতা দ্বিজ ঈশান। পালাটিতে কবিত্ব শক্তির অভাব পরিলক্ষিত। তবুও বাংলা সাহিত্যে পালাটির বিশেষত্বের দিক হল কমলার বারমাসী বর্ণনা। লক্ষণীয় ফুল্লরা ‘বারমাসী’ বর্ণনা করেছেন দেবী চণ্ডীর কাছে। খুল্লনার বারমাসী বর্ণনা ধনপতি দত্তের কাছে। আর কমলার বারমাসী সর্ব সমক্ষে রাজার সভায়, রাজার কাছে। গোটা জীবনের আধারে রমণীর ব্যক্তিক অন্তর্গূঢ় বর্ণনা আছে এমন বারমাসীর অনুষঙ্গে। বারমাসীর গতানুগতিক ঐতিহ্য থাকলেও কাঙ্ক্ষিত শিল্প-সৌন্দর্য পাঠককে উপহার দিয়েছেন কবি। ধারাপাতের মত প্রকৃতির পটভূমিতে মানব জীবনের আখ্যান বর্ণনায় কবির লেখনী অকৃপণ। বৈশাখ মাসের আম, জ্যৈষ্ঠে পাকা গাছের ফল, আষাঢ়ের ভরা নদী, শ্রাবণের ভরা বর্ষা, ভাদ্রে পাকা তালের পিঠে, আশ্বিনের দুর্গা পূজা, কার্তিকের লক্ষ্মীপূজা, কালী পূজা, চিড়া-পিঠা-পায়েস-খেচুরি, অবশেষে মাসের বর্ণনা যায় হারিয়ে। কবি নায়িকার হৃদয় চুরি করেন। কবি মানব হৃদয়ের বর্ণনায় ফেরেন। বৈশাখে পিতা-পুত্র কারাগারে অসহায় ভাবে বন্দী, জ্যৈষ্ঠে মায়ের ক্রন্দন, আষাঢ়ে মৃত্যুর কুডাক-গলায় কলসী দিয়ে মৃত্যু ইচ্ছে, শ্রাবণে দেবদূতের মত রাজ কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ--

“কোড়া শীকার করতে আইল রাজার কুমার।

মৈষালের বাসে দেখা হইল তাহার।।” (৩৫)

এরপর পাকাধান। সরু ফলবান শস্যে পৃথিবী ভরে যায়। অবশেষে কমলার দুঃখের অবসান হয়। মানব সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাসে পুরুষতন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কাছে নারী তাঁর অধিকার হারিয়েছেন। এটা ছিল নারীর ঐতিহাসিক পরাজয়। পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের জল যদি হয় কালি, স্থলভাগের গাছ যদি হয় কলম, তা দিয়ে যদি অবিরত লেখা হয়—তবুও রমণীর অবিরাম দুঃখের ইতিহাস লেখা শেষ হবে না। মধ্যযুগের কবিদের বারমাসী বর্ণনা রমণীর অতলান্ত বেদনার সামান্য একটু অংশমাত্র।

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অনুশাসন (মনু) এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে - তারা মনে করেছেন মাতা, ভগিনী বা কন্যার সাথেও কোন পুরুষের নির্জন গৃহে বাস করা উচিত নয়। ‘মনুসংহিতা’ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে—

“মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্যতি।।” (৩৬)

মধ্যযুগীয় এই মানসিকতা কোন প্রাণবন্ত সুস্থ সমাজের জন্ম দেয় না। ‘স্বামীই স্ত্রীলোকদের প্রভু’ (৩৭) --- শাস্ত্র বচনের এই আপ্তবাক্য মধ্যযুগের নারীকে স্বাধীন ও স্বাচ্ছন্দ্য হতে দেয় নি। বাংলাসাহিত্যে নারীর বারমাস্যা বর্ণনা নারীর অধিকারহীনতাকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। ভাগ্যকে বরণ করেছে অসহায় নারী। আত্মযন্ত্রণার এই সূত্রেই এসেছে মাস-ঋতু-বছর-প্রকৃতি-সমাজ-সংস্কৃতি। রমণীর চিত্তের বাধাহীন মুক্তি না থাকলেও কবিরা হয়েছেন স্রষ্টা, তাদের কাব্য হয়েছে শিল্পীত। যুগকে অতিক্রম করতে না পারলেও নারীর আত্মযন্ত্রণায় চিরন্তন ভাষ্যকার—শীলিত চিত্রকর হলেন বারমাস্যার শতেক যুগের কবিদল। তাদের সৃষ্টি আজো অম্লান। বারমাসের পটভূমিতে প্রকৃতির ঋতুরঙ্গের নির্জন দলিলে আঁকা কবির কাব্য শিল্প। Keats তাঁর ‘The Human Seasons’ কবিতায় যথার্থ লিখেছেন—

“Four Seasons fill the measure of the year
There are four seasons in the mind of man.” (৩৮)

**তথ্যসূত্র :**

১. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৫৯১

২. Arthur Schopenhauer, On women, Parerga paralipomena, Vol.2, Edited by Chritopher Janaway, University of Southampton, Cambridge University press, 2015, PP. 550-561

৩. শ্রী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), ঋতুসংহারম্ (হেমন্ত বর্ণন্ম) কালিদাসের রচনাবলী, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৫২৯

৪. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, চণ্ডীমঙ্গল, (সম্পা) সুকুমার সেন, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩, পৃ. ৬১

৫. পূর্বোক্ত

৬. পূর্বোক্ত

৭. শ্রী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), ঋতুসংহারম্ (গ্রীষ্মবর্ণন্ম) কালিদাসের রচনাবলী, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৫১২

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৈশাখ, কল্পনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪০২, পৃ. ১৬৩

৯. পূর্বোক্ত, বৈশাখ, নটরাজ, নবম খণ্ড, পৃ. ২৬১

১০. পূর্বোক্ত, সম্বোধন, নটরাজ, পৃ. ২৬৩

১১. পূর্বোক্ত, বৈশাখে, খেয়া, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৮০

১২. Karl Marx, Das Capital, Finger print classics, Prakash Books India Pvt. Ltd, New Delhi, 2020, P. 92

১৩. কালিদাস, মেঘদূতম্ (পূর্ব্বমেঘঃ), শ্রী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), কালিদাসের রচনাবলী, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৪৬১

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বর্ষামঙ্গল, কল্পনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪০২, পৃ. ১০৭

১৫. পূর্বোক্ত

১৬. Shelley, Hymn to Intellectual Beauty, The Selected poetry and prose of Shelley, Wordsworth poetry library, Hertfordsire, Great Britain, 2002, P. 129

১৭. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩, পৃ. ৬১

১৮. John Keats, To Autumn, Complete poems and Selected Letters of John Keats, The Modern library, New York, 2001, P. 249
১৯. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন(সম্পা), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩, পৃ. ৬১
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শীত, পূরবী, রবীন্দ্র-রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪০২, পৃ. ১৬৩
২১. John Keats, O Thou whose face hath felt the Winter's wind, Complete poems and Selected letters of John Keats, The Modern library, New York, 2001, P. 305
২২. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন(সম্পা), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩, পৃ. ৬১
২২. ক) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কচিডাব, সায়ম্, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা সংকলন, সুনীলকান্তি সেন (সম্পা), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৩৯০, পৃ. ৩৮
২৩. জয়দেব, শ্রীগীতগোবিন্দ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ (সম্পা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২৪, পৃ. ২১৪
২৪. কালিদাস, ঋতুসংহারম্, কালিদাসের রচনাবলী, সত্যচরণ শাস্ত্রী (সঙ্কলিত), শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৫৩৮
২৫. শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র ও শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার (সম্পা), বিদ্যাপতির পদাবলী, কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, বাগবাজার, কলকাতা, ১৩৫৯, পৃ. ১৩৮
২৬. Wordsworth, The Green linnet, Wordsworther Kichhu Kovita, Manna Publication, Calcutta, 2007, P. 77
২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বসন্ত, কল্পনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪০২, পৃ. ১৬১
২৮. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন(সম্পা), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩, পৃ. ৬২
২৯. পূর্বোক্ত
৩০. পূর্বোক্ত
৩১. পূর্বোক্ত, বণিক খণ্ড, পৃ. ১৬৭

৩২. পূর্বোক্ত

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮

৩৪. পূর্বোক্ত

৩৫. সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পা), ময়মনসিংহগীতিকা (কমলা পালা), ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২০৩

৩৬. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৭৪

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২৩

৩৮. John Keats, The Human Seasons, Complete poems and Selected Letters of John Keats, The Modern library, New York, 2001, P. 305

# মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁসা শিল্প ও কংসবণিক সম্প্রদায়ের ইতিহাস

সুমিত কুমার মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, গোবিন্দ প্রাসাদ মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

**সারসংক্ষেপ :**

বাংলার এক গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহি শিল্প হলো কাঁসা শিল্প। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার কাঁসা শিল্প সুনাম ও গুরুত্ব অর্জন করে আছে। কাঁসা শিল্প কংসবণিক সম্প্রদায়ের হাত ধরেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কংসবণিক সম্প্রদায় ছাড়াও অন্নান্য সম্প্রদায়ের লোকজনও জড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলাতেই কাঁসা শিল্পের ভিত গড়ে উঠেছিল, যেমন –নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ইত্যাদি।এই জেলাগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁসা শিল্প প্রাচীন কাল থেকেই সুনাম অর্জন করে রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার অর্থনীতির সঙ্গে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে রয়েছে কাঁসা শিল্প।অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী হস্তান্তরিত হওয়ার পর থেকেই যখন নবাবী আমলে বঙ্গদেশে ব্যাপক ভাবে বর্গীর আক্রমণ হয়েছিল, তখন থেকেই বড়ানগর ও ধননগর থেকে বহু শিল্পী কারিগর মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া ও কান্দিতে স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করেছিল। এরা জাতিতে কংসবণিক, এরা শিল্প কলার মধ্যে দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়ার কাঁসা শিল্প কে শুধু বাংলা নয় সারা ভারতে ও বিখ্যাত করে তুলেছিল।

সামাজিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি রাজকীয় দরবারেও কাঁসার তৈরী বিভিন্ন দ্রব্যাদির চাহিদা ছিল। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন রাজদরবারে কাঁসার তৈরী দ্রব্যাদির চাহিদা ছিল প্রাচীন কাল থেকেই। বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি কাঁসা শিল্পকে কেন্দ্র করে যেমন একদিকে কর্মসংস্থান তৈরী হয়েছিল অন্য দিকে সামাজিক ও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কাঁসা শিল্পের গুরুত্ব ছিল প্রাচীনকাল থেকেই।

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে এত বেশি সংখক কাঁসা শিল্পী বসবাস করতো যে, একটি মৌজার নামই ছিল কাঁসারিবাজার মৌজা। এই জেলার খাগড়া কাঁসারি পট্টিতে বহুসংখ্যক কাঁসারি বসবাস করতেন। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি অঞ্চলও ছিল কাঁসা শিল্পে বিশেষ সমৃদ্ধ। কাঁসা শিল্পের একটি শৈল্পিক দিকও ছিল প্রতিটি

কাঁসার দ্রব্যাদিতে বিশেষ চিন্তা ভাবনা ও বিশেষ শিল্পশৈলী পরিলক্ষিত হয়েছিল। তাই কাঁসার ব্যাবহারিক মূল্যের পাশাপাশি শিল্পগত মূল্যও বিশেষ স্বীকৃতির দাবি রেখে চলেছে। কাঁসা শিল্পের ওপর সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় ১০ -১৫ হাজার মানুষ নির্ভর করেছিল, শিল্পটি পুনর্গঠিত করলে আগামী দিনে আরো অনেক মানুষের কর্ম নিযুক্তির ব্যবস্থা হবে। কাঁসা শিল্পের পুনর্বিক্রয়মূল্য রয়েছে বলে সাধারণ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গ্রামের মানুষের কাছে এখনও চাহিদা ও গ্রহণ যোগ্যতা রয়েছে .গ্রামীণ অর্থনৈতিক বিকাশে কাঁসাশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করে চলেছে।

**সূচক শব্দ:** কাঁসাশিল্প, কংসবণিক সম্প্রদায়, বঙ্গদেশে, মুর্শিদাবাদ, পুনর্বিক্রয়মূল্য, গ্রামীণ, অর্থনীতি, মধ্যবিত্ত।

ভূমিকা : মুর্শিদাবাদের যে শিল্পগুলো জেলার অর্থনীতির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাঁসাশিল্প। অন্যান্য কুটির শিল্পের মতো এই শিল্পটিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে মুর্শিদাবাদে সরে এসেছিল। শোনা যায় যে, নবাবী আমলে বঙ্গদেশে যখন ব্যাপকভাবে বর্গির আক্রমণ হয়, তখন থেকেই বড়ানগর ও কান্দীতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিল। এরা ছিল জাতিতে কংসবণিক সম্প্রদায়।[১] কংসবণিক সম্প্রদায় ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন - কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, তেলে, বারুজীবি, নমঃশূদ্র, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায় যুক্ত ছিল। কংসবণিক সম্প্রদায় তাদের শিল্প কলার মধ্য দিয়ে খাগড়ার কাঁসাশিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। মুর্শিদাবাদের কাঁসাশিল্প শুধু মাত্র বাংলায় নয়, সারা ভারতে বিখ্যাত ছিল।[২]

বহরমপুর শহরে এত বেশি সংখ্যক কাঁসাশিল্পী ও কারিগর বসবাস করতেন যে, একটি মৌজার নামই ছিল কাঁসারি বাজার মৌজা।[৩] খাগড়ার কাঁসারি পট্টিতে বহু সংখ্যক কাঁসারি শিল্পী বসবাস করতেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে কাঁসারি বাজার মৌজা ও কাঁসারি পট্টি মিলিয়ে প্রায় ১৮০-১৮৫ টি কারখানা ছিল। এখানকার দক্ষশিল্পী ও কারিগররা কাঁসার বিভিন্ন বাসনপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তৈরি করতেন। ওই সময়কালে (১৯৪৪-৪৫) এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল জনসমষ্টি ছিল চার থেকে পাঁচ হাজারের মতো। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী অঞ্চলেও কাঁসা শিল্প বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। এখানকার তৈরি কাঁসার বিভিন্ন দ্রব্যাদি বাংলার পাশাপাশি বিহার, ওড়িশা, লখনউ, উত্তরভারত ও মধ্যভারতেও বিক্রি হত। কান্দী অঞ্চলে কংসবণিক সম্প্রদায় ছাড়াও ব্যায়েণ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা কাঁসাশিল্প-দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ছিল।[৪] মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁসাশিল্পের একটা অতীত ইতিহাস আছে প্রাচীনকাল থেকেই। বহু দক্ষ শিল্পী ও কারিগর এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়ার কাঁসার বৈশিষ্ট্য ছিল, বিশুদ্ধ কাঁসা তৈরি হয় সাতভাগ তামা ও দুভাগ (৭:২) রাঙ-এর মিশ্রণে, বিশুদ্ধ কাঁসা-ই ছিল খাগড়ার কাঁসার বৈশিষ্ট্য।[৫] আটভাগ তামার সঙ্গে দুভাগ রাঙের মিশ্রণে নিকৃষ্ট কাঁসাও তৈরি হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় ওদেশ থেকে আসা বহু

মানুষ জলের দামে বিপুল পরিমাণে কাঁসার বাসনপত্র বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। তখনও পর্যন্ত বিভিন্ন মহাজন সেই মজুত কাজে লাগাচ্ছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন কাঁসার দ্রব্যাদি সাবেকি ঘরানায় কাজ করা হত - এই কাজকে বলা হত পেটাই-এর কাজ। এছাড়া ছিল ঢালাই-এর কাজ। এই জেলার কাঁসাশিল্পের একটা শৈল্পিক দিকও রয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। এখানকার বিভিন্ন কাঁসার দ্রব্যাদি যেমন থালা, গ্লাস, বাটি, বালতি, হাতা, বড়ো গামলা প্রভৃতিতে নানান রকম ডিজাইন, নকশা আঁকা থকত। প্রতিটি কাঁসার বাসনপত্রের মধ্যে একটা চিহ্ন আঁকা থাকত, একটা শিল্প শৈলী পরিলক্ষিত হয়েছিল। তাই এই জেলার কাঁসাশিল্পের ব্যবহারিক মূল্যের পাশাপাশি শিল্পগত মূল্যও বিশেষ স্বীকৃতির দাবি রেখে চলেছে।[৬]

মুর্শিদাবাদসহ সারা বাংলার কাঁসার দ্রব্যাদি বিক্রয়ের মাধ্যম হল প্রধানত স্থানীয় মহাজন ও ব্যবসায়ীরা। এদের মধ্য দিয়ে বহু ব্যক্তি কলকাতায় গিয়ে শিল্পদ্রব্য বিক্রি করে আসেন। মুর্শিদাবাদের কিছু কিছু স্থানীয় ব্যবসায়ী যারা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তারা বিভিন্ন জায়গায় শিল্পদ্রব্য নিয়ে যায় বিক্রির জন্য। মুর্শিদাবাদ জেলা পশ্চিমবঙ্গের একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান হিসেবে পরিচিত। এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ জেলার ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মধ্যে অন্যতম শিল্প হল কাঁসা শিল্প। মুর্শিদাবাদের খাগড়ার কাঁসার এককালে জগৎজোড়া খ্যাতি ও সুনাম ছিল। নবাব আলি বাদশার সময় থেকেই এখানকার শিল্পী ও কারিগরদের শিল্প নৈপুণ্য ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। নবাব আলিবর্দি খাঁ থেকে শুরু করে নবা মুর্শিদকুলি খাঁ সকলেই এই জেলার কাঁসা শিল্পের খুবই প্রশংসা করেছিলেন। এখানকার শিল্পী ও কারিগরেরা কাঁসার বাসনপত্র তৈরির পাশাপাশি দেবদেবীর মূর্তি তৈরিতেও খুবই পারদর্শী ছিলেন।[৭] এখানকার শিল্পী ও কারিগরদের দক্ষতা ও শিল্পী কুশলতা ছিল অতুলনীয়। বর্তমান যুগ আধুনিক যুগ। এই আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের রুচি ও মানসিকতা, সংস্কৃতি ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কাঁসাশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধিও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে কাঁসাশিল্পের সঙ্গে বহু মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত রয়েছেন সেই প্রাচীনকাল থেকেই। কংসবণিক সম্প্রদায়ের হাত ধরেই কাঁসাশিল্পটি টিকে রয়েছে। কংসবণিক সম্প্রদায়গণটির ঐতিহ্যমন্ডিত এই কাঁসাশিল্পের সঙ্গে বংশ পরম্পরাগতভাবে যুক্ত রয়েছে। এই সম্প্রদায়গণ কাঁসাশিল্পের আর্থিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে প্রাচীনকাল থেকেই। অর্থনীতির বিচারে এই শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছিল। কাঁসাশিল্প একদিকে গ্রামীণ অর্থনীতির বনিয়াদ তৈরি করে দিয়েছিল, অন্যদিকে বহু মানুষের কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি করেছিল।[৮]

দেশের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল না হলেও কাঁসাশিল্প মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম শিল্পকেন্দ্র ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে রয়েছে। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণেই বহু বিদেশি বণিক সম্প্রদায় এসে ঘাঁটি গেড়েছিল বাংলা তথা মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলে। বাংলার কাঁসাশিল্প বিদেশিদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে

উঠেছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁসাশিল্পের একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা রয়েছে। কর্ণসুবর্ণ মহীপাল ও মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্থান-পতন এই জেলার শিল্পচর্চাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের নগরায়ণের দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে, তা সত্ত্বেও অবস্থানগত সুযোগ-সুবিধার কারণে মুর্শিদাবাদের কাঁসাশিল্প ও শিল্পীরা মোটামুটিভাবে নিজেদের মান বজায় রাখতে পেরেছিল তা বলা বাহুল্য।[৯]

শশাঙ্কের আমল থেকেই মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা পেয়ে এসেছে বিস্তৃত ব্যবসা-বাণিজ্য পথের সুবিধা। স্থলপথের বিকাশ তেমনভাবে না থাকলেও জলপথের প্রাচুর্য তখনকার শিল্প রপ্তানিতে অনেকটা সহায়তা করেছে। সুলভ শ্রমিক, সুদক্ষ কারিগর, অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আরও অন্যান্য নানা সুযোগ সুবিধা মুর্শিদাবাদের শিল্পসম্ভার পরিবেশ তৈরি করেছিল। সর্বপরি কাঁচামালের প্রাচুর্য, বিস্তৃত বাণিজ্যপথ ও কলকাতা বন্দরের সুযোগ-সুবিধা মুর্শিদাবাদের শিল্পের এক অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিল। মুর্শিদাবাদের কাঁসাশিল্পর চাহিদা শুধুমাত্র বাংলায় নয়, বাংলার পাশাপাশি সারা ভারত ও বর্হিভারতেও চাহিদা, কদর ও জনপ্রিয়তা ছিল। খাগড়া ও কান্দীর কাঁসার তৈরি দ্রব্যাদির চাহিদা এত বেশি পরিমাণে ছিল যে, বাংলার প্রায় সব জেলা থেকেই লোকজন ক্রয় করতে আসত। জগৎজোড়া এই কাঁসার তৈরি দ্রব্যাদির চাহিদা ছিল। নবাবি আমল থেকেই এই জেলার কাঁসার তৈরি দ্রব্যাদির চাহিদা ছিল।[১০] শিল্পের এই অগ্রগতি ও উন্নতির ফলে একদিকে যেমন এই জেলার অর্থনীতির ভিত্তি আরও সুদৃঢ় ও মজবুত হয়েছে, অন্যদিকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে তা বলা যায়। কাঁসার তৈরি দ্রব্যাদির চাহিদা শুধুমাত্র সমাজের নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে নয়, উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের পরিবারের মধ্যেও চাহিদা ছিল ও কান্দী অঞ্চলের কাঁসার শিল্পী ও কারিগরদের কারুকার্য খচিত বিভিন্ন নকশা বাংলার নবাব বাহাদুর, লালগোলাধিপতি রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখরা প্রশংসা করতেন। তবে বলার বিষয় যে, প্রাচীনকালে কাঁসার তৈরি দ্রব্যাদির যেমন চাহিদা, ক্রয়বিক্রয় ও জনপ্রিয়তা অনেক কমে গিয়েছে। বর্তমান যুগ আধুনিক যুগ, আর এই আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের মনে কাঁসার বিকল্প হিসেবে অন্য দ্রব্যাদি পেয়ে যাচ্ছে স্বল্পমূল্যে, তাই কাঁসার দ্রব্যাদির জনপ্রিয়তা অনেক কমে গিয়েছে। মুর্শিদাবাদের কাঁসাশিল্পের ক্ষেত্রে সেই একই ধারা লক্ষ করা যাচ্ছে। বর্তমানে কাঁসার দ্রব্যাদির চাহিদা ও জনপ্রিয়তা অনেক কমে যাচ্ছে ফলে উৎপাদনও কম হচ্ছে। ফলে কারিগর ও শিল্পীদের আর্থিক অবস্থার কোনো অগ্রগতি ঘটছে না।[১১] এমত অবস্থায় মুর্শিদাবাদের কাঁসাশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে ও পূর্বের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হলে বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে, যেমন - প্রথমত, উৎকৃষ্ট কাঁচামালের জোগান সুনিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য-নতুন দ্রব্যাদি তৈরি করতে হবে। তৃতীয়ত, কাঁসাশিল্পে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটাতে হবে। চতুর্থত, শিল্পে নিযুক্ত কারিগর ও শিল্পীদের মজুরিগত পরিবর্তন ঘটাতে হবে, যাতে তারা কাজ করতে অনেক বেশি আগ্রহী হয়। পঞ্চমত, মহাজন নির্ভরতা কমাতে হবে,

কারিগর ও শিল্পীদের স্বনির্ভরতা বাড়াতে হবে। ষষ্ঠত, সরকারি বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা বাড়াতে হবে।

বাংলা, বিহার ও ওড়িশার হারানো রাজধানী মুর্শিদাবাদ আজও অন্তরে প্রবহমান হয়ে বয়ে চলেছে মুর্শিদকুলি খাঁ, আলিবর্দি, সিরাজ-উদদৌলার স্মৃতি জড়ানো মুর্শিদাবাদ জেলা। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেসব ঘটনায় বাংলার মানচিত্রের রং বদলে গিয়েছিল তার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল মুর্শিদাবাদ। দেশের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল না হলেও, বিভিন্ন শিল্পের অনুকূল পরিবেশ এই অঞ্চলকে সারা ভারতের কাছে অন্যতম ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। আর এই ব্যবসা বাণিজ্যের কারণেই বহু বিদেশি বণিকগণ এসে ঘাঁটি গেড়েছিল বাংলা তথা মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলে। ঢাকা থেকে রাজধানী উড়িয়ে আনবার অনেক আগেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা আসতে থাকে এই বাংলার এক সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জেলা মুর্শিদাবাদ। রাজধানী বা প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র হওয়ার সুবাদে আরও বেড়ে যায় মুর্শিদাবাদের মর্যাদা। দ্রুত লয়ে সুসজ্জিত শহর হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে মুর্শিদাবাদ। বিভিন্ন শিল্প ব্যবসায়ে মুর্শিদাবাদ এক অনন্য স্থান অধিকার করে নিয়েছিল সেই বহুকাল থেকে, এমনই এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসমূহ ছিল রেশম ও কাঁসাশিল্প যা পরবর্তীকালে বিদেশিদের কাছে অনেক আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।[১২]

মুর্শিদাবাদের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে জনবসতির বিকাশ ঘটেছিল অনেক দ্রুত। এই জেলাতে মুসলমান শাসকরা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করতে শুরু করেছিল। মুসলমানদের পাশাপাশি বহু হিন্দু সচ্ছলভাবেই নিজেদের স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রেখে বসবাস করত। রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষক না থাকলেও হিন্দু ধর্মের বিকাশও ঘটেছিল। এর মূলে ছিল হিন্দু জমিদারের আন্তরিক সদিচ্ছা। এর জন্য তারা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ও করেছিল, জনবসতি বিস্তারের পাশাপাশি শিক্ষার আলোক বিস্তৃত হয়েছিল জেলায় প্রায় সর্বত্রই সমানভাবে। শিক্ষার সেই সুখবর পদযত্রা যেভাবে প্রাচীনকাল থেকেই শুরু হয়েছিল তা ঔপনিবেশিককাল থেকে শুরু হয়ে বর্তমান কালেও তা আজ অব্যাহত। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক জটিলতার কারণে জেলার শিক্ষা ব্যবস্থায় তার গতি বিমুখ হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে শিক্ষার এই গতিধারা সঠিকভাবেই বয়ে চলেছিল যা বর্তমানেও ঠিক একইভাবে চলছে। মুর্শিদাবাদ জেলা যেহেতু বাংলা তথা বিদেশিদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেই প্রাচীনকাল থেকেই এবং যেহেতু শিক্ষার গতি সঠিকভাবেই এগিয়ে চলেছিল, সেহেতু মুর্শিদাবাদ জেলা শিল্প ক্ষেত্রেও এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সমূহ জেলা হিসেবে সকলের মনে স্থান করে আছে। মুর্শিদাবাদ জেলাতে কৃষির পরেই শিল্প ক্ষেত্রে মানচিত্রে একটা স্থান করে নিয়েছে। বিশেষ করে কুটির শিল্পে মুর্শিদাবাদের যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছিল। মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদার দিকে নজর রেখে এই জেলায় বিভিন্ন রকম কুটির শিল্প গড়ে উঠেছিল যেমন সমস্ত শিল্প সমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলার এক ঐতিহ্য ও সুনাম অর্জনকারী কাঁসাশিল্প। অতীতের মতো বর্তমানেও এই কাঁসাশিল্পটি বাংলার পাশাপাশি সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরে এই কাঁসা শিল্পের চাহিদা ছিল সেই থেকেই যদিও ঔপনিবেশিক সরকারের আমলে

ঔপনিবেশিক সরকারের উদাসীন্য ও শোষণের ফলে এই কাঁসাশিল্পের অবস্থা প্রায় করুণ ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষ করে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কাঁসা শিল্পের অবস্থা অনেকটা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলা কাঁসা শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলায় এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই অঞ্চলে যে সমস্ত কাঁসার তৈরি বাসনপত্রাদি তৈরি হত তা শুধু মাত্র বাংলায় নয় তার অধিকাংশই ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তেও রপ্তানি হত। মুর্শিদাবাদের কাঁসাশিল্পের অর্ন্তগত খাগড়া অঞ্চলের কাঁসাশিল্পের জগৎজোড়া নাম ছিল। মুর্শিদাবাদের যে শিল্পগুলি জেলার অর্থনীতির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল প্রাক-ঔপনিবেশিক কাল থেকে ঔপনিবেশিক কালে প্রবহমানতা বজায় রেখে বর্তমানকাল পর্যন্তও ঠিক একইভাবে রয়েছে তার মধ্যে উল্লখযোগ্য হল কাঁসাশিল্প। অন্যান্য কুটির শিল্পের মতো মনে হলেও এই শিল্পটিও অষ্টাদশ শতাব্দীর ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্তানান্তরিত হওয়ার পর মুর্শিদাবাদে সরে এসেছে। শোনা যায় যে, নবাবি আমলে বঙ্গদেশে যখন ব্যাপক বর্গির আক্রমণ হয়, বড়ো নগর ও গ্রাম থেকে বহু শিল্পী মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া, জঙ্গিপুর ও কান্দীতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিল। এরা জাতিতে ছিল কংসবণিক। এদের শিল্পকলা খাগড়ার কাঁসাশিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। মুর্শিদাবাদের কাঁসাশিল্প শুধুমাত্র বাংলায় নয় সারা ভারত ও ভারতের বাইরেও এর কদর ও জনপ্রিয়তা ছিল। অনেক সময় খাগড়ার কাঁসার চাহিদা এত বেশি হয়ে পড়েছিল যে , বাংলার প্রায় সব জেলা থেকেই লোকজন ক্রয় করতে আসত। জগৎজোড়া এই কাঁসাশিল্পের খ্যাতি ছিল।

বহরমপুর শহরে এত বেশি সংখ্যক কাঁসা শিল্পী বসবাস করতেন যে, একটি মৌজার নামই ছিল কাঁসারি বাজার মৌজা। তাছারা খাগড়ার কাঁসারি পট্টিতে বহু কাঁসাশিল্পী বসবাস করতেন প্রাক-ঔপনিবেশিক কাল থেকেই। ঔপনিবেশিক আমলেও এই ধারা বজায় ছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে কাঁসারি বাজারে মৌজা ও কাঁসারি পট্টি মিলিয়ে প্রায় ১৮০-২০০ টি কারখানা ছিল। সেখানে কাঁসা ও কাঁসা থেকে বাসন ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য তৈরি করতেন সুদক্ষ কাঁসা শিল্পীরা। শুধুমাত্র বহরমপুর শহরে প্রায় এক থেকে দুই হাজার কাঁসা শিল্পী বসবাস করতেন এবং এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল জন সমষ্টি ছিল চার থেকে পাঁচ হাজারের মতো। মুর্শিদাবাদ জেলায় কৃষির পাশাপাশি শিল্পেও বহু মানুষ নিযুক্ত ছিল এবং বর্তমানেও আছেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শতকরা ৫০-৬০ শতাংশ মানুষ এই জেলায় শিল্পের সঙ্গে জড়িত। বর্তমান যুগেও তেমন কোনো যন্ত্রপাতি নয়, কেবলমাত্র সুনিপুণ হাতের দ্বারা এই জেলার মানুষজন বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করে চলেছেন, প্রাচীনকাল থেকেই। বিরাট সংখ্যক মানুষ কর্ম জীবিকা সূত্রে কাঁসাশিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। খাগড়ার উল্লেখযোগ্য কাঁসাশিল্প দেশ-বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে প্রাচীনকাল থেকেই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন এই কাঁসার বাসনপত্র ও এই বাসনপত্র নানারকমের নকশার কাজ দেখে ক্রয় করতেন আনন্দের আতিশয্যে। এখানকার শিল্পীদের কারুকার্য খচিত বাসনপত্র বাংলার নবাব বাহাদুর, লালগোলাধিপতি রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়, মহারাজা

মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ তারিফ করতেন এবং তাদের কাছ থেকেও ক্রয় করতেন প্রচুর পরিমাণে।[১৩]

মুর্শিদাবাদ জেলার শিল্পের একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। কর্ণসুবর্ণ, মহীপাল, মুর্শিদাবাদকে ঘিরে রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্থান-পতন এই জেলার শিল্পচর্চাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। মাঝে কিছুদিনের জন্য ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু এই জেলা থেকে গৌড়ে স্থানান্তরিত হলেও ভৌগোলিক দিক থেকে গৌড় জেলাঞ্চল থেকে খুব দূরে অবস্থিত নয়। রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের নগরায়ণ দ্রুততর পরিবর্তন হয়েছে। কখনো কখনো এসেছে দ্রুত অবনগরায়ণের ধাক্কা। তথাপি অবস্থানগত সুযোগ-সুবিধার কারণে মুর্শিদাবাদের শিল্প ও শিল্পীরা মোটামুটিভাবে নিজেদের একটা মান বজায় রাখতে পেরেছিল। শশাঙ্কের আমল থেকেই মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা পেয়ে এসেছেন বিস্তৃত বাণিজ্য পথের সুবিধা। স্থলপথের বিকাশ তেমনভাবে না থাকলেও জলপথের প্রাচুর্য এখানকার শিল্প রপ্তানিতে অনেকটা সহায়তা করেছিল। সুলভ শ্রমিক, সুদক্ষ কারিগর, অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আরও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা মুর্শিদাবাদের শিল্প-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করেছে। সর্বপরি কাঁচামালের প্রাচুর্য ও বিস্তৃত বাণিজ্য পথ ও বন্দরের সুবিধা মুর্শিদাবাদের শিল্পের এক অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল। দীর্ঘ সময় ধরে জেলার কোথাও না কোথাও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থাকাতে বাইরে থেকে বহু অভিজাত মানুষ নানা সময়ে এই জেলাতে এসেছেন ও বসতি শুরু করেছিল সেই প্রাক-ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকেই। তাঁদের পৃষ্টপোষকতাও জেলার শিল্পচর্চাকে গতি দিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতেই বাংলার দেওয়ান খানা ও পরবর্তীকালে রাজধানী মুর্শিদাবাদের স্থানান্তর মুর্শিদাবাদের শিল্পচর্চায় যে রক্ত স্রোত সঞ্চালন করে পরবর্তী প্রায় একশো বছর তা বজায় ছিল। রাজধানী স্থানান্তরের আগে ও পরে হিসাবে কালাম বাজারের উত্থানও সেই সূত্রে বিদেশি বণিকদের আগমন উত্তর ভারতের সঙ্গে জলপথে যোগাযোগ জেলাঞ্চলের শিল্প সম্ভারকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করেছিল। রাজধানী স্থানান্তর সেই প্রক্রিয়াকেই আরও দ্রুততর ও কার্যকরী করে তুলেছিল। তবে এই গৌরব বেশিদিন কার্যকরী ও স্থায়ী হয়নি। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব শ্রমনির্ভর দেশীয় শিল্পকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। শৈল্পিক উৎকর্ষের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে দাম। নানাদিক গুরুত্বের থেকেও নগদ কাঞ্চন মূল্য বড়ো হয়ে ওঠা দেশীয় শিল্পের অনেকটা বেশি সর্বনাশ করে তুলেছিল। জেলাঞ্চলের অবনগরায়ণের ধাক্কায় অভিজাত ব্যক্তিবর্গের অবস্থার অবনতিও জেলার শিল্পচর্চাকে চরম আঘাত হেনেছিল। ইংরেজদের উত্থানে কিছু দেশীয় লোকেদের হাতে কাঁচাপয়সা এলেও তারা মূলত ছিল বেনিয়া প্রকৃতির। শিল্পের নান্দনিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা বা তার পৃষ্টপোষকতা করা তাদের কাছে ছিল অপ্রয়োজনীয়। ফলে ঔপনিবেশিক আমলে এই জেলার শিল্পসমূহ প্রয়োজনীয় পৃষ্টপোষকতার অভাবে মৃত প্রায় হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে যন্ত্রনির্ভর শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতার স্বনির্ভর শিল্পদ্রব্য পদে পদে পর্যুদস্ত হয় ও ক্রমে ক্রমে দেশীয় শিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল।[১৪]

মুর্শিদাবাদ জেলায় ২৬টি ব্লক/পঞ্চায়েত সমিতি ও ৭টি পৌরসভা আছে। এই জেলার বহরমপুর শহরে একটি বহু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বস্ত্র বয়ন শিক্ষার কলেজ ও পলিটেকনিক কলেজ ও শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য পরিকাঠামো এই জেলায় প্রাক-ঔপনিবেশিক কালেও ছিল বর্তমানকালের তার প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। বাংলার এক অন্যতম শিল্প সমৃদ্ধ জেলা হিসেবে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাচীনকাল থেকে শিল্প ইতিহাসের মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। কৃষির পরেই শিল্পের স্থান। মুর্শিদাবাদ জেলায় কৃষিকে কেন্দ্র করেও অনেক শিল্প সমূহ এই জেলাতে গড়ে উঠেছে যেমন চালকল, হিমঘর, হস্তশিল্প ইত্যাদি। বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করেছে যা কৃষিকে ভিত্তি করে এই জেলার অর্থনীতি বাংলায় যে ভিত তৈরি করেছিল শিল্প সেই বাংলার অর্থনৈতিক ভিতকে আরও সুদৃঢ় ও মজবুত করেছিল বলা যায়।[১৫]

শিল্প বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে রাজ্যের সব থেকে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদ অন্যতম। জেলার জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশ (৬৪.২৫ শতাংশ) কৃষির উপর নির্ভর করে আর শিল্পের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে অনেকগুলি কুটির শিল্প। এই কুটির শিল্পের মধ্যে অন্যতম ছিল কাঁসা শিল্প। এই কুটির শিল্পগুলি জেলা তথা রাজ্যের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আছে। কৃষির পাশাপাশি শিল্প অর্থনীতিতে এক দিগন্ত বিস্তার করে আছে। কুটিরশিল্পের মধ্যে অন্যতম ছিল কাঁসাশিল্প। কেবল বাংলা নয় মুর্শিদাবাদের কাঁসাশিল্প বিশেষ করে (খাগড়া, জঙ্গিপুর) অঞ্চলের কাঁসার তৈরি দ্রব্যাদির চাহিদা সারা ভারত ও বর্হিভারতে ছিল। এই শিল্পের উপর ভিত্তি করেই ইউরোপীয় বণিক ও অন্যান্য বণিকদের টেনে এনেছিল এই জেলায়। নিম্ন গঙ্গা সমভূমিতে কাশিম বাজার হয়ে উঠেছিল প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। জঙ্গিপুরও ছিল শিল্প উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। জেলার বাইরেও এই কাঁসাশিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যাদির চাহিদা ছিল। প্রায় ৩০ হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা কাঁসারি নামে পরিচিত। কাঁসার তৈরি দ্রব্যাদি উৎপাদন অঞ্চল ছিল খাগড়া (বহরমপুর), কান্দী, ডোমকল, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ ও ধুলিয়ান অঞ্চলে। খাঁটি ও টেকসই হওয়ার জন্য খাগড়ার বাসনপত্র সারা বাংলা ও ভারতে চাহিদা ছিল প্রাচীনকাল থেকেই। এছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের কাঁসার তৈরি দ্রব্যাদিরও চাহিদা ছিল সর্বত্র। নবাবি আমল থেকেই এই জেলার কাঁসার তৈরি দ্রব্যাদির বিস্তৃতি ছিল। শিল্পের এই অগ্রগতি ও উন্নতির ফলে একদিকে যেমন এই জেলার অর্থনীতির ভিত্তি আরও সুদৃঢ় ও মজবুত হয়েছে অন্যদিকে বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তিও দৃঢ় হয়েছে তা বলা যায়। ফলে এই আমলের মানুষদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈচিত্র্যো পালটে গেছে। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক মানচিত্র ও পরিবর্তিত হয়েছে। খাগড়া অঞ্চলে কাঁসাশিল্প একসময় সারা ভারতের গর্ব ছিল। এই জেলায় শিল্পের একটা ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে প্রাচীনকাল থেকেই। রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্থান-পতন কখনো মুর্শিদাবাদের নগরায়ণ দ্রুততর করেছে, কখনো এসেছে অবনগরায়ণের ধাক্কা। তা সত্ত্বেও অবস্থানগত সুযোগ-সুবিধার জন্য মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন শিল্পী ও শিল্পীরা

মোটামুটিভাবে নিজেদের একটা স্বাধীন মান ও সত্তা বজায় রাখতে পেরেছিল।[১৬] এই জেলায় উল্লেখযোগ্য কাঁসার বাসনপত্রের স্থান খাগড়া। খাগড়ার কাঁসার বাসনপত্র দেশ ও বিদেশে সমানভাবে সমাদৃত। উচ্চবর্ণের পরিবারের লোক জনের মধ্যে কাঁসার তৈরি বিভিন্ন দ্রব্যাদির চাহিদা ছিল। এই অঞ্চলে কাঁসার তৈরি দ্রব্যাদির নকশার কাজ দেখে বাংলার সমস্ত অঞ্চল থেকেই মানুষজন ক্রয় করতে আসত। এই খাগড়া অঞ্চলে বহু সংখ্যক কাঁসারিরা বসবাস করত। কাঁসার বাসনপত্রাদির বিক্রির জন্য একটা বড়ো কাঁসারি বাজার গড়ে উঠেছিল, বিট্রিশ শাসনকালেও যার প্রবহমানতা দেখা গিয়েছিল বলা যায়। এই খাগড়া অঞ্চলের শিল্পী, কারিগরদের দক্ষতা সকল মানুষদের কাছেই খুবই প্রশংসা পেয়েছে। শিল্পীদের কাজের দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। তাদের কারুকার্য রচিত কাঁসার বিভিন্ন দ্রব্যাদি বাংলার নবাব বাহাদুর, লালগোলাধিপতি রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখরা শিল্পীদের তারিফ করতেন। এই খাগড়ার বাসনপত্রাদি ক্রয় করার কাজে বহু দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসত।

মুর্শিদাবাদের যে শিল্পগুলি বাংলা ও জেলার অর্থনীতির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল প্রাচীনকাল থেকেই এবং বর্তমানেও জড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাঁসা শিল্প। শোনা যায় যে নবাবি আমলে বঙ্গদেশে যখন ব্যাপকভাবে বর্গির আক্রমণ হয়েছিল তখন থেকেই বড়ানগর ও ধননগর থেকে বহু শিল্পী ও কারিগর মুর্শিদাবাদ জেলার উল্লেখযোগ্য ও সুনাম অর্জনকারী কাঁসাশিল্প অঞ্চল খাগড়া ও কান্দীতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিল বলা যায়। এরা বেশিরভাগই জাতিতে ছিল কংসবণিক সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত। তা ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও বর্গিদের অত্যাচারে এবং জীবিকার তাগিদে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছিল এবং কাঁসাশিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। এই সমস্ত শিল্পী ও কারিগরদের শিল্পকলা একদিকে খাগড়ার কাঁসা শিল্পকে প্রভাবিত করেছিল, আবার অন্যদিকে বাংলার কাঁসাশিল্পকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মুর্শিদাবাদের খাগড়ার কাঁসাশিল্প ছিল জগৎ বিখ্যাত। এখানকার কাঁসার তৈরি দ্রব্যাদি ভারতের বাইরেও রপ্তানি হত। বহরমপুর শহরে এত বেশি সংখ্যক কাঁসাশিল্পী বসবাস করতেন যে একটি মৌজার নাম ছিল কাঁসারি বাজার মৌজা। তাছাড়া খাগড়া পট্টিতে বহু কাঁসাশিল্পী বসবাস করতেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে কাঁসারি বাজার ও মৌজা মিলিয়ে প্রায় ১৮০-২০০ টি কলকারখানা ছিল। সেখানে কাঁসা এবং কাঁসার তৈরি বাসন ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য শুধুমাত্র বহরমপুর শহরেই প্রায় ১৮০০-২০০০ কাঁসাশিল্পী ছিলেন এবং এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল জনসমষ্টি ছিল ৫০০০-৬০০০ হাজরের মতো। কান্দী অঞ্চলেও এই কাঁসাশিল্প ছিল বেশ সমৃদ্ধ। এই শতকের পাঁচের দশকের প্রথমদিকে কান্দীতে ৩৫-৪০ টি কারখানা ছিল এবং ২৫০-৩০০ জন কারিগর ছিলেন। এখানকার তৈরি কাঁসার দ্রব্যাদি কান্দী ছাড়াও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে এবং বিহার, ওড়িশা, লখনউ ইত্যাদি রাজ্যেও বিক্রি হত। কান্দী অঞ্চলে বায়েন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা কাঁসা শিল্পদ্রব্য বাইরের বাজারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এর সঙ্গে বড়ানগর ও জঙ্গিপুর অঞ্চলের কাঁসা শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাঁসা শিল্পীরা হলেন অধীররঞ্জন মিস্ত্রি,

গোবর্ধন মিস্ত্রি, পতিতপাবন মিস্ত্রি, ননীগোপাল মিস্ত্রি, কালিদাস কাঁসারি, বিষ্ণু মিস্ত্রি, বিষ্টু মিস্ত্রি, তারাপদ মিস্ত্রি, দাশু মিস্ত্রি, বাঁকা কাঁসারি প্রভৃতি। ১৯৩১-৩২ সালে বৈদ্যনাথ দাস নামে একজন মূক শিল্পীর কাঁসার উপর খোদাই করা জেনারেল তোজো ও হিরোসীমার ছবি জাপানের এক প্রদর্শনীতে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।[১৭]

১৯৪০-৪২ সালে একজন দক্ষ কারিগর কাঁসার থালা, বাটি ও গেলাস তৈরির জন্য কেজিতে ২৫-৩০ টাকা মজুরি পেতেন। সেক্ষেত্রে খাগড়া ও কান্দীর একজন দক্ষ কারিগর ৩০-৩৫ টাকা মজুরি পেতেন। প্রায় সব কারিগরই এই মজুরি ও পরে প্রতি কেজি শিল্পদ্রব্যের জন্য ১ কেজি ৩০ গ্রাম খুঁট (ভাঙা কাঁসা) পেয়ে থাকেন। যে খুঁট দিয়ে পরবর্তীকালে বিভিন্ন কাঁসার দ্রব্যাদি তৈরি করতেন শিল্পীরা। ১৯৯২ সালে কাঁসারি পাড়ার একজন দক্ষ কারিগর কাঁসার শিল্পী বিভিন্ন ধরনের থালা, গেলাস, বাটি তৈরিতে কেজিতে ৪০-৪৫ টাকা ও কোনো কোনো সময় ৬০-৭০ টাকাও পেতেন ভালো কাজের দক্ষতার জন্য। তবে বর্তমানে একজন দক্ষ ও সুনাম অর্জনকারী শিল্পী কারিগরেরা অনেক বেশী পরিমান মজুরি পেয়ে থাকেন বেশ কিছু সাধারণ কারিগর আছেন যারা শুধু মাত্র কাঁসার তৈরি দ্রব্যাদিগুলি পালিশ করে থাকেন। এরা বাটির ক্ষেত্রে প্রতি কেজিতে ৬ টাকা, গেলাস ও থালার ক্ষেত্রে ৩-৪ টাকা পেয়ে থাকেন। তবে বর্তমানে তার মজুরি অনেকটাই বেশি। কেজিতে প্রায় ৮০-১০০ টাকা বড়ো বড়ো গামলা বালতির ক্ষেত্রে দিনে ১২০-১৫০ টাকা। ২০০১ সালের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিশুদ্ধ কাঁসার গেলাসের প্রতি কিলোতে ৬০-৭০ টাকা, ভরনের গেলাসের ক্ষেত্রে মজুরি কিলোতে প্রায় ৫০-৬০ টাকা, ২ নং কাঁসা (মেটাল) এর গেলাসের ক্ষেত্রে মজুরো প্রতি কিলোতে ৪০ টাকা। বিশুদ্ধ কাঁসার বাটির ক্ষেত্রে মজুরি প্রায় কিলোতে ৭০ টাকা, ভরনের এবং ২ নং কাঁসা (মেটাল) এর ক্ষেত্রে মজুরি কিলোতে প্রায় ৬০ টাকা। বিশুদ্ধ কাঁসার থালার ক্ষেত্রে মজুরি প্রায় প্রতি কিলোতে ৬০ টাকা। কাঁসার এই দ্রব্যগুলির কোনোটিই কোনো একজন কারিগর একরকভবে তৈরি করতে পারেন না। কয়েকজন শ্রমিক ও কারিগর মিলেই বিভিন্ন কাঁসার দ্রব্যাদি তৈরি করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে শ্রমবিভাজন নীতি কার্যকরী হয়ে থাকে। একজন শিল্পী ও কারিগর এক একটি কাজ করে থাকেন। এইভাবে শ্রমিক ঐক্য গড়ে ওঠে ও নিজেদের মধ্যে কাজের অগ্রগতিও বৃদ্ধি পায়। কাঁসার তৈরি বাটি, গেলাস, সকল শ্রমিক ও কারিগর এক সঙ্গে কাজ করলে সেই জিনিস অনেক তাড়াতাড়ি হয় এব্য ত্রুটি বিচ্যুতি কম হয়। ঐক্য ও ভাতৃত্ব বোধও অনেক সময় গড়ে ওঠে।[১৮] একজন দক্ষ কারিগর তাঁর ইউনিটে আরও পাঁচ-ছয় জনের সহায়তার দিনে ৯-১০ কেজি করতে পারেন ফলে মজুরিও অনেক বেশি পাওয়া যায়। দক্ষ কারিগর মূলত দিনে প্রায় ১০-১২ ঘন্টা কাজ করে থাকেন। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, দিনে ৮-১০ ঘন্টা কাজ করে ৯০-১০০ টাকা রোজ করে থাকেন। তবে বর্তমানে মজুরি হিসেবে দিনে ৮-১০ ঘন্টা কাজ করলে ১৫০-২০০ টাকা পেয়ে থাকেন। অর্ধদক্ষ কারিগর বা যারা মূলত কাঁসার দ্রব্যাদি পালিশ করে থাকেন তারা মূলত দিনে ১০০-২০০ টাকা পেয়ে থাকেন। একজন দিনে প্রায় সর্বোচ্চ ৬-৭ কেজি কাঁসার কাজ করে থাকেন। তার বিনিময়ে ৯০-১০০ টাকা পেয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা

প্রয়োজন যে, অধিকাংশ শ্রমিক কারিগরের মাসের মধ্যে সব সময় বা প্রতিদিন কাজ থাকে না। বাজার মন্দার সময় ১৫-২০ দিন কাজ হয় মরশুমেও ২৫ দিনের বেশি কাজ হয় না। তবে যে মাসে সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান বা অর্ডার থাকলে কোনো কোনো সময় মাসে তখন ৩০ দিন কাজ হয়। আবার সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান না থাকলে কাজ অনেক সময় কম হয়ে থাকে। তখন এই সমস্ত শিল্পী ও কারিগরদের বসে দিন কাটাতে হয়। কাঁসার কাজ করতে তেমন অসুবিধা না থাকলেও প্রচন্ড গরমে কাঁসা গলানোর কাজ করতে খুব কষ্ট হয়। এই সময় অনেক বেশি কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন মজুরিও কম পাওয়া যায়। কাঁসা শিল্পে পুরুষ শ্রমিক ও কারিগরদের সঙ্গে যেহেতু মহিলা শিল্পীরা খুব বেশি জড়িত থাকে না সেহেতু খুব বেশি পরিশ্রম গরমকালে আগুনের পাড়ে বসে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।[১৯]

কাঁসার তৈরি দ্রব্যাদি বিক্রয়ের প্রধান মাধ্যম যেহেতু স্থানীয় বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী ও মহাজন সেহেতু কাঁসা শিল্পী ও কারিগরেরা এই সমস্ত ব্যবসায়ী ও মহাজনদের মাধ্যমে কলকাতা ও আরও অন্যান্য স্থানে শিল্পদ্রব্য বিক্রি করে আসেন। তাদের মধ্য দিয়েই শিল্পী ও কারিগরেরা তাদের বিক্রিত অর্থে পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে অনেক সময় নানান সমস্যাও দেখা যায়। যেমন কাঁসা শিল্পে শিল্পী ও কারিগরেরা মহাজন ও ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে তাদের দ্রব্যাদি বিক্রি করে তখন তাদের পক্ষে কলকাতা ও আরও অন্যান্য স্থানের বাজার দরের কোনো খবর তারা পায় না, ফলে কাঁসার বাজার দর অনেক বেশি থাকলেও তারা কম দামে তা বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কেন-না তাদের পক্ষে কলকাতা বা আরও দূরবর্তী স্থানে অনেক সময় যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না অল্প কিছু মাল দ্রব্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য। এতে পরিবহণ খরচ অনেক বেশি পড়ে, লাভ কম হয়। তাই তারা বাধ্য হয় মহাজন ও বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীর কাছে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রি করতে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, বেশির ভাগ কাঁসাশিল্পী ও কারিগরেরা হলেন নিরক্ষর বা অর্ধ শিক্ষিত, ফলে তাদের কলকাতায় গিয়ে বা অন্য কোন স্থানে গিয়ে বাজার দর জেনে আসা সব সময় সম্ভব নয়। তাই তারা মহাজনের কাছে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আবার মহাজন বা ব্যবসায়ীদের কাছে উৎপাদিত কাঁসার দ্রব্যাদি বিক্রি করলে সুবিধাও আছে, কেন-না দেখা যায় যে, তাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি কলকাতা ও আরও অন্যান্য স্থানে নিয়ে যেতে যে অর্থ ও সময় ব্যয় হবে, সেই সময়ের মধ্যেও অর্থ দিয়ে শিল্পী ও কারিগরেরা আরও খুঁট কিনে ও ওই সময়ের মধ্যে বেশি কাঁসার দ্রব্যাদি তৈরি করতে পারবে। ফলে লাভ বেশি হবে এবং অর্থনেতিক দিক দিয়ে তারা আরও বেশি স্বাবলম্বী হতে পারবে এই আশায়। মুর্শিদাবাদে এমন কিছু ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী আছেন যারা এই শিল্প ব্যবসায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত রয়েছেন। তারা এই জেলার শিল্পদ্রব্য বাংলার বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যায়। তাছাড়া আরও অন্যান্য স্থানে এবং বর্হিবাংলায় শিল্পদ্রব্য নিয়ে যায়। আবার বাংলার উল্লেখযোগ্য যেমন নবদ্বীপ, রানিগঞ্জ কাঁসা শিল্পকেন্দ্রগুলি থেকে শিল্পদ্রব্য মুর্শিদাবাদের ছোট ছোট কাঁসা শিল্প কেন্দ্রগুলিতেও নিয়ে আসেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় কান্দী, জঙ্গিপুর প্রভৃতি অঞ্চলের তৈরি বিভিন্ন ধরনের কাঁসার দ্রব্যাদি খাগড়ায় নিয়ে এসে বাইরেও নিয়ে যায়

বিক্রির উদ্দেশ্যে। এইভাবে কাঁসাশিল্পের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, সেটি হল বিভিন্ন স্থানের কাঁসার উৎপাদিত দ্রব্যাদি অন্য কেন্দ্রগুলিতেও নিয়ে আসা হয় ও পাঠানো হয় বিক্রির উদ্দেশ্যে।[২০]

বহরমপুরে কাদাই, গোরাবাজার, খাগড়া, চুয়াপুর, স্বর্ণময়ী বাজার প্রভৃতি অঞ্চল মিলিয়ে প্রায় ৫০-৬০টি দোকান রয়েছে। এইসব অঞ্চলে কাঁসার দোকানের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। কান্দীতে প্রায় ২০টি, জঙ্গিপুরে ২৫টি দোকান রয়েছে। পূর্বে এখানে কারিগর, শিল্পী ও শ্রমিক সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। তবে বর্তমানে কাঁসাশিল্পে নিযুক্ত এই শিল্পী, কারিগর ও শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক কমে যাচ্ছে। কেন-না সেই সময় একদিকে যেমন কাঁসার উৎপাদিত দ্রব্যাদির চাহিদা ছিল অনেক বেশি, বাংলা ও বর্হিবাংলা এবং দেশের বাইরেও চাহিদা ছিল, ফলে উৎপাদন বেশি করতে হত। স্বাভাবিকভাবে শ্রমিক, কারিগর ও শিল্পী অনেক বেশি জাগ্রত। তাছাড়া ব্রিটিশদের কাছে এই শিল্প ছিল অনেক বেশি জনপ্রিয়। তারা কাঁসার বিভিন্ন দ্রব্যাদি অনেক বেশি বেশি দামে কিনে নিত এবং কাঁসাশিল্পী ও কারিগরেরাও মজুরি বেশি পেত। এর ফলে বহু মানুষ অন্য জীবিকা ও পেশা ছেড়ে কাঁসাশিল্পের মতো লাভজনক শিল্পে নিজেদেরকে আরও বেশি বেশি করে মনোযোগ দিয়ে এই শিল্পকে সকলের সামনে তুলে ধরেছিল। কাঁসার তৈরি দ্রব্যাদি এখন আর মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা নেই। আবার দেখা যায় যে, বহু পুরোনো শিল্পী যারা পূর্বে অনেক দক্ষতার সঙ্গে কাঁসার দ্রব্যাদি তৈরি করত তারা বার্ধক্যজনিত কারণে এই পেশায় আর নিজেদেরকে নিয়োজিত করছেন না এবং তাদের ঘরের ছেলে মেয়েরাও পড়াশোনা করে এই অমানবিক পরিশ্রম করতে চাইছে না, ফলে হাতে ধরে দক্ষ ও সুনাম অর্জনকারী কাঁসাশিল্পী কারিগর তৈরি হচ্ছে না। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আধুনিক যুগের ছোঁয়া। আধুনিক যুগে এই কাঁসার বাসনপত্রাদির বিকল্প হিসেবে বহু নতুন নতুন জিনিস তৈরি হচ্ছে যেগুলির দাম কাঁসার তুলনায় অনেক কম অথচ আকর্ষণীয়। সর্বোপরি বলা যায় বর্তমান বাজার মূল্য অনেক বেশি ফলে কাঁসার একটি গেলাস, বাটি, থালা বা আরও অন্যান্য জিনিস তৈরি করতে যে পরিমাণ অর্থ দিয়ে কাঁচামাল কিনতে হচ্ছে, সেই পরিমাণ দাম ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে লোকসান হচ্ছে আগের থেকে লাভ কম হচ্ছে। আবার কোনো কোনো সময় দেখা যাচ্ছে যে, উন্নত মানের কাঁসার কাঁচামালও তেমনভাবে নিকটবর্তী স্থানে পাওয়া যাচ্ছে না। দূরবর্তী স্থান থেকে আনতে গিয়ে পরিবহণ খরচও অনেক বেশি পড়ছে। ফলে কাঁসার উৎপাদনও অনেক কম হচ্ছে। ফলে কারিগর ও শিল্পীদের অবস্থার কোনো অগ্রগতি ঘটেনি।[২১]

মুর্শিদাবাদের কাঁসাশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে বা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, উৎকৃষ্ট কাঁচামালের জোগান সুনিশ্চিত করা, কারণ বৈধ কাঁচামালের জোগান বৃদ্ধি ছাড়া কোনো শিল্প যথাযথভাবে সম্প্রসারিত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, শিল্পের সাবেকি ঘরানার অনেক কাজই আজ হারিয়ে গেছে, আবার নতুন চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক দ্রব্যসামগ্রী তেমনভাবে তৈরি হচ্ছে না, অর্থাৎ গতানুগতিক বাসনকোসনের পাশাপাশি

শৌখিন দ্রব্য, নানান কারুকার্য করা ডিশ উপহার সামগ্রীর উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। যদিও অনেক শিল্পী কারিগরের একটা অংশ এসব কাজে অনেক দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করেন, সৃষ্টি হতে পারে অন্যান্য সাধারণ শিল্প সম্ভার। তৃতীয়ত, কাঁসাশিল্পের কিছু যান্ত্রীকরণের সুযোগ রয়েছে, কিন্তু অর্থাভাবে শিল্পীরা এগুলো ব্যবহার করতে পারে না। শিল্পীদের এইসব যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে সাহায্য করতে পারলে শিল্পের উন্নতি সাধিত হবে। ব্যাংক ও অন্যান্য বেসরকারি আর্থিক সংস্থাগুলি সাহায্য সহযোগিতা করলে আগামী দিনে এই কাঁসাশিল্প উন্নতির স্তরে পৌছাবে একথা বলা অনস্বীকার্য। চতুর্থত, এই শিল্পে কারিগরদের মজুরি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দিন মজুরদের থেকেও অনেক কম। কাঁসাশিল্পী ও শ্রমিকদের বর্তমান মজুরি অনেকটা বৃদ্ধি করতে হবে। মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে বর্তমান বাজার মূল্যের সঙ্গে সংহতি বা সামঞ্জস্য বজায় রেখে, তাহলেই এই কাজে নিযুক্ত শিল্পী ও কারিগরেরা আরও বেশি বেশি করে নিযুক্ত হবে। বাজার মূল্যের থেকে এই সমস্ত শিল্পী ও কারিগরেরা কম মজুরি পায় তার ফলে তারা এই শিল্প থেকে সরে গিয়ে অন্য পেশায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে। শিল্প প্রতিভার এই অপচয় দুঃখজনক। পঞ্চমত, কাঁসাশিল্পটি যেহেতু সম্পূর্ণরূপে মহাজনদের কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে, সেহেতু বেশিরভাগ সময় এই শিল্পী, কারিগরদের মহাজনদের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়।[২২] দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও শিল্পী সমবায় ও বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন, তবে যদি শিল্পীদের নিকট কাঁচামালের জোগান সুনিশ্চিত করা যায়, তবেই পরবর্তীকালে এ শিল্পটি চালানো সম্ভব। কাঁসাশিল্পের ওপর সমগ্র মুর্শিদাবাদের প্রায় ১০-১৫ হাজার মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই নির্ভরশীল ছিল, ঔপনিবেশিক আমলেও এই ধারা বজায় ছিল তবে বর্তমানে এই সংখ্যাটা অনেকটাই কমে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও প্রায় ৫-৬ হাজার মানুষ এই শিল্পের ওপর নির্ভর করে রয়েছেন। এই শিল্পটইকে পুর্নগঠিত করতে পারলে আরও কিছু মানুষের কর্ম নিযুক্তির ব্যবস্থা হবে ভবিষ্যতে। কাঁসাশিল্পের যেহেতু পুর্নবিক্রয় মূল্য রয়েছে বলে সাধারণ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রামের মানুষেরা কাঁসার জিনিসপত্র কিনতে উৎসাহী হয়ে থাকে। আবার বলা যায় যে, কাঁসার বাসন বেশি স্বাস্থ্যসম্মত বলে অনেকে মনে করেন তাই কাঁসার থালা বাসন অতি মাত্রায় ব্যবহার করে থাকেন প্রাচীনকাল থেকেই। তাছাড়া কাঁসা অস্থাবর সম্পত্তিও বটে। বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে উপহার দেওয়া ও মাঙ্গলিক চিহ্ন হিসেবে দেওয়ার ক্ষেত্রে কাঁসার দ্রব্যের চাহিদা রয়েছে এই চাহিদা বাড়ানোর সুযোগও রয়েছে।[২৩]

**তথ্যসূত্র**

১. আশুতোষ দত্ত, কংসবণিক পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ
২. সন্তোষকুমার কুন্ডু, বাঙালী হিন্দু জাতি পরিচয়
৩. মুর্শিদাবাদ জেলা ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার, ২০০৩
৪. আশুতোষ দত্ত, কংসবণিক পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ
৫. প্রাগুক্ত

৬. প্রাগুক্ত
৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, অসিত পাল (কাঁসাশিল্পী), মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৬.০৪.২০১৫
৮. স্বপনকুমার ঘোষ, দক্ষিণবঙ্গের হস্তশিল্প, ২০১১
৯. আশুতোষ দত্ত, প্রাগুক্ত
১০. মুর্শিদাবাদ জেলা ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার, ২০০৩
১১. তদেব
১২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, হরিদাস দত্ত (কাঁসাশিল্পী ও ব্যবসায়ী), খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৫.০৩.১৪
১৩. সুশীল চৌধুরী, নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ: ৩৮
১৪. মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার, পাক্ষিক, ২০০৩, পৃ: ১৭
১৫. অরূপ চন্দ্র, মুর্শিদাবাদ বার্তা, পাক্ষিক, পৃ: ৫৫
১৬. তদেব, পৃ: ৮২
১৭. তদেব, পৃ: ৮৫
১৮. স্বপন কুমার ঘোঘ, দক্ষিণ বঙ্গের হস্ত শিল্প, দেজ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১১, পৃ: ১২৬
১৯. তদেব, পৃ: ১২৭
২০. সাক্ষাৎকার, নিমাই দত্ত (কাঁসার দোকানদার), জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১ ২.১২.২০১৫
২১. স্বপন কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৩০
২২. সাক্ষাৎকার, স্বপন পাল (কাঁসাশিল্পী), বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, তারিখ, ২০.৩০.২০১৫
২৩. সাক্ষাৎকার, বাবন বিশ্বাস (কাঁসাশিল্পী), ধর্মদা, নদীয়া, তারিখ, ১৬.০৫.২০১৬
২৪. সাক্ষাৎকার, যতীন দাস (কাঁসাশিল্পী), মুড়াগাছা, নদীয়া, তারিখ, ২২.০২.২০১৬
২৫. স্বপন কুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৩৫

# লীলা মজুমদারের উপন্যাসে একাকিনীর আত্মনির্ভরতা : সময়ের নিরিখে অভিনবত্বের দাবিদার

কৃষ্টিশ্রী ভট্টাচার্য
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

**সারসংক্ষেপ :**
লীলা মজুমদারের মুখ্য পরিচিতি শিশু সাহিত্যিক রূপে। এর বাইরেও সাহিত্য জগতের বিভিন্ন দিকে তাঁর পদচারণা। তিনি বড়দের জন্য বেশ কয়েকটি উপন্যাস-ও লিখেছেন। মুখ্যতঃ নারীজীবন-ই তার উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। প্রায় নিরুচ্চারে তিনি তুলে আনেন নারী জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের নিপুণ চিত্রমালা। তাঁর নারী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অপরাজেয় আত্মনির্ভর মানসিকতা। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে একলা মেয়েদের আত্মনির্ভরতার চিত্র কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে আর সময়ের নিরিখে তার অভিনবত্বই বা কতখানি, তা-ই বর্তমান প্রবন্ধের বিবেচ্য বিষয়।

**সূচক শব্দ :** লীলা মজুমদার, উপন্যাস, নারীকেন্দ্রিক, আত্মনির্ভরতা, অভিনবত্ব।

লীলা মজুমদার নামটি উচ্চারণ মাত্রই আনুষঙ্গিক যে শব্দটি মনে আসে তা হল শিশু সাহিত্য। তার অন্যান্য কীর্তি ছাপিয়ে শিশু সাহিত্যিক পরিচয়টি যে কেবল বড় হয়ে উঠেছে তা-ই নয় অর্ধ শতকেরও বেশি সময় ধরে তাকে বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী করে রেখেছে। দীর্ঘকালব্যাপী এই জনপ্রিয়তা রক্ষা করে চলা শিশু সাহিত্য রচনায় তার মুন্সীয়ানার সাক্ষ্য বহন করে। পরিবার ও পরিবেশের উত্তরসূরীতা বজায় রেখেও তিনি স্বকীয় এবং স্বতন্ত্র। " পূর্বপুরুষের তুলনায়, তাঁকে মনে হয় বেশি অভিজ্ঞ বেশি সচেতন, কিংবা যাকে ইংরিজিতে বলে সফিস্টিকেটেড – আশাকরি কথাটায় কেউ অপরাধ নেবেন না। এর সমস্তটাই কালধর্মের প্রভাব ভাবলেও ভুল হবে, তাতে লেখকের স্বকীয়তাকে খর্ব করা হয়। যেমন তার গল্পের স্বাদ পাগলা দাশুর সীমাতিক্রান্ত তেমনি সমসাময়িক কারো সঙ্গেও তাঁর সাদৃশ্য নেই।"[১] মহাশ্বেতা দেবী তাঁর প্রসঙ্গে বলেন 'শিশুসাহিত্যে আর একটি ইনস্টিটিউশন।[২] তিনি নিজেও বিভিন্ন সময়ের কথায় নিজের শিশুসাহিত্যিক সত্ত্বাটিকেই গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন - " ... মনে মনে জানতাম বড়দের জন্য লেখা আমার বিলাস, ছোটদের জন্য লেখা আমার জীবন।"[৩] কিংবা "বড়দের চাইতে ছোটদের জন্য লেখায় আনন্দ বেশী। সার্থকতাও।"[৪] 'পাকদণ্ডী' তে

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এই সব টুকরো-টাকরা কথায় ছোটদের জন্য সাহিত্যচর্চার সঙ্গে তার প্রাণের নিবিড় সংযোগটি মূর্ত হয়ে ওঠে।

নিজেকে শিশুসাহিত্যের পথিক রূপে স্বীকৃতি দিতে পছন্দ করলেও তার জীবনের সাহিত্যকৃতির দিকে নজর ফেরালে দেখতে পাই দীর্ঘ সাহিত্য সাধনার পথে তিনি বড়দের জন্যে গল্প উপন্যাস লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, বাংলার পাশাপাশি ইংরাজিতেও মৌলিক রচনা ও অনুবাদ করেছেন, অর্থাৎ সাহিত্যক্ষেত্রের অন্যান্য দিকেও তার লেখনী প্রসারিত হয়েছে। বড়দের জন্য লেখা প্রসঙ্গে সুদক্ষিণা ঘোষ তাঁরই মন্তব্য তুলে ধরেছেন – " ...সত্যি কথাই বলব আমার হৃদয় মথিত করে, দম বন্ধ করে দিয়ে 'আর কোনোখানে আর আরো দু'তিনটে গল্প বাদে বড়দের জন্য লেখা আমার কোনো গল্পের জন্ম আমার হৃদয়ের মর্মমূলে নয়, বরং আমার মস্তিষ্কের উষ্ণ অসহিষ্ণু কোষে কোষে। সত্যিকার সাহিত্যের জন্ম সেখানে নয়।' "[৫] বড়দের জন্য তাঁর কলম ধরার পিছনে সক্রিয় ছিল বাহ্যিক তাগিদ। বড়দের জন্য তার প্রথম লেখা গল্প 'সোনালি-রুপোলি'র রচনা হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে। তার প্রথম দুটি উপন্যাস 'শ্রীমতি'(১৯৫২খ্রিঃ) ও 'জোনাকি'(১৯৫৫খ্রিঃ) মীরা চৌধুরীর 'শ্রীমতি' পত্রিকার জন্য ফরমায়েসি লেখা - "...আমি ওঁদের পেড়াপীড়ি এড়াতে না পেরে, পর পর দু-টি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছিলাম। শ্রীমতি আর জোনাকি, বড়োদের জন্য আমার প্রথম দু-টি উপন্যাস, মনের খুশিতে লেখা। ওঁদের দু-টি নিয়ম ছিল – (১) প্রধান চরিত্র হবে মেয়ে। (২) তার সুখের পরিণাম হবে। নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়ম দু-টি পালন করেছিলাম। তাতে তাদের সাহিত্যিক গুণ বেড়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু জনপ্রিয়তার অবধি ছিল না। এরপর আমার বড়োদের উপন্যাসের চাহিদা এবং সংখ্যা দুই-ই সমানভাবে বেড়ে গেছিল।" [৬]

আপন সৃজনকর্মে বড়দের জন্যে লেখা উপন্যাসকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ হলেও সাহিত্যগুণের বিচারে সেগুলি তাৎপর্যপূর্ণ, এবং সময়ের নিরিখে যথেষ্ট অভিনবত্বের দাবীদার। স্বাধীনতার মাত্র পাঁচ বছর পরে জন্ম নিয়েছিল তার প্রথম উপন্যাস 'শ্রীমতি'(১৯৫২খ্রিঃ) , কেন্দ্রীয় চরিত্র এক নারী। কেবল শ্রীমতি-ই নয়, তার প্রায় সমস্ত উপন্যাসই নারী কেন্দ্রিক। একেবারে নিজস্ব অভিনব লিখনশৈলীতে প্রতিটি উপন্যাসে তিনি তুলে ধরেছেন মেয়েদের যাপন-কথা, চলজীবনের সংঘাত, সংগ্রাম, প্রতিষ্ঠা।

মাত্র সাত মাস বয়সে পিতৃহীন মেয়ে শ্রীমতির মায়ের সঙ্গে অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয় রমেশ চৌধুরীর কাছে আশ্রয় পাওয়া, দেড় বছরে মাতৃপরিত্যক্ত হবার পর সেখানেই বেড়ে ওঠা, শিক্ষা লাভ করা এবং একমাত্র অভিভাবক রমেশ চৌধুরীর মৃত্যুর পর স্বাবলম্বনের পথে নিজের জীবন অতিবাহনের প্রয়াস, এই 'শ্রীমতি' (১৯৫২ খ্রিঃ) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। রমেশ চৌধুরী শ্রীমতিকে সযত্নে মানুষ করলেও, তাঁকে ফেলে চলে যাওয়া মায়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমৃত্যু নীরব থাকেন। এই মৌনতা কেবল পদ্মার দায়িত্ব জ্ঞানহীন স্বার্থান্ধতার জন্য, না অভিনেত্রী পেশাটির প্রতি ঘৃণা থেকে,স্পষ্ট করে কিছু না বললেও সন্ধিৎসু পাঠকের সামনে উঠে আসে এক অদৃশ্য প্রশ্নচিহ্ন । চাঁপাডাঙ্গা স্কুলে শ্রীমতি, প্রধান শিক্ষিকা ও সহশিক্ষিকাবৃন্দের ব্যক্তিগত জীবন পরিচয়, মূল সমাজবৃত্তের থেকে কর্মরতা মেয়েদের অবস্থান দূরত্ব  মেয়েদের শিক্ষা, আর্থিক স্বনির্ভরতা প্রসঙ্গে উঠে আসা সামাজিক-পারিবারিক ভাবনাস্রোতের খণ্ডখণ্ড দৃশ্য জুড়লে পাঠকের সামনে সে সময়ের আত্মনির্ভর নারীর সমাজ-বিচ্ছিন্ন একাকীত্বের আভাস প্রতীত হয়। সেকালের ইঙ্গ-বঙ্গ অভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্চবিত্ত-প্রগতিশীল আধুনিকতার তথাকথিত ঝাঁ চকচকে পর্দা সরিয়ে কথক দেখিয়েছেন সাধারণ গড়পড়তা মধ্যবিত্ত জীবনের মত এখানেও শেষাবধি বিয়েই নারী জীবনের একমাত্র কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য। মেয়েদের যাবতীয় শিক্ষা, শিল্প সৌন্দর্যচর্চা মনোমত সুপাত্রটিকে বশে আনবার সেরা টোপ হয়ে উঠবার জন্যে। কিছু না বলেও কথক বুঝিয়ে দেন কেবলমাত্র বিয়ের বাজারে দর বাড়ানোর জন্য স্কুলে আসা চাঁপাডাঙার নিতান্ত সাধারণ মেয়েদের সাথে এলা, বেলা, চারুশীলা মাসির মেয়েদের অবস্থানে স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে একই। । সমাজবৃত্তের বাইরে থেকে আত্মনির্ভরতার লড়াই করা শ্রীমতিকে মূলবৃত্তে অনুপ্রবিষ্ট করানোর ব্যবস্থা তথা শুভেন্দুর সঙ্গে তার বিবাহসম্ভবনার মাধ্যমে তথাকথিত মিলনান্তক সুখদ যবনিকা পাতেই উপন্যাসের সমাপ্তি। ছকভাঙা জীবনখণ্ডকে তিনি অনায়াসে মিলিয়েছেন নিটোল জীবনবৃত্তে। 'শ্রীমতি' মতই জোনাকি উপন্যাসেও মন্দিরার ভগ্নপ্রেমের পথ চলার পরিসমাপ্তি ঘটে প্রেমের পূর্ণতার বোধে। শঙ্করের সঙ্গে বিচ্ছেদের আঘাত সয়ে নিতে পাটনা থেকে সে কলকাতায় বিধবা মাসির কাছে পাড়ি জমায়। নিজের মতো করে বাঁচতে শেখে। স্টেনোগ্রাফি শিখে সরকারি চাকরিতে যোগদান করে। স্বাবলম্বনের বল কিভাবে একটি নারীর ব্যক্তিত্ব গঠন করে তোলে মন্দিরার জীবনকে যেন তারই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। যে প্রেমিকের বিচ্ছেদে একদা সে গৃহত্যাগ করেছিল, তারই সঙ্গে আপন অনুজার বিবাহ তাকে বিচলিত করতে পারে নি। এই উত্তরণ প্রসঙ্গে

সুদক্ষিণা ঘোষ লিখেছেন – “... প্রথম প্রণয়ভীতা মেয়েটি স্বাধীন জীবিকা আর স্বাবলম্বনের শক্তিতে এমনই ব্যক্তিত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে যে, মন্দিরাকে করুণার চোখে দেখার কথা ভাবেনি সমাজের পরশ্রীকাতর মানুষেরাও। স্বাধীন মেয়ের সক্ষমতার এ-ও এক দৃষ্টান্ত। ”[৭]

কাল্পনিক নাতনি মণিমালাকে উদ্দেশ্য করে ঠাকুমার লেখা চিঠির সমাহারে নির্মিত মণিমালা(১৯৫৬খ্রিঃ) উপন্যাসটি আঙ্গিক ও বিষয়ভাবনা উভয়ের নিরিখেই অভিনবত্বের দাবিদার। শৈশব থেকে নারী হয়ে ওঠার পথে মেয়েদের জীবনে ঘনিয়ে আসা বিচিত্র সমস্যাকে কেন্দ্র করে কথকের ভাবনার প্রতিফলন উপন্যাসে বিম্বিত। আদ্যান্ত স্নেহের সুর বজায় রেখে মণিমালার মাধ্যমে তিনি সমস্ত পাঠককুলের সামনে অতি অনায়াস সরস ভঙ্গিমায় নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। ঠাকুমার চিঠি, প্রকৃতপক্ষে মণিমালাকে উপলক্ষ করে পাঠকের সামনে কেবল মেয়েমানুষ নয় সার্বিক ভাবে মানুষ হয়ে উঠবার পথনির্দেশ। তাই তিনি মণিমালাকে অনর্থক লোকলজ্জাকে প্রশ্রয় দেবার পরিবর্তে নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করেছেন। নিজের দায়িত্ব বহন করার সঙ্গে পরিবার সমাজ এমনকি দেশ গঠনের জন্য নারীর এগিয়ে আসবার প্রয়োজনীয়তার কথাও স্মরণ করাতে ভোলেন নি। কেবল দায়িত্বের বুলি আওড়ানো নয়, শারীরিক মানসিক ভাবে নারীর দায়িত্ব বহনের উপযোগী হয়ে উঠবার নির্দেশনা ঠাকুমার চিঠিগুলিতে অভিনব মাত্রা যোগ করেছে। নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা তথা সংরক্ষণের পরিবর্তে ঠাকুমার চিঠিতে উঠে এসেছে পক্ষপাতহীন সমানাধিকারের কথা - “ পুরুষদের সঙ্গে সব বিষয়ে যখন সমান অধিকার দাবী করো, তখন তোমাদের সমান সমান দায়িত্ব নেবার জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে। ট্রামে বাসে জায়গা কম থাকলে কারা বসবে জানো? যারা বুড়ো , অথর্ব, অসুস্থ,তারা। ... ... ... সত্যি সত্যি যদি পুরুষদের সমান হতে চাও, তা হলে কোনো বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব দাবি করতে পারবে না।”[৮] নারীর সমানাধিকার বা স্বনির্ভরতাকে তিনি এখানে দান নয় অর্জনের স্তরে তুলে এনেছেন। সময়কালের বিচারে এ ভাবনা নিঃসন্দেহে অভিনব ও আধুনিক। ভারতীয় তথা বাংলার ঐতিহ্য রীতিনীতিকে যথোচিত মর্যাদা দিলেও, প্রথার নামে অন্ধসংস্কারের গড্ডলিকা প্রবাহে নির্বিচারে বয়ে যাওয়াকে সমর্থনের পরিবর্তে তিনি যৌক্তিক সংস্কার মূলক প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ১৯৫৬ খ্রিঃ দাঁড়িয়ে নারী স্বনির্ভরতার প্রয়োজনীতা সম্পর্কে তার অভিমত অর্ধশতবছর পেরিয়েও আজও সমান প্রাসঙ্গিক –“ ... আজকাল যে রকম চারদিকে দেখছি,

প্রত্যেকটি পুরুষ ও নারীর নিজের সংস্থানটুকু নিজে করে নেবার ক্ষমতা থাকা নিতান্ত দরকার। বিয়ে হয়ে গেলেও দরকার। ... ... ... তুমি যদি শিক্ষিত ও সমর্থ হও, তা হলে পরমুখাপেক্ষী হওয়া একজন পুরুষ মানুষের পক্ষেও যতটা নিন্দনীয়, তোমার পক্ষেও তাই।"[৯] সময়ের নিরিখে তার ভাবনায় যে প্রগতিশীল মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে, তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়াবহ। প্রচলিত সমাজ ধারণানুসারী দৃষ্টিতে গৃহবধূকে কেবল মাত্র পরনির্ভরশীল হাউস-ওয়াইফ হিসাবে না দেখে, তিনি হোমমেকার হিসাবে তুলে ধরেছেন সংসারের যার অবদান ও ভূমিকার কথা অনস্বীকার্য। গৃহবধূর যে অবস্থানের কথা কল্পনা করে তিনি নাতনিকে কেবল প্রয়োজন ব্যতীত চাকরি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে বারণ করেছেন, যুক্তির বিচারে তার আংশিক সারবত্তা থাকলেও বাস্তবে, নারীর গৃহকাজকেও যথোপযুক্ত সন্মানপ্রাপ্তি ব্যতিক্রমেরও ব্যতিক্রম। যথেষ্ট প্রগতিশীল ভাবনার অধিকারি হবার পরেও হবার নারী ও গৃহকর্ম এই দুটি শব্দবন্ধ তার কাছে প্রায় সমার্থক হয়েই রয়ে গেছে। তবে সামগ্রিকভাবে যে প্রগতিশীল মননের ছবি উপন্যাসে বিম্বিত হয়েছে তার নিরিখে এটুকু উপেক্ষা করাই যায়।

মণিকুন্তলা (১৯৫৬ খ্রিঃ), শূন্য থেকে শুরু করে একটি মেয়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনি। অনাথ, তেরোবছরের বিধবা মণিকুন্তলা আত্মভোলা সঙ্গীত শিল্পী দাদামশাই-এর দীর্ঘ সাত বছরের তালিম ও সাধনায় দক্ষ সঙ্গীত শিল্পী হয়ে ওঠে। জীবনাবসানের পর মণিকুন্তলার বাকি জীবনের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পার্থিব সম্পদের ব্যবস্থা করে যাওয়া তার মত দরিদ্র শিক্ষকের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তৎপরিবর্তে তিনি মণিকুন্তলাকে স্বোপার্জনে সক্ষম করে তুলেছিলেন। মৃত্যুকালে মণিকুন্তলার উদ্দেশ্যে তার অন্তিম উক্তি –" ... দেখ মণি, কিছু রেখে যাচ্ছি না সেটা কিন্তু মিছে কথা, তোকে তো আমি রাজা হবার গুণ শিখিয়ে দিয়েছি। তাই দিয়ে রাজা হ রে মণি, রাজা হ।"[১০] সঙ্গীত-ই মণিকুন্তলা কে শূন্য থেকে পূর্ণের পথে অগ্রসর করে অর্থ, খ্যাতি, মান এনে দেয়। আকস্মিক রোগের আক্রমণে স্বররোধের ফলে তাকে গানের জগত থেকে সরে আসতে হয়। এতদিনের শ্রমে সাজিয়ে তোলা জীবনে ঝড় ওঠে। নিরুচ্চারে ঝড়ের যাবতীয় অভিঘাত বয়ে যাওয়ার ছবি, মণিকুন্তলার আর্থিক স্বাবলম্বনের পাশাপাশি মানসিক দৃঢ়তার-ও পরিচায়ক হয়ে ওঠে। রোগমুক্তির পরেও প্রতিযোগীতার ইঁদুর দৌড়ে থেকে সরে দাঁড়াবার সিদ্ধান্তে, উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে নিমাই চৌধুরীর সঙ্গে মিলন-সম্ভবনা তার ব্যক্তিত্বের অনন্যসাপেক্ষতায় ফাটল ধরাতে পারে না। নারীর জীবনে আত্মনির্ভরতাকে যে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন তা প্রতীয়মান হয় এই উপন্যাসে

কনকের জীবন কথায়-ও। লগ্নভ্রষ্টা কনক, দাদা দিদির সংসারে গলগ্রহ-দশা থেকে মুক্তি পেতে, লোকনিন্দার সম্ভবনা উপেক্ষা করে মণিকুন্তলার কাছে সেলাই শেখে। স্থানীয় মেয়েদের স্কুলে, অস্থায়ী সেলাই শিক্ষিকা হিসাবে পঞ্চান্ন টাকা মাইনের চাকরিওতে যোগ দেয়, পরিকল্পনা করে সরকারি সেলাইয়ের পরীক্ষায় বসবার। পরীক্ষোত্তীর্ণ হলে চাকরির স্থায়ীকরণের সঙ্গে শিক্ষিকার কোয়ার্টারও মিলবে, পরমুখাপেক্ষী জীবন-মুক্তির এই আশা তাকে আনন্দে উদ্বেলিত করে। পরনির্ভর জীবনের যন্ত্রণা আর স্বনির্ভর-স্বাধীন জীবনের পরিতৃপ্তি দুই বিপ্রতীপ অভিজ্ঞতার স্বাদ কনকের কাহিনির মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে।

'ঝাঁপতাল' (১৯৫৮ খ্রিঃ)-এর বিধবা অলকানন্দা দাদার অপমানের ভাত ত্যাগ করে গ্রামের ঠাকুরমশাইয়ের সাহায্যে উঠে এসেছিলেন গ্রামসম্পর্কের আত্মীয়বাড়িতে। অলকানন্দা থেকে অলি মাসির পরিচয়ে দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছরের অক্লান্ত শ্রমের বিনিময়ে পাওয়া পারিশ্রমিক তিলে তিলে জমিয়ে আজীবন তিনি স্বপ্ন দেখে গিয়েছেন একটি নিজস্ব নীড় নির্মানের, যেখানে তিনি তাচ্ছিল্যের অলি নন অলকানন্দা আপন ভুবনের সম্রাজ্ঞী। জীবনের সায়াহ্নবেলায় সে স্বপ্ন পূরণের প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ ত্বরান্বিত করতে এতদিনের পুরোনো আশ্রয়ের নিরাপত্তা ছেড়ে একশ টাকা মাইনেয় ক্যান্টিনের রান্নার কাজের চাকরির সিদ্ধান্ত নিতেও পিছপা হননি। পায়ের নিচে একফালি জমি, মাথার ওপরে ছোট্ট ছাদ, তারই মাঝে মাথা উঁচু করে নিজের মত দাঁড়াবার পরিসর, আত্মনির্ভরতার স্বপ্নটুকু একটি নারীর জীবনে কতখানি হয়ে উঠতে পারে অলিমাসিমার জীবন কথা তার-ই অনবদ্য নিদর্শন। ঝাঁপতালে পাই কেয়ার কথাও - স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ের আত্মনির্ভরতার; মাথা উঁচু করে নিজের শর্তে নিজের মত করে বাঁচার গল্প, আর্থিক স্বনির্ভরতার পাশাপাশি মানসিক স্বনির্ভরতার ছবি - আনন্দের সঙ্গে নতুন ভাবে জীবন তৈরীর সম্ভবনা। রচনাকালের নিরিখে বাংলা উপন্যাসে এ চিত্র অভিনব, লেখকের আধুনিক সংস্কারমুক্ত মানসিকতার পরিচয়বাহী। পুরুষতন্ত্রের ক্রীড়নক নারীই আত্মনির্ভরতার বলে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটিয়ে নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে পারেন তার মূর্ত উদাহরণ কেয়াদের অফিসের বাঙালি মহিলা ছোটসাহেব। একদা কালো হবার অপরাধে স্বামীর পরিত্যক্ত মেয়েটি শিক্ষার বলে হয়ে ওঠেন তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ! অকর্মা বাগাড়ম্বর সর্বস্ব কেরাণী মুকুন্দবাবু প্রবল দাপুটে ছোটসাহেব তথা প্রাক্তন স্ত্রী-র কাছে চূড়ান্ত অপমানিত হয়ে বদলী নিয়ে অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য হন। কর্মক্ষত্রে নারীর এই প্রতাপবলিষ্ঠ রূপ সমকালের নিরিখে তো বটেই সার্বিক বিচারেও বাংলা সাহিত্যে খুব

সুলভ নয়। নারীর আত্মনির্ভর সবলা রূপ বার বার ফিরে ফিরে এসেছে তার উপন্যাসে। উপর্যুপরি চারটি কন্যাসন্তান প্রসবের অপরাধে সন্তান সহ স্বামী গৃহ থেকে বিতাড়িত 'নাটঘর'(১৯৬১ খ্রিঃ) -এর মেনাকাকিমা দরিদ্র পিতার সংসারের গলগ্রহ হবার বদলে সমবায় প্রতিষ্ঠা করে পরিবারের আর্থিক অবস্থা ফেরানোর সঙ্গে গ্রামের বিশিষ্ট জনেদের অন্যতম হয়ে ওঠেন। যে স্বামীগৃহ থেকে একদা তাকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল, সেই বাড়ির অভাব মেটে তারই অনুগ্রহে -'এমন প্রতিশোধ নেবার সুযোগ কম লোকেরই হয়।'[১১] 'নাটঘরে'-ই পাঠকের সঙ্গে পরিচয় হয় নয়নাগ্রামের প্রাথমিক স্কুলের রাধা দিদিমণির। পুলিশ উদ্ধারের পরেও স্বামী বা বাপের বাড়ি থেকে কেউ ধর্ষিত রাধাকে নিতে আসেনি। আশ্রয় ভিক্ষায় নারাজ রাধা রেস্কিউ হোম থেকে নতুন ভাবে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। কারও স্ত্রী বা মা নয়, নিঃসঙ্গ মানবী রূপে শিক্ষকতা আর সমাজসেবার মধ্যে খুঁজে নেয় অনন্যসাপেক্ষ বাঁচার পথ। অতীতকথা জানাজানি হতে নয়নাগ্রামেও আপত্তির ঝড় ওঠে। তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার সম্ভবনা দেখা দেয়। একূল ভেঙে ওকূল গড়ার মতই এই ঝড় তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া সন্তানেদের কাছে। সামাজিক অবিচারের অন্ধকারের বুক চিরে ঔপন্যাসিক জ্বালিয়ে দেন মাতৃস্নেহের আলো।

'আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে'একাকিনীর পথ চলার ছবি দেখা যায় 'আয়না' (১৯৬৪ খ্রিঃ) উপন্যাসেও। তবে এখানে আর স্বামী পরিত্যক্তা নয়, 'আয়না'-র সোমা নিজেই পূর্ব-বিবাহের সত্যগোপনের মত প্রতারণার জন্য, স্বামীকে ত্যাগ করে। প্রেমকে প্রতিষ্ঠা দিতে একদা যে ডাক্তারীর পাঠ অসম্পূর্ণ রেখে ঘর বেঁধেছিল, ভাঙনের পর দিল্লিতে গিয়ে বহু চেষ্টায় সেই পাঠই সে পূর্ণ করে, ডাক্তারী ডিগ্রী অর্জন করে। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ব্যাপী প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলে নিজেকে উৎসর্গ করে মানুষের আরোগ্যের সাধনা চালিয়ে যায়। প্রেমের তাগিদে পিতার ঘর, প্রতারণার প্রতিবাদে নিজহাতে গড়া সংসার ছেড়ে এসে নতুন করে জীবন গড়ার প্রতিস্পর্ধার চিত্র সমকাল ও উত্তর পর্বের সাহিত্যেও অনন্য।

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের উদ্দীপনায় দীপ্ত 'যাত্রী' (১৯৮২খ্রিঃ) উপন্যাসের শোহিনীর মঞ্জরী গ্রামের মায়া পেরিয়ে স্বাধীন জীবনের পথ চলা, সুখস্বপ্নের মত সংক্ষিপ্ত অথচ সুমধুর বিবাহিত জীবন, আর বছর অতিক্রান্ত হতে স্বপ্নভঙ্গের দুঃসহ আঘাত, জীবন সমুদ্রের অবিরত তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যেও অগ্রসরমানতা - নারীর আত্মনির্ভরতাকে বিশিষ্ট মাত্রা দেয়। বিপন্ন বান্ধবীর সন্তানকে বুকে নিয়ে অখ্যাত মঞ্জরী গ্রামের মেয়ে পা রাখে

আমেরিকায়। সেখানে অতুলের সঙ্গে সংযোগে দুটি ভাঙ্গাচোরা জীবন মিলে বহমান হয় একটি পরিপূর্ণ আত্মনির্ভর জীবনস্রোত।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর বুনিয়াদের অন্যতম ভিত্তি নারীর পুরুষমুখাপেক্ষীতা। নারীর হাত থেকে পরনির্ভরশীরতার ষষ্ঠিখানি সরিয়ে বারংবার তাদের নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছেন লীলা মজুমদার। তার উপন্যাসে তাই স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা, অভিভাবকহীন কিংবা অবিবাহিতা মেয়েদের মাথা তুলে বাঁচবার লড়াই, আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার কাহিনি ফিরে ফিরে নানা আঙ্গিকে দেখা দেয়। সার্বিকমূল্যে যাই হোক না কেন, একাকিনীর আত্মনির্ভর অভিযাত্রার চিত্রণে তাঁর উপন্যাস গুলি নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের দাবিদার, এ নিয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। সিংহভাগ ক্ষেত্রেই তার উপন্যাসের নায়িকাদের চলার পথ নিঃসঙ্গ, একাকীত্বে ভরা। স্বেচ্ছায় বা ঘটনাচক্রে আপনজনের সাহচর্য বিহীন দীর্ঘ অভিযাত্রা পথে তারা অপরের গলগ্রহ হননি। দুর্ভাগ্য বা দুরভিসন্ধির কাছে নতমস্তক হবার পরিবর্তে আত্মনির্ভরতার বলে এগিয়েছেন আপন ভাগ্য জয়ের সন্ধানে। জীবনের নানা চড়াই-উৎরাইয়ে ভরা পাকদণ্ডীতে নারীদের এগিয়ে চলার আয়াসের যে ছবি তাঁর উপন্যাসে উঠে আসে লিখন বৈশিষ্ট্যে তা কখনোই উচ্চকিত হয়ে ওঠে না। রূপকথার রাজ্যে যেমন ঢাল তলোয়ারের ঝনঝনানি, রাক্ষস-খোক্ষসের গর্দান কাটার অভিঘাতে কখনওই বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎস রসের ছিঁটে লাগতে দেন না কথাকার, তেমনই লীলা মজুমদার যেন তার লিখন শৈলীর অভিনব মায়ার কুহেলির নিচে ঢেকে রাখেন পাকদণ্ডীর পাশটির খাদের অতলস্পর্শী গভীরতাকে। বাস্তব জীবনের প্রতিকূলতার আগুন ছুঁয়ে গিয়েও দহনজ্বালার আঁচ পড়েনা তার উপন্যাসের মেয়েদের গায়ে। উপন্যাসের নারী চরিত্রেরা অধিকাংশই সুশিক্ষিতা এবং স্বাবলম্বী। স্বাবলম্বনের ক্ষেত্র নির্বাচনেও সম-সময়ের তুলনায় তিনি অভিনবত্বের দাবীদার। শিক্ষিকা, নার্স, গভর্নেস, থেকে শুরু করে সাংবাদিক, অফিস চাকুরে, গায়িকা ইত্যাদি অভিনব পরিসরে তার নায়িকাদের জীবিকার পরিধি বিস্তৃত। সামাজিক ইতিহাসে চোখ রাখলে বোঝা যায়, যে সময় মেয়েদের ন্যূনতম শিক্ষাটুকুও অর্জন করা পুরুষ তান্ত্রিক সমাজের রক্তচক্ষুর কারণ হত, প্রায় সে সময়েই তাঁর লেখায় উঠে এসেছে মেয়েদের শিক্ষা স্বনির্ভরতার কথা। কেবল শিক্ষিকা, পরিচারিকা, বা নার্সিংয়ের চেনা গলিতে নয়, তার মানসকন্যারা জীবিকার সন্ধানে পা রেখেছে বিচিত্র পথের বাঁকে। হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও বজায় রেখেছে জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী–এখানেই তার স্বকীয়তা ও অভিনবত্ব।

**তথ্যসূত্র :**

১. বুদ্ধদেব বসু। সাহিত্যচর্চা। প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত। সিগনেট প্রেস। কলকাতা। এপ্রিল ১৯৫৪ খ্রিঃ – পৃ. ৬৪

২. মহাশ্বেতা দেবী। চেতনায় দুই বিশ্ব। দেশ। সাহিত্য সংখ্যা। ১৯৬৯খ্রিঃ

৩. লীলা মজুমদার। পাকদণ্ডী। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৮৬খ্রিঃ। কলকাতা। পৃ. ২৮২

৪. তদেব.–পৃ. ৩১৯

৫. সুদক্ষিণা ঘোষ। মৃণালের কলম : মেয়েদের ভুলে যাওয়া লেখালিখির জগৎ। প্যাপিরাস। কলকাতা। সেপ্টেম্বর ২০০৭। - পৃ. ১১৫

৬. লীলা মজুমদার। গল্প লেখার কথা। লীলা মজুমদার রচনা সমগ্র। সম্পাঃ সোমা মুখোপাধ্যায়। প্রথম খণ্ড। লালমাটি। কলকাতা। জানুয়ারি ২০০৮ খ্রিঃ

৭. সুদক্ষিণা ঘোষ। মৃণালের কলম : মেয়েদের ভুলে যাওয়া লেখালিখির জগৎ। প্যাপিরাস। কলকাতা। সেপ্টেম্বর ২০০৭। - পৃ. ১১৮

৮. লীলা মজুমদার। মণিমালা। সম্পাঃ- সোমা মুখোপাধ্যায়। লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র। সপ্তম খণ্ড। লালমাটি। ডিসেম্বর, ২০১৩ খ্রিঃ। কলকাতা। পৃ. ১৮৮

৯. তদেব – পৃঃ ১৯৭-১৯৮

১০. লীলা মজুমদার। মণিকুন্তলা। তদেব.– পৃ. ২৬৬

১১. লীলা মজুমদার। নাটঘর। তদেব. – পৃ. ৪৫৮

# আঞ্চলিক পরিবেশ রচনায় বনফুলের অভিনবত্ব

রাজকুমার দে

গবেষক, বাংলা বিভাগ, তিলকা মাঝি ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়

**সারসংক্ষেপ:**

বাংলা সাহিত্যের বহু ঔপন্যাসিকের মধ্যে একমাত্র বনপফুলের উপন্যাসেই বিহারের পূর্ণিয়া, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষের কথা বেশি পরিমাণ রয়েছে । তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র চরিত্র রূপে দেখা দিয়েছে ও মানবমনের উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছে । তাঁর উপন্যাসে অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে গোষ্ঠী জীবনের সামঞ্জস্য জীবনস্বাদের এক অনন্য একমুখীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 'ভুবনসোম' উপন্যাসে সাহেবগঞ্জ ও তৎসংলগ্ন এলাকার ভাষা, সেখানকার অধিবাসীদের সামাজিক রীতিনীতি, পাখি শিকারের কলাকৌশল বর্ণিত হয়েছে । 'কিছুক্ষণ' উপন্যাসটিতেও বিহারের এক অজ্ঞাত গ্রামাঞ্চলের পরিবেশ বর্ণিত হয়েছে । ষ্টেশনের রূপকে জীবনের রঙ্গমঞ্চের কথা এখানে ব্যক্ত  হয়েছে । 'জঙ্গম' উপন্যাসটিতে তিরিশের দশকের কলকাতা শহরের জীবন চাঞ্চল্য রূপটির সঙ্গে বিহার অঞ্চলের শান্ত গ্রামাঞ্চলের রূপটি উপন্যাসে প্রতিভাসিত হয়েছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী দশকের ভারতের গ্রাম ও শহরের এক আলেখ্য রূপ তিনি তুলে ধরেছেন । এখানেই বনফুলের লেখনীর অভিনবত্ব ধরা  পড়েছে ।

**মূল আলোচনাঃ-** বাংলা সাহিত্যের সৌধ নির্মাণে বিহারের মাটি ও পরিবেশের বেশ বড় একটা অবদান আছে । বনফুল, শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকরা বিহারে জন্মেছেন ও জীবনের বড় একটা অংশ অতিবাহিত করেছেন এই বিহারেই। শরৎচন্দ্রও ভাগলপুরে বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনেকদিন বিহারে বসবাস করেছেন। তিনি বিহারের কর্মস্থানে বসেই 'পথের পাঁচালী' রচনা করেছেন । সাহিত্যিক বিমল করের প্রথম জীবনটা বিহারেই অতিবাহিত হয় । সুতরাং এঁদের প্রত্যেকের সাহিত্য কর্মে বিহারের অল্প বিস্তর বর্ণনা রয়েছে । শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বের ইন্দ্রনাথ, নতুনদা, ছিনাথ বহুরূপী বিহারের অঞ্চলের বিশেষ পরিবেশ থেকে উঠে আসা মানুষগুলির কথা মনে পড়িয়ে দেয় । এছাড়া বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিতা' ও 'আরণ্যক' উপন্যাসেও বিহার অঞ্চলের বিশেষ

পরিবেশের প্রভাব রয়েছে । কিন্তু এদের মধ্যে বনফুলের উপন্যাসেই সবচেয়ে বেশি বিহারের পূর্ণিয়া, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষের কথা রয়েছে । মেডিকেল কলেজের কয়েকটা বছর ও পরিণত বয়সে কলকাতায় এসে পাকাপাকিভাবে বাস করার আগে জীবনের উল্লেখযোগ্য বছরগুলো তিনি বিহারের গ্রামীণ পরিবেশ ও লোক জীবনের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসেছিলেন । আর এজন্যই তাঁর উপন্যাসে বিহারের এই সরল, সবল মানুষগুলির জীবনকথাই অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে বর্ণিত হয়েছে । প্রত্যেক সাহিত্যিক বিশেষ এক পরিবেশ থেকে নিজ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে । সেজন্য অনুনয় চট্টোপাধ্যায় বলেছেন – "সাহিত্যিক মাত্রেরই নিজস্ব একটি পরিবেশ থাকে, যেখান থেকে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, চরিত্র নির্বাচন করেন, এক কথায় শিল্পের যাবতীয় মাল-মশলা সংগ্রহ করেন । প্রতি শিল্পীই একটি ভৌগলিক সীমায় conditioned হয়ে যান এবং যিনি এই সীমাকে অতিক্রম করতে পারেন তিনি মহাকবি শক্তির অধিকারী।"[১] বনফুল ছিলেন প্রকৃতপক্ষে এই মহাশক্তিধর প্রতিভার অধিকারী । আঞ্চলিক পরিবেশ উপন্যাসে কীভাবে অঙ্গীভূত হয় তা নির্ধারণ করতে গিয়ে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন – "আঞ্চলিক উপন্যাসের তিনটি প্রধান উপাদান : অঞ্চলটি সম্পর্কে লেখকের দীর্ঘকালীন নিবিড় অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি ও নির্লিপ্তি । আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান দুটি লক্ষণ – প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র চরিত্র রূপে দেখা দেয় ও মানবমনের উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করে; এবং ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে গোষ্ঠী জীবনের সামঞ্জস্য জীবনস্বাদের অনন্য একমুখীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় । একথা এখানে অবশ্যস্মর্তব্য, আঞ্চলিক উপন্যাস যখন আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে এক সংকেত ধর্মীতায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই তা সার্থক ।"[২] এখন বনফুলের উপন্যাসে আঞ্চলিকতার এই উপাদানগুলি কতটা প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে তা পর্যালোচনা করে দেখা যাক ।

'ভুবনসোম' উপন্যাসে সখীচাঁদ একজন বিহারী গোয়ালা । সাহেবগঞ্জ ও তৎসংলগ্ন এলাকার ভাষার প্রভাব তার কথাবার্তায় ধরা পড়ে । সে 'ঝঞ্ঝাট' কে 'ঝনঝট', 'দ্বিরাগমন' না বলে 'গওনা' বলে, এক নম্বর বদমাইশকে বলে 'নমরি বদমাশ' । ভুবন ঘোষের স্মৃতিচারণায় ধরা পড়েছে পাগড়ি পড়া মহাত্মা গান্ধী বারহারোয়া স্টেশনে থার্ড ক্লাস গাড়িতে চড়ে ভ্রমণ করছেন । পরের স্টেশনে গাড়ী থামলে গান্ধীজীকে ফুলের মালা পরায় জনতা । উপন্যাসটির কাহিনি শুরু হয়েছে ভুবনসোমের প্রতীক্ষায় অপেক্ষারত ভাইপো নিখিলের কথা দিয়ে । পরের দিন সন্ধ্যায় ভুবনসোম শিকারযাত্রা শেষ করে তামা তুলসী দিয়ে সখীচাঁদকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে জাহাজে ফিরে

গেছেন । মূল কাহিনিটি মাত্র কয়েক ঘণ্টার । উপন্যাসটিতে সাহেবগঞ্জ ঘাট থেকে সাত-আট মাইল দূরবর্তী সখীচাঁদের শ্বশুরবাড়ির গ্রাম ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিবরণ রয়েছে । শিকার করতে গিয়ে ভুবনসোম ঐ অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষগুলির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসেছিলেন । ফলে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বর্ণনা রয়েছে ।

সাহেবগঞ্জ এলাকায় মানুষদের যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম মোষের গাড়ি বা গরুর গাড়ি । পাখি শিকার করতে যাবার জন্য অনিল তাই ভুবনসোমকে বলেছে – "একরটা মোষের গাড়ি ব্যবস্থা করেছি । আমারই গাড়ি । সেই গাড়ি করে ভোরে কিযনপুর যেতে হবে । সেখান থেকে হাঁটাপথে যেতে হবে আরও কিছুদূরে, তারপর গঙ্গার চর পাওয়া যাবে । সেই চরে অনেক পাখি বসছে আজকাল ।"[৩] রাতে বিশ্রাম করে ভুবনসোম সেই কথা মতো ভোর তিনটের সময় মোষের গাড়ি করে গঙ্গার চরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে । গাড়োয়ান ছেলেটির নাম ভুট্টা । ভুট্টা খেতেই তার জন্ম দিয়ে তার মা সেখানেই মারা যায় । মাসীর কাছেই সে মানুষ হয় । সময় মতো গন্তব্যস্থলে যাবার জন্য ভুট্টা মোষের পেটে কাতুকুতু দেয় । ফলে মোষগুলি খুব জোরে ছুটতে থাকে । গাড়ির ছই এর ভিতর বসে থাকা ভুবনসোমের হাড়গোড় ভাঙার উপক্রম হয় । ভুবনসোম আসতে চালাতে বললেও ভুট্টা মোষদুটিকে তাড়া করে – "ভুট্টা কিন্তু কর্ণপাতই করলে না তাঁর কথায় । পর মুহূর্তেই একটা মোষের পিঠে দমাস করে এক ঘা লাঠি বসিয়ে বলে উঠল, 'বাবু হেনো বুইলছে, শালা বোচা !' এর প্রত্যেকটি কথা বুঝতে পারলেন ভুবনসোম । বাবুর মতো হাঁটছেন, শালা কুমির । একটা কৌতুক অনুভব করলেন তিনি । যে আইন অনুসারে মানুষকে বাঁদর বললে গালাগালি দেওয়া হয়, ভুট্টা সেই আইনই অনুসরণ করেছে, বেআইনি কিছু করেনি । কিন্তু এরকম গালাগালি এই প্রথম শুনলেন তিনি ।"[৪] অবশেষে ভুবনসোম তার সঙ্গে গল্প করে ভুট্টাকে একটু অন্যমনস্ক করে দিতে চাইলেন । ভুট্টার খাদ্যাভাসও বিচিত্র ধরণের । সে বুটের ছাতু খেতে ভালোবাসে । সে ভাত খায় না, রুটি খায় । পেঁয়াজের সাথে উচ্ছে ভেজে রুটি দিয়ে খেতে সে ভালোবাসে । গাড়ি চলতে চলতে হঠাৎ এক 'বিহনিয়া' মোষের আবির্ভাব হলে ভুট্টা ও ভুবনসোম বহু কষ্টে গাছে চড়ে বসল । আসলে বিহনিয়া মোষ হল 'ব্রিডিং বাফেলো'। এরা নিজের এলাকায় দ্বিতীয় পুরুষ মোষকে কিছুতেই প্রবেশ করতে দেয় না । এই 'বিহানিয়ার' অতর্কিত আক্রমণে মোষ দুটি বাঁধন খুলে ছুটে পালিয়ে যায় । ভুট্টা মোষদুটি খুঁজে আনতে যায় । ভুবনসোমও হেঁটে হেঁটে গঙ্গার চরের দিকে এগিয়ে গেলেন । চারদিকে গম, যব, ছোলার সবুজ শস্যক্ষেত । এছাড়া

বড় বড় অড়হর গাছ রয়েছে । ভরদ্বাজ, টিয়াপাখি, খঞ্জন ইত্যাদি নানা পাখির ঝাঁকের সঙ্গে অজানা প্রচুর পাখিও আকাশে উড়ে বেড়াছে । আকাশেও নানা রঙের খেলা জমে উঠেছে । একে একে দেখা হয় ভাগিয়া, ভিখন গোপ, বিদিয়া, চতুর্ভুজ গোপ, মাস্টার ইত্যাদি বিচিত্র মানুষদের সঙ্গে । শহুরে ভুবনসোমের কাছে এরা অচেনা কিন্তু ঐ অঞ্চলে তারা খুব স্বাভাবিক চরিত্রের মানুষ বলে মনে হয় । ভাগিয়া কুড়িয়ে পাওয়া পাঁচ টাকার নোটটি ভুবনসোমকে ফিরিয়ে দেওয়ায় তার সততা প্রকাশ পেয়েছে । বিবাহিতা কিশোরী বিদিয়া উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে মোষের পিটে চড়ে ঘুরে বেড়ায় । ভুবনসোম এ অঞ্চলে পাখি শিকার করার কৌশল জানে না বলে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে । আবার নিরীহ পাখিদের হত্যা করছে বলে অভিযোগ করে – "আপনি নিরীহ পাখিদের উপর গুলি চালাচ্ছেন কেন ? কি দোষ করেছে বেচারারা -"[৫] অতিথি সেবা না হওয়া পর্যন্ত চতুর্ভুজ গোপ হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে ।

ভুবনসোম খুব কড়া অফিসার । তিনি তাঁর অধস্তন কোন কর্মচারীর অন্যায় দেখলে তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট দেন । তাদের কোন অনুগ্রহ তিনি চান না । এমনকি তিনি নিজের ছেলের চাকরিটিও খেয়েছেন এই একই কারনে । তিনি সখীচাঁদ নামে এক ঘুষখোর কর্মচারীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবেন বলে ভেবেছিলেন কিন্তু কাজের চাপে এখনও তা করা হয়নি । কিন্তু বিদিয়ার ঘরে সখীচাঁদের ছবি দেখে জানতে পারে সখীচাঁদই বিদিয়ার স্বামী । ভুবনসোম নিজ পরিচয় আত্মগোপন করে বলে যে সে ভুবনসোমকে চেনে । বিদিয়া তাই তাকে বলল যে তিনি যেন ভুবনসোমকে অনুরোধ করে সখীচাঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না করেন । কারণ সখীচাঁদের চাকরি চলে গেলে তার আর শ্বশুর ঘর করা হবে না । বিদিয়ার চেষ্টায় অতিকষ্টে ভুবনসোম এরপর একটি 'চখা' শিকার করেন । পাখিটার পায়ে খুব সামান্য লেগেছিল আর তাতেই ভয় পেয়ে পাখিটা পড়ে যায় । মজুরেরা পাখিটার ডানা আর পা ভাল করে বেঁধে দিল যাতে হাত থেকে ফসকে উড়ে পালাতে না পারে । বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার কারণে গুলি চালাতে গেলে হাত কেঁপে যায়, ফলে পাখি উড়ে পালায় । নিজের অক্ষমতা বুঝতে পেরে চোখে জল আসে তাঁর । তাই বিদিয়ার সহযোগিতায় হাঁসটি ধরে তাঁর খুশি আর ধরে না । তাই সরলা বালিকা বিদিয়ার প্রতি আত্মীয়তার উষ্ণতা অনুভব করে ভুবনসোম । ভুবনসোম বন্দী চখাটিকে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন । কিন্তু তার সঙ্গিনী স্ত্রী হাঁসটি তার মাথার উপর চক্রকারে ঘুরতে থাকে । কাঁ – আ, কাঁ – আ শব্দে করে আর্তনাদ করে । হঠাৎ ভুবনসোমের মনে হল - "যে পুরুষ চখাটাকে তিনি

জখম করে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন সে যেন সখীচাঁদ, আর যেটা উড়ে উড়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসছে সে বিদিয়া। 'কাঁ – আ, কাঁ – আ' এই ডাকের মধ্যে তিনি শুনছিলেন, 'দয়া করুণ, ওকে ছেড়ে দিন'। ওর চাকরিটা যেন না যায়, তা হলে আমার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হবে না।"[৬] তাই তিনি চখাটিকে মুক্তি দিলেন, রিপোর্টও তিনি আর করলেন না। তাঁর বদলে তামা, তুলসী আর গঙ্গাজল দিয়ে সখীচাঁদকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে জীবনে আর কখনো সে ঘুষ নেবে না ।

একটি ষ্টেশন চত্বরকে কেন্দ্র করে 'কিছুক্ষণ' উপন্যাসটির পটভূমি গড়ে উঠেছে। উপন্যাসটিতে মাত্র কয়েক ঘন্টার বিবরণ আছে । ষ্টেশন সংলগ্ন পরিবেশটি গ্রাম্য – "বন্ধুর গ্রাম্যপথ । যতদূর দৃষ্টি চলে, চাহিয়া আছি । চোখে পড়িতেছে দূরে তালগাছের সারি, ঋজু বলিষ্ঠ দেহ লইয়া আকাশের বুকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য আঁকিয়া রাখিয়াছে । তাহাদের আশেপাশের ঘনসন্নিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণিকে এতদূর হইতে চেনা যায় না । নগণ্য জনতার মতো উহারা দিগন্তরেখাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে মাত্র ।"[৭] পশ্চিমগামী একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হবার জন্য যানজট সৃষ্টি হয়েছে । তাই দুদিকের যাবার যাত্রীরা ষ্টেশনে আটকে পড়েছেন । লেখকও একজন আটকে পড়া যাত্রী । তিনি একে একে মানুষগুলিকে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তাদের কথা বলে যাচ্ছেন । তিনি এক একটি ঘটনা দেখছেন এবং তার বিস্তারিত বর্ণনা করে যাচ্ছেন । উপন্যাসটিকে কোন নায়ক – নায়িকা নেই, কোন মূল ঘটনাও নেই । টুকরো টুকরো দৃশ্যগুলি জুড়ে সমসগ্র উপন্যাসটি অবয়ব গড়ে উঠেছে । উপন্যাসে যে ষ্টেশনটির বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেটি নিতান্তই গ্রাম্য । এটি একটি ছোটোখাটো ষ্টেশন । অনেক যাত্রী একসঙ্গে আটকে পড়ায় ষ্টেশন চত্বরে সকলের স্থান সংকুলান হচ্ছে না । খাবারের একটি মাত্র দোকান রয়েছে । দোকানী বনশি লুচি ভেজে সকলের চাহিদা মেটাচ্ছে । ষ্টেশনে একটি মাত্র জলের কল রয়েছে । এক কাবুলিওয়ালা জলের কলটিকে কিছুক্ষণ আটকে রাখলে জলের জন্য হাহাকার পড়ে যায় । ষ্টেশনের এক কোনে বসে থাকা একটি একাকিনী মেয়েকে কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক বিরক্ত করছে – "ইহাদের এত আনন্দের উৎস কি, তাহাও পরক্ষণেই আবিস্কার করিলাম, নিকটেই দেখিলাম, একটি কমবয়সী মেয়ে একেবারে একাকিনী একটি সুটকেসের উপর বসিয়া আছে । কাছাকাছি তাহার কোনও আত্মীয়স্বজন আছে বলিয়া মনে হইল না । মেয়েটি গম্ভীর ভাবে দূরে মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে ।"[৮] এই মেয়েটিই 'মুচির মেয়ে' বলে নিজেকে পরিচিত করেছে । তাঁর জন্ম কায়স্থ বংশে। কিন্তু জন্মের পরই সে মুচির ঘরে মানুষ হয়েছে । ছোট

জাতের বলে নিজের পরিচয় দিয়ে সে মাখনবাবুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেল না । এখন সে ক্রিশ্চান হয়েছে । তাই সে মেডিকেল কলেজের ছাত্রটির কাছে পরিচয় দেয় – "হ্যাঁ, আমি ক্রিশ্চান । মিস মার্থা দাস এখন আমার নাম । কিন্তু আমি মুচির মেয়ে বলেই নিজের পরিচয় দিতে ভালবাসি – বিশেষত হিন্দু সমাজে ।"[৯] শেষে জানা যায় যে ইনি রেলের পি.ডব্লিউ.আই. সাহেবের বাগদত্তা স্ত্রী । আসল পরিচয় জানার পর সকলই তার প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয় । ট্রেন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সিগন্যালার রামদীপ । কিন্তু তার চাকরিটি বাঁচাবার জন্য ড্রাইভারের উপর দোষ চাপায় ষ্টেশন মাস্টার । এক মারোয়ারী তার ব্যবসায়ী বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে ট্রেনটিকে আরও চব্বিশ ঘণ্টা আটকে রাখতে অনুরোধ করে রেলকর্মচারীকে । কারণ এতে তার লুচি তরকারির বিক্রিটা আরও কিছুটা বাড়বে । এই বিশৃঙ্খল পরিবেশেও এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান দম্পতি তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার হাস্যকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে ।

লেখক ষ্টেশন ছাড়িয়ে নদীপথে হাটতে বেরুলেন । সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল । চারদিকে পরিবেশ ছিল মনোরম – "দূরে কোথাও একটা কেউ ডাকিতে লাগিল, গাছটার ও পাশে গিয়া দেখি, একটা উঁচুমতো ঢিবি রহিয়াছে । তাহাতেই উঠিয়া বসিলাম । উঠিয়া বসিয়া পূর্ব দিগন্তে চাহিয়া রহিলাম । চাঁদ উঠিয়াছে । আকাশে মেঘের চিহ্ন নাই । ফাঁকা মাঠে ঝিরঝির করিয়া সুন্দর বাতাস বহিতেছে ।"[১০] স্নিগ্ধ হাওয়ায় লেখক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন । নিদ্রাভঙ্গ হলে তিনি দেখেন পাশেই একটা চিতা জ্বলছে । কয়েকজন লোক মড়া পোড়াচ্ছে । তাড়াতাড়ি করে তিনি ষ্টেশনে ফিরে এলেন। তিনি এসে দেখলেন সমস্ত যাত্রী নিয়ে ট্রেন চলে গেছে । তিনি যাবেন উল্টোদিকে । তারও ট্রেনের সময় আসন্ন হয়েছে । গোটা ষ্টেশন চত্বর এখন নিস্তব্ধ । ষ্টেশনের রূপকে জীবনের রঙ্গমঞ্চের কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে ।

তিরিশের যুগের কলকাতা শহরের জীবনচাঞ্চল্যপূর্ণ রূপটি 'জঙ্গম' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে । একদিকে চঞ্চল প্রাণ কলকাতা, অন্যদিকে বিহারের শান্ত গ্রামাঞ্চলের রূপটি উপন্যাসে প্রতিভাসিত হয়েছে । শঙ্কর বন্ধু উৎপলের জমিদারীতে জমিদারী পরিচালনার ভার নিয়ে বিহারের এক গ্রামাঞ্চলে বহুমুখী গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাকে কাজে রূপ দিতে চেয়েছে – "কলিকাতা পরিত্যাগের পর দেখিতে দেখিতে চার বৎসর কাটিয়া গেল । যে উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া সে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা অনেকটা সফল হইয়াছে বইকি । দশটি পাঠশালা, একটি বালিকা বিদ্যালয়, গোটা দুই দাতব্য চিকিৎসালয়, দুইটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে । দরিদ্র চাষিদের জলকষ্ট

নিবারণের জন্যপ্রতি গ্রামে গ্রামে নতুন ইঁদারা প্রস্তুত করানো হইয়াছে, পূরাতন কূপগুলির সংস্কার – সাধন করা হইতেছে । ইহা ছাড়া অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সহজ – প্রতিষেধ্য সংক্রামক ব্যাধি নিবারণ প্রভৃতির জন্যও চেষ্টার ত্রুটি নাই ।"[১১] কিছুদিন কাজ করার পর শঙ্কর নিজ অভিজ্ঞতায় বুঝাতে পেরেছে যে, গ্রাম শহরের থেকে অনেক পিছিয়ে আছে । এমনকি গ্রাম ও শহরের মধ্যে কোন আন্তরিক যোগাযোগও নেই । শঙ্কর উপলব্ধি করেছে – "উপকারী ভদ্রলোক সম্বন্ধে দরিদ্র নিরক্ষর আত্মোন্নতি – বিমুখ অপরিনামদর্শী গ্রামবাসীদের যে অবিশ্বাস ও বিরূপতা আছে তাঁকে অতিক্রম করা শঙ্করের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয় । শহুরে শিক্ষিত সাহিত্যপ্রাণ সংস্কৃতি – অভিমাণী আদর্শবাদী তরুণ শঙ্কর উৎপলের জমিদারিতে গরীবের 'ভালোই' করতে গিয়ে অনুধাবন করেছে  গ্রাম-ভারতের মর্মকে যে স্পর্শ করতে পারছে না । ধীরে ধীরে ভারতের আর এক রূপ শঙ্কর দেখেছে । 'জঙ্গম' তাই শহর ভারতের নয়, গ্রাম-ভারতের ও জীবনচিত্র । এখানেই বনফুলের শিল্পীমানস সামাজিক কাঠামোকে অবলম্বন করে জীবনের ছবি এঁকেছে । সমাজতত্ত্বের জ্ঞান, চিকিৎসকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জীবনের প্রতি অশ্রান্ত কৌতূহলের সমবায়ে গড়ে উঠেছে 'জঙ্গমে'র জগৎ । বনফুল তারই রূপকার ।"[১২] শহর থেকে গ্রামে গিয়ে শঙ্করের জীবন সম্বন্ধে ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে । শঙ্করের সাহিত্যসেবায়, জনহিতকর কাজকর্মে, জনসেবার মধ্য দিয়ে তার এক নতুন রূপের পরিচয় পাই । শঙ্কর চরিত্রের এই বিবর্তন উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে এক ঐক্যমূল – বন্ধন এসেছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী দশকের ভারতের গ্রাম ও শহরের এক আলেখ্যরূপ তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন । এখানেই বনফুলের লেখনীর স্বাতন্ত্র্যতা খুব সহজেই ধরা পড়ে ।

**তথ্যসূত্র:**

১. অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, আঞ্চলিকতা, অনাগরিক প্রেম : তারাশঙ্করের গল্প, গল্পগুচ্ছ পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, শরৎ ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ ।

২. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা । পৃ – ২৭, ১৯৯৯ খ্রিঃ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ।

৩. বীতাশোক ভট্টাচার্য (সম্পা), বনফুলের রচনাসমগ্র (অষ্টম খন্ড) । পৃ – ৫৯৮, ২০১৩ খ্রিঃ, বাণীশিল্প, কলকাতা ।

৪. তদেব, পৃ – ৬০৪ ।

৫. তদেব, পৃ – ৬২৭ ।

৬. তদেব, পৃ – ৬৪২ ।

৭. বীতাশোক ভট্টাচার্য (সম্পা), বনফুলের রচনাসমগ্র (প্রথম খন্ড) । পৃ – ৪২১, ২০১২ খ্রিঃ, বাণীশিল্প, কলকাতা ।

৮. তদেব, পৃ – ৪২৭ ।

৯. তদেব, পৃ – ৪৫৩ ।

১০. তদেব, পৃ – ৪৬২ ।

১১. বীতাশোক ভট্টাচার্য (সম্পা), বনফুলের রচনাসমগ্র (তৃতীয় খন্ড) । পৃ – ৫৯৮, ২০১২ খ্রিঃ, বাণীশিল্প, কলকাতা ।

১২. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা । পৃ – ১২১, ১৯৯৯ খ্রিঃ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ।

# শিশু সাহিত্যে ঐতিহ্যবাহী মহাভারতের পরম্পরার অভিনবত্ব

সৌমিতা মুখার্জ্জী
গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

**সারসংক্ষেপ :**
মহাভারত পরম্পরাগত আদর্শ সোপান, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সমন্বিত দর্শন তত্ত্ব। শিশুচেতনায় বিস্ময়-রহস্য-কৌতুক বিচিত্রগামী। বিশ্বায়ন-যন্ত্রদানবতা প্রযুক্তিবিদ্যা সাহিত্যে শিশুদের অনীহা – সেতু নির্মাণ করেছে। শিশুমননে মহাভারত্বের ভরাডুবি, সেখানে ধর্মনীতি অপেক্ষা অলৌকিকতা – রহস্য – অবাস্তবতার অভিনবত্ব শিশুমননে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মহাভারতের মহাভার ও বিশালবপু শশিভূষণ দাশগুপ্ত, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর প্রমুখ শিল্পীর হাতে অভিনব শিল্পিত আখ্যানে পরিণত হয়েছে। সেই ঐতিহ্যের অভিনিবেশে সাহিত্যিকদের লেখনীর তুলনামূলক অভিনবত্বের দিকগুলি এখানে আলোচিত হয়েছে। সেখানে অমৃতসমান মহাভারতকথা শিশুচেতনায় অভিনব শিল্পিত পন্থা রচনা করেছে।
**সূচক শব্দ :** পরম্পরাগত ঐতিহ্যে মহাভারতের অবস্থান – শিশুমননের উপযোগীতা – যোগীন্দ্রনাথ, শশিভূষণ, উপেন্দ্রকিশোর বর্ণিত মহাভারতে অভিনবত্ব – পর্বভিত্তিক অভিনবত্বের তুলনা – আদর্শগত গ্রহণযোগ্যতা – শিশুমনে অভিনিবেশ – উপসংহার।

মহাভারত জগতের বিস্ময়, কুহেলিকা আচ্ছন্ন রহস্যাবৃত চমকপ্রদ জ্ঞানবিচ্ছুরণের ধ্রুবক সংহিতা। মহাভারতে চরিত্রের বিচিত্রতা, কর্ম-ধর্ম-শাস্ত্র-নীতি-উপদেশ ন্যায় অন্যায় – সত্য মিথ্যা – চিন্তা চেতনার অবগাহনে কৌতূহলের অনন্য জীবন জিজ্ঞাসা। সেই জিজ্ঞাসার সাংকেতিকতায় মূল গ্রন্থিগুলির অনুসন্ধানে পাথেয় স্বরূপ জাগতিক জ্ঞানবোধে দ্বান্দ্বিক প্রবাহে বৈজ্ঞানিক যুক্তির উত্তরণে মহাভারতের অভিনবত্ব যুগ যুগ ধরে অমলিন। সেই ঐতিহ্যবাহী পরম্পরা শিশুসাহিত্যের জগতে ধরা পড়ে প্রকাশে বর্ণনায় রসরুচিতে নতুন অবয়ব ধারণ করে বর্ণময় আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

শিশুচেতনার জগত তথা শিশুমনন এক বিস্ময় সমুদ্রে দোদুল্যমান। ভাবনার বাতাসে তা বিচিত্রগামী ও রহস্যের অপার কৌতুকে রঞ্জিত। বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যা ও যন্ত্রসভ্যতা শিশুদের শৈশব ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছে। বিশ্বায়ন সাহিত্য- সংস্কৃতির প্রতি শিশুদের অনীহা- সেতু নির্মাণ করেছে। তবুও কোন অদম্য আকর্ষণবোধে রূপকথার জাদুকাঠি, অলৌকিক রহস্য, পৌরাণিক পরম্পরা আজও অমলিন। শিশুমননে

মহাভারতের ভরাডুবি, সেখানে ধর্ম-নীতি-আদর্শ অপেক্ষা পৌরাণিক অলৌকিকতা, রহস্য, অবাস্তবতার অভিনবত্ব শিশুহৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলে। শিশুপুরাণের বীজবপনে ভবিষ্যৎ আদর্শবোধের মহাপ্রাণ ঘুমিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে মহাভারতের কাহিনী বৃত্তান্ত ছবির মত কল্পনাবিলাসী। ছেলেদের মহাভারত রচনার সমুদ্রে শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'ছোটদের ব্যাসদেব রচিত মহাভারত', যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ছোটদের মহাভারত', উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছেলেদের মহাভারত' অদ্ভুত রসাত্মক সৃষ্টিকর্মে উল্লেখযোগ্য। মূল মহাভারতের সমন্বয়ে পর্ব –সমাহারে অতি সরল অথচ রোমাঞ্চপূর্ণ ক্ষুদ্র শিল্পিত অভিনিবেশ। অমৃতসমান মহাভারত কথা অপেক্ষা ভীষণ আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনার রসায়ন শিশুচেতনায় তরঙ্গের উথালপাতাল। ছোটোদের তিন মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনায় ঐতিহ্যবাহী পরম্পরার বিশ্লেষণ আলোচ্য বিষয়। প্রথাগত পরম্পরার চর্যা ও চর্চা পুরুষানুক্রমিক এবং শ্রুতিনির্ভর। বিশাল আয়তনের সারবত্তাকে শিশু উপযোগী, রসময় – প্রাণবন্ত – আনন্দপূর্ণ করতে গিয়ে শিশুদের জন্য লিখিত মহাভারতে অভূতপূর্ব সৃজনশক্তি ও কল্পনাবিলাসিতার পরীক্ষা দিয়েছেন, যাতে অপ্রাসঙ্গিক জটিলতা – ঘটনার ঘনঘটার প্রাচুর্য বর্জিত হয়েছে।

মহাভারত কেবল ভারত নয়, বিশ্বসাহিত্যের অমূল্যরতন। ঐতিহ্য – পরম্পরার আবর্তনে মহাভারতের নবরসায়ণ, বিশ্বমস্তিষ্কে রহস্যের বিস্ময় পদচারণা। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সে কাব্যগাথা অনবদ্য ও রমণীয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত এই মহাকাব্য। কাশীদাসী মহাভারতের জেরে মহাকাব্য গাথা বাঙালীর মন – মানসিকতায় আচ্ছন্ন, প্রচ্ছন্ন ভালোলাগা শিশু মননে প্রভাব বিস্তারকারী। বাংলায় ঐ মহাকাব্যকে কাশীরাম ছাড়া ঘনশ্যাম দাস, অনন্ত মিশ্র, ষষ্ঠীধর সেন, গঙ্গাদাস সেন, সৃষ্টিধর সেন, রাজেন্দ্র দাস প্রমুখরা পর্ব বিশেষে অনুবাদ করে জনপ্রিয়তা দান করেছেন। মহাভারত প্রখর দীপ্যমান – একাধারে মহাকাব্য, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, পুরাণ সমন্বয়ে জ্ঞানভাণ্ডারের মূলীভূত প্রেরণা। গাথা তথা আখ্যানে রচিত চরিত্রে জীবনের সরলতা – জটিলতা – কুটিলতা – মহানুভবতার আদর্শে প্রকৃত পথনির্দেশে সূত্রায়ন লিপিবদ্ধ।

ছোটদের মহাভারতে ঐ চরিত্রসমূহের ঘনত্ব শিথিল করে কিছু আদর্শ চরিত্রকে গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে অকারণ ঘটনার বিন্যাস শিশু মনের স্বাভাবিক রসবোধ ও কৌতূহলী জিজ্ঞাসাকে বিঘ্নিত না করে। সেখানে দেব – নর – কিন্নর – গন্ধর্ব – রাক্ষস – ঋষি প্রত্যেকের অস্তিত্বে দৃঢ় প্রভাব আচ্ছন্নতা লক্ষণীয়।তিন সাহিত্যিকের বর্ণনার

তুলনামূলক আলোকপাতে অভিনবত্বের ছটায় শিশু উপযোগী মহাভারতের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। অষ্টাদশী পর্ব সমাহারে মহাভারতের ভারত্বের সংক্ষিপ্তায়ণ ঘটানো হয়েছে।

মূল মহাভারতে অজস্র আখ্যানের ভিড়, কথা প্রসঙ্গে বহু উপাখ্যান তাত্ত্বিক নৈতিকতা – ধর্ম – অর্থ কাম মোক্ষ জটিল মনোস্তত্ত্বের বহুমুখী অবস্থান। আদিপর্বে কৌরব পাণ্ডবদের জন্ম, দ্রোণাচার্যের অস্ত্রশিক্ষা, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থে বা খাণ্ডবপ্রস্থে রাজপুরী নির্মাণ সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ, দ্যূতক্রিড়ার আয়োজন, দ্রৌপদীর অপমান, পাণ্ডবদের বনগমন; বনপর্বে পাণ্ডবদের বনবাস কথা, ইন্দ্র কর্তৃক কর্ণের কবচ কুণ্ডল হরণ, বিরাটপর্বে বিরাট রাজপুরীতে দ্রৌপদীর সহ পঞ্চপাণ্ডবের অবস্থান, কীচক বধ, উদ্যোগপর্বে যুদ্ধ আয়োজন, ভীষ্ম – দ্রোণ – কর্ণ – শল্য পর্বে কৌরববীরের মৃত্যু, দ্রোণপর্বে অভিমন্যুবধ, সৌপ্তিকপর্বে পাণ্ডব শিবিরে অশ্বত্থামার হত্যাকাণ্ড, দুর্যোধনের মৃত্যু, স্ত্রীপর্বে শোক, শান্তি ও অনুশাসন পর্বে ভীষ্মের মৃত্যু, অশ্বমেধ পর্বে অশ্বমেধ যজ্ঞ, মুষলপর্বে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির দাবানলে মৃত্যু, মুষলপর্বে যদুবংশধ্বংস, মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ পর্বে দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান বিধৃত হয়েছে।

- যোগীন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক প্রণীত 'ছোটদের মহাভারত' গ্রন্থের সূচনা হয়েছে –

'সেকালে দিল্লীর কাছে হস্তিনা নামে একনগর ছিল'। হস্তিনায় শান্তনুর রাজত্ব, শান্তনু – গঙ্গাদেবীর বিবাহ এবং দেবব্রত নামে এক পুত্র রেখে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন কথা দিয়ে কাহিনির শুরু। ধীবর পালিত সত্যবতীর সঙ্গে শান্তনুর বিবাহ, ধীবরের শর্তমতে দেবব্রতের ভীষণ প্রতিজ্ঞায় 'ভীষ্ম' হবার কথা রয়েছে। কুরু বংশে পাণ্ডব ও কৌরবরা জন্মায়।

> *"পাণ্ডু কুরুবংশের রাজা হইলেও তাঁহার ছেলেগুলিকে লোকে*
> *'পাণ্ডব' বলিত আর ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের বলিত 'কৌরব'।"*

দুই পক্ষের প্রতিযোগিতা, দ্রোণের কাছে শিক্ষা প্রসঙ্গ স্বল্প কথায় রয়েছে। বারণাবতের অগ্নিকাণ্ড থেকে উদ্ধার পেয়ে পাণ্ডবের জঙ্গলে প্রবেশ করে। এখানে হিরিম্ব – হিরিম্বা প্রসঙ্গটিকে রসালো ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গটি নিম্নরূপ –

"বা, কি মজা রে! ছুটে যা, ধ'র্‌বি আর ঘাড় মট্‌কাবি!" দাদার কথায় হিড়িম্বা হন্‌ হন্‌ করিয়া ছুটিয়া আসিল বটে, কিন্তু ভীমকে দেখিয়াই সে এমন মোহিত হইয়া গেল যে, ঘাড় মট্‌কাইবার কথা তাহার আর মনেই রইল না।

শিশু মননে চমক সৃষ্টি কথা মত করে হিড়িম্বা বধ, ছায়া দেখে পঞ্চতীরে চক্রভেদ প্রসঙ্গ দ্রৌপদীর পাণ্ডবদের সাথে বিবাহ, খাণ্ডব – বন দহন প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।

- উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছেলেদের মহাভারত'-এর সুচনায় রয়েছে –

“এখন আমরা যাহাকে দিল্লী বলি, সেই দিল্লীর কাছে, অনেকদিন আগে, হস্তিনা বলিয়া একটি নগর ছিল।”

হস্তিনার রাজা বিচিত্রবীর্যের ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু নামে দুই পুত্র এবং জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হবার জন্যে পাণ্ডুকে রাজা করা হয়, সেই থেকে তাদের এবং তাদের পুত্রদের মধ্যে বিবাদের সুত্রপাত। উপেন্দ্রকিশোর শান্তনু প্রসঙ্গটিকে বাদ দিয়ে কাহিনী শুরু করেছে এবং দ্রোণাচার্য কথা প্রসঙ্গে শান্তনু-গঙ্গা-ভীষ্ম-সত্যবতীর কথা প্রসঙ্গ এনেছেন। হিরম্ব বধ প্রসঙ্গটি অধিক মনোগ্রাহী। হিরম্ব বিকট রাক্ষস, তালগাছের মত দেহ, আগুনের চোখ, জ্বালার মত মুখ, মুলোর মত দাঁত, গাধার মত কান আর বেলুনের মত বিশাল ভুঁড়ি। হিড়িম্বার ভাষাখানা আরো অদ্ভুত, পাণ্ডবদের দেখে হিড়িম্বাকে বলে –

*“বাঃ! কিএ মিঠ্‌ঠারে গন্ধো! ও বোহিন্‌, ঝাট্‌ কোরে ধোরে লিয়ে আয়! মোরা খাবো! আর পেটমে ঢাক পিট্টায়কে নাচ্‌বো!”*

-এই বর্ননা বাস্তবিক মনোহারী।

উপেন্দ্রকিশোর আদিপর্বের বিশাল আখ্যানকে সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা করলেও তাতে কথা পূর্বকথা পুরান প্রসঙ্গ ইত্যাদি কার্যকারণসূত্রে যোগীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বিস্তারিত ভাবে রয়েছে।

- শশীভূষণ দাশগুপ্তের ছোটদের মহাভারতে 'কথা-আরম্ভ'-তে অভিমন্যু পুত্র পরীক্ষিৎ, শৃঙ্গীমুনির শাপে রাজার তক্ষক নাগ দংশনে মৃত্যু, পরীক্ষিৎ পুত্র জনমেজয়ের সর্পজজ্ঞ, ব্যাসদেব আদেশে বৈশম্পায়নের মহাভারত কথন প্রসঙ্গে মহাভারত পূর্বকথায় মূলসূত্র সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। বৈশম্পায়ন যজ্ঞের ফাঁকে জনমেজয়কে যে কাহিনী শোনান, তাই হল মহাভারত কথা। আদিপর্বের শুরু হয়েছে গঙ্গাকে শান্তনুর নিষেধবাক্য দিয়ে –

“ফেলো না, ফেলো না –এই ছেলেটিকেও গঙ্গার জলে ফেলে দিও না।”

সাতটি ছেলেকে জলে ফেললেও অষ্টমকে না ফেলতে অনুরোধ করে শান্তনু, পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে গঙ্গা অন্তর্হিতা হন। এই অষ্টম পুত্র দেবব্রত ভীষ্ম। সরলভাবে গল্পধারা প্রবাহে সৃজনীশক্তির অনন্যতা লক্ষণীয়। প্রতিপর্বে বোধগম্যের সুবিধার্থে ছোট ছোট উপপর্ব শিরোনাম সহ রয়েছে, যেমন – 'কুমারগণের বাল্যক্রিড়া ও বিবাদের সুত্রপাত', 'কুমারগণের অস্ত্রগুরু রূপে দ্রোণাচার্য', 'একলব্যের গুরুদক্ষিণা' ইত্যাদি বিষয় গম্ভীরতাকে ছবির মত স্পষ্ট করে দেয়।

শশিভূষণের হিড়িম্ব শ্যামবর্ন, চক্ষু পিঙ্গলবর্ন, চুল গোঁফদাড়ি রক্তবর্ণ। হিড়িম্বের বাক্য ভদ্রগোছের, বোন হিড়িম্বাকে বলে –
'অনেক দিন খাইনি সুস্বাদু নরমাংস – মানুষ-কটা শিগগির ধরে নিয়ে আয় তো' বর্ননার অতি সরলতা শশিভূষণের মহাভারতের জনপ্রিয়তার কারণ।

- সভাপর্বে ইন্দ্রপ্রস্থে ময়দানবের অপূর্ব মায়া নগরী নির্মাণ ও রাজসূয় যজ্ঞের মহা আয়োজনে ঈর্ষান্বিত হয়ে কৌরবরা ধূর্ত পাশাখেলায় আহ্বান জানালে যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় বাজি রেখে দাস-দাসী, ধনদৌলত, সম্পত্তি হারান। আবারো চারভাই, নিজেকে এবং শেষে দ্রৌপদীকে বাজি রেখে পরাজিত হন। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গ মহাভারতের অনাকাঙ্খিত কলঙ্কিত অধ্যায়। মূল মহাভারতে কর্ণ দুঃশাসনকে পাণ্ডবসহ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের নির্দেশ দেয়। দুঃশাসন যখন অন্তপুর থেকে দ্রৌপদীকে কেশ আকর্ষণ করে টানতে টানতে আনেন তখন তিনি একবস্ত্রা রজঃস্বলা ছিলেন। দ্রৌপদীর অনুরোধে –

"দুঃশাসন বলে তুমি ছাড় হেন আশা।
অশুচি বা হও কিম্বা হও একবাসা।।" (কৃত্তিবাসী মহাভারত সভাপর্ব)

সভাপর্বে সকলের সামনে বিধ্বস্ত দ্রৌপদীর সম্ভ্রম কৃষ্ণ রক্ষা করেন। বিষয়টির প্রভাব শিশুমনে বিশেষ ভাবে যাতে না পড়ে ছোটদের মহাভারত রচয়িতাবৃন্দ সজ্ঞানে রিক্ততা উল্লেখ না করে তা এড়িয়ে গেছেন। যোগীন্দ্রনাথ সরকার লেখেন –

*"সেদিন শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা ভিন্ন দ্রৌপদীর লজ্জা সম্ভ্রম রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।"*

উপেন্দ্রকিশোরের বর্ননা কিছু বিস্তারিতভাবে ঢেলে সাজানো –

*"দ্রৌপদীর গায়ের কাপড় দুঃশাসন নিজেই কাড়িয়া লইতে গিয়াছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! দেবতার কৃপায় সে সময়ে তাঁহার গায় এতই কাপড় হইল যে, দুঃশাসন প্রানপণে টানিয়াও তাহা শেষ করিতে পারে না। সে যত টানে, ততই লাল, নীল, হলদে, সোনালী,*

*নানারঙের হইয়া কাপড় বাড়িয়া যায়। শেষে অপ্রস্তুত হইয়া হতভাগা বসিয়া পড়িল।"*

বর্ণনার প্রাঞ্জলতায়, নিঁখুত বিন্যাসে, মনগ্রাহী ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

শশিভূষণের বর্ননায় সরল বিন্যাস লক্ষণীয় –

*"দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষন করতে লাগলেন, দুর্যোধনও তাঁকে অপমান করতে লাগলেন।... কৃষ্ণের মায়ায় দ্রৌপদীর গায়ে নানা বর্নের অফুরান্ত বস্ত্র দেখা দিল, দুঃশাসন আর টেনে শেষ করতে পারলেন না।"*

ধৃতরাষ্ট্রের তিনটি বরে দ্রৌপদী সকলের মুক্তি চাইলে পাশাখেলার পুনরায় আহ্বানে যুধিষ্ঠির হারলেন এবং পণ অনুসারে পাণ্ডবরা সব হারিয়ে বারো বছর বনবাস এবং এক বছর অজ্ঞাতবাসে বনে গমন করেন এবং বনপর্ব শুরু হয়।

- বনপর্বে বারো বছর বনবাসের দ্রৌপদীসহ চার পাণ্ডবের বৃত্তান্ত হয়েছে। এই পর্বের বকরূপী –ধর্ম ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন নীতিশিক্ষা ও মূল্যবোধের আধারস্বরূপ। যোগীন্দ্রনাথের মহাভারতে অতিসংক্ষেপে প্রশ্ন উত্তরের নির্দেশ দিয়েছেন মাত্র। যুধিষ্ঠির ব্যতীত অন্য ভ্রাতাদের সংজ্ঞাহীনতা এবং ধর্মপুত্রের উত্তরে সন্তুষ্ট ভ্রাতৃগণ সকলের প্রান ফিরিয়ে ধর্ম বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসের নির্দেশ দেন। উপেন্দ্রকিশোরের মহাভারতের প্রসঙ্গটি তুলনামূলকভাবে বিস্তারিত করেছেন। প্রশ্ন উত্তরের কথাও সংক্ষেপে রয়েছে। একনাগারে ধর্ম বলে গেছে ধর্মপুত্র তার উত্তর দিয়েছেন। শশিভূষণের গ্রন্থটিতে এই প্রশ্ন উত্তর পর্বটি বিস্তারিত ভাবে এসেছে। ধর্মরূপী বকের প্রশ্নগুলিকে ছান্দিক উপস্থাপনে লেখা হয়েছে অনেকটা কাশীদাসী মহাভারতের মত –

'এই জগতে সুখী কে?
কী আশ্চর্য সবচেয়ে?
খাঁটী পথ কী? বললে তাই –
বাঁচিয়ে দেব তোমায় ভাই।'

এর সপক্ষে পাদটীকা মূল মহাভারতের উৎসটির নির্দেশ করেছে –

"কো মোদতে কিমাশ্চর্যং ক পন্থা কা চ বার্তিকা।
বদ মে চতুরঃ প্রশ্নান্ – মৃতা জিবন্তু বান্ধবাঃ।।"

ধর্ম পুত্রের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে দেন –

'পাঁচদিন বা ছ-দিন পরে
শাক রেঁধে খায় নিজের ঘরে,
ঋণ নেই – আর নয় প্রবাসী
তার জীবনে সুখের হাসি।'

সপক্ষে পাদ টীকায় মূলশ্লোক রয়েছে –

"পঞ্চমি হহনি ষষ্ঠে বা শাক্যং পচতি স্বে গৃহে।
অনৃনী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে।।"

এইভাবে সকল প্রশ্নোত্তর গুলিকে মূলশ্লোকের সাপেক্ষে সুসজ্জিত করা হয়েছে। বকরূপ ধর্ম ও ধর্মপুত্রের প্রশ্ন উত্তরগুলি জীবনের জাদুকাঠি। শিশু মনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী সেগুলিকে নিখুঁত উপস্থাপনে শশিভূষণ তার বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী।

• দ্রোণপর্বে অভিমন্যু বধ মহাভারতের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। অর্জুনের অনুপস্থিতিতে চক্রব্যূহ ভেদ রহস্য করেছিল বালক অভিমন্যু। গর্ভকালীন অবস্থান সে ব্যূহভেদ প্রক্রিয়া জানলেও তা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় জানত না। যুধিষ্ঠির আদি তাতগণ ব্যূহে একত্রে প্রবেশ করতে চাইলেও দ্রোণসজ্জিত ব্যূহে অভিমন্যু ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারে না। সপ্তরথী অপ্রতিরোধ্য বালককে একত্রে আক্রমণ করে। যোগীন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন –

"দুঃশাসনের পুত্র অগ্রে উঠিয়া তাঁহার মস্তকে এমন কঠিন আঘাত
করিল যে, সেই বীরশিশুর মোহনিদ্রা আর ভাঙ্গিল না।"

ভীমপুত্র ঘটোৎকচের যুদ্ধ বর্ননা আকর্ষণীয় –

"ঘটোৎকচ একাই যেন একশত। সে যে কখন্ কোথায় থাকে,
কখন্ কাহার ঘাড়ে পড়ে, কখন্ কাহার মাথা ভাঙ্গে, বুঝাই ভার!"

কর্ণের ইন্দ্রপ্রদত্ত অব্যর্থ অস্ত্র দ্বারা ঘটোৎকচের মৃত্যু হলে তার বিরল দেহের ভারে এক অক্ষোহিনী সেনা ধ্বংস হয়।

উপেন্দ্র কিশোরের কাহিনীতেও শিশুমন উপযোগীয় ভাষায় বালক অভিমন্যুর মহান বীরত্বের কথা এবং ছয়বীরের একত্র আক্রমণে গদার আঘাতে ক্লান্ত অবসন্ন অভিমন্যুর মৃত্যু বর্ননা হয়েছে। ঘটোৎকচের উৎপাতে কৌরবপক্ষ ব্যতিব্যস্ত। অর্জুনের কথায় ঘটোৎকচ কর্ণের সাথে যুদ্ধ করলে ঘটোৎকচ দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। জটাসুরের পুত্র অলম্বল রাক্ষস দুর্যোধনকে বলে –

> “হেই মোহাররাজ্জ! মোকে বোল্না, মুহি পাণ্ডোবের্র্কে মারকে মারকে খাই। ই লোক মোর বাপ্পুকে মারিলেক্।”

রাক্ষসের বাচনভঙ্গি অশিষ্ট, প্রকৃতই তা বর্ণনাগুণে প্রশংসনীয়।

শশিভূষণের দ্রোণপর্বে বালক অভিমন্যুর পতন উপমাত্মক –

> “সারাদিন নিজের তেজে পৃথিবীকে দগ্ধ করে সন্ধ্যায় যেমন সূর্য অস্ত যায় তেমনিতর সারাদিন নিজের অমিত তেজে কৌরব সৈন্য দগ্ধ করে কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে অস্ত গেল বীর কিশোর অভিমন্যু।”

ঘটোৎকচের বর্ননা সাধারণ, কবচকুণ্ডলের বিনিময়ে ইন্দ্রকর্তৃক প্রদত্ত অব্যর্থ শক্তিবাণে কর্ণ দুর্ধর্ষ মহাবপু ঘটোৎকচকে মেরে ফেলে।

- ভরাসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে ভীম দুঃশাসনের রক্তপানের প্রতিজ্ঞা করেছিল। কর্ণ পর্বে দুঃশাসনের সঙ্গে ভীমের গদাযুদ্ধে দুঃশাসন পরাস্ত হয়। যোগীন্দ্রনাথের মহাভারতে পাই প্রতিজ্ঞা পালনের কথা –

> “... দুঃশাসনকে দুই পায়ে পেষণ করিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাঁর বুক চিবিয়া ফেলিলেন। তারপর দুই হাত ভরিয়া রক্ত উঠাইয়া পান করিতে করিতে বলিলেন, ‘আঃ ঠিক যেন অমৃত!’

উপেন্দ্রকিশোর রক্তপান প্রসঙ্গও মনোরম। গদা আঘাতে ধরাশায়ী দুঃশাসনের বুকে পদপেষণে তলোয়ার বসিয়ে দিয়ে ভীম-

> “দুঃশাসনের গরম রক্ত সবেগে বাহির হওয়ামাত্র, ভীম আনন্দে তাহা পান করিয়া বলিলেন, “আহা! কি মিষ্টি! দধি দুগ্ধ বা ঘৃত পানেও আমি এত সুখী হই না।” ভীমের অবস্থা দেখে সৈন্যরা ভয়ে পলায়ন করে- “বাবা রে! রাক্ষস রে!”

শশিভূষণের বর্ননায় ভীমের দুঃশাসনের রক্তপান বর্ননা অতিসংক্ষিপ্ত ও সাধারণ।

- সৌপ্তিকপর্ব মহাভারতের কলঙ্কিত পর্ব। ভগ্নউরু দুর্যোধনের সেনাপতি হয়ে অশ্বথামা অন্যায়ভাবে রাতের অন্ধকারে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে পাণ্ডবপুত্রদের এবং স্ত্রীলোক ব্যতীত সকল যোদ্ধাদের হত্যা করেন। বীভৎস নারকীয় হত্যা বর্ননা ছোটদের তিন মহাভারতকার খুব সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন। শিশুমনে হত্যার ত্রাস যাতে সঞ্চারিত না হয়, এ বিষয় তাঁরা বিশেষ সচেষ্ট ভাবে এড়িয়ে গেছেন। বর্ণনার খাতিরে নীরব পদচারণা লক্ষণীয়। স্ত্রী-শান্তি-অনুশাসন অশ্বমেধ আশ্রমবাসিক –মুষল, মহাপ্রস্থান ও

স্বর্গারোহন পর্বগুলি সাধারণ ভাবে গল্পের ছলে অগ্রগতি পেয়েছে। সংক্ষিপ্ত পর্বগুলির বর্ণনা সরল ও আড়ম্বরহীন। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্বে যুদ্ধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে পৌঁছালে নিজ আত্মীয়বর্গকে দেখার জন্য ব্যাকুল হলে ইন্দ্র দেবদূতকে তাদের কাছে নিয়ে যেতে বলে।

কৃমি-কীট-রক্তমাংসের কর্দম ও দুর্গন্ধে পূর্ন পথ দিয়ে নরকে কর্ন-ভীম-অর্জুন-নকুল-দ্রৌপদী প্রমুখদের ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পান। উপেন্দ্রকিশোরের মহাভারতেও এ পর্বের সুঠাম সাবলীল বর্ননা লক্ষনীয়। অশ্বাথামা বিষয়ে দ্রোণকে মিথ্যার বলার অপরাধে যুধিষ্ঠিরের ক্ষনিক নরকদর্শন হয়। ধর্ম দেবনদী মন্দাকিনীতে স্নান করে মনুষ্যদেহ লুপ্ত হয়ে যুধিষ্ঠির দিব্য মূর্তি লাভ করে। স্বর্গে সকল আত্মীয়বর্গ ও কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে অতুল আনন্দে মগ্ন হয়। কাহিনীর শেষে ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয় বিষয়টি উঠে আসে। শশিভূষণের মহাভারতে দেখি কুকুররূপী ধর্ম নিরন্তর ধর্মপুত্রকে  পরীক্ষা করে চলে, ধর্মপথে সদা অটল যুধিষ্ঠির একমাত্র সশরীরে স্বর্গে যায়। নীতিবাক্যরূপে বলা হয়েছে-

> "ধর্মকে কোরো না ত্যাগ কখনো প্রানের বিনিময়ে। .... কিন্তু জেনো,
> এর মাঝে জাগে জীব সত্য চিরন্তন আর সত্য ধর্ম শুধু-ধর্ম নিত্য
> চির অকম্পন।"

শশিভূষণবাবু এর সাথে মূলভারতের শ্লোক উপস্থাপন করেছেন –

'ন জাতু কামাদ্ ন ভয়াদ্ ন লোভাদ্
ধর্মং ত্যজেজ্-জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
নিত্যো ধর্মঃ সুখ-দুঃখে ত্বনিত্যে
জীব নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ।।'

মহাভারতের কাহিনী পরম্পরার অন্তিমে নীতিবাক্য ও মূল প্রাপ্তির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সমগ্র মহাভারতের চরিত্রগুলির উত্থান পতন, ন্যায়-ত্যাগ-সংকল্প-শাসন-শোষণ-শান্তি অপেক্ষা ধর্মপথে অটল থাকার অস্তিবাদে আস্থা রেখেছেন সকলে। জয়-পরাজয়, জীবন-মৃত্যু, ধর্ম-কর্ম মিলেমিশে একাকার স্বর্গীয় লাবণ্যে সৌন্দর্য নিকেতনে। চিরন্তন সত্যবীজ ধর্ম পথে ঊর্দ্ধগামী, মনের জটিলতা নিম্নগামী। ধর্মচ্যুতিতে নরকদর্শন, সেখানে সংসার সমুদ্রে নিত্য আসা-যাওয়া, নিত্য জন্ম-মৃত্যু, নিত্য-সুখ-দুঃখ নিমিত্তমাত্র – ধর্ম সত্য – চিরন্তন-অকম্পন একমাত্র পরম কাঙ্ক্ষিত ধন। সত্য-ন্যায়ের ভিত্তিতে ধর্ম উচ্চচূড়। শিশুমননে মহাভারতের বৃহৎ কথার জটাজাল দূরীভূত করে সাধারণ কাহিনী

পরম্পরায় তাত্ত্বিক জড়িমাকে ব্যতিরেকে মূল ঐতিহ্যের অনুসরণ তিন শিশুশিল্পীর মহৎ উদ্দেশ্য।

উপেন্দ্র কিশোর গ্রন্থের সূচনায় বলা হয়েছে –

> "মহাভারতের সুরটি অন্যরকম। এই গ্রন্থে সমাজ ও রাজনীতি একটা সচেতনতা লাভ করেছে। ..... মহাভারতের আখ্যানকে বালক – বালিকাদের উপযোগী করিতে গিয়া উহার স্থানে স্থানে আবরণের প্রয়োজন হইয়াছে।"

শশিভূষণবাবুও বলেছেন সাহিত্য-সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতি গোটা ভারতবর্ষের পরিচয় ছড়িয়ে আছে বিপুলায়তন মহাভারতে। বস্তুত তিন শিশুশিল্পী নিরলস প্রয়াস করেছেন জটিলতার জটিল অপসারণ করে আকর্ষণীয় সরল আখ্যানের পটচিত্রের প্রলেপ দিতে। গ্রন্থগুলির জনপ্রিয়তা সেই সাফল্যের জয়ধ্বজাকে আন্দোলিত করে চলেছে প্রবহমান কালের দীর্ঘসময় জুড়ে পাশাপাশি মহাভারতের রসময় বৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ছবিগুলি শিশুমনের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে বাড়িয়ে দিয়ে বিষয়টিকে অতোধিক আকর্ষণীয় করে তোলে। প্রতিপর্ব কেন্দ্রিক চিত্র উপস্থাপনের নিপুণতা আখ্যানকেন্দ্রিক গ্রহণযোগ্যতাকে বাড়িয়ে তোলে। যা নেই মহাভারতে, তা নেই ভূভারতে – প্রবাদবাক্যের সত্যতায় অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে মহাভারত দর্পনে চিত্তশুদ্ধির দর্শন। শিশুমনের সরলতার প্রতিচ্ছবিতে এই শুদ্ধতা-পবিত্রতা ন্যায়-ধর্মপ্রাণতা একাকার হয়ে তা ঐতিহ্যবাদী পরম্পরাকে কেবল ত্বরান্বিত করবে না বরং কিশলয় মন অটল আদর্শবোধে সম্পদতুল্য মহীরূহে পরিণত হবে। সেখানে ছোটদের মহাভারতের চরম প্রাপ্তি পরম সার্থকতা। মনগঙ্গার অবগাহনে হৃদয়েশ্বরীর পরম পরিতৃপ্তি। ঐতিহ্যবাহী পরম্পরার সাপেক্ষে মহাভারতে শিশুসাহিত্যরূপে রুচি ও সজ্জায় প্রয়াসগত দিগন্তবিস্তারের রূপান্তর বাস্তবিক অভিনব।

**সহায়ক গ্রন্থ :**

১. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ – ছোটদের ব্যাসদেব রচিত মহাভারত, শিশুসাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, অক্টোবর, ১৯৬৩।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ – কাশীদাসী মহাভারত (১ ও ২ খণ্ড), সাহিত্যসংসদ, কলকাতা, চতুর্থমুদ্রণ, নভেম্বর, ২০১৪।

৩. ভট্টাচার্য্য, শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ : মহাভারতম্ (১-৪৩ খণ্ড) বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ।

৪. রায়চৌধুরী, শ্রী উপেন্দ্রকিশোর – ছেলেদের মহাভারত, কলিকাতা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৯৯৫।

৫. সরকার, যোগীন্দ্রনাথ – ছোটদের মহাভারত, সিটি বুক্ সোসাইটি, কলিকাতা, বিংশ সংস্করণ, ১৩৫২।

# অভিনব ভাবনায় "আজকের দ্রৌপদী"

রচনা রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আমডাঙা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়

**সারসংক্ষেপ :**
বর্তমান বাংলা কথাসাহিত্যের একজন শক্তিশালী লেখক হরিশংকর জলদাস। অবহেলিত, অপাংক্তেয় ব্রাত্যজনের কথাকার হরিশংকর। সচেতনভাবে তার প্রতিটি কাহিনীতে সমাজ বিশেষত নিম্নবর্গীয় জীবনচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারত লেখকের অন্যতম প্রিয় বিষয়। মহাভারতের প্রেক্ষাপটে তিনি রচনা করেছেন একাধিক উপন্যাস ও ছোটগল্প। সেখানেও কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছে বঞ্চিত নিম্নবর্গের মানুষ। প্রান্তবাসী একলব্যকে নিয়ে হরিশংকর জলদাস রচনা করেছেন এপিকধর্মী উপন্যাস 'একলব্য'। 'সেই আমি নই আমি' উপন্যাসে শকুনি চরিত্রকে অন্য আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করেছেন। 'মৎস্যগন্ধা' উপন্যাসে কৈবর্ত কন্যা কালী ওরফে ব্যাসদেব মাতা সত্যবতীকে নিয়ে রচিত হয়েছে ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। মহাভারতের কাহিনিকে নতুনভাবে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে লেখক আর্য সংস্কৃতি উত্থানের পাশাপাশি অনার্য চরিত্রের গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমান আলোচ্য গল্পটি সংগৃহীত হয়েছে হরিশংকর জলদাস রচিত 'চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত' (২০১৬) নামক গল্প সংকলন থেকে যেখানে মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনাবলীর আধারে রচিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের নয়টি গল্প। এর মধ্যে প্রথম গল্প 'আজকের দ্রৌপদী'। মহাভারতের মহানায়িকা দ্রৌপদীর জীবনাকাঙ্ক্ষা আর একালের বাঙালি বধূর জীবনাকাঙ্ক্ষা একই কাহিনিতে সমান্তরালভাবে প্রকাশ করে কথাকার বাঙালি মানসে মহাভারতের গভীর প্রভাব অনুসন্ধান করেছেন।

**সূচক শব্দ :** দ্রৌপদী, কর্ণ, হৃদয়াকাঙ্ক্ষা, গোপন অনুরাগ

**মূল আলোচনা :**
মহাকবি ব্যাসদেব ছিলেন মানব জীবনের যথার্থ রূপকার। মহাভারতের সুবিশাল প্রেক্ষাপটে মানব চরিত্র ও মানব মনস্তত্ত্ব প্রকাশে তার মত দক্ষ শিল্পী ভারতীয় সাহিত্যের অনন্য সম্পদ। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরনো এক মহাকাব্যে যে কাহিনি মহাকবি সৃষ্টি করেছিলেন, তার পরতে পরতে লুকিয়ে আছে নতুন

সৃষ্টির বীজ। কবি অনেক স্থানে নীরব থেকে শুধু কতগুলি ঘটনার সম্ভাবনাকে উস্কে দিয়েছেন মাত্র, অথচ মহাকাব্যে তার কোন বিস্তার বা প্রসার নেই। একালের সাহিত্যিকদের চিন্তা-চেতনায় তাই-ই নতুন রূপ পেয়ে নতুন নতুন কাহিনিতে পরিবেশিত হয়েছে। বিখ্যাত দার্শনিক জ্যাক দেরিদার তার "অফ গ্রামাটোলজি" গ্রন্থে বিনির্মাণের যে তত্ত্বকথা বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছিলেন তার মূল বক্তব্য ছিল এক পাঠকৃতি থেকে সৃষ্টি হতে পারে অনন্ত পাঠকৃতির সম্ভাবনা। এক সৃষ্টি বয়ে আনে অন্য সৃষ্টির দ্যোতনা। অর্থাৎ কোন সাহিত্য জন্ম দিতে পারে একাধিক নতুন ভাবনা সমৃদ্ধ সাহিত্য। লেখক এক অর্গল খুলে দিলে, পাঠক সেখান থেকে পেতে পারেন একাধিক অর্গলের চাবি। তাই কোন সাহিত্যই কোন বিশেষ কালের নিজস্ব সম্পদ হতে পারে না; তা যুগে যুগে, কালে কালে সাহিত্যিকদের নতুন চিন্তার আলোকে যুগোপযোগী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম। বাংলা সাহিত্য এই নির্মাণ-পুনর্নির্মাণের বিন্যাসে নানা মাত্রায়, নানা স্বাদে, নানা অভিনবত্বে পূর্ণ। কবি সাহিত্যিকেরা বারংবার ঐতিহ্য, ইতিহাস ও পুরাণের পুনর্নির্মাণে বাংলা সাহিত্যে অতীতকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে রেখেছেন।

মহাভারত ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্য। এর মধ্যে এমন অনেক কাহিনির সন্নিবেশ আছে, যেখানে মহাকবি আভাসে- ইঙ্গিতে কতগুলি রেখা অঙ্কন করে তার কলম স্তব্ধ করে দিয়েছেন। পরবর্তীকালের লেখকের স্পর্শে তা থেকেই রচিত হয়েছে কালজয়ী সৃষ্টি সম্ভার। এমনই এক চর্চিত ও আলোচিত কাহিনি দ্রৌপদী ও কর্ণের গভীর গোপন অনুরাগের সম্পর্ক। ব্যাসদেব রচিত মহাভারতে তাদের সম্পর্কের কোনো উল্লেখ নেই। বরং একে অপরের প্রতি যে বৈরীভাব পোষণ করতেন তার পরিচয় রয়েছে। দ্রৌপদী যেমন কর্ণকে সূতপুত্র হিসেবে অপমান করেছিলেন, ঠিক তেমনি কুরুরাজসভায় বস্ত্রহরণের সময় কর্ণ  অকথ্য ভাষায় দ্রৌপদীকে অপমান করেছিলেন।  কিন্তু পরবর্তী বিভিন্ন ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় মহাভারতের অনুবাদের সময় দ্রৌপদী ও কর্ণের পারস্পরিক অনুরাগের পরিচয় রয়েছে। বাঙালি কবি কাশীরাম দাস রচিত মহাভারতের ভাবানুবাদেও রয়েছে এই প্রসঙ্গের অভাস — সন্দীপন মুনির আশ্রমে একটি গাছে অকালে আম দেখে দ্রৌপদী আনন্দিত হয়ে অর্জুনকে অনুরোধ করেন আম পেড়ে দিতে। স্ত্রীর অনুরোধে অর্জুন আম পেড়ে দ্রৌপদীর হাতে দেন। এ ঘটনায় কৃষ্ণ অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জানান সন্দীপন মুনি সারাদিন তপস্যা করার পর এই একটি মাত্র ফল ভক্ষণ করেন। অলৌকিক ভাবে প্রতিদিন সকালে গাছে একটি করে আম ধরে আর সন্ধ্যাকালে মুনি তপস্যা শেষে পরম আনন্দে আম ভক্ষণ করেন। আর আজ যখন মুনি

এসে দেখবেন গাছে আম নেই, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন। এবং যে তার আম পেড়ে নিয়েছে তাকে তিনি নিশ্চিত অভিসম্পাত করবেন। এ ঘটনায় পঞ্চপান্ডব সহ দ্রৌপদী অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। অবশেষে কৃষ্ণ প্রতিকারের পথ বলে দেন। কৃষ্ণ জানান এই ফল পুনরায় বৃক্ষে স্থাপন করা সম্ভব —

*"দ্রুপদনন্দিনী আর তোমা পঞ্চ জনে।*
*কোন্ কথা অনুক্ষণ জাগে কার মনে।।*
*সবার মনের কথা কও মোর আগে।*
*কপট ত্যাজিয়া কহ তবে আম্র লাগে।।"* [১]

কথা মতো সকল ভাই একে একে তাদের অন্তরের কথা প্রকাশ করতে থাকে আর আম একটু একটু করে ঊর্ধ্বে অগ্রসর হতে থাকে। সবশেষে দ্রৌপদীর পালা। দ্রৌপদী নিজের মনের কথা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু হঠাৎই আম উর্দ্ধগতির পরিবর্তে মাটিতে পড়ে যায়। সকলেই বিস্মিত হয়। কৃষ্ণ জানান দ্রৌপদী তার মনের সত্য কথা গোপন করেছ। তাই আমের এই পরিণতি। অবশেষে সকলের মঙ্গল কামনায় দ্রৌপদী নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করে —

*"যজ্ঞকালে কর্ণবীর আসিল যখন।*
*তারে দেখি মনে মনে চিন্তিনু তখন।।*
*এই জন হৈত যদি কুন্তীর নন্দন।*
*ইহার সহিত পতি হৈত ছয় জন।।"* [২]

দ্রৌপদীর এই কথা ব্যক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আম পুনরায় বৃক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

পরবর্তীকালে আধুনিক কবি সাহিত্যিকদের কলমেও প্রকাশ পেয়েছে দ্রৌপদী-কর্ণের প্রচ্ছন্ন ভালোবাসার ছবি। মনে পড়বে বুদ্ধদেব বসু রচিত 'প্রথম পার্থ' বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'নন্দনকাননে দ্রৌপদী' কাব্যনাটকের কথা। তবে আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু কাব্য বা কাব্যনাট্য নিয়ে নয়, পক্ষান্তরে এমন একখানি ছোটগল্প নিয়ে যার অভিনব উপস্থাপন ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য পাঠককে বিস্মিত করে। হরিশংকর জলদাস রচিত 'আজকের দ্রৌপদী' নামাঙ্কিত গল্পে গল্পকার পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে অভিনব কৌশলে ও ভাবনায় চিত্রিত করেছেন দ্রৌপদীর প্রণয় কথা। হৃদয়াবেগে একালের নারী আর প্রাচীন মহাকাব্যের নায়িকা কিভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে লেখক অভিনব শিল্প রীতিতে তা পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যে হরিশংকর জলদাস একজন ব্যতিক্রমী ঘরানার শিল্পী। ১৯৫৩ সালে মতান্তরে ১৯৫৫ সালে চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গার এক জেলে পরিবারে তার জন্ম। জীবনের উত্থান-পতনকে তিনি নিবিড় ভাবে অনুভব করেছিলেন। সেই উপলব্ধির ফলশ্রুতি তার প্রথম উপন্যাস 'জলপুত্র'। এরপর লিখে গেছেন একের পর এক জনপ্রিয় উপন্যাস । তার সৃষ্টির ভান্ডারে রয়েছে জলপুত্র (২০০৮), কসবি (২০১১), দহনকাল (২০১০), মৎস্যগন্ধা (২০২০), সুখলতার ঘর নেই (২০১৯), প্রস্থানের আগে (২০১৯), রঙ্গশালা (২০১৭), ইরাবতী (২০১৭), অর্ক (২০১৭),সেই আমি নই আমি (২০১৬), কোনো এক চন্দ্রাবতী (২০১৫), এখন তুমি কেমন আছ (২০১৫), প্রতিদ্বন্দ্বী (২০১৪), হরকিশোরবাবু (২০১৪,), আমি মৃণালিনী নই (২০১৪), হৃদয়নদী (২০১৩), মোহনা (২০১৩), রামগোলাম (২০১২) মহীথর প্রভৃতি (তথ্যসূত্র উইকিপিডিয়া) । তার প্রতিটি রচনা অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। সমাজের অন্ত্যজ ও তথাকথিত নিম্নবর্গীয় মানুষগুলি তাঁর উপন্যাসে নতুনভাবে পাঠকের সামনে উঠে এসেছে। পাঠককে নতুন ভাবনায় ভাবিত করা সাহিত্যের অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য। সেই কাজটি লেখক করে চলেছেন অবিরত। বাংলাদেশের বহু সম্মানীয় পুরস্কারে সম্মানিত করে পাঠকও বরণ করে নিয়েছেন এই কথাসাহিত্যিককে।

গল্পটির ঘটনা অতি সাধারন ও যৎসামান্য। পারিবারিক প্রেক্ষাপটে গল্পের মূল বক্তব্য একটি নারীর হৃদয় আকাঙ্ক্ষা। ছোট ছোট বাক্যবন্ধে লেখক কাহিনি বিস্তারের পাশাপাশি মানব মনের বহু গ্রন্থিক জটিল মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রতুল সেন এবং চন্দ্র বিকাশ ধর এই দুই পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গল্পের ঘটনা। একসময় দুই পরিবারের মধ্যে প্রবল সখ্যতা থাকলেও ছেলের বিবাহের সূত্রধরে দীর্ঘ বছরের সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। লেখক অসাধারণ শব্দকুশলতায় তাদের পূর্বেকার পারিবারিক হৃদ্যতার পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন। তাদের বর্তমান ও পূর্বেকার অবস্থা প্রকাশ করেছেন লেখক এইভাবে —

> *“সেনবাড়ি আর ধরবাড়ি। মাঝখানে পাঁচিল, মাথা সমান। বাড়ি দুটোর মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল, আগে। ভালো রান্না হলে এবাড়ির তরকারি ওবাড়িতে যেত, শীতে ওবাড়ির পিঠে এবাড়িতে আসত, আগে। এখন আসে না। আগে সেনবাড়ির ছেলেপুলেরা ধরবাড়ির উঠানে খেলতে যেত, এখন যায় না। ধরবাড়ির ছোটরা সেনবাড়িতে খেলতে খেলতে খাটে ঘুমিয়ে পড়ত, সেনগিন্নি কোলে করে ঘুমন্ত বাচ্চাকে*

*ধরবাড়িতে পৌঁছে দিতেন, এখন দেন না। দুই বাড়ির মাঝখানে এখন কনক্রিটের দেয়াল।”*[৩]

ধর বাড়ির ছেলে প্রভাস আর সেনবাড়ির ছেলে কল্যাণ। প্রভাস কল্যাণের সমবয়সী। একজন বর্তমানে নামকরা প্রাইভেট ফার্মে উচ্চ বেতনের চাকুরীজীবী। অন্যজন সরকারি কলেজের বাংলার অধ্যাপক। রূপে-গুণে দুজনেই প্রায় সমান। পারিবারিক গভীর সখ্যতা থাকলেও তাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের পরিবর্তে শত্রুতা ছিল বেশি — প্রভাসের প্রতি কল্যাণের মনে ছিল 'চাপা ক্রোধ'। স্কুল জীবনে সে ক্রোধের প্রকাশ প্রায়শই ধরা পড়েছে কখনো শ্রেণিকক্ষে, কখনোবা খেলার মাঠে। ধর বাড়ি ও সেন বাড়ির বিবাদের সূত্রপাত এই দুই ছেলের বিবাহকে কেন্দ্র করে। সৌম্য আচরণের প্রভাসের সঙ্গে ‘সুন্দর মনের অধিকারী’ অহনার বিবাহের স্থির হয়। কিন্তু হঠাৎ গোলমাল বাধে সেনবাবুর আশ্চর্য কথাবার্তায়। কন্যার পিতার কাছে হঠাৎই তিনি ধরবাবুর হয়ে কন্যাপণ হিসেবে বরপক্ষ থেকে ৭০ ইঞ্চি টিভির দাবি করে বসেন। ধনবান জীবন চৌধুরীর পক্ষে একমাত্র কন্যার বিবাহে তা দেওয়া অসাধ্য ছিল না বটে, কিন্তু লোভী পরিবারে মেয়ের বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি হন জীবন চৌধুরী। ফলে প্রভাস ও অহনার সম্ভাব্য বিবাহ ভেঙে যায়। এরপরই ঘটে আশ্চর্য ঘটনা। এর তিন মাস পরে সেনবাবু তার পুত্র কল্যাণের স্ত্রী হিসেবে পুত্রবধূ করে নিয়ে আসেন অপরূপা, রূপবতী, মিষ্টভাষী আহনাকে। ফলে সহজেই বোঝা যায় নিজের পুত্রবধূ হিসেবে অহনাকে নির্বাচন করে আনার জন্যই সেনবাবু ধরবাবুর সঙ্গে এমন অদ্ভুত চালাকি করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই দুই পরিবারে আর সুসম্পর্ক বজায় থাকে নি —

*“দুই বাড়ির সীমানায় দেওয়াল উঠল। মুখ দেখাদেখি বন্ধ হল। পাড়ার মানুষের মুখে মুখে এই ঘটনা কিসসার রূপ নিল।”*[৪]

পাঠক গল্পে এখনো কোনো নতুনত্ব আবিষ্কার করতে পারেননি। বাঙালি পরিবারে এইরকম বেইমানি নতুন নয়, সাহিত্যেও নয়। পাঠকের মনে পড়বে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "না" ছোটগল্পটির কথা। এ গল্পটির মূল আকর্ষণ লুকিয়ে রয়েছে পরবর্তী অংশ থেকে। অহনার সেন পরিবারে সুখের সংসার। স্বামী কল্যাণ 'তাকে আদরে সোহাগে ভরিয়ে রেখেছে'। শ্বশুর-শাশুড়ির কাছেও অহনার আদর পুত্রবধূ সুলভ নয়, কন্যা সুলভ। এ সংসারে অহনার কারো প্রতি কোন অভিযোগ বা অনুযোগ নেই — কিন্তু 'তারপরও অহনার ভেতরটা কেন জানি জ্বলে, এক অজানা বেদনা তাকে কুরে

কুরে খায়।' বোঝা যায় লেখক ইঙ্গিত করেছেন মানব-মনের বহুগ্রন্থিক জটিল হৃদয় আকাঙ্ক্ষার প্রতি।

সমগ্র গল্পটি লেখক ছোট ছোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রথম দুই অধ্যায় ভূমিকা স্বরূপ দুই পরিবারের পারিবারিক অবস্থান চিহ্নিত করেছেন লেখক। এরপর তৃতীয় অধ্যায়ে সমান্তরাল প্রসঙ্গ রূপে মহাভারতের দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভার বর্ণনার পাশপাশি দ্রৌপদীর কর্ণকে প্রত্যাখ্যান ও তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে এবং পরবর্তীতে মাতা কুন্তীর নির্দেশমতো পঞ্চপান্ডবকে পতি হিসেবে গ্রহণ করার বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। মহাভারতের কাহিনিতে লেখকের কল্পনাপ্রসূত কোন ঘটনার উল্লেখ নেই। তিনি কেবল নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে মহাভারতের অনুসরণ করে দ্রৌপদীর বিবাহ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। কিন্তু একালের সেনবাবু আর ধরবাবুর পারিবারিক গল্প শোনাতে লেখক যখন দ্রৌপদীর বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তখন বোঝা যায় লেখক কোনো অভিনব বিষয়ের সন্ধান দিতে তৎপর। দ্রৌপদীর বিবাহ প্রসঙ্গে লেখক কল্পনার আশ্রয় না নিলেও দ্রৌপদীর মনোবিশ্লেষণে লেখক একালের নারীর মনের আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মূল মহাভারতে দেখা যায় সুতপুত্র হবার অপরাধে কর্ণকে দ্রৌপদী স্বেচ্ছায় পতি হিসেবে নির্বাচন করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে কর্ণের প্রতি তার হৃদয় দৌর্বল্য মহাভারতের কোথাও প্রশ্রয় পায় নি। কিন্তু একালের লেখকের কলমে কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করার অপরাধে বিবেক দংশনে জর্জরিত হতে দেখা যায় দ্রৌপদীকে। হীন জাতীয় কর্ণের জন্য দ্রৌপদীর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে পান্ডবদের বিশেষত অর্জুনের অন্যতম প্রধান প্রতিস্পর্ধী কর্ণের বীরত্বের পরিচয়ে দ্রৌপদী মুগ্ধ হয়ে যান —' কর্ণ কথা শুনে দ্রৌপদীর উল্লাস বোধহয়'। আশ্চর্য মানুষের মনের গতিপ্রকৃতি। মানুষ হয়তো নিজেও তার মনের নাগাল পায় না সব সময়। দ্রৌপদীও পায় না। পঞ্চস্বামীর পাশাপাশি তাই ষষ্ঠের প্রতি তার আকর্ষণ অনুভূত হয়। লেখকের ভাষায় —

> *"হীনজাতের দোহাই দিয়ে কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল সে। আর কী আশ্চর্য! সেই হীনজাতের কর্ণের জন্য হৃদয়ে এত তোলপাড় হচ্ছে আজ! আহা, কর্ণকেও যদি স্বামী হিসেবে পাওয়া যেত। ... ... ... পাঁচজনের জায়গায় না হয় ছয়জন হতো। যদি কর্ণকে হৃদয়ের কাছে পাওয়া যেত, পরম তৃপ্তি পাওয়া যেত। এরকম ভাবনা দ্রৌপদীর ভেতরটাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, আনমনা করে তোলে*

*তাকে। পঞ্চস্বামীর সামনে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে হয়। নিজেকে সংযত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যায় দ্রৌপদী। কিন্তু অবুঝ মন, বিবেকের কথা শোনে না। স্বামীদের সঙ্গে, পুত্রদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে থাকে দ্রৌপদী।"* [৫]

পরবর্তী চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক পুনরায় মনোনিবেশ করেছেন অহনার হৃদয় যন্ত্রণা প্রকাশে। সুখে সংসার করলেও এক ধরনের বিপর্যস্ততায় অহনা অস্থির হতে থাকে-' রক্তক্ষরণ হতে থাকে অহনার মস্তিষ্কে, হৃদয়ে।' অনেকটা দ্রৌপদীর মতই। দ্রৌপদীর প্রথম পাণি প্রার্থী ছিল কর্ণ। দ্রৌপদী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অহনারও প্রথম পুরুষ ছিল প্রভাস, যে পুরুষ প্রথম তার হাত স্পর্শ করেছিল। পিতার আজ্ঞায় অহনা প্রভাসকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। দ্রৌপদী পরবর্তীতে রাজরানী বা পঞ্চস্বামী প্রিয়া হলেও কর্ণের প্রতি সে যে অন্যায় করেছিল তাতে বারংবার সে আত্মগ্লানি অনুভব করেছে। অহনার হৃদয়েও হয়তো জ্বলে উঠেছিল প্রভাসকে বিয়ে না করার যন্ত্রণার দাহ। পঞ্চম অধ্যায়ে খুব সংক্ষেপে মহাভারতের প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন লেখক। এখানে লেখক মহাভারতের সুপরিচিত কাহিনিকে কিছুটা পরিবর্তন করেছেন। মহাভারতের পাঠক মাত্রই জানেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-জয়ের পর, দীর্ঘ ছত্রিশ বছর হস্তিনাপুরে রাজত্ব করে পৌত্র পরীক্ষিতের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে যুধিষ্ঠির তার চার ভ্রাতা ও পত্নী দ্রৌপদীকে নিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে পথশ্রম সহ্য করতে না পেরে সর্বাগ্রে পতন হয় পান্ডব ঘরনী দ্রৌপদীর। মধ্যম ভ্রাতা ভীম জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের কাছে দ্রৌপদীর পতনের কারণ জানতে চাইলে নির্বিকারভাবে যুধিষ্ঠির জানিয়েছিলেন পঞ্চস্বামীর মধ্যে অর্জুনকে সর্বাধিক ভালোবাসার অপরাধে দ্রৌপদীর পতন। লেখক হরিশংকর যুধিষ্ঠিরের এই সুপরিচিত বক্তব্যকে একটু অন্য ভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'তাছাড়া' শব্দ সংযোজন করে কর্ণের প্রতি দ্রৌপদীর দুর্বলতার উল্লেখ করেছেন তিনি—

"যুধিষ্ঠির বলে, অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পক্ষপাতিত্ব ছিল।
তাছাড়া.....।
তাছাড়া কী দাদা?' ভীম আবার জিজ্ঞেস করে।
কর্ণের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা পোষণ করত দ্রৌপদী, মনে মনে। এটা অপরাধ। এই অপরাধেও দ্রৌপদীর অকালে মৃত্যু হল। ধীরস্থির কণ্ঠে বলে গেল যুধিষ্ঠির।
ভীম স্তম্ভিত।" [৬]

বোঝা যায় গল্পকার এই অভিনব সংযোজনে দ্রৌপদীর হৃদয় আকাঙ্ক্ষাকে সমগ্র পাঠকসমাজে তার স্বামীর মুখ দিয়ে ব্যক্ত করলেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মুখনিঃসৃত এই বক্তব্যে পরিস্ফুট হয় দ্রৌপদীর অর্জুনের পাশাপাশি কর্ণকে ভালোবাসার মান্যতা।

ষষ্ঠ তথা শেষ অনুচ্ছেদ এ গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ছোটগল্পের একমুখীনাতায় এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে লেখক বক্তব্য পরিবেশনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অহনা- কল্যাণের দাম্পত্য জীবনে এই অংশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি গল্পের নামকরণেও। দেখা যায় আসন্নপ্রসবা অহনা হসপিটালে ভর্তি। তার অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। এমতাবস্থায় মৃত্যুকে শিয়রে রেখে শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে অহনা তার শেষ ইচ্ছা ব্যক্ত করে প্রিয়তম স্বামীর কাছে —

"আমি মরার আগে প্রভাসকে এক নজর দেখতে চাই।" [৭]

কাহিনি সমাপ্ত হয়। ছোট গল্পের 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ'র দ্যোতনা ছড়িয়ে পড়ে পাঠক হৃদয়ে। হয়তো কল্যাণের মতই পাঠক কিছুটা বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যায় অহনার শেষ ইচ্ছা প্রকাশে। দ্রৌপদী তার হৃদয় আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে পারেনি। কর্ণের প্রতি তার হৃদয় উদ্বেলতার সাক্ষী ছিল না কেউ। কিন্তু এ যুগের নারী তার হৃদয় বাসনা প্রকাশে কুণ্ঠিত হলেও লজ্জিত হয়নি। তাই মৃত্যুর পূর্বে একবারের জন্য হলেও অহনা প্রভাসকে দেখে যেতে চেয়েছে। স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তিতে দ্রৌপদী আর অহনা সমপংক্তিতে অবস্থান করলেও এই যুগের নারী হিসেবে অহনা অনেক বেশী আধুনিক। তাই লেখক অহনাকে দ্রৌপদীর সঙ্গে তুলনা করেও অহনাকে দ্রৌপদী থেকে আলাদা করে দেন নামকরণে 'আজকের' শব্দটি যুক্ত করে। একটি সাধারণ ঘটনাকে কেবলমাত্র নামকরণের গভীর ব্যঞ্জনায় এবং মহাভারতের প্রসঙ্গের তুল্যমূল্যে বিচার করে লেখক যে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা এককথায় অনবদ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রভাস ও কল্যাণের রূপ গুনের তুলনা করে তাদের পারস্পরিক শত্রুতার আভাস দিয়েছিলেন। এই তুলনায় পাঠকের মনে পড়বে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণ ও অর্জুনের প্রসঙ্গ। দ্রৌপদীর বঞ্চনা, লাঞ্ছনা বা অপমান নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বহু আলোচনা-সমালোচনা হলেও তার হৃদয় আকাঙ্ক্ষার এই আবৃত দিকটিকে নতুনভাবে অনাবৃত করেন নি কেউ। হরিশংকর জলদাস দ্রৌপদীর সঙ্গে একালের নারীর তুলনা করে যে অভিনবত্বের স্বাদ পাঠককে দিলেন, তাতে বাঙালি পাঠক তার কাছে আরো নতুন নতুন অভিনব সাহিত্য ভাবনার প্রত্যাশী।

**আকরগ্রন্থ :**

হরিশংকর জলদাস, 'চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত', ফেব্রুয়ারী, ২০১৬, অবসর, ঢাকা - ১১০০

**সহায়ক :**

১. তপোধীর ভট্টাচার্য, প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব, সেপ্টেম্বর, ২০১৬, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩

২. রাজশেখ বসু, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত, এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লি:, চতুর্দশ মুদ্রণ, ১৪২০

৩. https://roar.media/bangla/main/biography/harishankar-jaladas

৪. https://bn.wikipedia.org/wiki/হরিশংকর_জলদাস

**তথ্যসূত্র :**

১. কাশীরাম দাস, কবি ঁনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সংশোধিত, মহাভারত (প্রথম খণ্ড), বসুমতি সাহিত্য মন্দির (বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড), ৩৩তম সংস্করণ, ১৩৯৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৫২৪

২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৫২৪

৩. হরিশংকর জলদাস, 'চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত', ফেব্রুয়ারী, ২০১৬, অবসর, ঢাকা - ১১০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৩

৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৮

৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২০

৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২২

৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২২

# আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় 'শ্রুতি' কবিতার অভিনবত্ব

শিউলি বসাক
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

**সারসংক্ষেপ :**
যুগে যুগে সংগঠিত বিভিন্ন আন্দোলনে বারবার আন্দোলিত হয় সমাজ; আর সমাজের দর্পণে অর্থাৎ সাহিত্যে তা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এই আন্দোলন যখন হয় সাহিত্যেই, তখনই সাহিত্যধারায় আসে এক-একটি বাঁকবদল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি পাকাপোক্ত ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠার পরে, বড়সড় বাঁকবদলটি হয়েছিল বিশ শতকের ত্রিশের দশকে কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির তরুণ লেখকদের হাত ধরে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠিত অসংখ্য সাহিত্য-আন্দোলনের ঢেউ মতবাদরূপে এইসময়ে এদেশে পৌঁছে বাংলা সাহিত্যকে নব নব রূপ দিয়েছে। এরপর পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর-আশির দশকে বাংলা সাহিত্য-জগতে এমন কিছু যৌথ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, যেগুলি কোনো বিদেশি সাহিত্য-আন্দোলনসঞ্জাত নয়, এদেশের সাহিত্য-ভূমিতেই যাদের উৎপত্তি। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ছোটোগল্পের যে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তার মূলে ছিল বিমল করের 'ছোটগল্প-নূতনরীতি' গল্প-আন্দোলন। এরপর একের পর এক হাংরি আন্দোলন, নিমসাহিত্য আন্দোলন, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, শ্রুতি আন্দোলন, ধ্বংসকালীন আন্দোলন, নতুননিয়ম আন্দোলন, ছাঁচ-ভেঙে-ফেল আন্দোলন, চাকরসাহিত্যবিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি আন্দোলনগুলি ষাট-সত্তর-আশির দশকে বাংলা সাহিত্য-জগতে এক একটি তরঙ্গ তুলেছিল। বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সচেতনভাবে ঘোষিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই আন্দোলনগুলির প্রতিক্রিয়ায় প্রত্যাখ্যানও প্রবল হয়ে উঠেছিল সেই সময়ে। মূলধারার সাহিত্য পাঠককে যে স্থিতাবস্থার মধ্যে আটকে রাখে, এই সাহিত্য সেই স্থিতাবস্থাকেই ভাঙতে চেয়েছিল নানাভাবে। শ্রুতি কবিতা-আন্দোলন এই স্থিতাবস্থাকে ভেঙে আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় যেসব অভিনবত্ব নিয়ে এসেছিল, তা আলোচনা করাই এই নিবন্ধের অন্বিষ্ট।

**মূল আলোচনা**

ষাট-সত্তর দশকের বাংলা কবিতা-আন্দোলনগুলির কথা বলতে গেলে, হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যে নামটি সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়, তা শ্রুতি আন্দোলন। হাংরি কবিরা

কবিতার বিষয় বা ভাষারীতি নিয়ে যতটা আন্দোলিত হয়েছেন, আঙ্গিকের ক্ষেত্রে ততটা নন। শ্রুতি কবিরাই প্রথম আঙ্গিক নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন, কবিতার চিরাচরিত আঙ্গিকের থেকে অনেকটা সরে গেলেন। কারণ তাঁরা মনে করতেন, "আঙ্গিক এবং উপলব্ধির অদ্বৈত-সিদ্ধিই সার্থক কবিতার সৃষ্টি করে।"[১] প্রসঙ্গত দেবেশ রায়ের একটি বক্তব্য এখানে উল্লেখ্য, "ফর্মই কবিতার একমাত্র অবলম্বন। ফর্মের বাইরে কবিতার কিছু নেই। ... কবিতায় এই আকার বা ফর্মের কল্পনা, ধারণা ও প্রয়োগ থেকেই প্রধানত ও প্রথমত কবিরা পূর্বতনদের থেকে স্বতন্ত্র হতে চান। তারপর বিষয়, অলঙ্কার, বক্তব্য – এই সব খুচরো কথা আসে।"[২]

শ্রুতি-আন্দোলনের মুখপত্ররূপ পত্রিকা 'শ্রুতি'র প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে। তবে এমন ধারণার কোনো কারণ নেই যে, ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাস থেকেই শ্রুতি-আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনের সূত্রপাত আসলে আরও কয়েক বছর আগে। ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে রমানাথ রায়ের সম্পাদনায় 'এই দশক' নামে একটি বুলেটিন প্রকাশিত হয়েছিল। এই বুলেটিনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তরুণ কবি ও গল্পকারদের একটি দল। সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ছাপা হতো এই বুলেটিনে। ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত মোট নয়টি সংখ্যা প্রকাশ পায়।[৩] এরপর এই বুলেটিনের সঙ্গে যুক্ত কবি ও গল্পকাররা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যান। এই কবিরা ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে 'শ্রুতি' নামে একটি কবিতা-পত্রিকা প্রকাশ করে শ্রুতি আন্দোলন শুরু করেন। অন্যদিকে 'এই দশক' বুলেটিনের সঙ্গে যুক্ত গল্পকাররা ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে 'এই দশক' পত্রিকা প্রকাশ করে শাস্ত্রবিরোধী গল্প-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। ১৯৬৫ এপ্রিল থেকে ১৯৭১ আগস্ট পর্যন্ত 'শ্রুতি' পত্রিকার মোট চোদ্দটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। 'শ্রুতি' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পুষ্কর দাশগুপ্ত, মৃণাল বসুচৌধুরী, অনন্ত দাশ, পরেশ মন্ডল এবং সজল বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে শ্রুতির প্রথম চারটি সংখ্যার পরে অনন্ত দাশের আর কোনো লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। তাই পুষ্কর দাশগুপ্ত, মৃণাল বসুচৌধুরী, পরেশ মণ্ডল এবং সজল বন্দ্যোপাধ্যায় – এই চার জন কবিকেই শ্রুতি আন্দোলনের প্রধান কবি হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। এছাড়াও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন – সুকুমার ঘোষ, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, তপনলাল ধর, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রত্নেশ্বর হাজরা, কালীকৃষ্ণ গুহ, মদনমোহন বিশ্বাস, কালিপদ কোঙার, অভি সেনগুপ্ত, প্রলয় শূর, অশোক চট্টোপাধ্যায়, রথীন ভৌমিক, অতীন্দ্রিয় পাঠক প্রমুখ।

বিষয়গত দিক থেকে শ্রুতি কবিতার অভিমুখ ছিল অন্তর্মুখী। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পুষ্কর দাশগুপ্ত 'কবিতা সম্পর্কে' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছিলেন, "জৈব আর্তনাদ কিংবা সমাজ-চিন্তার স্থান যেখানেই হোক কবিতায় নয়।"[৪] বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে, এটি বলা হয়েছিল সমকালীন হাংরি কবিতার দিকে ইঙ্গিত করে। শ্রুতি কবিদের মতে কবিতায় কোনো তথাকথিত বক্তব্য থাকে না; থাকে কবির বিচিত্র অনুভব সমন্বিত স্বপ্নময় আত্মিক আবহের প্রকাশ। এই একই কথা তাঁরা 'শ্রুতি' পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় বারবার করে বলে গিয়েছেন। পঞ্চম সংখ্যাতে পত্রিকার শেষে 'শ্রুতি সম্পর্কে'[৫] শিরোনামে বলা হয়েছিল যে, কোনরকম ব্যাখ্যা, বিধান বা তত্ত্ব-প্রচারের দায়িত্ব কবিতার নেই; চিৎকার বা বিবৃতি কবিতা নয়; রাজনীতি-প্ররোচিত সামাজিকতা বা ক্ষুৎকাতর যৌনকাতর জৈব মত্ততার স্থান কবিতায় নেই; ব্যক্তির কল্পনাময় আন্তরিক অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির প্রকাশে ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল রচনাই কবিতা, তাই কবিতা হবে ব্যক্তিগত – মগ্ন এবং একান্তই অন্তর্মুখী; কবিতায় কোন একমুখী বক্তব্য বা একটিমাত্র বিষয় থাকে না, থাকে বহু অনুভবের মিলনে জটিল উপলব্ধির আবহ। পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে – প্রাচীন কাল থেকে নীতিপ্রচার, ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা, ইতিহাস-বর্ণনা, সমাজবিধান সম্পর্কিত চিন্তা প্রভৃতি যে সব প্রতারণার ভার কবিতাকে প্রায়শই বহন করতে হয়েছে কবিতা আজ তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।[৬] আবার সপ্তম সংখ্যাতে 'বিষয় ও বিষয়ী' শীর্ষক রচনায় বলা হয়েছিল, "কবিতার সেই বিষয় মুখ্যতই 'আমি'। সে 'আমি' এখানেও আছে, আবার বিচিত্র বিশ্ব-পরিচয়েও আছে।"[৭] এই আত্মিক অভিজ্ঞতাকে, উপলব্ধির গভীরতাকে ভাষায় যথার্থভাবে প্রকাশ করতে না পারার অতৃপ্তি প্রত্যেক শ্রুতি কবির মধ্যেই ছিল। 'শ্রুতি' সপ্তম সংখ্যায় কবি সজল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "ভাষা যে লৌকিক জগতের। অর্থের সীমায় সংকুচিত, আবদ্ধ। তথাকথিত বাস্তবের প্রয়োজনে বহু ব্যবহৃত। আত্মাবিষ্কার করতে করতে যখন সেই অভিজ্ঞতা লিখে রাখতে যাই, মনে হয় ঠিক বলা হল না। যা পবিত্র, আন্তরিক তা আন্তরিকতার আবরণেই নিজেকে ঘিরে রাখে, যা রহস্যময় তাকে রহস্যময়তার মধ্যে দিয়েই ব্যক্ত করতে হয়। আমার মধ্যে আছে অন্তহীন রহস্যের জগত। তাকে প্রকাশ করতে হলে যে তার উপযুক্ত ভাষা আমায় গড়ে নিতে হবে। লৌকিক জগতের ভাষাকে আমি কি করে অলৌকিকের পরিবাহক করে তুলব? লিখি, আবার পাল্টাই। বারবার মনে হয়, না, আমার রহস্য অভিজ্ঞতাকে ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না।"[৮] ভাষাপদ্ধতির জীর্ণতা সম্পর্কে সচেতন এই শ্রুতি কবিরা অনেককিছু "বলতে গিয়ে অথচ কিছুই বলতে না

পেরে”[৯] সপ্তম সংখ্যায় ঘোষণা করলেন, “ভেঙে ফেলতে হবে সমস্ত প্রথার শাসন, ছিন্ন করতে হবে সংস্কারের সমস্ত বন্ধন। শব্দকে ব্যবহৃত বাক্যবন্ধের আবর্জনা থেকে এক এক করে বেছে নিতে হবে। তৈরী করতে হবে ব্যক্তিগত এবং অনন্য, এক প্রচলমুক্ত বাকরীতি।”[১০] পুরনো শব্দকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলেন তাঁরা। শব্দকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়েছেন তাঁরা। চতুর্দশ সংখ্যায় পরেশ মণ্ডল ‘কবিতা সম্পর্কে’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছিলেন, “কবিতা হচ্ছে আত্মগোপনের ইতিহাস। শব্দ তার মাধ্যম। তাই শব্দকে ঘিরে যতো সংগ্রাম। শব্দের সংস্থান বদলে, শব্দকে গুঁড়ো করে, গুঁড়োগুলোকে উল্টেপাল্টে জুড়ে দিই। আবার অপরিচিত শব্দকে পরিচিতির মধ্যে খুঁজতে চাই। পরিচিতকে অচেনা পটভূমিতে।”[১১] তাই তাঁর ‘কবিতা৭৭৭’ কবিতায় চর্যাপদের প্রসঙ্গে আসে ইতালীর অরণ্যের পাখিদের কথা, বেহুলার প্রসঙ্গে আসে রাশিয়ার নদীর কথা, পিকাসোর অগ্নিময় স্কেচের প্রসঙ্গে ‘যামিনী রায়ের হাতি’ বা ‘কান্দিনস্কির বহুবর্ণ বৃত্ত’-এর কথা। পরিচিত প্রসঙ্গ-উপকরণগুলিকে কবি নিয়ে গিয়েছেন অপরিচিত পটভূমিতে। উত্তম দাশ তাঁর ‘হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন’ গ্রন্থে বলেছেন, “একটা মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই পুষ্কর ও পরেশ শ্রুতি আন্দোলনে নেমেছিলেন। সমকালীন বাংলা কবিতার চেহারার সঙ্গে মেলেনা এমন বাক্যবন্ধ ও শব্দসজ্জা, সংক্ষিপ্ত মিতবাক ভাষণ, এক একটি শব্দে তরঙ্গিত অনুভূতি দুজনেরই স্বভাবের সঙ্গে নিবিড়।”[১২] শব্দ নিয়ে যেন রীতিমত খেলেছেন শ্রুতি কবিরা। চতুর্দশ সংকলনের প্রথম কবিতাটি হল পরেশ মণ্ডলের ‘এনাগ্রাম’, এই ‘এনাগ্রাম’ শব্দটির অর্থ হল কোনো শব্দের বর্ণগুলিকে এদিক-ওদিক করে গঠিত নতুন শব্দ। অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ‘সংশ্লেষণ’ কবিতাটিকে বলা যেতে পারে একটি এনাগ্রাম -

গাছে গাছে পাতায় পাতায় মুখে মনে নামে
অহঙ্কারে অপমানে
পাছে গাতায় মুনে মমে অপমাঙ্কারে
একদিন আলাদা আলাদা
চিনে নিতাম[১৩]

‘গাছে’ ও ‘পাতায়’ শব্দদুটিকে ভেঙে, তারপরে একটির ভাঙা টুকরোর সঙ্গে অন্য শব্দের ভাঙা টুকরোটিকে জুড়ে লেখক তৈরি করেছেন ‘পাছে’ ও ‘গাতায়’ শব্দদুটি। আবার ‘মুখে’, ‘মনে’, ‘নামে’ শব্দতিনটিকে ভেঙেচুরে তৈরি করেছেন ‘মুনে’ ও ‘মমে’ শব্দদুটি। ‘অহঙ্কার’ ও ‘অপমান’ শব্দদুটি থেকে তৈরি করেছেন ‘অপমাঙ্কার’ শব্দটি। প্রায়ই তাঁরা

পুরনো শব্দকে ভেঙে তৈরি করেন নতুন শব্দ। যেমন সুকুমার ঘোষ 'আত্মবিলাপ ২' কবিতায় বলছেন, "প্রণয়িণী পিল খায় অনন্তঃসত্ত্বার"[১৪]। আমরা 'অন্তঃসত্ত্বা' শব্দটির সঙ্গে পরিচিত, কিন্তু 'অনন্তঃসত্ত্বা'? দশম সংকলনে প্রকাশিত পুষ্কর দাশগুপ্তের '৩' নং কবিতাটিতে ব্যঞ্জনবর্গের প্রথম বর্ণ গুলি নিয়ে অর্থাৎ ক, চ, ট, ত, প নিয়ে যেন খেলেছেন কবি। '৫' নং কবিতাটিও বর্ণ নিয়ে খেলা, এবং সেই সূত্রে শহুরে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমী, ক্লান্তিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আবার '১' নং কবিতায় চুনীগোস্বামীর প্রসঙ্গে ষড়গোস্বামী-বৃন্দাবন-কৃষ্ণদাসকবিরাজ, সেখান থেকে কবিরাজী স্বর্ণসিঁদুর; আবার দইয়ের প্রসঙ্গে গাঙ্গুরাম, সেখান থেকে রঘুপতিরাঘব রাম; আবার বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা প্রসঙ্গে নবকুমার, সেখান থেকে উত্তমকুমারের কথা এসেছে। শব্দ ধরে ধরে ভাবনার বিস্তার কবিতা জুড়ে বা বলা যেতে পারে শব্দ-সাদৃশ্য নিয়ে খেলা। আবার মৃণাল বসুচৌধুরী 'শব্দ' কবিতায় একই বর্ণ দিয়ে শুরু শব্দগুলি নিয়ে যেন খেলায় মেতেছেন -

ক বললেই কলকাতা কলেজ কল্পনা কোলাহল কোনটাই নয় কল্কে
চুমু নয় চ বললে চাবকানো হতে পারে
ট কি শুধু টরেটক্কা না কি টমেটম[১৫]

(মৃণাল বসুচৌধুরী 'শব্দ')

আবার কখনো শ্রুতি কবিতায় বিশেষণ+বিশেষ্য-এর অদ্ভুত কম্বিনেশন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন - অমল উৎসব, অটো অশ্রুপাত (তপনলাল ধর 'পরিবর্তনমালা ৫); লৌকিক ঘরবাড়ী (অতীন্দ্রিয় পাঠক 'আর হয়ে গেলে'); মায়াবী চেতনা, ঘটনপটিয়সী মলয়, স্নিগ্ধ ইঙ্গিতময়তা (অভি সেনগুপ্ত 'কোথাও তোমার কথা ছিল'); পীড়িত বিভ্রম (প্রলয় শূর 'দুঃখ'); শব্দহীন প্রচণ্ড চিৎকার (মৃণাল বসুচৌধুরী 'আর্তনাদ'); অশ্লীল গন্ধ (পরেশ মণ্ডলের 'অভিশাপ'); লোমশ দৃষ্টি (পরেশ মণ্ডলের 'ইতিহাস'); ম্লেচ্ছ জল (সুকুমার ঘোষ 'যখন গল্পের মোড়'); উত্তপ্ত কবর (গৌরাঙ্গ ভৌমিক 'শহীদ বেদীর পাশে এলে'); বিনীত কুয়াশা (পরেশ মণ্ডল 'প্রতিশ্রুতি'); আড়ষ্ট ঘড়ি (পরেশ মণ্ডল 'বিদায়')। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরনো শব্দের অর্থগত নতুনত্ব এসেছে। শংকর চক্রবর্তী 'মৃণাল বসুচৌধুরীর কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে মৃণাল বসুচৌধুরীর প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা অন্য শ্রুতি কবিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, "যতিচিহ্নহীন আটপৌরে ও যথেষ্ট প্রচলিত শব্দ ব্যবহারই তাঁর পছন্দ। অথচ, ওই নিতান্ত প্রচলিত শব্দটি যখন অতি ব্যবহারে আক্রান্ত, তখন তাঁর ব্যক্তিগত শব্দের ঝুলি নেড়েচেড়ে আরও একটি বহুল প্রচলিত শব্দ পূর্বের

ওই পচা ফলের মতন শব্দটির পাশে বসিয়েই শব্দটিকে একটি ভিন্নতর ডাইমেনশন দিয়ে থাকেন।”[১৬]

আবার হাংরি কবিদের মতো অতটা বেশি না হলেও, শ্রুতি কবিরা কখনও কখনও উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখেছেন। যেমন – ‘দরোজায়’ (পরেশ মণ্ডলের ‘ইতিহাস’); ‘বল্ল’ (সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ‘তখন বৃষ্টি পড়ছিল’); ‘ফেল্ল’ (সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ‘চাঁদের আলোয়’) ইত্যাদি। আবার কখনও শ্রুতি কবিতায় গাণিতিক সংখ্যার ব্যবহারও দেখা যায় হাংরি কবিতার মতোই। যেমন, পুষ্কর দাশগুপ্তের ‘মাথার ওপর ছাদ’ কিংবা, পরেশ মণ্ডলের ‘নীচে’ কবিতাটি।

এছাড়া কবিতার ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁরা আঙ্গিকের আশ্রয় নিলেন। কবিতার স্তবক, পঙক্তি, শব্দ ভেঙে এমন ভাবে সাজালেন যাতে কবিতার ভাবটি একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য আদল পায়। তাই শ্রুতি কবিদের হাতে কবিতা ও চিত্রকলা মিশে যেতে দেখা যায়। শ্রুতির দ্বিতীয় সংখ্যায় পুষ্কর দাশগুপ্ত ‘কবিতার মুদ্রণ-বিন্যাস’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছিলেন, “মুদ্রণের উন্নত অবস্থায় কবি সম্ভাব্য উপায়ে এবং প্রয়োজন অনুসারে কবিতার বিন্যাসে দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিতে পারেন। ... কবিতায় কোন শব্দ বা চরণকে বিশেষভাবে বা বিশেষ হরফে ছাপিয়ে কবি তাঁর উপলব্ধির সঙ্গে জড়িত অনুভবের স্তর এবং বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত করতে পারেন। এছাড়া বিশেষ কোন ছক বা আকারে কবিতাকে বিন্যস্ত করে কবি তাঁর মানসিক অনুষঙ্গকে সাংকেতিক করতে পারেন।”[১৭] শ্রুতি পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত পরেশ মণ্ডলের ‘ইঙ্গিত’ কবিতাটি উল্লেখ্য –

“এ
কা
কী
প্র...তি...ধ্ব...নি
নী
র
ব
জ্যোৎস্নায়”[১৮]

‘একাকী’ শব্দটিকে ভেঙে প্রতিটি সিলেবলকে পৃথকভাবে এক একটি পঙক্তিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আবার ‘প্রতিধ্বনি’ শব্দটিকে ভেঙে মাঝখানে ‘...’ চিহ্নের প্রয়োগে

প্রতিধ্বনির প্রসারতা যেন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার দশম সংখ্যায় প্রকাশিত মৃণাল বসুচৌধুরীর ‘স্মৃতি’ কবিতায় শব্দকে যেভাবে ভেঙে অভিনব সজ্জায় বিন্যস্ত করা হয়েছে, তাতে কবিতাটির ভাব বা বক্তব্যের পরিপূরক একটি অসাধারণ ইমেজ তৈরি হয়ে যায় –

“সারারাত বৃষ্টি হয়ে
তি
স্মৃ সৌ
ধ
ভেঙে গেলে
ফায়ার বিগ্রেড এসে
ছ ড়া নো টু ক রো গু লো
একে একে...”[১৯]

স্মৃতিসৌধ শব্দটিকে ভেঙেচুরে কবি ভাঙা এক স্মৃতিসৌধের ইমেজ তৈরি করেছেন। আবার ‘ছড়ানো টুকরোগুলো’র কথা বলতে গিয়ে কবি শব্দগুলিকেই টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়েছেন। অষ্টম সংখ্যায় প্রকাশিত গৌরাঙ্গ ভৌমিকের ‘তারা পঁচিশ জন’ কবিতাটিও লক্ষণীয় -

“আজও
তারা
পাহাড়তলিতে
সিঁড়ি
বানায়
পাথর
ভাঙে
সিঁড়ি
বানায়
পাথর
ভাঙে
আর –”[২০]

সিঁড়ি বানানোর কথা বলতে গিয়ে কবি শব্দগুলিকে এমনভাবে সজ্জিত করেছেন যে, একটি সিঁড়ির দৃশ্যরূপ তৈরি হয়ে গিয়েছে। শব্দ দিয়ে যেন ছবি এঁকেছেন কবি কিংবা ছবির রূপ, রেখার আদল দিয়ে কবিতা লিখেছেন। কিংবা তাঁর 'গলির ওপরে ছায়া' কবিতায় –

"গলির ওপরে
দী
র্ঘ
থে
কে
দী
র্ঘ
ত
র
হ
য়..."[২১]

এক দীর্ঘ ছায়ার দৃশ্যরূপ অঙ্কিত হয়েছে এই কবিতায়। আবার পরেশ মণ্ডলের 'সমীক্ষা' কবিতায় -

"বিছানা পেতেই মনে হলো তার
ঘুমের কথাও বিড়ম্বনা
বহুকাল আগে
চিঠি লিখবার
কথা ছিল
আর
..."[২২]

বহুকাল আগে না লিখতে পারা কোনো চিঠির জন্য অনুশোচনার দংশন-যন্ত্রনা ক্রমশ সূচিমুখ হয়ে উঠেছে পংক্তির পর পঙক্তিতে। অনন্ত দাশের 'ক্রমশ ক্ষয়ের দিকে' কবিতা–

"ক্রমশ ক্ষয়ের দিকে
প্র.........
বা.........
হি.........
ত.........
আমার জীবন।"[২৩]

'প্রবাহিত' শব্দটিকে ভেঙে চারটি পঙক্তিতে বিন্যস্ত করার পাশাপাশি, উলম্বভাবে না সাজিয়ে প্রতিটি পংক্তির শুরুতে স্পেস ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ফলে একটা ঢেউ বা প্রবাহের দৃশ্যরূপ ফুটে উঠেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে '...' চিহ্নের প্রয়োগে প্রবাহের অবিচ্ছিন্নতাকে তুলে ধরা হয়েছে।

আবার বেশ কিছু কবিতাতে এক একটি শব্দকে এক একটি পঙক্তিতে উলম্বভাবে বিন্যস্ত করার ফলে সরলরৈখিক একটা দৃশ্যরূপ তৈরি হয়েছে। যেমন, পরেশ মণ্ডলের 'বোধি', 'ছবিটা' কিংবা পুষ্কর দাশগুপ্তের 'রাস্তা এবং' ইত্যাদি। 'রাস্তা এবং' কবিতাটিতে পরপর একক শব্দের  বিন্যাসের বিশেষ ধরণ থেকে একটি রাস্তার ইমেজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়া অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'কাচ'; তপনলাল ধরের 'ঈশ', 'কলকাতা ২৬'; পরেশ মণ্ডলের 'মহাদেশ', 'অভিশাপ'; সুকুমার ঘোষ 'তোমার বাগানে'; পুষ্কর দাশগুপ্ত 'এখন আর'; মৃণাল বসুচৌধুরীর 'বিস্মরণ', 'যুদ্ধ'; গৌরাঙ্গ ভৌমিক 'গল্প করতে করতে' ইত্যাদি কবিতাগুলি আক্ষরিক অর্থেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরেশ মণ্ডলের 'মহাদেশ' কবিতাটি দশটি শব্দকে সাজিয়ে তৈরি, কবিতাটিতে স্প্যানিশ চিত্রশিল্পী জোয়ান মিরো-র (১৮৯৩-১৯৮৩) কথা বলা হয়েছে।

আবার কখনও কবিতার মূলভাবটিকে বা 'key-word' গুলিকে বোল্ড হরফে লিখেছেন শ্রুতি কবিরা। মৃণাল বসুচৌধুরীর 'ঘরময় পদচিহ্ন' কবিতায় 'ঘরময় পদচিহ্ন' ও 'আলোড়ন'  বোল্ড হরফে এবং ভেঙে ভেঙে বিশেষ সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে এভাবে – "ঘ র ম য় প দ চি হ্ন"[২৪]

কিংবা,

"আ
লো
ড়
ন"[২৫]

কবিতার মূল ভাবটি দৃষ্টিগ্রাহ্য দিক থেকে পাঠকের কাছে আবেদন সৃষ্টি করে এভাবে। এছাড়া তাঁর 'সেই শূন্যতার মুখোমুখি', 'বাতায়ন', 'কয়েক মুহুর্ত শুধু'; তপনলাল ধরের 'হঠাৎ', সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বয়া' ইত্যাদি কবিতায় কবিতার মূল ভাবটিকে বোল্ড হরফে বিভিন্ন সজ্জায় দেখা যায়।

সবশেষে বলা যায়, শ্রুতি কবিরা অনুভূতিকে প্রাধান্য দিলেও সংহত আবেগ, পরিশীলিত ইঙ্গিতবহ মার্জিত শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে মুহূর্তের অনুভূতিটিকে জীবন্ত করে তোলেন। দ্বাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত 'নীরবতা' কবিতায় আমরা দেখি সজল বন্দ্যোপাধ্যায় নীরবতার কথা বলতে গিয়ে যতটা সম্ভব নীরবই থেকেছেন –

কুজোর মধ্যে জল
আলনায় জামা কাপড়
আলমারীতে বই
বিছানার ওপর চাদর
আর .........[২৬]

শব্দ ব্যবহার না করে '...' চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে নীরবতার ভাবটিকে কবি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন পাঠকমনে। 'শ্রুতির মৃণাল, কবিতার মৃণাল' শীর্ষক প্রবন্ধে রাজদীপ রায় মৃণাল বসুচৌধুরীর 'দরোজা খুললেই' কবিতা প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন, তা যে কোন শ্রুতি কবিতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে, "এখানে শব্দ, ধ্বনিই হয়ে উঠেছে কবিতার শরীর। যে ধ্বনি আছে, আবার নেই-ও। নেই, কিন্তু আছে। আত্মসমর্পণ কার? একজন মানুষের যিনি নির্জন। হারিয়ে যাওয়া ধ্বনির, যে ধ্বনি চলে যাওয়ার সময় তার গোপন স্পন্দটুকু রেখে গেছে। সেইটুকু সমগ্রে জড়িয়ে উৎসুক বুকের মধ্যে কম্পন গড়ে তুলতে চান তিনি। কিন্তু আঁকড়ে ধরার লোভে যখনই খোলেন দরজা। আর কিছু নেই। সব মিলিয়ে যায়। বলা যেত এই যন্ত্রণার সম্পর্কে অনেক অনেক হাহাকার, অভিব্যপ্তি। সুযোগও ছিল। কিন্তু কবি চুপ রইলেন এর ফলে তার যন্ত্রণা হয়ে উঠল আরো বাঙ্ময়।"[২৭]

শ্রুতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অন্যতম কবি অশোক চট্টোপাধ্যায় 'আন্দোলিত ষাট ও কবিতা আন্দোলন শ্রুতি' শীর্ষক প্রবন্ধে জানিয়েছেন "বুলেটিন বা পরে এই দশক ও শ্রুতি ঘোষণাতেও ছিল রীতির উপর গুরুত্ব – 'কবিতার ইতিহাস তার আঙ্গিকের ইতিহাস', লুই আরাগঁর বিখ্যাত উক্তি এঁরা আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। শোক, দুঃখ, আবেগ, প্রেম, বিরহ এই সবই তো সাহিত্যের বিষয় – চিরকালই ছিল, এবং

থাকবে। শুধু কালে কালে তার প্রকাশটাই আলাদা হয়ে যায়। সুতরাং এই ‘প্রকাশ’-এর অর্থাৎ আঙ্গিক বা রীতিরই চর্চা দেখা গেল শ্রুতি গোষ্ঠীর সচেতন আন্দোলনকারীদের মধ্যে।”[২৮] শ্রুতির তাত্ত্বিক নেতা, ফরাসী ভাষায় তৎকালীন কৃতী ছাত্র ও পরবর্তীকালের কৃতী অধ্যাপক পুষ্কর দাশগুপ্ত মালার্মে-পাউন্ড, এ্যাপলিন প্রমুখের দৃষ্টান্তে কবিতার দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকে নিজের মতো করে প্রকাশ করেছিলেন। শ্রুতির প্রথম সংখ্যাটির প্রথমেই ছিল পুষ্কর দাশগুপ্তের টাইপে সাজানো ‘সূর্যস্ত্রোত্র’ কবিতাটি। অশোক চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, “সমসময়ে এসব রচনা প্রবলভাবে সমালোচিত, কখনো ধিকৃত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন টাইপোগ্রাফি, কেউ বা বিস্ময় প্রকাশ করেছে – এরা কি আগের জন্মে কম্পোজিটর ছিল !”[২৯] আসলে শ্রুতি কবিরা কবিতার রূপগঠনে কোনো নির্দিষ্ট রূপের বন্ধনে নিজেদের স্বাধীন সৃষ্টি-কল্পনাকে বন্দী না রেখে খোলামেলা রূপের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৈচিত্রে তাকে ছড়িয়ে দিলেন। স্পেসের তাৎপর্যময় প্রয়োগ ঘটালেন শব্দ ও পঙক্তি বিন্যাসে; শব্দকে ভেঙে সাজালেন অভিনব বিন্যাসে, কবিতায় ব্যাকরণগত যুক্তি-পারম্পর্য ভেঙে শব্দকে একক স্বাধীন মহিমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক একটি পঙক্তিতে এক একটি শব্দকে বিচ্ছিন্নভাবে স্থাপন করলেন, যার দ্বারা আবেগের উচ্ছ্বসিত স্রোতকে যেমন তাঁরা একদিকে রুখতে চাইলেন, তেমনি অন্যদিকে পাঠকের মনে একটি আবহ সঞ্চারও করলেন, একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যঞ্জনা তৈরি করলেন কবিতার। শ্রুতি-কবিতা তাই কেবলই পাঠের জন্য নয়, দেখার মতোও কবিতা।

**তথ্যসূত্র**

১. শ্রুতি পত্রিকা, দ্বিতীয় সংকলন, মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত, ৬৮/৪ সি পূর্ণদাস রোড, কলকাতা-২৯, পৃ. ২৩।

২. দেবেশ রায়, ‘শাস্ত্রবিরোধিতা ও গল্প’ শীর্ষক প্রবন্ধ, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, গাঙচিল, কলকাতা - ৭০০১১১, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৩৩৯-৩৪০।

৩. উত্তম দাশ, হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, মহাদিগন্ত, কলকাতা - ৭৪৩৩০২, দ্বিতীয় প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৯৮।

৪. তদেব, পৃ. ৬২।

৫. শ্রুতি পত্রিকা, পঞ্চম সংকলন, ৪২-গড়পার রোড, কলকাতা - ০৯, জুলাই ১৯৬৬, পৃ. ১৮।
৬. শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সংকলন, সম্পাদকীয় নিবন্ধ।
৭. শ্রুতি পত্রিকা, সপ্তম সংকলন, সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরেশ মণ্ডল সম্পাদিত, ৩৫-এফ, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা - ০৫, জানুয়ারি ১৯৬৮, পৃ. ২৮।
৮. তদেব, পৃ. ১৬।
৯. শ্রুতি পত্রিকা, অষ্টম সংকলন, সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরেশ মণ্ডল সম্পাদিত, ৩৫-এফ, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা - ০৫, এপ্রিল ১৯৬৮, পৃ. ২৮।
১০. শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত সপ্তম সংকলন, পৃ. ১।
১১. শ্রুতি পত্রিকা, চতুর্দশ সংকলন, মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত, ৩৫-এফ, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা - ০৫, আগস্ট ১৯৭১, পৃ. ১।
১২. উত্তম দাশ, পূর্বোক্ত 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ৬৮।
১৩. শ্রুতি পত্রিকা, ত্রয়োদশ সংকলন, মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত, ৪২-গড়পার রোড, কলকাতা -০৯, ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, পৃ. ১১।
১৪. শ্রুতি পত্রিকা, দশম সংকলন, মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত, ৩৫-এফ, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা - ০৫, মার্চ ১৯৬৯, পৃ. ১৫।
১৫. তদেব, পৃ. ২১।
১৬. শংকর চক্রবর্তী, 'মৃণাল বসুচৌধুরীর কবিতা' প্রবন্ধ, পদ্যপত্র পত্রিকা, অর্পণ পাল সম্পাদিত, শ্রুতি বিশেষ সংখ্যা, দঃ ২৪ পরগণা- ৭৪৩৩৭২, ২০১৪, পৃ. ৩১৬-৩১৭।
১৭. শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সংকলন, পৃ. ২৪।
১৮. তদেব, পৃ. ১৫।
১৯. শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত দশম সংকলন, পৃ. ২১।
২০. শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত অষ্টম সংকলন, পৃ. ২৫।
২১. তদেব, পৃ. ২৬।
২২. শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত পঞ্চম সংকলন, পৃ. ৫।
২৩. শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সংকলন, পৃ. ২১।
২৪. তদেব, পৃ. ৮।
২৫. ঐ।

২৬. শ্রুতি পত্রিকা, দ্বাদশ সংকলন, ৪২ - গড়পার রোড, কলকাতা - ০৯, অক্টোবর ১৯৭০, পৃ. ৭।

২৭. রাজদীপ রায়, 'শ্রুতির মৃণাল, কবিতার মৃণাল' প্রবন্ধ, পদ্যপত্র পত্রিকা, অর্পণ পাল সম্পাদিত, শ্রুতি বিশেষ সংখ্যা, দঃ ২৪ পরগণা - ৭৪৩৩৭২, ২০১৪, পৃ. ৩৩৩।

২৮. অশোক চট্টোপাধ্যায়, 'আন্দোলিত ষাট ও কবিতা আন্দোলন শ্রুতি' প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত পদ্যপত্র পত্রিকা, পৃ. ৪৭।

২৯. তদেব, পৃ. ৪৮।

# চিত্রকল্পের আলোকে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার অভিনবত্ব

সীমা পুরকাইত
গবেষক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

**সারসংক্ষেপ :**
কবিতা হল কবি - অনুভূতির এক বিশেষ শিল্পরূপ। শব্দ ও অর্থের যথার্থ বিন্যাস ঘটিয়ে এবং ছন্দ, অলঙ্কার, উপমা, চিত্রকল্প ইত্যাদির রঙে রঞ্জিত করে একজন কবি তাঁর ভাব ও কল্পনাকে যখন শিল্পরূপ দানে সচেষ্ট হন, তখন তা কবিতা হয়ে ওঠে। ছন্দ ও অলংকারের মতো 'Image' বা চিত্রকল্পও কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান সৌন্দর্য সৃষ্টিকারীউপাদান। চিত্রকল্প মানে কেবল চিত্র বা দৃশ্যের সমাবেশ নয়।দৃশ্য ছাড়াও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে স্পর্শ, গন্ধ, শ্রাব্য, স্বাদ ইত্যাদি নানারকম ইন্দ্রিয়ানুভবের প্রকাশ ঘটে।আর চিত্রকল্প অবশ্যই ভাবকে বহন করবে। চিত্রকল্প নির্মাণ সার্থক হয় তখন, যখন তাভাবাশ্রিত হয়। যার মধ্য দিয়ে কবির অন্তর্সত্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। আধুনিক কবিরা অনেক সময় তাঁদের সমকালীন সমাজ পরিস্থিতিকে চিত্রাঙ্কিত করার চেষ্টা করে থাকেন চিত্রকল্প সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।অতএব, চিত্রকল্প সঙ্কীর্ণ অর্থে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলেও, তার অন্তরালে লুকিয়ে থাকে নানা ব্যঞ্জনা।

একটি কবিতার অবয়বত্ব প্রদানে চিত্রকল্পের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। যদিও আমাদের মূল আলোচনার বিষয় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে নিয়ে। কিন্তু চিত্রকল্প বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে তিন ও চারের দশকের প্রধান কবিদের নিয়ে না বললে আলোচনাটি সম্পূর্ণ ও যথার্থ হয়না। তিনের দশকের কবিদের কবিতার চিত্রকল্প বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের জীবনানন্দ দাশের কথা মনে আসে। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে খুব সহজেই চিত্রদর্শন হয়ে যায় আমাদের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতা সম্পর্কে যথার্থই বলেছিলেন, 'চিত্ররূপময়'। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কালের পুতুল' - এ বলেছেন, 'তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল, তাঁর রচনা চিত্রবহুল এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল।' তবে, আধুনিক কবিদের চিত্রকল্প বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে, ত্রিশের দশকের বিশিষ্ট দুই কবি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে'র নাম উল্লেখ করতেই হয়। বিশ শতক ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার, অবক্ষয়ের এক চরম উত্তাল সময়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর

সময়ের ভয়াবহতা, দৈন্যদশা, হাহাকার এই সময়ের কবিদের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। তার প্রতিফলন তাঁদের কবিতায় পাওয়া যায়। আধুনিক সমাজজীবনের যান্ত্রিকতাকে চিত্রকল্পরূপ দান করতে ত্রিশের কবিরা ছিলেন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তবে, এ বিষয়ে তাঁরা ছিলেন অনেক বেশি পাশ্চাত্যপন্থী।

আমরা জানি বিংশ শতাব্দী ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার চরম মূহূর্ত।চারের দশকে এসে তা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। একাধারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশেরতেভাগা আন্দোলন, সেইসঙ্গে ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগ – সবমিলিয়ে গোটা চল্লিশের দশক হয়ে উঠেছিল জাতির জীবনের অভিশাপ।অন্ধকারের কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল সমাজ ও ব্যক্তিজীবন। এই সমস্ত কিছুর চিত্রকল্প চারের দশকের কবিদের কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে।আর এই দশকের কবিরা ছিলেন বিশেষত সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী। কাজেই সমস্ত রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামী কণ্ঠস্বরকে উচ্চকিত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। যেমন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মা, তুমি কান্দো' কবিতায় –

"অন্ধকারের চোখ জ্বলে
চোখে আগুন।" ("মা, তুমি কান্দো", 'অগ্নিকোণ')

এখানে আগুন বলতে আসলে বহুদিন ধরে সমাজের অন্ধকারকে বহন করে আসা মানুষদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যেশক্তির দ্বারা তারা সংগ্রামের আগুন জ্বালাতে চায়।চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতার মূল ধারাটি গড়ে উঠেছিল বামপন্থী রাজনৈতিক চেতনাকে কেন্দ্র করে। এই ধারার প্রধান উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণমিত্র প্রমুখ।এই দশকেরই অপর এক কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তাঁর কবিতায় কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বমূলক ভাবনার সরাসরি প্রয়োগ না ঘটালেও, কলুষিত সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদের সুরপরোক্ষে শোনা যায়।নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রধানত জীবনবোধের কবি।তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে নানারূপ চিত্র পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে। কবিতার ভাবকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলে, তারপর তার অন্তর্নিহিত সত্যটিকে পাঠকের অন্তরে প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে নীরেন্দ্রনাথের নৈপুণ্য অসামান্য।ইন্দ্রিয়গম্য অনুভূতিই চিত্রকল্পের শেষ কথা নয়।ইন্দ্রিয়ময় জগতের বাইরে গিয়ে পাঠক যখন তার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাটিউপলব্ধি করতে পারে, তখনই চিত্রকল্প সৃষ্টিতে একজন কবির সার্থকতা প্রমাণিত হয়। সময় –

সমাজ – মানুষনীরেন্দ্রনাথের কবিতার ভাবকেন্দ্রে সর্বদাই বিরাজমান। চিত্রকল্প নির্মাণেও সেগুলি মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাঁর কবিতায়। বিপর্যস্ত সমাজের ভয়াবহ রূপটি তাঁর কবিতায় কীভাবে চিত্রকল্প - রূপ পাচ্ছে, তা দেখে নেওয়া যেতে পারে -

“পাহাড়টিকে
মস্ত একটা ময়াল সাপের মতন
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে যে
সরকারি সড়ক।”

(“ঈশ্বরের মুখোমুখ”, ‘যাবতীয় ভালোবাসাবাসি’)

কবি তাঁর সমকালীন বিশ্বসভ্যতার কুৎসিত ভয়ঙ্কর রূপটি এখানে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।‘ময়ালসাপ’ এখানে সমাজ ও সভ্যতার ভয়াল রূপের প্রতীক হয়ে উঠেছে।অতএব চিত্রকল্পের অভিঘাত কেবল ইন্দ্রিয় - কেন্দ্রিক হয় না।তা ব্যাপক অর্থে ইন্দ্রিয়াতীত ব্যঞ্জনাকেও বহন করে, জগৎ ও জীবনের বিচিত্র রূপের পরিচয় দেয়। এ দিক দিয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা এক অভিনব নিদর্শন-স্বরূপ হয়ে উঠেছে চল্লিশের তথা বাংলা কবিতার জগতে।

**মূল প্রবন্ধ**

কবিতা হল কবি-অনুভূতির এক বিশেষ শিল্পরূপ। শব্দ ও অর্থের যথার্থ বিন্যাস ঘটিয়ে এবং ছন্দ, অলঙ্কার, উপমা, চিত্রকল্প ইত্যাদির রঙে রঞ্জিত করে একজন কবি তাঁর ভাব ও কল্পনাকে যখন শিল্পরূপদানে সচেষ্ট হন, তখন তা কবিতা হয়ে ওঠে। ছন্দ ও অলংকারের মতো ‘Image’ বা চিত্রকল্পও কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।এছাড়া কবিতার প্রধান সৌন্দর্যই হল চিত্রকল্প।ইংরাজি Image বা Imagery শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে কেউ চিত্রকল্প, কেউ আবার রূপকল্প শব্দের ব্যবহারে আগ্রহী। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার চিত্রকল্প ও প্রতিমান শব্দের ব্যবহার করেছেন।[১]

চিত্রকল্প বলতে কেবল দৃশ্যবস্তুর বর্ণনা বোঝায় না। দৃশ্য ছাড়াও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে স্পর্শ, গন্ধ, শ্রাব্য, স্বাদ ইত্যাদি নানারকম ইন্দ্রিয়ানুভবের প্রকাশ ঘটে।“imagery” in this usage includes not only visual sense qualities but also qualities that are auditory, tactile (touch), thermal (heat and cold), olfactory (smell),gustatory (taste)and kinesthetic (sensations ofmovement).[২]আর চিত্রকল্প অবশ্যই ভাবকে বহন করবে। চিত্রকল্প নির্মাণ সার্থক হয় তখন, যখন তাভাবাশ্রিত হয়। যার মধ্য দিয়ে কবির মানসিকতাকে

অনুধাবন করা যায়, কবির ব্যক্তিত্বকে জানা যায়।এককথায় কবির অন্তর্সত্তার সঙ্গেআমাদের পরিচয় ঘটে।আধুনিক কবিরা অনেক সময় তাঁদের সমকালীন সমাজ পরিস্থিতিকে চিত্রাঙ্কিত করার চেষ্টা করে থাকেন চিত্রকল্প সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। M.H.Abrams - এর'A Glossary of Literary Terms' অনুযায়ী– "...the writer's impression of a visual object or a scene; often the impression is rendered by means of metaphor, or by juxtaposing, without indicating a relationship, the description of one object with that of a second and diverse object."[৩]

আধুনিককবিতায় চিত্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী।যদিও, আমাদের মূল আলোচনার বিষয়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে নিয়ে। কিন্তুচিত্রকল্প আলোচনায় তিনওচারের দশকেরপ্রধানকবিদের কথানা বললেআলোচনাটিসম্পূর্ণ ও যথার্থ হবেনা।এই প্রসঙ্গেপ্রথমেই জীবনানন্দ দাশের কথা উল্লেখ করতে হয়।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতা সম্পর্কে যথার্থই বলেছিলেন,'চিত্ররূপময়'। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কালের পুতুল' - এ বলেছেন,'তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল, তাঁর রচনা চিত্রবহুল এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল।'[৪]আমরা আগেই বলেছি, চিত্রকল্প মানে কেবল চিত্ররূপদর্শন নয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলিও(গন্ধ - স্পর্শ - শ্রুতি - স্বাদ)চিত্রকল্পের গণ্ডির মধ্যে আসে। জীবনানন্দের কবিতাগুলি পড়লে তা খুব সহজেই অনুভূত হয়। এই মুহূর্তে বুদ্ধদেব বসুর একটি উক্তি মনে পড়ছে,'ছবি আঁকতে তাঁর নিপুণতা অসাধারণ। তার উপর ছবিগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের ও স্পর্শেরও বটে...।'[৫] তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠাইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্পের রূপ এইরূপ ---

১. সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ। ("আমি যদি হতাম",'বনলতা সেন')

২. "ফেনসা ভাতের গন্ধে আম-মুকুলের গন্ধ মিশে যায়
যেন বারবার।"("একদিন এই দেহ ঘাস", 'রূপসী বাংলা')

৩. "বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।"
("বাংলারমুখ আমি দেখিয়াছি", 'রূপসী বাংলা')

তাঁর কবিতার চিত্রকল্পগুলি আপাতভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলেও, তার অন্তরালে কবির বিষন্নতা অনেক সময় লুকিয়ে থাকে। যেমন 'হায় চিল' কবিতায় –'তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে'পংক্তিটিতেচিলের কান্নার রূপকে কবির

প্রিয়তমা হারানোর বেদনা একাত্ম হয়ে গেছে। ‘পাখিরনীড়েরমতোচোখ তুলে নাটরের বনলতা সেন’ -এইউপমাশ্রয়ীচিত্রকল্পটিরমধ্য দিয়ে একটি অসাধারণ প্রশান্তির ভাব ফুটে উঠেছে।নীড়মানেই শান্তির আশ্রয়। পাখিরা দিনের শেষে যখন নিজেদের আশ্রয়ে ফেরে তখন যে প্রশান্তি তারা লাভ করে, কবির কাছে বনলতা সেন এর চোখ সেই আশ্রয়ের দ্যোতক। যার দৃষ্টির কোমলতায় প্রশান্তি ও আশ্রয় দেখতে পান কবি। আরও একটি অসাধারণ চিত্রকল্পের রূপ ফুটে উঠেছে,‘সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে’ পংক্তিতে।শিশিরের শব্দ যেমন শোনা যায় না, ঠিক তেমন করেই সন্ধ্যা আসে,যা শ্রুতিগ্রাহ্য নয়। কবি সন্ধ্যা বলতে এখানে জীবনের সন্ধ্যাকে, জীবনের বার্ধক্যকে আসলে বোঝাতে চেয়েছেন।মানুষ যখন তার বার্ধক্যে এসে উপস্থিত হয়, তখন তার জীবনে নতুন করে পাওয়া বা হারানোর মতো অবশিষ্ট কিছু আর থাকে না অর্থাৎ, জীবনে যখন সন্ধ্যা নেমে আসে তখন তা শিশিরের শব্দের মতো নীরবেই আসে। এখানে শিশিরের শব্দের চিত্রকল্পে সন্ধ্যাকে একটা স্নিগ্ধতা দান করেছেন কবি। চিত্রকল্পবাদীশিল্পী হিসাবে এখানেই জীবনানন্দের সার্থকতা।

আধুনিক কবিদের চিত্রকল্প বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে ত্রিশের দশকের বিশিষ্ট দুই কবি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে’র নাম উল্লেখ করতেই হয়।বিশ শতক ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার, অবক্ষয়ের এক চরমউত্তাল সময়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়েরভয়াবহতা, দৈন্যদশা, হাহাকার তাঁদের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। তার প্রতিফলন তাঁদের কবিতায় পাওয়া যায়।সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘ক্রন্দসী’ কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতা প্রতীকধর্মী। তার মধ্যে ‘উটপাখি’ একটি সার্থক চিত্রকল্পধর্মী কবিতা।উটপাখি যেমন ঝড়ের সম্ভাবনায় মরুভূমির বালিতে মুখ গুঁজে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়, সমাজ ও সময়ের সংকটে বিধ্বস্ত মানুষও কঠিনসত্যের, রূঢ় বাস্তবের কবল থেকে মুক্তি পেতে আত্মরক্ষার চেষ্টা যতই করুক, আসন্নঝড়ের হাত থেকে তাদেরও মুক্তি নেই। উটপাখির চিত্রকল্পে নৈরাশ্যপীড়িত দিকভ্রান্ত মানুষের কথা আসলে এখানে বলা হয়েছে,

“কোথায় লুকাবে? ধুধু করে মরুভূমি;
ক্ষ'য়েক্ষ'য়ে ছায়া ম’রে গেছেপদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যেনেই;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামৃগেম'জে নেই;

তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।
কোথায় পালাবে? ছুটবেবা আর কত?"

("উটপাখি", 'ক্রন্দসী')

এই কবিতায় মরুভূমি যুদ্ধবিধ্বস্ত অবক্ষয়ী সমাজের প্রতীক বা চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে। যা টি. এস.এলিয়টের 'The Waste Land'- এরঅনুরূপ, যেখানে অবক্ষয়ীত সমাজ ও সভ্যতাকে পোড়ো জমি রূপে দেখেছিলেন তিনি।

সুধীন্দ্রনাথের মতো বিষ্ণু দে'ও জগৎ ও জীবনের যাবতীয় বিপর্যয়ের ছবি এঁকেছেন কবিতায়। তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত চিত্রকল্পে টি. এস. এলিয়টের ছায়া পাওয়া যায়।বিশ্বযুদ্ধোত্তর কবি এলিয়ট বিশ্বসভ্যতাকে পোড়া জমি রূপে দেখেছিলেন তাঁর 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এ। সেই সময়ের কবি বিষ্ণু দে'ও সমকালীন নাগরিক জীবনের রুদ্ধশ্বাস যান্ত্রিকতাকে দেখেছিলেন,'চোরাবালি','ফণীমনসা' ইত্যাদির রূপকে। যেমন --
'স্বপ্নেরা হল ফণীমনসার বন' ("পঞ্চমুখ",'চোরাবালি')।
পুরাণকে সমকালীন জীবনচেতনায় সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন কবি।'চোরাবালি' কাব্যের 'ক্রেসিডা' কবিতায়,

"হেলেনেরপ্রেমে আকাশে ঝঞ্ঝারকরতাল
দ্যুলোকভূলোকদিশাহারাদেবদেবী...
বৈশাখী মেঘ মেদুর হয়েছে সুদূর গগনকোণে।
কুরুক্ষেত্রে উড়েছে হাজার রথচক্রের ধূলি।
স্বপ্ন - গোধূলি ডুবে গেলোখর রক্তের কোলাহলে।"

("ক্রেসিডা", 'চোরাবালি')

এই কবিতার মূলে আছে ট্রয়লাস ও হেলেনের প্রেম। কিন্তু ট্রয়ের যুদ্ধে তাদের সেই প্রেমস্বপ্ন ভেঙে পড়ে।এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিষ্ণুদে বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের মানুষের দুর্বিষহ, বিধ্বস্ত জীবনকে প্রতীকায়িত করে তুলতে চেয়েছেন। সমাজ ও সভ্যতার অবক্ষয়ব্যক্তিজীবনেও যে ভয়ঙ্কর ভাবে প্রভাব ফেলতে পারে এই কবিতায় বিষ্ণু দে সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন।চিত্রকল্প সৃষ্টিতে বিষ্ণু দে যে অভিনবত্ব গড়েছেন, সেই হিসাবে তাকে চিত্রকল্পবাদী কবি বললে খুব একটা ভুল হবে না। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন,"তাঁর কাব্যে ছন্দ, মিল, উপমা, অলংকার ইত্যাদির প্রয়োগ তো সুমিতবটেই, এমন কি বিষয় মাহাত্ম্যে বা অর্থ গৌরবে ভাবের স্বল্পতা তিনি কোথাও ঢাকতে চাননি।

সার্বজনীন অনুভূতির ঐকান্তিক অঙ্গীকারেই সাধারণ চিত্রকল্পাদির মধ্যে প্রাণস্পন্দন জাগিয়েছেন।”[৬]

আমরা জানি বিংশ শতাব্দী ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার চরম মূহূর্ত।চারের দশকে এসে তা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। একাধারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের তেভাগা আন্দোলন, সেইসঙ্গে ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগ–সবমিলিয়ে গোটাচারের দশক হয়ে উঠেছিল জাতির জীবনের অভিশাপ।অন্ধকারের কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল সমাজ ও ব্যক্তিজীবন। এই সমস্ত কিছুরচিত্রকল্প এই সময়েরকবিদের কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। আর এই দশকের কবিরা ছিলেন বিশেষতসাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী। কাজেই সমস্ত রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামী কণ্ঠস্বরকে উচ্চকিত করতে চেয়েছিলেন চল্লিশের প্রধান কবিরা।যেমন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘মা, তুমি কান্দো’ কবিতায় –

“অন্ধকারের চোখ জ্বলে
চোখে আগুন।”

(“মা, তুমি কান্দো”, ‘অগ্নিকোণ’)

এখানে আগুন বলতে আসলে বহুদিন ধরে সমাজের অন্ধকারকে বহন করে আসা মানুষদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যেশক্তির দ্বারা তারাসংগ্রামের আগুন জ্বালাতে চায়। তাঁরকবিতায় অন্ধকারেরচিত্রকল্প নানা রূপে উদ্ভাসিত। যেমন – ‘ধৈর্যচ্যুত অন্ধকার’ (“অসহ্য এক রাত্রি”, ‘ফুল ফুটুক’), ‘হিংস্র অন্ধকার’ (“আলো থেকে অন্ধকারে”, ‘যত দূরেই যাই’) ইত্যাদি।আরও একটি কবিতায় কবি অন্ধকারকেই অস্ত্র বানাতে চেয়েছেন আলোর দিন ফোটাতে,

“তুমি আলো আমি আঁধারের আলবেয়ে
আনতে চলেছি
লাল টুকটুকে দিন।”

(“লাল টুকটুকে”,‘ফুল ফুটুক’)

সংগ্রামী মানুষের আশার বাণী প্রতীকায়িত হয়ে উঠেছে উপরোক্ত বক্তব্যে। অরুণ মিত্রের কবিতায়ও সংগ্রামী মানুষের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন –

“বিজয়ী রথের চাকা
থমকাবেলালচে কাদায়,

সামনে দাঁড়াবে খাড়া মাংসের প্রাচীর।
জানুক জানুক ওরা মানুষের অসম সাহস।”

(“মাটির খবর”,‘প্রান্তরেখা’)

কিংবা,

“এখন প্রহর গোনো।
উপোসী হাতের হাতুড়িরাউদ্যত,
কড়া - পড়া কাঁধে ভবিষ্যতের ভার,
দেবতার ক্রোধকুৎসিত রীতিমতো
মানুষের হুঁশিয়ার।”

(“লালইস্তাহার”, ‘মেঘের মিছিল’)

সেই অভিশপ্ত সময়ে দাঁড়িয়ে সুকান্ত ভট্টাচার্য উচ্চারণ করেছেন,

‘ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।’

(“হে, মহাজীবন”, ‘ছাড়পত্র’)

দারিদ্র্যের নির্মমতাই এখানে প্রতীকায়িত হয়ে উঠেছে।ক্ষুধা-দারিদ্র্য যেখানে মুখ্য, সেখানে একজন ক্ষুধার্তের কাছে পূর্ণিমার চাঁদকেও ঝলসানো রুটি বলে মনে হয়। পেটে ক্ষুধা নিয়ে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে কখনোই কল্পনা জাগে না, কবিতাও সৃষ্টি হয় না। দারিদ্র্যের কাছেকবিত্বের পরাজয় স্বীকার করতেই হয়। একজন ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে এ সমস্তই মূল্যহীন।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠার ইন্ধন যোগায় এই ভাবাদর্শ।শ্রমজীবী মানুষ, অথচ সমাজে নিজের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত, তার সেই অধিকার অর্জনের লড়াই সাম্যবাদী ভাবধারার মূলকথা। দেশজুড়ে অন্নাভাব, দু’মুঠো ভাতের জন্য মানুষ কাঁদছে।ব্যথিত হৃদয়ে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখছেন –

“আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে
কারা যেন আজো ভাত রাঁধে
ভাত বাড়ে, ভাত খায়।
আর আমরা সারারাত জেগে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে

প্রার্থনায় সারারাত।”

(“আশ্চর্য ভাতের গন্ধ”, ‘মুখে যদি রক্ত ওঠে’)

চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতার মূল ধারাটি গড়ে উঠেছিল বামপন্থী রাজনৈতিক চেতনাকে কেন্দ্র করে। এই ধারার প্রধানউল্লেখযোগ্য কবিরাহলেন,সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণমিত্রপ্রমুখ।এই দশকেরই অপর এক কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর কবিতায় কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বমূলক ভাবনার সরাসরি প্রয়োগ না ঘটালেও, কলুষিত সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদের সুরপরোক্ষে শোনা যায়।সাম্যবাদী রাজনৈতিক চেতনার পাশাপাশি আরও একটি কবিতার ধারা এই সময়ে গড়ে উঠেছিল - আত্মগত কবিতার ধারা। এই দুই ধারার বাইরে আরও একটি নতুন ধারার জন্ম হয়েছিল নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর হাত ধরে। ব্যক্তি - অনুভূতি কীভাবসমগ্রসমাজের অনুভূতি হয়ে ওঠে এবং বিপরীতে সমাজের সামগ্রিক ভাবনা অর্থাৎ গোষ্ঠীচেতনা ব্যক্তিকে কীভাবে অভিভূত করে তোলে, তাই এই ধারার কবিতার মূল বক্তব্য। একজন কবিতাঁর ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা অবশ্যই বলবেন, সেইসঙ্গে সমাজের বৃহত্তরঅনুভূতিকেও বহন করা তাঁর কর্তব্য।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রধানত জীবনবোধের কবি।চল্লিশের অন্যান্য কবির মতো তাঁর কবিতাও বর্ণনাধর্মী।অল্পকথনে কবিতা খুব কম লিখেছেন তিনি, প্রায় নেই বললেই চলে। তবে অনেক কথার মাঝে তাঁর কবিতা কখনো ভারাক্রান্ত হয়নি। অতিকথন তাঁর কবিতাকে কাব্যগুণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি।তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে নানারূপ চিত্র পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে। কবিতার ভাবকেইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলে, তারপর তার অন্তর্নিহিত সত্যটিকে পাঠকের অন্তরে প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে নীরেন্দ্রনাথের নৈপুণ্য অসামান্য।

চিত্রকল্প কবিতার একটি অমূল্য সম্পদ।নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা সম্পর্কেও তা পরম সত্য।তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প দু’ভাবে পাওয়া যায় - ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্প এবং ভাবাশ্রয়ী চিত্রকল্প।কবিতার মধ্যে লুকিয়ে থাকে কবির অব্যক্ত চেতনা, কবিরনিজস্ব বক্তব্য।অতএব চিত্রকল্প কবির মানসিকতারউন্মোচনে সহায়তা করে। আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্প মানে কেবলই দৃশ্যের বর্ণনা নয়, চিত্রকল্প শ্রুতিযোগ্য – স্পর্শযোগ্য – ঘ্রাণপ্রধানওহতে পারে।যেমন -

১. “ঝানু আকাশ ঝুঁকে পড়ে অবাক।” (“কাঁচরোদ্দুর, ছায়া অরন্য”, ‘নীলনির্জন’)

‘ঝানু আকাশ’ এখানে দৃশ্যকে প্রতীকায়িত করছে।

২. “রাজপথে ছিন্ন শব, ভগ্নদ্বারপ্রাসাদে কুটিরে
নির্জন বীভৎস শান্তি।দলভ্রষ্টআহত অশ্বের
চকিতখুরের শব্দ, মুমূর্ষুরআর্তকণ্ঠ, ফের
ভৌতিক স্তব্ধতা।”(“তৈমুর”, ‘নীলনির্জন’)

এখানে শ্রাব্যের অনুভূতি হয় অর্থাৎ শব্দের চিত্রকল্প।

৩. “কী দেখলে তুমি? রৌদ্রকঠিন
হাওয়ায় অট্টহাসি
দু’হাতে ছড়িয়ে দিয়ে নিষ্ঠুর
গ্রীষ্মেরপ্রেত - সেনা
মাঠে মাঠেবুঝি ফিরছে?”(“একচক্ষু”,‘নীলনির্জন’)

এখানে গ্রীষ্মের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ‘রৌদ্রকঠিনহাওয়ার অট্টহাসি’, ‘গ্রীষ্মেরপ্রেত–সেনা’ কথাগুলি গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের ইঙ্গিত বহন করছে।তবে তাঁর এই সমস্ত শব্দ প্রয়োগে স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা যায় না। তাঁর ‘হঠাৎ হাওয়া’ কবিতার শব্দ ও ছবি আঁকা দুই-ই বেশ স্বত:স্ফূর্ত।

“হঠাৎ হাওয়া উঠেছে এই দুপুরে,
আকাশী নীল শান্তি বুঝি ছিনিয়ে নিতে চায়।
মালোঠিগাঁও, বিমূঢ় হতবাক্।
মেঘেরক্রোধ গর্জে ওঠে ঝড়ের ডঙ্কায়।
এখনই এল ডাক।
মন্দাকিনী মিলায় তালতরঙ্গের নূপুরে।”
(“হঠাৎ হাওয়া”, ‘অন্ধকার বারান্দা’)

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ছাড়াও ঘ্রাণের অনুভূতি - সম্পৃক্ত চিত্রকল্প পাওয়া যায় তাঁর কবিতায় -

“অতপর সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো
জুঁইয়ের গন্ধে বাতাস যেখানে মন্থর হয়ে আছে;
এবং রেলিংয়ে ভর দিয়ে,
যেখান থেকে অল্প একটু আকাশ দেখা যায়।”
(“অল্প-একটু আকাশ”, ‘অন্ধকার বারান্দা’)

ইন্দ্রিয়গম্য অনুভূতিই চিত্রকল্পের শেষ কথা নয়। ইন্দ্রিয়ময় জগতের বাইরে গিয়ে পাঠক যখন তার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাটিউপলব্ধি করতে পারে, তখনই চিত্রকল্প সৃষ্টিতে একজন কবির সার্থকতা প্রমাণিত হয়। সময় – সমাজ – মানুষনীরেন্দ্রনাথের কবিতার ভাবকেন্দ্রে সর্বদাই বিরাজমান। চিত্রকল্প নির্মাণেও সেগুলি মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাঁর কবিতায়। বিপর্যস্ত সমাজের ভয়াবহ রূপটিতাঁর কবিতায় কীভাবে চিত্রকল্প - রূপ পাচ্ছে, তা দেখে নেওয়া যেতে পারে -

"পাহাড়টিকে
মস্ত একটা ময়াল সাপের মতন
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে যে
সরকারি সড়ক।"

("ঈশ্বরের মুখোমুখ",'যাবতীয় ভালোবাসাবাসি')

কবি তাঁর সমকালীন বিশ্বসভ্যতার কুৎসিত ভয়ঙ্কর রূপটি এখানে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।'ময়ালসাপ'এখানে সমাজ ও সভ্যতার ভয়াল রূপের প্রতীক হয়ে উঠেছে।'মৌলিক নিষাদ' কবিতায়ও কবিতাঁরসমকালীন সমাজজীবনের অন্ধকার রূপটিকে তুলে ধরেছেন।যেখানে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যু গ্রাস করতে আসে -

"মনে হয় আমি এক অমোঘ মৃত্যুর কাছাকাছি
নিয়েছি আশ্রয়। আমি ভিতরে বাহিরে
যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে বিদেশে
যেখানে তাকাই - শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।"

("মৌলিক নিষাদ", 'অন্ধকার বারান্দা')

বিশ্বসভ্যতা বিধ্বস্ত।কবি স্বদেশে বিদেশে যেদিকে তাকান অন্ধকার গ্রাস করতে আসে প্রতিমুহূর্তে। চতুর্দিকে মৃত্যুর ছায়া।বিপন্ন জীবন।এই সমস্ত কিছুর মধ্যেও কবি শৈশবের স্মৃতিরদ্বারা আগলে রাখতে চান দেশেরস্বচ্ছ নির্মল রূপটিকে -

"একটু - একটু বাতাস দিচ্ছে, বাতাসে আছে ফুলের গন্ধ;
তার মানে তো আর - কিছু নয়।
ছেলেবেলার শিউলি গাছে
এই আঁধারেও ফুলের দারুন সমারোহ।
গুরুমশাই,
অন্ধকারে কে দেখবে মানচিত্রখানা?

মাথার মধ্যে দৃশ্য নানা,
স্মৃতিরমধ্যে অজস্র ফুল,
তার সুবাসেইদেশকে পাচ্ছি বুকের মধ্যে।”

(“দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে”, ‘কলকাতার যিশু’)

দেশের অবস্থা যখন সংকটাপন্ন, তখন কবির স্মৃতিতে ভেসে আসে শৈশবের নানান ছবি। বর্তমানের আঁধারের মধ্যে থেকেও কবি স্মৃতির দ্বারা শৈশবকালের শিউলি ও নানা ফুলের গন্ধ অনুভব করতে পারেন।কবিতাঁর দেশের নির্মল স্বচ্ছরূপটিকে নতুন করে পাবার জন্য স্মৃতির হাত ধরে শৈশবে পৌঁছে যেতে চান।‘সূর্যাস্তের পর’ কবিতায় কবি রাত্রিকেশিকারীজন্তুর সঙ্গে তুলনা করেছেন,

“আমি দেখলাম, দিগন্ত থেকে গুঁড়ি মেরে
ঠিক একটা শিকারী জন্তুর মতন
রাত্রি এগিয়ে আসছে।”

এখানে যে চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে তা আপাতদৃষ্টিতে চিত্রকে ব্যঞ্জিত করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবি এখানে সমকালীন সমাজ ওসভ্যতার অন্ধকারময় রূপটিকেই উদঘাটিত করতেচেয়েছেন। সময়ের এই অন্ধকার কবিকে কখনো আবার অবসাদগ্রস্ত করে তোলে,

“দৌড়তেদৌড়তে দিন যায়,
অতর্কিতে রাত্রি নেমে আসে,
তারপর সে যেতে চায় নাআর।”

(“ঘরবাড়ি ও অজস্র ঘটনা”, ‘কবিতার বদলে কবিতা’)

অন্ধকার যখন সমাজকেপুরোপুরি গ্রাস করে ফেলে তখন তার থেকে নিষ্কৃতিসহজে মেলে না।

সমাজের ক্ষমতাশালী মানুষদের ভুলত্রুটি বিচার করার অধিকার বা সাহস যে সাধারণ মানুষের নেই, তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ‘উলঙ্গ রাজা’।সবাই দেখছে রাজা উলঙ্গ, তবুও সবাই হাততালি দিচ্ছে। কেউ ভাবছে, সত্যিই হয়তো রাজবস্ত্র অতীব সূক্ষ্ম, তাই চোখে পড়ছে না -

“সবাই দেখছে যে রাজা উলঙ্গ, তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে
সবাই চেঁচিয়ে বলছে; শাবাশ, শাবাশ!

কারও মনে সংস্কার কারও ভয়;
কেউ-বা পরান্নভোজী, কেউ
কৃপাপ্রার্থী,  উমেদার, প্রবঞ্চক;
কেউ ভাবছে, রাজবস্ত্র সত্যিই অতীব সূক্ষ্ম, চোখে
পড়ছে না যদিও,  তবুও আছে,
অন্তত থাকাটা কিছু অসম্ভব নয়।”

এখানে মানুষের ভীরু মনোভাবটিকে প্রতীকায়িত করতে চেয়েছেন কবি।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রধানত জীবনবোধের কবি।দার্শনিকবোধেসমৃদ্ধতাঁর অনবদ্য একটি কবিতা হল,‘কলঘরে চিলের কান্না’।চিল এখানে বাস্তবের প্রতিটি লড়াকু অথচ ভাগ্যহত জীবনেরপ্রতীক। পদমর্যাদায় শীর্ষস্থানে থাকা আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির যখন আকস্মিক পতন ঘটে,  তখন তাঁর প্রতি ঈর্ষাকারী কাপুরুষেরা তাঁকে অপদস্ত করার সুযোগ পেয়ে যায়, তখন সেই ব্যক্তির কাছে মৃত্যুবরণ ছাড়া আর অন্য পথ খোলা থাকে না।সে কারো করুণার পাত্র হয়েও থাকতে চায় না।সেই মুহূর্তে তার প্রতি করুণার প্রদর্শন তার পক্ষে আরও বেশি মর্যাদা-হানীকর।আকাশের সম্রাট চিলেরঠিক সেই দশা হয়েছিল। কবি লিখছেন -

“গগনবিহারী চিল! যারা ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনা,  আর
পারে না বলেই যারা
পৃথিবীর
ভাগাড়ে ও আস্তাকুঁড়ে কাপুরুষমস্তানের মতো
দঙ্গল পাকিয়ে ঘুরে বেড়ায়,  তাদের
হাতে কি কখনও আমিউর্ধ্বচারী মানুষের
লাঞ্ছনা দেখিনি?”

‘অমলকান্তি’ কবিতায় আরো এক আশাহত ব্যক্তির কথা উল্লেখিত আছে। কবির বন্ধু অমলকান্তি। সবাই যখন ডাক্তার, উকিল, মাষ্টার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে, তখন সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।

“ক্ষান্তবর্ষণ কাক-ডাকা বিকেলের সেই লাজুক রোদ্দুর,
জাম আর জামরুলের পাতায়
যা নাকি অল্প একটু হাসির মতন লেগে থাকে।”

(“অমলকান্তি”, ‘অন্ধকার বারান্দা’)

'রোদ্দুর' কথাটির তাৎপর্য এখানে অস্পষ্ট। সবার জীবনে একটা স্বপ্ন থাকে। আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে গেলে একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে এগোতে হয়, আর একটা বাঁধাধরা নিয়ম মেনেই সেই পথ অতিক্রম করতে হয়।তবেই সে সাফল্য অর্জন করতে পারবে।কিন্তু অমলকান্তির স্বপ্নপূরণের পথটি কোনো নির্দিষ্ট নিয়মরেখার ছকে বাঁধা ছিল না। অমলকান্তি নিজেও জানে না সেই পথের সীমারেখা। আর যারা নিয়ম-নীতির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না, তাদের জন্য অবশিষ্ট থাকে অন্ধকার ছাপাখানা। অমলকান্তিররোদ্দুর হওয়ার স্বপ্নটি এখানে অনির্দিষ্ট পথেরনির্দেশক, শৃঙ্খলা – বিচ্ছিন্ন।ফলে তার বাস্তবায়নঅসম্ভব। অতএব, একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, তাঁর কবিতার চিত্রকল্পগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর সমকালীন সময় ও সমাজের স্বরূপটি খুব সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে উঠেছে।

অতএব বোঝাই গেল চিত্রকল্পের অভিঘাত কেবল ইন্দ্রিয় - কেন্দ্রিক হয় না।তা ব্যাপকঅর্থে ইন্দ্রিয়াতীত ব্যঞ্জনাকে বহন করে জগৎ ও জীবনের বিচিত্র রূপের পরিচয় দেয়।এজরা পাউন্ড – এর একটি উক্তি মনে পড়ে যাচ্ছে,"An image that which presents an intellectual and emotional complex in an instant oftime."[৭]চিত্রকল্পই কবিকে নিত্য নতুন সৃষ্টিতে নিত্য নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে। এ বিষয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এক অভিনব দৃষ্টান্ত গড়েছেন বাংলা কবিতার জগতে।

**তথ্যসূত্র:**


১. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার,'সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ–রীতি', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং,২০১৮, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩, পৃঃ৭৪

২. M.H.Abrams, 'A Glossary of Literary Terms', Cengage Learning India Private Limited, Delhi, 2017,Page - 172

৩. M.H.Abrams, 'A Glossary of Literary Terms', Cengage Learning India Private Limited, Delhi, 2017, Page - 174

৪. বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৫৯, পৃঃ ৩৬

৫. বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৫৯, পৃঃ ৩১

৬. "চোরাবালি", 'কুলায় ও কালপুরুষ', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃঃ ২৯১

৭. Ezra Pound, 'A FEW DON'TS BY AN IMAGISTE', Poetry, 1913, Page – 200

**গ্রন্থপঞ্জি**

১. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার,'সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ–রীতি', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং,২০১৮, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩,

২. M.H.Abrams, 'A Glossary of Literary Terms', Cengage Learning India Private Limited, Delhi, 2017

৩. বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৫৯

৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০

৫. Ezra Pound, "A FEW DON'TS BY AN IMAGISTE", Poetry, 1913

৬. দীপ্তি ত্রিপাঠী, 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২০, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮

৭. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১১

৮. সুমিতা চক্রবর্তী, 'আধুনিক কবিতারচালচিত্র', সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০১৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪

# বেগম রোকেয়া : সাহিত্যে ও নারীমুক্তির ইতিহাসে এক বীরাঙ্গনা নারী

ইরাবতী মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, দমদম মতিঝিল কলেজ

"যদি বলি, আমরা দুর্বলভূজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী,সে দোষ কাহার?আমাদের।আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীন তেজো হইয়াছে।এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তিকে সতেজ করিব।যে বাহুলতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিব।এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি তো এ dull head সুতীক্ষ্ণ হয় কিনা।"

----বাংলা ১৩১০সালে 'মহিলা' পত্রিকায় লিখেছিলেন মিসেস আর,এস হোসেন।এভাবেই নিজের নাম স্বাক্ষর করতেন রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন।বাঙালী সমাজ তাঁকে মহীয়সী, প্রাতঃ স্মরণীয় ইত্যাদি রকমারি বিশেষণে বিভূষিত করে তাকে সযত্নে মনের কুলুঙ্গিতে তুলে রেখেছে।কারণ রোকেয়া যা করেছেন, যেভাবে করেছেন, বাঙালী সচরাচর তা করে না,সেভাবে করে না।রোকেয়া গড়পড়তা বাঙালী নন। রোকেয়া এমনকি গড়পড়তা বাঙালি নারীবাদীও নন।বাঙালি নারীবাদীরা সাধারণত নারীর স্বাধীনতার দাবিতে কোটি কোটি শব্দ খরচ করেন,কিন্তু দু-এক আনাও পরিশ্রম করেন না।তাঁদের ঐ কোটি কোটি শব্দের বেশিরভাগই খরচ হয় পুরুষের অন্যায় অবিচারের নিন্দায়,আর নারীজাতির দুর্ভাগ্য কীর্তনে।বেগম রোকেয়া পুরুষ তন্ত্রের অন্যায়ের সমালোচনায় কম সরব ছিলেন না।একশো বছর আগে পিতৃতন্ত্রের অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর দৃপ্ত লড়াই আজো স্তম্ভিত করে দেয়।কিন্তু কান্না-কাটি আর নিন্দা মন্দ করে সময় নষ্ট করার মানসিকতা তাঁর ছিল না।তাঁর যুদ্ধের প্রথম শর্তই ছিল কাজ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মেয়েদের নিজের অধিকার আদায় করে নেওয়া যায় একমাত্র কাজ দিয়েই।তাঁর সাফ কথা,--"পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়,তাহাই করিব,যদি স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়,তবে তাই করিব। আমরা লেডি কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি মেজিস্ট্রেট, লেডি ব্যরিস্টার, লেডি জজ সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডি ভাইসরয় দেখিয়া পুরুষের চক্ষে ধাঁধাঁ লাগিবে।"--স্বপ্ন?কল্পনা?রোকেয়া তা মনে করেন না।কিন্তু যদি আপনি তাঁর কথা না

মানেন, বলেন 'আকাশ কুসুম', তিনি তর্ক করবেন না,বলবেন --"আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি,তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব।"এমন আশ্চর্য লাইন বাংলায় খুব কম লেখা হয়েছে।

বেগম রোকেয়া নিজের জীবন থেকেই বুঝেছিলেন যে নারীমুক্তির একমাত্র উপায় হলো শিক্ষা।শিক্ষিত হলেই মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে,ঘরে ও বাইরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করতে পারবে।সুতরাং মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে হবে।আর এই কাজেই তিনি গোটা জীবনটা উৎসর্গ করেছিলেন। রোকেয়া নিজে কখনো স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করতে পারেন নি।বনেদি মুসলমান পরিবারের কন্যা পাঁচ বছর বয়স থেকেই পর্দা প্রথার শিকার।পুরুষ তখন অন্তঃপুরে ঢুকতো না,কিন্তু পড়শী অনাত্মীয় মেয়েদের সামনেও বেরোনো নিষেধ ছিল সেই শিশুকাল থেকেই।নিজের চেষ্টায় আর আগ্রহে লেখাপড়া শিখেছিলেন।শৈশবে সাহায্য পেয়েছিলেন অগ্রজের,বিয়ের পর স্বামী খান বাহাদুর সৈয়দ শাখাওয়াত হোসেনের।স্বামীর সহযোগিতাতেই অনেক বাঁধা নিষেধ পেরিয়ে তিনি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন 'শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'(১৯১১)।অনেক বাঁধাবিপত্তি,বারবার স্কুল বাড়ি এই ঠিকানা থেকে সেই ঠিকানায়, কিন্তু রোকেয়া অদম্য।সেই সঙ্গে চলতে থাকলো সাহিত্য সাধনার কাজ। রোকেয়ার লেখাগুলি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে বোঝা যায়, নারী সমাজের ভিতরকার অন্ধকার ঘোচানোর জন্য যে অন্যতম হাতিয়ার বর্ণমালা, সেকথা কেবল মেয়েদের নয়,মেয়েদের অভিভাবক-পুরুষদের ও তিনি বোঝাতে চেয়েছেন।একটি মেয়ে নিরক্ষর থাকলে ,অনালোকিত থাকলে সে যে ভালো মা বা স্ত্রী হতে পারে না,একথা রোকেয়ার লেখায় বার বার এসেছে।মেয়েদের এইভাবে ভালো মা বা স্ত্রী হিসাবে দেখার জন্য রোকেয়া সেকালে সমালোচিত হয়েছেন, একালেও তার এই দৃষ্টিকে নারীবাদী বলা যায়না নিশ্চয়ই।কিন্তু তাঁর কাছে নারীমুক্তি কোনো তাত্ত্বিক ব্যাপার ছিল না।সমাজের বাস্তব অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে কীভাবে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, সেটাই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান।সেই বাস্তব সত্যকে নস্যাৎ করে মেয়েদের সমান অধিকারের বৈপ্লবিক স্লোগান তুলে নিজেকে আগুনখোর নারীবাদীর তকমায় ভূষিত করতে পারতেন তিনি, কিন্তু তাতে স্ত্রী শিক্ষা এগোত না।

এই কথা খাটে বোরখা সম্পর্কে তাঁর অবস্থান নিয়েও।। 'অবরোধ বাসিনী'র লেখক১৩১১বঙ্গাব্দে 'নবনূর' এ একটি লেখায় লিখেছিলেন--"পর্দা কিন্তু শিক্ষার পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়ায় নাই।এখন আমাদের শিক্ষয়িত্রীর অভাব আছে। এই অভাবটি পূরণ

হইলে এক স্বতন্ত্র স্কুল কলেজ হইলে যথাবিধি পর্দা রক্ষা করিয়াও উচ্চশিক্ষা লাভ হইতে পারে। প্রয়োজনীয় পর্দা কম করিয়া কোন মুসলমান ই বোধহয় শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন না।"স্পষ্ট, সহজ বাস্তববোধ ।

ঊনিশ শতকের মুসলিম নারীসমাজ এবং বিশ শতকের আধুনিক শিক্ষার আলোকচ্ছটায় দীপ্ত মুসলিম নারীসমাজের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য। রোকেয়ার জন্ম সে এক অন্ধকার যুগে।নারী তখন গৃহ প্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধা।মুসলিম সমাজে সে সময়ে ছিল নানাবিধ কুসংস্কার, অশিক্ষা, অজ্ঞানতা ও কূপমণ্ডুকতার অপ্রতিহত প্রভাব।পর্দাপ্রথার নামে ছিল কঠোর অবরোধ প্রথা।কেবল পুরুষ মানুষ নয়,মেয়ে মানুষের সামনেও পর্দার অন্তরাল ছিল।বেগম রোকেয়ার ভাষায়--"---গোটা ভারতবর্ষে কুলবালাদের অবরোধ কেবল পুরুষদের বিরুদ্ধে নহে,মেয়ে মানুষের বিরুদ্ধেও।অবিবাহিতা বালিকাদিগকে অতি ঘনিষ্ট আত্মীয় এবং বাড়ির চাকরানী ব্যাতিত অপর কোন স্ত্রী লোক দেখিতে পায় না।"

কঠোর অবরোধ থাকার জন্য শুধু শিক্ষা থেকেই নয়, জীবনের বহু বিচিত্র দিক যেমন স্বাস্থ এবং মনের প্রফুল্লতা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশ থেকেও মুসলিম মেয়েরা ছিল বঞ্চিত।নারী ছিল সমাজের বোঝা স্বরূপ,বেগম রোকেয়ার ভাষায় "Human luggage বা মানববোঝা।"

অবরোধ প্রথার বিভীষিকা এবং অবরোধ বাসিনীদের দুর্দশা ও দুরবস্থা সম্পর্কে নানা লোমহর্ষক কাহিনী রোকেয়ার "অবরোধ বাসিনী"গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।সেগুলো মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে বোঝা যায় শতসহস্র অবরোধ বন্দিনীর মর্মবেদনা তিনি স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন।এই বীরাঙ্গনা তাঁর এক ভাষণে বলেছেন--"অবরোধ প্রথাকে একমাত্র প্রাণঘাতক কার্বলিক এসিড গ্যাসের সঙ্গে তুলনা করা যায়।যেহেতু তাহাতে বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্বলিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবসর পায়না।অন্তঃপুর বাসিনী নারী এই অবরোধ গ্যাসে বিনা ক্লেশে তিল তিল করিয়া নীরবে মরিতেছে।" অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে কেবল উচ্চকণ্ঠই ছিলেন না,তিনি এজন্য ছিলেন ব্যথিত।অবরোধ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তাঁর খেদোক্তি--"কেন আসিলাম, হায় !এ পোড়া সংসারে /কেন জন্ম লভিলাম পর্দানশীন ঘরে।"এত যন্ত্রণা সহ্য করেও আজীবন তিনি গভীর ভাবে পর্দা মেনে চলেছেন কেবলমাত্র নারী মুক্তির বাসনায়।নিজের স্কুলটিকে রক্ষাকরার জন্য, সরকারি করার জন্য ,উচ্চপদে অধিষ্ঠিত নিজের ভাগনে স্যার আব্দুল করিম গজনভীকে কথা

দিয়েছিলেন যে আজীবন পর্দা মেনে চলবেন।কি মর্মান্তিক! হয়ত তাঁর অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলো,কিন্তু বিদ্রোহী আত্মাকে হয়ত তিনি বলেছিলেন --"থামরে তুই থাম,আমাকে যেতে দে আলোর রাজ্য হতে সরে ,তবু স্কুলটা বেঁচে থাক।স্কুল বাঁচলে ওর থেকে হাজার হাজার মুক্ত বুদ্ধি নারী বেরিয়ে যখন আলো ঝলমল আকাশের তলে দাঁড়াবে তখন কেউ তাদের অবরোধের আড়ালে যাবার কথা বলতে সাহস পাবে না"-- কি আশ্চর্য নারী!এটাই ছিল মহান এই নারীর সাধনা।

বেগম রোকেয়া সৃষ্ট সাহিত্য হয়তো পরিমাপে বিরাট কিছু নয়,কিন্তু তা বৈচিত্র্যপূর্ণ । তাঁর গ্রন্থ গুলির মধ্যে 'মতিচূর(১ম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড),sultana's Dream(সুলতানার স্বপ্ন), 'পদ্মরাগ'ও 'অবরোধ বাসিনী' উল্লেখযোগ্য।এছাড়া আছে অনেক কবিতা ও ব্যঙ্গধর্মী রচনা। তাঁর সাহিত্য সাধনার ভিত্তিই ছিলো নারীমুক্তি।তিনি যা কিছু করেছেন যা কিছু লিখেছেন কেবল এই কারণেই।তিনি যে মুসলিম নারী সমাজকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে চেয়েছিলেন--সাহিত্য চর্চার মাধ্যমেই তার প্রতিফলন ঘটেছে।কৈশোরে তাঁর অন্তরে সাহিত্যের প্রতি যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল ক্রমে তা বিরাট মহীরুহের আকার ধারণ করেছিল।বিচিত্র প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার উন্মেষ ঘটে।বাংলা ভাষা শিক্ষা যে পরিবারে নিষিদ্ধ ছিল, সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ রোকেয়া শুধু বাংলাকে মাতৃভাষা রূপেই নয় ,সেই মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন পরিপূর্ণ ভাবে।তাঁর সাহিত্য সাধনার স্বরূপ অনুধাবন করলে দেখা যায় --নারী সমাজের পশ্চাদপদতা, অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, কূপমণ্ডুকতা ,গোঁড়ামি, কুসংস্কার, অবরোধ প্রথার প্রতি অসহায় আত্মসমর্পণ তাঁর অন্তর মথিত করেছিল।নারীত্বের লাঞ্ছনা, অবমাননা, নারীজীবনের মর্মন্তুদ ব্যথা তাঁর হৃদয়কে করেছিল আলোড়িত, মনকে করেছিল বিদ্রোহী।আর নারী সমাজের এই পঙ্কিল গ্লানিময় চিত্র শিক্ষিত পুরুষ সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই বীরাঙ্গনা এই নারী কলম ধরেছিলেন।নারী কল্যাণ আর নারী মানসিক মুক্তি ছাড়া সাহিত্য চর্চার অন্য কোনো উদ্দেশ্যই তাঁর ছিল না।

সমাজের কল্যাণ ও নারী জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে যুগে একমাত্র বেগম রোকেয়াই লেখনী ধারণ করেছিলেন।সেকালে বাংলার মুসলমান সমাজে এমন কোন সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে নি,যার লেখনীর প্রভাবে বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক জীবনে কোন বড় রকমের পরিবর্তন সাধিত হতে পারে ।সেদিক থেকে বেগম রোকেয়ার সাহিত্য সাধনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক ঘটনা।অবরোধ প্রথার

বিভীষিকা, পর্দার নামে অমানবিক অবরোধ প্রথা ,স্ত্রী শিক্ষা বিরোধী মনোভাব এবং সমস্ত প্রকার সামাজিক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এই বীরাঙ্গনা মসী ধারণ করে আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।সমাজ জীবনে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অত্যন্ত শুভ।আজীবন তাঁর সংগ্রাম ছিল শুধুমাত্র নারীমুক্তির আশায়।তাঁর সাহিত্য রীতিও সেই সাধনার ফল।তাঁর শক্তিশালী লেখনীই যে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে অগ্রগতির পথে যাত্রারম্ভ করেছিলো --তা অনস্বীকার্য।তাই আক্ষরিক অর্থেই তিনি এক বীরাঙ্গনা নারী।

**তথ্যসূত্র:**

১. সুতপা ভট্টাচার্য--মেয়েলি কণ্ঠ

২. গোলাম হোসেন--রাম সুন্দরী থেকে রোকেয়া, নারী প্রগতির ১০০ বছর, বাংলা একাদেমী।

৩. সমুদ্ধ চক্রবর্তী--অন্দরে অন্তরে

৪. বেগম রোকেয়া--বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি

৫. ভারতী রায়--সেকালের নারীশিক্ষা, বামাবোধিনী পত্রিকা ১২৭০--১৩২৯

# চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর অভিনবত্ব

কৈলাশপতি সাহা
সহঅধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রামানন্দ সেন্টেনারি কলেজ, পুরুলিয়া

শুধুমাত্র মঙ্গলকাব্যের ধারায় নয়, সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট কাব্য হল মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল'। কালের কষ্টি পাথরে যার মূল্য যাচাই হয়ে আজ এসে পৌঁছেছে আমাদের কালে। দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যকথা নিয়ে মধ্যযুগে আরও অনেক কাব্য লেখা হয়েছিল, কিন্তু শিল্পগুণে সেগুলি কবিকঙ্কন চণ্ডীর সমকক্ষ নয়। মুকুন্দের উপলক্ষ চণ্ডী—এখানে তিনি মধ্যযুগের মঙ্গলকবি, কিন্তু লক্ষ্য হল সজীব মানুষ—এখানেই তাঁর আধুনিকতা বা অভিনবত্ব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিকতার খোঁজ পেয়েছিলেন পাঁজি মিলিয়ে নয়, মর্জি মিলিয়ে। অর্থাৎ মনের ও ভাবনার প্রগতিশীলতা বা নতুনত্বই হল আধুনিকতা। মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে রয়েছে যুগোত্তীর্ণ উপাদান, যার জন্য সমকালে অভিনব এবং আজও সেই কাব্য ফসিল হয়ে যায়নি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'অভয়ামঙ্গল'এর মধ্যে দেখেছেন উপন্যাসের লক্ষণ।

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটির আধার তৈরি হয়েছে দেবী চণ্ডীকে ঘিরে, আর আধেয় হল সজীব মানুষ। এর বাইরের আবরণ ধর্মের, আর ভিতরের প্রবাহ হল জীবনরসের। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটির আকর্ষণ বাঙালি জীবনরসের জন্য—এখানে মধ্যযুগের কবি হয়েও মুকুন্দ চক্রবর্তী অভিনব। জীবনকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা, জীবনের উষ্ণতাকে উপলব্ধি করা, রূঢ় বাস্তবতার স্বরূপ উদঘাটনের মধ্যে নিহিত রয়েছে মুকুন্দ চক্রবর্তীর অভিনবত্ব। মুকুন্দ চক্রবর্তী রোমান্টিক কবি নন, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রোমান্সের স্থান নেই। অথচ সুযোগ ছিল। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দেবখণ্ড ও নরখণ্ড জুড়ে চার জোড়া নায়ক-নায়িকা। দেবখণ্ডে হর-পার্বতী, নরখণ্ডের অন্তর্গত আখেটিক খণ্ডে কালকেতু-ফুল্লরা এবং বনিক খণ্ডে ধনপতি-খুল্লনা ও শ্রীমন্ত-সুশীলা। কবি এদের নিয়ে পূর্বরাগের কোনো চিত্র আঁকেননি। অথচ কবির সামনে ছিল পূর্বরাগের অপূর্ব ঐতিহ্য বৈষ্ণব পদাবলী। মুকুন্দ চক্রবর্তী নিজেও ছিলেন বৈষ্ণব। তিনি তাঁর আত্মবিবরণীতে জানিয়েছেন তাঁর পিতামহ জগন্নাথ বৈষ্ণব ছিলেন—"কয়াড়ি অনুজ জাত মহামিশ্র জগন্নাথ/ একভাবে পূজিল গোপাল।/ বিনয়ে মাগিয়া বর জপি মন্ত্র দশাক্ষর/ মীন মাংস ত্যাজি বহুকাল।" কিন্তু তিনি সেই রোমান্টিক ঐতিহ্য অস্বীকার করে ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে নেমে এসেছেন সংসার জীবনের কঠোর বাস্তবতায়। তাই তাঁর কাব্যের বিষয় উপস্থাপন

গদ্যধর্মী, কাব্যধর্মী নয়। তিনি জীবনের কেজো দিকটির প্রতি লক্ষ রেখেছেন, জীবনকে নিয়ে স্বপ্নের মায়াজাল বিস্তার করেননি। তাই 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে জীবন নিয়ে কোনো রোমান্টিকতা বা দার্শনিকতা নেই। মধ্যযুগের কাব্যরীতির রোমান্টিক পরিমণ্ডলে মুকুন্দ চক্রবর্তী বাস্তবরীতির গদ্যাত্মক উপমান নির্মাণ করে নতুন দিক উন্মোচন করেছেন। কালকেতু ও ফুল্লরার মিলন দৃশ্যে কবি রোমান্টিকতাকে পরিহার করে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন বর-কনের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—"সেই বর জুগ্যা কন্যা তোমার ফুল্লরা/ খুঁজিয়া পাইল জেন হাঁড়ির মুখে সরা।" এমন বস্তুনিষ্ঠ উপমান ব্যবহারে মুকুন্দ চক্রবর্তী ছিলেন অভিনব।

সামাজিক সমস্যার রূপায়ণে মুকুন্দ চক্রবর্তীর দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব লক্ষ করি। সতীন সমস্যা মধ্যযুগের বাংলাদেশের একটি সামাজিক সমস্যা। মুকুন্দ চক্রবর্তী 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের তিনটি খণ্ডেই এই সমস্যাকে রূপদানের চেষ্টা করেছেন। সতীন সম্পর্কে সেকালের নারী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল তা মুকুন্দের বর্ণনায় ধরা পড়েছে। সতীন হল সংসারের জ্বালা। সতীনের আশঙ্কায় ফুল্লরা যখন গোলাঘাটে গিয়ে কালকেতুকে ক্রন্দনরতা অবস্থায় অভিযোগ করেছে তখন কালকেতু প্রথমেই প্রশ্ন করেছে—"সাসুড়ি ননদি নাঞি নাঞি তোর সতা/ কা সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলে রাতা।" সতীন মানেই সাংসারিক কোন্দল। বণিক খণ্ডে দুবলা লহনাকে শিক্ষা দিয়েছে— "সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে/ অবশেষে তাই তোমা বধিব পরাণে।" বণিক খণ্ডের কাহিনি দাঁড়িয়ে আছে এই সতীন সমস্যার উপর। গল্পের নায়ক ধনপতি। তার প্রথমা স্ত্রী লহনা। একদিন পায়রা ওড়াতে ওড়াতে সে ইছানি নগরে চলে আসে। সেখানে দেখা হয় রূপসী খুল্লনার সঙ্গে। তাকে বিবাহ করতে মনস্থ করে। বিবাহের প্রস্তাবে খুল্লনার পিতা লক্ষপতি রাজী হয়ে গেলেও বাধ সাধল খুল্লনার মা রম্ভাবতী। সতীনের ঘরে সে মেয়েকে দেবে না। তাই স্বামীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। রম্ভাবতীর এই প্রতিবাদ যেন কোনো আধুনিক নারীকে স্মরণ করায়। আধুনিক যুগে বিধবাদের নিয়ে যেমন 'বিষবৃক্ষ', 'চোখের বালি' উপন্যাসে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তেমনি মধ্যযুগে সমস্যা জর্জরিত চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সতীন সমস্যাকে কেন্দ্র করে।

সতীন সমস্যাকে কেন্দ্র করে নারীর যৌবনের উপমা ও নারী চরিত্রের বুদ্ধিমত্তা মুকুন্দ চক্রবর্তীর আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দেয়। খুল্লনার রূপ ও যৌবন দেখে লহনা ঈর্ষান্বিত। সে খুল্লনার মতো সুন্দরী নয়, তার যৌবন বিগতপ্রায়। এই প্রসঙ্গে

মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন—“নারীর যৌবন কেবল অধম/ যেমন জলের ফোঁটা।” এখানে যৌবনের সঙ্গে জলের ফোঁটার তুলনা লক্ষনীয়। প্রভাতে সবুজ ঘাসের উপর জলবিন্দুর নিটোল সৌন্দর্যের মতো নারীর পূর্ণ যৌবনও সুন্দর। আবার প্রভাতের জলবিন্দু যেমন ক্ষণস্থায়ী, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা যেমন বাষ্পীভূত হয়ে যায়; তেমনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীর যৌবনও চলে যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তীর এই কাব্যিক উপমা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের স্মরণ করায়। সতীন নির্যাতনের শিকার হয়ে খুল্লনা অরণ্য জীবন থেকে নিজগৃহে ফিরে এসে বনিক সমাজের কাছে তাকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে সতীত্বের। খুল্লনা সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বনিক সমাজ সন্তুষ্ট হয়নি। তাদের কাছে সতীত্বের পরীক্ষার দরকার নেই, লাখ টাকা পেলে তারা খুল্লনাকে সতী বলে ঘোষণা করে দেবে—“উচিত কহিব তাহে কিবা আছে শঙ্কা/ পরীক্ষা না হৈলে দিবে এক লক্ষ তঙ্কা।” এই বিষয়ে ধনপতি খুল্লনার কাছে পরামর্শ চেয়েছে। বনিকদের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে বুদ্ধিমতী খুল্লনা জানিয়েছে—“অবোধ পরাণনাথ বলিছে তোমারে/ আজি ধন দিলে দিবে বৎসরে বৎসরে।” ধনপতির এই পরামর্শ গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্ত্রীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আধুনিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। খুল্লনা বুঝেছিল বনিক সমাজ সতীত্বের নামে ধনপতিকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়। একবার টাকা দিলে তারা প্রতিবছর ধনপতির কাছে আসবে এবং সতীত্বের ভয় দেখিয়ে টাকা লুটবে। তাই ধনপতিকে লক্ষ টাকা দিতে বারণ করেছে। চরিত্রটি এখানে জীবন্ত এবং অভিনব। তার চিন্তাভাবনা, কার্যধারা সবটাই যুক্তিযুক্ত—অনেকটা উপন্যাসের রাউন্ড ক্যারেকটারের মতো।

রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার তির্যক বাণে বিদ্ধ হয়েছিল মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘অভয়ামঙ্গল। তাঁর সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ফুল্লরার বারমাস্যা। রবীন্দ্রনাথ ফুল্লরার বারমাস্যায় আমানি খাবার গর্তটুকু দেখেছেন, তাতে কবিত্বশক্তির পরিচয় পাননি। কিন্তু ফুল্লরার বারমাস্যা অংশটির নিবিড় পাঠে দেখা যায় এটি নিছক মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত রীতির বর্ণনা নয়—এটির একদিকে রয়েছে প্রকৃতি বর্ণনা, অন্যদিকে সামাজিক রীতিনীতির সামান্য আলেখ্য, সর্বোপরি ফুল্লরা চরিত্রের অন্তঃপ্রকৃতির উদঘাটন। ফুল্লরা নিজের জীবনের বাৎসরিক দুঃখ প্রকাশ করেছে এক সুন্দরী নারীর কাছে—যখন দেবী চণ্ডী প্রকাশিত নয়। স্বামী প্রেমে যে নারী ভাগ বসাতে এসেছে তার প্রতি বিদ্বেষ, ঈর্ষা বা অসূয়া প্রসূত জীবন যন্ত্রণা হল এই বারমাস্যা। এখানে একটি ছত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়—ভাদ্র মাসে জল ও রোদে ফুল্লরার কষ্টের সীমা

নেই। প্রচণ্ড রৌদ্র কিরণে সে বলেছে –"অনলে পোড়ে এ অঙ্গ ভিতরে বাহিরে"। আমরা রোদে ঘুরলে বাইরেরটা পুড়তে পারে, কিন্তু ভিতর পোড়ে কার? রোদে ভিতর পোড়ে না, পোড়ে অন্য জ্বালায়। রোদের জ্বালায় পুড়েছে বাইরের অঙ্গ, আর মনের জ্বালায় পুড়েছে ভিতর—"কত নিবেদিব দুঃখ কত নিবেদিব দুঃখ/ বিপথি হইল স্বামী বিমাতা বিমুখ"। এইভাবে ফুল্লরা চরিত্রের অন্তঃপ্রকৃতি উদঘাটনে মুকুন্দ চক্রবর্তী অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

মুকুন্দ চক্রবর্তী বস্তুনিষ্ঠ কবি। বস্তুরসের ভিতর তিনি কোনো কোনো জায়গায় অভিনবত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রটির অবতারণা করা যেতে পারে। ভাঁড়ুর অত্যাচারে কালকেতুর প্রজাকুল অস্থির। তারা সকলে মিলে ভাঁড়ুর নামে কালকেতুর কাছে অভিযোগ জানায়। কালকেতু ভাঁড়ুকে শাসন করলে ভাঁড়ুও ছাড়বার পাত্র নয়। সে আস্ফালন করে বলে ওঠে—"হরিদত্তের বেটা হঙ জয়দত্তের নাতি/ হাটে যদি বেচাঙ বীরের ঘোরা হাতি। তবে সুভাসিত করঙ গুজরাট ধরা/ পুনর্বার হাটে মাস বেচাঙ ফুল্লরা।" ভাঁড়ু দত্ত আস্ফালন করে চলেছিল কালকেতুর শত্রু কলিঙ্গরাজের কাছে। রাজার কাছে যাওয়ার সময় ভেট হিসেবে সঙ্গে নিয়েছিল কাঁচকলা, পুঁইশাক ও কদলীর মোচা। এই সমস্ত উপকরণগুলির বর্ণনায় মুকুন্দ চক্রবর্তী কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ছবি এঁকেছেন। আত্মমর্যাদা সচেতন ভাঁড়ু এই সমস্ত কিছুকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভাই শিবা দত্তকে সঙ্গে নিয়েছে বিবাহের লোভ দেখিয়ে। কারণ—" ভাঁড়ুদত্তের ছোট ভাই নাম তার শিবা/ পঞ্চাশ বৎসরে তার নাহি হয় বিভা।/ সাম্য বাক্যে ছোট ভাইয়ের নিবারিল ক্রোধ/ বিভা নাহি হয় তার দুই পায়ে গোদ।/ ভাঁড়ু দত্ত বলে ভাই দড় কর হিয়া/ এবার মণ্ডলি পাইলে আগে তোমার বিভা।"—এখানেই ভাঁড়ু চরিত্রের অভিনবত্ব। ভাঁড়ু বুঝেছিল এ ভাই সহজে কাঁচকলা বয়ে নিয়ে যাবে না। তাকে লোভ দেখাতে হবে। ভাঁড়ু দত্ত জানত তার ভাইয়ের বিবাহের প্রতি লোভ রয়েছে। কারণ যে ব্যক্তির বয়স পঞ্চাশ অতিক্রান্ত এবং পায়ে গোদ তাকে যে কোনো মেয়েই পছন্দ করবে না। ভাঁড়ু দত্ত ভাই এর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে এবং তার ভাইকে এক্সপ্লয়েট করেছে। এখানে ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রটি আধুনিক। আমরা চরিত্রটির মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের বেনী ঘোষালের পূর্বসূরিকে খুঁজে পায়।

মুকুন্দের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যের একদিকে রয়েছে বঙ্গ প্রকৃতির নানা পরিচয়, অন্যদিকে রয়েছে বঙ্গ রমণীর সংসার চিত্র। আমাদের স্মরণে থাকবে কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'এ বাঙালিয়ানা আছে, কিন্তু তা সামান্য। আবার কৃত্তিবাসে রামকে ছাড়িয়ে নারী

প্রাধান্য পায়নি। সমালোচক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মনে করেন এর কারণ হল কৃত্তিবাসের বাল্মীকিকে অনুসরণ এবং সংস্কৃত ঐতিহ্যকে কাব্যে গ্রহণ করা। সেই অর্থে মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে রয়েছে বঙ্গ ভূমির প্রতি টান। তাঁর কাব্যে রয়েছে বাংলার বিচিত্র গাছপালা, ফলমূল, পুষ্পরাজি, নদ-নদী, পশুপাখি, গ্রাম-শহর, বাঙালির নামাবলী, বাঙালি মুসলমানের নানা পরিচয়, জাতপাত, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ড, শাপ-শাপান্ত, সমাজের ভালো লোক-মন্দ লোক, নারী নাম, সাধ, বিবাহ, প্রভৃতি নানা উপকরণ, শিশু নাম, ছেলে ভুলানো ছড়া, আহারাদি, সাজ-পোশাক ইত্যাদি। মুকুন্দ চক্রবর্তীর আগে ও পরে বাংলাকে এমন নিবিড়ভাবে খুব কম লেখকই দেখেছেন। মুকুন্দের কাব্যে বাঙালি সংসারের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নারী। ভালোবাসাতে নারী, কোন্দলে নারী, রন্ধনে নারী, পরামর্শে নারী। এই নারী প্রাধান্য বাংলা সাহিত্যে পূর্বাপর আছে—কিন্তু বাংলা সাহিত্য, সমাজ, সংসারে নারী প্রাধান্য মুকুন্দ চক্রবর্তীর সময় থেকেই।

আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ ফসল হল উপন্যাস। উপন্যাসের প্রাথমিক শর্ত হল—কাহিনি ও গদ্য। চণ্ডীমঙ্গল এর সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনিগত মিল লক্ষ করা যায়। উপন্যাস মানে হল গল্প, আর সেই গল্পকে বয়ে নিয়ে যায় চরিত্র। চণ্ডীমঙ্গল-এ নামকরণের দিকে তাকালে মনে হয় চণ্ডীর গল্প—অর্থাৎ দেবতার গল্প। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলে দেবতা গৌণ, মানুষ মুখ্য। মানুষ মুখ্য হলে গল্পও হবে মানুষকে নিয়ে। আর উপন্যাস হল মানুষের সুখ, দুঃখ, মিলন, বিরহ নিয়ে গড়ে ওঠা গল্প। তাই চণ্ডীমঙ্গলকে উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত বলা যেতেই পারে।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' তিনটি খণ্ডে বিভক্ত—দেবখণ্ড, আখেটিক খণ্ড, বণিক খণ্ড। এই তিনটি খণ্ডের কাহিনি এক নয়, আবার চরিত্রও এক নয়। কিন্তু একটি সূক্ষ্ম কাহিনি তিনটি খণ্ডেই বিস্তৃত—তা হল নারীর বেদনা। এই বেদনার কাহিনি হল—দেবখণ্ডে পার্বতী, আখেটিক খণ্ডে ফুল্লরা, বণিক খণ্ডে খুল্লনার। এই অন্তঃসলিলা কাহিনি মূল গল্পটিকে ধরে রেখেছে। সমালোচক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, "মুকুন্দ গ্রন্থের নাম নারীমঙ্গল দিলেই উপন্যাস হয়ে যেত। চণ্ডীমঙ্গল হওয়ায় পুরনো কালেই রাখতে হচ্ছে।" (কবিকঙ্কন মুকুন্দের 'আধুনিকতা' উপন্যাসের সম্ভাবনা, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য, বুকস ওয়ে, সম্পাদনা- বাসুদেব মোশেল, পৃ- ২০১)

বাস্তবতা হল উপন্যাসের সম্পদ। এই বাস্তবতা নির্মিত হয় জীবন নিয়ে, কাল নিয়ে। জীবনকে হতে হয় স্থান কাল সাপেক্ষ। এই স্থান কালই হল জীবনের স্বপ্ন,

জীবনের সংঘাত, জীবনের ভাঙা গড়ার লীলা। সব নিয়ে জীবনরস হল বাস্তব। চণ্ডীমঙ্গলে এই জীবনরসের অভাব নেই। এই জীবন একান্তভাবে বাঙালি জীবন। পুরানো কালের হয়েও একালের। দেবখণ্ডে দরিদ্র আহারপ্রিয় মহাদেব যখন দশ ব্যঞ্জনের পরিবর্তে স্ত্রীর গঞ্জনা লাভ করে গৃহত্যাগের জন্য আস্ফালন করেন, তখন কোনো এক দরিদ্র মহাদেব ভট্টাচার্য তাঁর বিড়ম্বিত জীবন নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান। কিংবা সেকালের বিবাহিত নারীরা যখন তাঁদের দুঃখ বিড়ম্বিত জীবন নিয়ে পতিনিন্দা করেন, তখন সেইসব জীবনের শূন্যতা আমাদের ব্যথিত করে। যেমন নারীগণের পতিনিন্দা অংশে একজন নারী বলেন—"এক আইয় বলে স্বামী বর্জিত দশন/ শাক সুক্তা ঘণ্ট বিনে না করে ভোজন।/ জে দিবস আমি দ্রড় ব্যঞ্জন রাঁধি/ মারএ পিড়ার বাড়ি কোনে বস্যা কান্দি।"

চণ্ডীমঙ্গলে সজীব চরিত্রের অভাব নেই। মুকুন্দ চক্রবর্তী কোনো বড় মাপের চরিত্র আঁকবার চেষ্টা করেননি। রবীন্দ্রনাথের গোরার মতো মহাকাব্যিক চরিত্র কালকেতু বা ধনপতি সদাগর নয়। কোনো চরিত্রের মধ্য দিয়ে আদর্শ প্রচারের চেষ্টা নেই বা কোনো রোমান্টিক নায়ক-নায়িকা নেই। তিনি সাদামাটা বাঙালির চিত্র এঁকেছেন। চরিত্রগুলি তাঁর অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডল থেকে উঠে এসেছে। এদিক থেকে তিনি একজন ঔপন্যাসিকের মতো বস্তুনিষ্ঠতা দেখিয়েছেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালি চরিত্র অঙ্কনে মুকুন্দ চক্রবর্তী কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। যেমন মুরারি শীল চরিত্র। কালকেতু অঙ্গুরি ভাঙাবার জন্য মুরারি শীলের বাড়ি এসেছে জেনে মুরারি শীল গা ঢাকা দিয়েছে, কেননা মাংসের জন্য ধার রয়েছে বিস্তর। এদিকে কর্তাকে লুকিয়ে রেখে ভালোমানুষ সেজে কালকেতুর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বান্যানী। কবিকঙ্কন দেখিয়েছেন—"বীরের বচন শুনি আসি বলে বান্যানি/ ঘরে নাহি সহর পোতদার/ সকালে তোমার খুড়া গেছেন খাতক পাড়া/ কালি দিব মাংসের ধার।" কালকেতু জানায় সে মাংসের ধার শোধ নিতে আসেনি, একটি আংটি ভাঙাতে খুড়োর কাছে এসেছিল। কিন্তু খুড়োর অনুপস্থিতিতে সে অন্য বাড়িতে যেতে উদ্যত হলে লোভে তার চোখ চকচক করে উঠেছে। মুরারি শীলও গুটি পায়ে গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে। এখানে চরিত্র দুটির সজীবতা প্রমাণিত। মুকুন্দের বাস্তব অভিজ্ঞতা এখানে কাজ করেছে। সামান্য ঘটনায় চরিত্র দুটি হয়ে উঠেছে বাস্তব ও জীবন্ত।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত। উপন্যাসের অবলম্বন হল ভাষা। মুকুন্দের কাব্য পদ্যে লেখা হলেও, সেখানে রয়েছে গদ্যের গন্ধ। রাঢ়ের

জনজীবনের গদ্যকে মুকুন্দ পদ্যের কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর শব্দ চয়ন, উপমান, প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহ এবং বর্ণনা মূলত গদ্যধর্মী। তাঁর ভাষা জীবনাশ্রয়ী। সে ভাষায় কল্পনার রঙ নেই, আছে মাটির গন্ধ। এই ভাষা তাঁর চরিত্রগুলিকে দাঁড় করিয়েছে এবং কাহিনিকে বাস্তবমুখী করেছে—এখানেই মুকুন্দের অভিনবত্ব এবং তিনি যুগোত্তীর্ণ।

কবিকঙ্কন প্রচলিত লোক-ঐতিহ্য থেকে চণ্ডীমঙ্গলের গল্পবীজ সংগ্রহ করলেও তা বপন করেছিলেন বাস্তবের মাটিতে। কবি ছিলেন সেকালের মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। তিনি স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে এই শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখকে চিত্রিত করেছেন তাঁর কাব্যে। আবার অবাস্তব কল্পনায় তাঁর কাহিনি গ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়েছে। ব্যাধের মৃগয়া, যে কোনো যুদ্ধের বর্ণনা, কালকেতুর রাজসিক মূর্তি, চণ্ডীর নানা দেবী প্রসঙ্গ, ধনপতির বাণিজ্য যাত্রা ইত্যাদি অংশগুলি বিচার করলে এর সত্যতা ধরা পড়বে। মানবচরিত্র সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা কবির বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির জনক। কোনো রহস্যময় ধ্যান-ধারণা তাঁকে মিস্টিক করে তোলেনি, কোনো রোমান্টিক কল্পনাদর্শ নিয়ে যায় নি দূর কল্পলোকের সুরমূর্ছনার জগতে, বরং অত্যন্ত বাস্তববাদ তাঁর কবিমানসের ভিত্তিভূমি গঠন করেছিল বলে তিনি আধুনিক উপন্যাস রচনার কাব্যিক সূত্রপাত করে যেতে পেরেছিলেন।

নিরপেক্ষভাবে দেখতে গেলে কবিকঙ্কনের কৃতিত্ব নির্ভর করেছে অলৌকিকতা বর্জিত সাংসারিক বাস্তবতার উপর। তিনি নির্ভেজাল দেবকথায় যেখানে আড়ষ্ট, মানবজীবনের জয়গাথায় সেখানে উচ্ছল, প্রাণবন্ত। দেবী চণ্ডীর সঙ্গে কালকেতুর কথোপকথন পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় ঠেকে এই জন্যে যে, দেবী মানবী রূপ ধারণ করে অলৌকিকতার মধ্যেও একটি বাস্তব পরিমণ্ডল তৈরি করেছেন বলে। আবার কাব্যের প্রধান অপ্রধান সব চরিত্রই এত বেশি জীবন্ত যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে গতানুগতিক আখ্যানের ঘেরাটোপে পুতুলখেলায় পর্যবসিত হতে দেয়নি। আসলে তাঁর মন ও মেজাজ ছুঁয়ে ছিল সমকালের মাটি, তাই কাব্য রচনা করতে গিয়ে আজগুবি কল্পনার কাছে হাত পেতে গ্রহণ করতে হয়নি বাস্তবতার ঋণ। এটি তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের অচ্ছেদ্য অংশ ছিল বলে 'রিয়্যালিটির কারি পাউডার' বলে কোনো সমালোচক এর গুরুত্ব হ্রাস করতে পারেন না।

কবিকঙ্কনের কৃতিত্ব নির্ভর করেছে অলৌকিকতা বর্জিত সাংসারিক বাস্তবতায়। তিনি নির্ভেজাল দেবকথায় যেখানে আড়ষ্ট, মানবজীবনের জয়গাথায় সেখানে উচ্ছল প্রাণবন্ত। এমনকি দেবদেবীর মানবায়নে তিনি যেন বেশি করে স্বাচ্ছন্দ খুঁজে পান।

দেবী চণ্ডীর সঙ্গে কালকেতুর কথোপকথন পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় ঠেকে এই জন্য যে, দেবী মানবী রূপ ধারণ করে অলৌকিকতার মধ্যেও একটি বাস্তব পরিমণ্ডল তৈরি করেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রধান-অপ্রধান সব চরিত্রই এত বেশি জীবন্ত আর সচল যে, গতানুগতিক আখ্যানের ঘেরাটোপে পুতুলখেলায় পর্যবসিত হয়নি। কবি নানা সামাজিক প্রসঙ্গ এমনভাবে এনেছেন যাতে সেকালের সমাজজীবনের হৃদস্পন্দন ধরা পড়েছে। আসলে তাঁর মন ও মেজাজ ছুঁয়ে ছিল সমকালের মাটি, তাই কাব্য রচনা করতে গিয়ে আজগুবি কল্পনার কাছে হাত পেতে গ্রহণ করতে হয়নি বাস্তবতার ঋণ। এটি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বলে 'রিয়ালিটির কারি পাউডার' বলে এর গুরুত্বকে হ্রাস করা যায় না।

বস্তুবাদী সাহিত্য বিচারে কনটেন্ট ও ফর্মের সে ঐক্যের কথা বলা হয়ে থাকে মুকুন্দ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠত্বের মূলে সেই ঐক্য বিরাজমান। কনটেন্ট মূলত দুই রকমের হয়—কথাবস্তু ও ভাববস্তু। যখন কথাবস্তুকে ছাড়িয়ে ভাববস্তুর কথা মুখ্য হয়ে ওঠে তখন সেই সাহিত্য হয়ে ওঠে চিরন্তন সাহিত্য। এই ভাববস্তু যখন নব সৃষ্টি হয়ে রূপলাভ করে তখন তা সত্য হয়ে ওঠে। এই সত্যতা নির্ভর করে বিষয়বস্তুর প্রকাশে ও রূপায়ণে। কবিকঙ্কনের 'অভয়ামঙ্গল'এ দেখা যায় কথাবস্তু তিনি প্রচলিত ধারা থেকে গ্রহণ করলেও ভাববস্তুর বৈচিত্র্য উপস্থাপনে তিনি স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। সেজন্য প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের ধারায় মধ্যযুগে কাব্য রচনা করেও কবিকঙ্কন আধুনিকতার অগ্রদূত। দেবমাহাত্ম্যমূলক কাব্য রচনা করতে বসেও তিনি চিরন্তনত্বের কথা ভুলে যাননি বলেই তাঁর কাব্যের মধ্যে অভিনবত্বের নিদর্শন মেলে এবং মঙ্গলকাব্যের ধারায় তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

**গ্রন্থঋণ :**

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য- বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস
২. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড; প্রথম পর্ব)
৩. তরুণ মজুমদার সম্পাদিত- কবিকঙ্কন-চণ্ডী চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী
৪. সনৎকুমার নস্কর- কবিকঙ্কন চণ্ডী
৫. দীনেশচন্দ্র সেন- বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
৬. কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদীয় ২০১৬, মঙ্গলকাব্য ও মঙ্গলকাব্যচর্চা

# স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজ বাস্তবতা : বাদল সরকারের একাঙ্ক নাটক

অশোক মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে বাংলা নাট্য সাহিত্যে (১৯৫০ থেকে ১৯৭০ এর মধ্যে) যে কয়েকজন শক্তিশালী প্রতিভাধর নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটেছিল এঁদের মধ্যে অন্যতম একজন বাদল সরকার (১৯২৫-২০১১)। জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতার ভান্ডার নিয়ে নাট্য গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ ইত্যাদি ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হিন্দুদের অসহায় দুর্গতি তাদের বাস্তু সমস্যা। পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সর্বগ্রাসী প্রভাবে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মানুষের মনে জাগতে থাকল একাধিক প্রশ্ন। আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসায় ব্যক্তি ও সমাজের টানাপোড়েন, ব্যক্তির স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামাজিক প্রচলন ও গতানুগতিকতার সংঘাত। মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের জীবনে নানা দুর্গতি ইত্যাদি মাথাচড়া দিয়ে উঠল। স্বাধীন ভারতে শিল্প সম্প্রসারণের ফলে শ্রমিক আন্দোলনের পথ সুগম হয়। সমাজ জীবনে এইসব ঐতিহাসিক অভিঘাত বাদল সরকারের নাটককে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র চিলেন। তাই তাঁর নাটকে বিজ্ঞান মনস্কতার একটা ছাপ লক্ষ্য করা যায়। প্রবাস জীবনকালে তিনি বিদেশী চলচিত্র। নাটক অভিনয় দেখে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার পাশাপাশি একাঙ্ক নাটর রচনাতেও তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর দুটি অন্যতম একাঙ্ক নাটক হল ‘সলিউশন এক্স’ এবং ‘শনিবার’। তাঁর নাট্য রচনার হাতে খড়ি হয়েছে একাঙ্ক নাট্য রচনার মধ্য দিয়ে। ‘সলিউশনস এক্স’ নাটকটিকে অনুদিত নাটকের আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ‘শনিবার’ নাটকটি মৌলিক নাট্য রচনা।

এখন দেখা যাক বাদল সরকারের উপরিউক্ত দুটি একাঙ্কে সমজ বাস্তবতার ছবিটি কিরূপ প্রতিফলিত হয়েছে। বিদেশী চলচিত্র দেখে অনুপ্রাণিত হলেও ‘সলিউশন এক্স’ একাঙ্ক নাটকটির আগা-গোড়া পাল্টে ফেলেছিলেন। নাটকটিতে বিজ্ঞানের একটি

কাল্পনিক বিষয়ের সমাধানকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। বিজ্ঞানের পাশাপাশি সমাজবীক্ষার ছবিটি প্রতিভাষিত হয়েছে।

বাঙালি বৈজ্ঞানিক ডক্টর শম্ভুনাথ সেনগুপ্ত যার বাড়িতে নিজস্ব গবেষনাগার। বিজ্ঞানের উদ্ভট ভাবনা নিয়ে তিনি সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। ভুলে যাওয়া তার ধাতে আছে। তার গবেষনার বিষয় হল মানব জীবনের বার্ধক্য নিবারণ। বিজ্ঞানের এই সলিউশনকে নিয়েই যত কাণ্ড কারখানা আর এই নিয়েই যত গণ্ডগোল, বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে। শম্ভুনাথের এই উদ্ভট প্রচেষ্টা পরিবারের সকলে সানন্দে মেনে নিতে পারে না। মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকেই তার চারপাশের জগৎ সম্পর্কে কৌতুহলী ছিল। এই কৌতুহল থেকেই বিজ্ঞান আবিষ্কার। তবে বিজ্ঞান যে শুধু সভ্যতার কল্যান করেছে তা নয়। বিজ্ঞান মানুষের অকল্যাণেও ব্যবহৃত হয়েছে। দুই বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর পরিণতি আমরা দেখেছি। অর্থাৎ বলা যায়, সংকটময় জীবন থেকে উত্তোরণের আশায় মানুষ বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশায় মত্ত হলেও বিজ্ঞান যে মানব জীবনে সার্বিক শান্তি এনে দিয়েছে তা কিন্তু নয়। এই একাঙ্কে সেই সত্যই নাট্যকার দেখানোর প্রয়াস করেছেন।

'সলিউশন এক্স' প্রধানত থমকে যাওয়া সময়ের বিরুদ্ধে, জরাজীর্ন মানুষের মনের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। নৈরাজ্য অরাজকতায় ক্লান্ত মনের স্থবিরতা কাটিয়ে তাকে নতুন প্রাণ, নতুন স্বপ্ন, নবজাগ্রত চেতনায় উজ্জীবনের প্রতীক হিসেবে নাটকটিকে প্রতিফলিত করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক শম্ভুনাথ বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে মানুষের শরীর মনে যে বার্ধক্যের অনুপ্রবেশ ঘটে তা নিবারণের উপায় আবিষ্কারে মত্ত হয়ে আছেন। অন্যদিকে তার স্ত্রী অনিমা এতে খুশী নন। কেননা আবিষ্কার করতে গিয়ে যত কাণ্ডকারকানা, বিপত্তির সৃষ্টি হয় তা তার স্ত্রীকেই পোহাতে হয়। তাই অনিমা বলেছে "সাকসেসের ধাক্কাটা আমার উপর দিয়ে কম যায় নি?"[১] আবিষ্কারের সফলতা অন্য কেউ ভোগ করে কিন্তু সেই সফলতার পিছনে ঘরের স্ত্রীদের কত স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। কত ঝক্কি-ঝামেলা সহ্য করতে হয় সেই খবর অগোচরেই থেকে যায়। একজনের স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে বাড়ির অন্যজনেরা সাধ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে দেয়। তাই অনিমা শম্ভুনাথকে বলেছে-

> "তুমি আজকাল আমাকে কোথাও নিয়ে যাও না, আমার যেন কোনো ইচ্ছে থাকতে নেই। সাধ আহ্লাদ থাকতে নেই – যতো কিছু সব যেন তোমারই-"[২]

ফলে এদের জীবনে নেমে আসে হতাশা, অশান্তি। বিজ্ঞানে সমাজের অন্দর মহলের –এ এক বাস্তব ছবি। বিজ্ঞান জগতের অন্ধকারময় দিকগুলিও নাট্যকার বেশ দক্ষতার সাথে দেখিয়েছেন। শম্ভুনাথ তার বার্ধক্য ঘোচানোর সলিউশনের প্রভাবে এক সময় পাগলামির চরম স্তরে পৌঁছে যায়। সে একটা সময় শিশুর মতো আচরণ করতে থাকে। তখন অনিমা রেগে শম্ভুনাথের সহকর্মী অধ্যক্ষ ড. খাস্তগীরকে প্রশ্ন করেছেন কড়া ভাষায়-

> *"আপনাদের ইনস্টিটিউট কি মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করবার জন্যে তৈরী হয়েছে? আপনারা রিসার্চ করছেন আর মানুষ হবে তার গিনিপিগ?"*[৩]

অনেক সময় বিজ্ঞানের পরিক্ষা নিরিক্ষায় গবেষকরা নিজেরাই গিনিপিগ হয়ে ওঠে। মানুষের কল্যাণের কাজে গবেষণা করতে গিয়ে দু-একটা প্রাণও বলি দিতে হয়। নাট্যকার এই বক্তব্যই এখানে রাখতে চেয়েছেন।

শুধু তাই নয় বৈজ্ঞানিকদের গবেষণায় সফলতা এলে তার দখলদরি নিয়ে অর্থাৎ সাফল্যের ভাগ বসাতে শুরু হয়ে যায় রাজনীতি। ক্ষমতার প্রভাব ঘটিয়ে গবেষকের আবিষ্কারকে নিজেদের নামে করে নেয় আর আসল মানুষটি অন্ধকারে রয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে অনিমার একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য –

> *"হ্যাঁ, উনি নিজেই ওষুধ খেয়েছেন। সুতরাং আপনাদের তার দায়িত্ব থাকবে কেন? এক্সপেরিমেন্ট সফল হলে ইনস্টিটিউটের নাম হবে। আপনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ডিনার খাবেন, আর যে বার করলো সে তার স্ত্রীর, তার ছেলের কোলে চড়ে ঘুরে বেড়াবে, আর ঝুমঝুমি বাজাবে।"*[৪]

এ এক বিজ্ঞান সমাজের নগ্ন বাস্তবতার প্রতিবিম্ব। একজন বৈজ্ঞানিক অনেক পরিশ্রমের বিনিময়ে, অনেক স্বার্থ ত্যাগের মাধ্যমে জীবনকে বাজি রেখে গবেষণা করে থাকেন। গবেষনায় সফল হলে ইনস্টিটিউটের নাম হয়, বড় বড় ব্যক্তিদের সাথে মিটিং হয় ছবি তোলা হয়। আর যে আবিষ্কার করলো সে অনেক সময় অন্তরালেই থেকে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাজের বুকে প্রচণ্ড দুটি আঘাত। এমন এক রক্তিম দগদগে ক্ষত সমাজ শরীরে যা কখনো নির্মূল হয়নি। সমাজের বুকে যখন চরম আঘাত আসে জীবন বিপন্ন বোধ করে, অবসাদগ্রস্ত হয়ে ওঠে। সমাজ গতি হারিয়ে ফেলে। স্থবিরতা লাভ করে। এ যেন এক স্থবির, অবসাদগ্রস্ত সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। বার্ধক্য দূরীকরণের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে আবার নতুন করে ফিরে আসবে শুভ্রতা,

সতেজতা। সলিউশন পানের পর যখন সহকর্মী সৌমেন শম্ভুনাথের মাথা ঘুরছে কিনা জানতে চাইলে শম্ভুনাথ বলেছে –

> *"ড্যাম ইয়োর মাথা ঘোরা! বুঝতে পারছেন না? আজ বারো বছর পরে চশমা ছাড়া পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি! পরিস্কার! কে বলে আমার চোখ খারাপ? মনে হচ্ছে আমার বয়স বিশ বছর কমে গেছে! মনে হচ্ছে হাড়ের জয়েন্টগুলোকে নতুন অয়েল করা হয়েছে। ফুসফুসে পাম্প করা হয়েছে।..."*[৫]

শম্ভুনাথের মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই বক্তব্যই প্রকাশিত হয়েছে। শম্ভুনাথ বার্ধক্য মোচনের সলিউশন পান করেছে। শম্ভুনাথের মুখের ভাব নিমিষে বদলে গেছে। প্রৌঢ়ত্বের লক্ষণ মুছে গেছে। জোরে চিৎকার করে দ্রুততার সাথে কথা বলছে। আজ সে প্রৌঢ়ত্ব মোচনের আনন্দে মেতে উঠেছে। আর এই কাজটি সফল হয়েছে বিজ্ঞানের ছোঁয়ায়। স্থবির সমাজে সতেজতা ফিরিয়ে আনতে, মানুষের চেতনায় অজ্ঞানতার অন্ধাকর দূর করতে, ক্লান্ত মনের প্রৌঢ়ত্ব ঘোচাতে বিজ্ঞানীকে সাথে নিতে চেয়েছেন নাট্যকার। বিজ্ঞানের জাদুকাটিতে স্থবির সমাজের পরিবর্তন সম্ভব। তারই ছোঁয়ায় মানব মনের প্রৌঢ়ত্ব মোচনের স্বপ্ন দেখেছেন। অন্যদিকে সেই বিজ্ঞানের, বিজ্ঞান সমাজের কিছু অন্ধকারময় দিক রয়েছে নাট্যকার সে ব্যাপারেও আমাদের সজাগ করে দিতে চেয়েছেন। বিজ্ঞানের প্রভাবেই মানুষের জীবন যাত্রার অসংখ্য পরিবর্তন সম্ভব। নাট্যকার বাদল সরকার এই নাটিকায় সমাজবীক্ষার এই দিকটি উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা করেছেন।

বাদল সরকারের অপর একটি অন্যতম একাঙ্ক নাটক 'শনিবার' (১৯৫৯)। এই নাটকে মধ্যবিত্ত বিশেষ করে নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের কথা প্রতিফলিত হয়েছে। তাদের স্বপ্ন, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা কীভাবে গড়ে ওঠে এবং বাস্তবের আঘাতে, বাস্তবের মুখোমুখি হতেই তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় – এটাই এই একাঙ্কের মূল বিষয়বস্তু। মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বপ্নভঙ্গের ছবি দিব্যেন্দুর জীবনের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত হয়েছে। দিবেন্দুর বয়স ত্রিশ ছাড়িয়েছে, অতি সাধারণ অফিস চাকুরে চেহারার অবিবাহিত এক যুবক। মুখে যার সব সময়ই চিন্তাগ্রস্ত ভাব। বাড়িতে আছে দেড় বছর রিটায়ার করা বাবা, বয়স্কা মা, এবং ভাই, অবিবাহিতা এক বোন। দিব্যেন্দুর রোজগারের উপর পুরো পরিবারটা নির্ভরশীল। দিব্যেন্দুকে কেন্দ্র করে সমাজে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছবিটি

যেন আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। মধ্যবিত্ত জীবনের একাকিত্বের ছবি, অসংখ্য যুবক যুবতীর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, স্বপ্নভঙ্গের ছবি লক্ষ্য করা গেছে এই একাঙ্কটিতে।

দিব্যেন্দু, পরিতোষ বিশু এরা সকলে মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। এরা অফিসে চাকরি করে। এদের প্রত্যেকের গতিবিধি যন্ত্রের মতো। টাইপ রাইটারের ধ্বনি এদের স্বপ্ন-জাগরনে সর্বদা লেগে আছে। এদের বাড়িতেও শান্তি নেই। ফাইলের উপর ফাইলের বোঝা এদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি শনিবার, রবিবারও এদের জীবনে শান্তি নেই। রাত জেগে ফাইল চেক করতে হয়। কিন্তু বোনাস, প্রমোশনের কথা উঠলেই নানা অজুহাত এসে হাজির হয়। শুধু তাই নয় কাজে একটু গাফিলতি হলে তাকে বরখাস্তও হতে হয়। কেরানির জীবনের এক এক নিষ্ঠুর বাস্তবতার ছবি প্রকাশ পেয়েছে। এরা যত খাটে তত আরো পেয়ে বসে আরো খাটাতেই থাকে। সেটা এরা জানে, কিন্তু জানা সত্ত্বেও এদের হাতে কোনো উপায় থাকে না। তাই অগত্যা খাটতেই থাকে।

দিব্যেন্দু একদিন স্বপ্ন দেখে তার প্রমোশন হয়েছে, একেবারেপ তিন ধাপ টপকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডায়রেক্টর হয়ে গেছে। কিন্তু এ  যে এক স্বপ্ন তা কিছুক্ষণ পরেই টের পায়। মদ্যবিত্তের জীবন ভাবনায় কেউ নৈরাশ্যবাদী আবার কেউ আশাবাদী স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু বাস্তবের অভিঘাতে তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। মধ্যবিত্ত জীবনের জটিল ও অবচেতন মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এদের নৈরাজ্য জীবনের পাশাপাশি আগামী দিনে সুস্থ জীবন গড়ার উপযোগী স্বপ্ন ও প্রত্যয় জেগে ওঠে। একদিন দিব্যেন্দু স্বপ্ন দেখেছে প্রেম-ভালোবাসার। অফিসের কাজের চাপকে দূরে সরিয়ে রেখে নিঃসঙ্গ একাকীত্ব বোধ থেকে মুক্তি পেতে বোনের বান্ধবী সাগরিকার সাথে স্বপ্ন সাজিয়েছে। মধ্যবিত্ত ব্যক্তি সর্বস্ব মন সর্বদা জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে থাকে। কোনও এক নিজস্ব কল্পনার জগতে তারা বিচরণ করে। এরা পথ চলার মধ্যে নিজেকে নিজের মধ্যে খুঁজে ফেরে। অফিসের ফাইলের থেকে মনকে সরিয়ে দিব্যেন্দু সাগরিকার সাথে রোজ বার্তালাপ করতে চেয়েছে। হাজারো প্রশ্ন। ভাবনা মাথার মধ্যে অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে রয়েছে। দিব্যেন্দুর মনের মধ্যে কত কবিতা জমে ওঠে মেঘের মতো।  আঘাত পেলে ঘন বর্ষার ধারায় তা নেমে আসতে খোঁজে। কিন্তু এদের সম্যসা কেউ শোনে না, কেউ দেখে না। এরা স্বপ্ন দেখে কিন্তু তাদের স্বপ্ন সত্যি হয় না। স্বপ্নের জগত থেকে বাস্তবের সারিতে ফিরে এলে মনের মধ্যে ফুটে ওঠে নিঃসহায়তার বোধ।

দিব্যেন্দুর স্বপ্নে জাগরনে সর্বদা কেরানীর চাকরি হারানোর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ও চিন্তাগ্রস্ত। সে স্বপ্ন দেখেছে কোম্পানীর অফিসের ফাইলের কাজ সঠিক সময়ে সম্পূর্ণ করতে পারেনি বলে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাসু সাহেবের মন্তব্যটি বেশ উল্লেখযোগ্য-

> *"(গর্জন করিয়া) শাট্ আপ্! (দিব্যেন্দু নিস্তব্ধ, অল্প থামিয়া) আপনার জন্য কোম্পানি বিশ লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট হারালো। অতএব কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে আপনাকে এই মুহূর্তে বরখাস্ত করা হোলো। এ মাসের পাওনা মাইনেও এক সঙ্গে না মঞ্জুর করা হলো।"*[৬]

কাজ হারিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় টাকার চিন্তা। ভাই নবেন্দু চল্লিশ টাকা চেয়েছে কিন্তু টাকা নেই। বোন সুনন্দা গান শেখার জন্য টাকা চেয়েছে। বাবা দেশের বাড়িটা সারিয়ে নিতে চেয়েছে। মা সুনন্দার জন্মদিনে বাড়িতে দু-চারজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে চেয়েছে, কিন্তু দিব্যেন্দুর প্রতি ক্ষেত্রে সেই একই সংলাপ- "টাকা কোথায়"?। চরিত্রগুলোর মধ্যে দেখা যায় বিপন্নতা। বিষন্নতা ও সমাজ অস্তিত্বের এক সংকটময় রূপ। দিব্যেন্দুর অবচেতন সত্তা জেগে ওঠে সে প্রতিবাদ করতে চাই বাসু সাহেবের চোখে চোখ রেখে। সে তাই বলে উঠেছে-

> *"অফিসে চাকরি করি বলে কি আমি আপনার চাকর? আপনি অফিসার বলে কি যা খুশি তাই অত্যাচার করে যেতে পারেন? সপ্তায় একটা দিন ছুটির অধিকার কি আমাদের নেই? আমরা কি যন্ত্র? আমরা কি রক্ত মাংসের মানুষ নই?... আমাদের কি ঘরের কাজ নেই? আমোদ আহ্লাদ নেই?"*[৭]

কিন্তু এ প্রতিবাদ বাস্তবে প্রকাশ পায়নি, তা অবচেতন স্তরেই রয়ে গেছে। বাস্তবে ফিরে আসতেই গলার চিৎকার শান্ত হয়ে এসেছে। অফিসের বেয়ারার ডাকে দিব্যেন্দুর ঘোর কাটে। বেয়ারা জানিয়ে যায় অফিসে আর তাকে দরকার নেই। আগামীকাল থেকে তার অফিস আসতে হবে না। দিব্যেন্দু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। মাকে হতাশ সুরে বলে উঠেছে-

> "মা কাল অফিসে যেতে হবে না। অফিসের লোক এসে বলে গেল।"[৮]

দিব্যেন্দুর জীবন এখানেই থেমে যায়। দিব্যেন্দুর মতো কত মধ্যবিত্ত যুবেকের স্বপ্ন এভাবেই থেমে যায় নাট্যকার তারই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন।

স্বাধীনতা উত্তর সাহিত্যে – কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকে এমনকি একাঙ্ক নাটকেও মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটের ছবি প্রধান রূপে দেখা দেয়। আধুনিক জীবনের জটিলতা, অসাম্য, শ্রেণি শোষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং সুন্দর জীবন গড়ে তোলবার প্রয়াস দেখা দিয়েছিল নাটকে বিশেষ ভাবে। মধ্যবিত্ত জীবনের জটিলতা, অসহায়তা, তীব্র অর্থনৈতিক সংকট, স্বপ্নভঙ্গের হতাশা, বাদল সরকার ফুটিয়ে তুলেছেন দিব্যেন্দুকে কেন্দ্র করে। উচ্চশিক্ষিত দিব্যেন্দু উপযুক্ত রোজগারহীনতা আদলে স্বাধীনতা পরবর্তী ষাট দশকের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের প্রতীকী ঘটনা হিসেবে চমৎকারভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

**তথ্যসূত্র :**

১. ‘নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড)’, বাদল সরকার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২৪, পৃ. ১৭
২. তদেব, পৃ. ১৯
৩. তদেব, পৃ. ২৭
৪. তদেব, পৃ. ২৭
৫. তদেব, পৃ. ১৩
৬. তদেব, পৃ. ১২৬
৭. তদেব, পৃ. ১৩১
৮. তদেব, পৃ. ১৩২

**গ্রন্থঋণ:**

১. ‘নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড)’, বাদল সরকার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২৪
২. ‘বাংলা একাঙ্ক নাটক সংকলন’ – সম্পাদনা কুমার রায়, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, পঞ্চম পুর্নমুদ্রণ – ২০১৭
৩. ‘নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার’ – দর্শন চৌধুরী, কলিকাতা : একুশ শতক, ২০০৯

# আফগানিস্তানে নারীদের অবস্থা : অতীতের আলোকে বর্তমানকে বিশ্লেষণ

সৌতিক নন্দী
এম. এড, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির

সাম্প্রতিক কালে দোহায় তালিবান-আফগান সরকারের যে শান্তিচুক্তি বৈঠক সংঘঠিত হলো সেখানে 4 জন মহিলার প্রতিনিধিত্বের ঘটনাটি ইতিমধ্যেই সমগ্র বিশ্বের নজর কেড়েছে।দীর্ঘ তালিবানি শাসনের অন্ধকার যুগ পার করে ফতিমা গৈলানি, হাবিবা সারাবি,ফজিয়া এবং শরিফা জুরমতি-দের 17 জন পুরুষ প্রতিনিধিদের পাশে নিজেদের জায়গা করে নিতে যে কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তা একদিনে সম্ভব হয়নি। পূর্বে আফগানিস্তানে মেয়েদের অবস্থা কিছুটা ভালো থাকলেও ঠান্ডা যুদ্ধের সময় থেকেই মেয়েদের অন্ধকার যুগের সূচনা হয়।তালিবানি শাসনের সময় যা অসহনীয় হয়ে ওঠে।অতীতের দিকে চোখ রাখলে আমরা ফতিমাদের লড়াইটা সহজেই অনুমান করতে পারবো।

আলোচনা শুরুর আগে ফতিমা,হাবিবা,ফজিয়া শরিফা দের পরিচয়টা একটু জেনে নেওয়া যাক।ফজিয়া কফি আফগানিস্তানের National Assembly র প্রথম মহিলা vice president.যিনি মেয়ে হওয়ার কারণে শৈশব কালে পরিবার তাকে মেনে নেয়নি।পরবর্তীতে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করেন,UNICEF এর সদস্য হন এবং Internally Displaced person (IDP), মহিলা এবং শিশুদের অধিকার রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন 2004 পর্যন্ত।এরপর থেকে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়।এই শান্তি চুক্তি সংঘটিত হওয়ার কিছু দিন আগেই তার ওপর হামলা চালানো হয়।ফতিমা যিনি 2004 সাল থেকে afgan red crescent society র প্রেসিডেন্ট।আফগানিস্তানে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের সময় তার পরিবার আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে যায়,2002 সালে 23 বছর পর ফতিমা আফগানিস্তানে ফিরে আসে।2004 সালে আফগানিস্তানের নতুন সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে ফতিমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।হাবিবা সারাবি আফগানিস্তানের প্রথম মহিলা গভর্নর।এর পূর্বে তিনি আফগানিস্তানের women's affair's এবং calture and education dept.এর মন্ত্রী ছিলেন।তিনি 1987 সালে medicine নিয়ে পড়াশুনো শেষ করার পর world Health Organization (WHO)এর ফেলোশিপ পান এবং পরবর্তীতে Hematology নিয়ে পড়াশুনো করার জন্য ভারতে আসেন।তিনি আফগানিস্তানে এবং পাকিস্তানের রিফিউজি

ক্যাম্পের আফগান মহিলাদের গোপনে শিক্ষাদান করতেন।শরিফা একজন journalist ছিলেন।তালিবানি শাসনকালে যখন মেয়েদের চাকরি করা নিষিদ্ধ হলো তখন তাঁর journalist এর চাকরি চলে যায়।পরবর্তীতে তিনি Afgan Coordination Against Corruption (AFCAC),The Advocacy Group For Women In Free and Fair Election Fouram of Afganistan (FAFEA),The Advisory Board of The Supporting open Media in Afganistan (NAI) এর মেম্বার ছিলেন।এই চারজন মহিলার জীবনের ওঠা-পড়ার গল্পের পাশাপাশি আমরা আফগানিস্তানের বাকি মেয়েদের লড়াই,তাদের অবস্থাটা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবো।

আলোচনার শুরুতেই ঠান্ডা যুদ্ধ,তালিবানি শাসনের কথা বলা হয়েছে,তা থেকে খুব সহজেই কতগুলো প্রশ্ন আমাদের সামনে উঠে আসছে-ঠান্ডা যুদ্ধের সময় আফগানিস্তানের অবস্থা কেমন ছিল?তালিবান কারা?এদের উদ্ভব হলো কীকরে?আমরা যদি ঠান্ডা যুদ্ধের সময় কালে ফিরে যাই তাহলে দেখতে পাবো এই সময় আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন Brezhnev theory প্রয়োগ করে।আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনা অভিযান চালায় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেদের অনুগত বারবার কারমালকে শাসক হিসেবে নিযুক্ত করে।আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নানা স্তরে সশস্ত্র প্রতিরোধ ও গরিলা আক্রমণ সংঘটিত হতে শুরু করে।সোভিয়েত এবং সাম্যবাদ বিরোধী এই বিদ্রোহীদের নিয়মিত অর্থ ও অস্ত্রের যোগান দিত আমেরিকা ও তার তৎকালীন অনুগামী পাকিস্তান,ইরান,লিবিয়া,এবং আরও কিছু দেশ।এছাড়াও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সৌদি আরব থেকে আগত মুজাহিদ ওসামা বিন লাদেন ও মুসলিম জঙ্গিগোষ্ঠী গুলিকে আর্থিক সাহায্য সহ সবরকম সাহায্য করতো।এদের প্রশিক্ষণ চলেছিল আফগানিস্তানের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে।পরবর্তী গরবাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হলে তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাব ও জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী আফগানিস্তান থেকে সমস্ত সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহার করে নেন।এই সময় আফগানিস্তানে নতুন শাসক নিযুক্ত হন নাজিবুল্লাহ।কিন্তু তার ক্ষমতা মূলত কাবুলেই সীমাবদ্ধ ছিল।গ্রামাঞ্চল গুলি শাসন করছিল বিভিন্ন গরিলা বাহিনী।অবশেষে 1992 সালে তিনি ক্ষমতা হারান এবং তালিবানদের হাতে নিহত হন।এরপর থেকে আফগানিস্তানে শুরু হয় মধ্যযুগীয় তালিবানি শাসন।পরবর্তীতে 1996 সালে তালিবানরা আফগানিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে এবং 2001সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে তালিবানের জঙ্গলরাজ চলতে থাকে।ইতিমধ্যে তালিবান জন্মদাতা আমেরিকার সাথে তালিবান নেতা ওমর ও তার উপদেষ্টা ওসামা বিন লাদেনের সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে।1999 সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে আফগানিস্তানে আর্থিক

নিষেধাজ্ঞা জারি করে আমেরিকা।এর পাল্টা ওমর ও লাদেন গোষ্ঠী 2001 সালে আমেরিকার ট্রেড সেন্টারে হামলা চালায়।আমেরিকা ও তালিবানদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের এখানেই ইতি ঘটে।তালিবানদের নিশ্চিহ্ন করতে আমেরিকা বিশাল সংখ্যক সৈন্য বাহিনী নিযুক্ত করে আফগানিস্তানে।ফলশ্রুতিতে তালিবানরা পিছু হটে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের অনুগত ব্যাক্তির হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দেয়।

দীর্ঘদিন ধরে আফগানিস্তানে এই অরাজক অবস্থার ফলে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আফগান মহিলারা।এই পঙ্কিল আবর্ত থেকে বেরোতে মহিলাদের অনেকটা সময় লেগেছে।কিন্তু প্রথম দিকে তাদের পরিস্থিতিটা এমন ছিলনা।অতীতে আফগান মহিলারাই স্থানীয় সমস্ত সমস্যা সংঘাত মেটাতে ভূমিকা নিতো1920 সালে আফগান মহিলারা ভোটাধিকার পায়,বিশ্বের দুই উন্নত দেশ ব্রিটেনের এক বছর পর এবং আমেরিকার সাথে একই সময়ে।1960 সালের আগে পর্যন্ত আফগান মহিলারা পুরুষদের সমান অধিকার ভোগ করতো।জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রেও মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো।1965 সালে আফগানিস্তানে প্রথম womens group, The Democratic Organization of Afgan Women (DOAW)গড়ে ওঠে।এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ ছিল মহিলাদের মধ্যে থেকে অশিক্ষা দূর করা,এবং বলপূর্বক বিবাহদান নিষিদ্ধ করা। 1977 সালে আফগানিস্তানের Highest legislative body তে মহিলাদের 15%প্রতিনিধিত্ব ছিল।1990 সালের পূর্বে পর্যন্ত কাবুলের 70%স্কুল শিক্ষক,50%সরকারী কর্মচারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠরতা এবং 40% ডাক্তার ছিলেন মহিলা।

পরবর্তীতে তালিবানের উত্থান,গৃহযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে আফগানিস্তানে মহিলাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে।মেয়েদের সবসময় বোরখা পরে মুখ ঢেকে থাকতে হতো।কারণ তালিবানরা মনে করতো মেয়েদের মুখ দুর্নীতির উৎস।বোরখার নীচ দিয়ে চামড়ার 1 ইঞ্চি দেখা গেলেও জনসমক্ষে অত্যাচার চলতো।এছাড়াও বাড়ির কোনো পুরুষ সদস্য ছাড়া মহিলাদের বাড়ি থেকে একা বেরোনো নিষিদ্ধ ছিল।মহিলাদের ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানি ছিল একটি অতিপরিচিত ঘটনা।তালিবানরা ক্ষমতায় আসার পর সমস্ত মহিলা স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু মহিলা স্কুল খোলা হয়েছিল।কিন্তু সেখানেও তালিবানরা 8 বছরের উর্দ্ধে কোনো শিশুকে(মেয়েকে)স্কুলে পাঠানো যাবেনা বলে আদেশ জারি করে।শুধু তাই নয় এই স্কুলে শুধু কোরান পড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।এই সময় মেয়েদের শিক্ষার হার অস্বাভাবিক ভাবে কমে গিয়ে শহরে 13% এবং গ্রামে 3-4% এ এসে দাঁড়ায়।যেখানে মহিলাদের সর্বক্ষণ পর্দার আড়ালে রাখাই ছিল প্রথা সেখানে মহিলাদের স্বাস্থ্য উপেক্ষিত হবে তা

অতিসাধারণ।মাতৃত্বকালীন অবস্থায় মহিলাদের মৃত্যুর ঘটনায় আফগানিস্তান দ্বিতীয়।প্রতি 100 জনের মধ্যে 16 জনের সন্তান জন্ম নেওয়ার সময় মৃত্যু হতো।মহিলাদের গড় আয়ু 46এ এসে দাঁড়িয়েছিল।মাতৃত্বকালীন অবস্থায় মহিলাদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর না দেওয়ার ফলাফল পরবর্তী প্রজন্মের ওপর এসে পড়ে।UNICEF এর রিপোর্ট অনুযায়ী ওইসময় 1000 জন শিশুর মধ্যে 165 জন শিশু তাদের প্রথম বছরের মধ্যেই মারা যায়।ফলে মহিলাদের পিছিয়ে রাখার সাথে সাথে পরবর্তী প্রজন্মকেও দুর্বল করে দেয় তালিবানরা।যেখানে মহিলাদের স্বাস্থ্য,শিক্ষার মতো নূন্যতম প্রয়োজনটুকু অসম্ভব ছিল সেখানে বাইরে বেরিয়ে চাকরি করাটা কল্পনাবিলাসীতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধের সময় অনেক পরিবারের পুরুষ সদস্য প্রাণ হারিয়েছিল।ফলে সেইসব পরিবারের মহিলারা তাদের জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য বা পরিবারের অন্য সদস্যদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য পথে নেমে ভিক্ষে করতে বাধ্য হয়।

তালিবানি শাসন শেষ হওয়ার পর ধীরে ধীরে মহিলারা স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে।2002 সালে 1.5 মিলিয়ন শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েছিল,2005 এ এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 5.2 মিলিয়ন।যার মধ্যে কমপক্ষে 2 মিলিয়ন ছিল মেয়ে।মহিলাদের সাক্ষরতার হার 7% বেড়েছিল।2003 সালে আফগানিস্তানে নবনির্মিত সংবিধানের 43 ও 44 নং ধরা মহিলাদের শিক্ষার অধিকারের কথা বলে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে।এছাড়াও Millennium Developmental Goal এর সাথে যুক্ত হয় আফগানিস্তান।যার 8 টি লক্ষের মধ্যে 2 টি লক্ষ্য শিক্ষা সংক্রান্ত।এছাড়াও নতুন তথাকথিত নির্বাচিত সরকারের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় ভেঙেপড়া স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে পুনরুদ্ধার করা।সংবিধানের 52 নং ধারায় এই সংক্রান্ত উল্লেখ রয়েছে।2016 সালের UNICEF এর রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি 3 জনের মধ্যে 1 জন মেয়ের 18 বছরের আগেই বিয়ে হয়ে যায়।3.7 মিলিয়ন স্কুল ছুট এদের মধ্যে 60% ই মেয়ে।15 বছরের কম বয়সী মাত্র 19%অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন।31% যুবতী annomic।

যদিও বর্তমান সরকার মহিলাদের অধিকার ও ক্ষমতায়নের বিষয়ে দায়বদ্ধ।কিন্তু পরিসংখ্যান দেখলে দেখাযাবে মহিলাদের সর্বাগ্রে উন্নয়ন ঘটছে খুব ধীর গতিতে।শিক্ষাক্ষেত্রে পুরুষ ও।মহিলাদের সমানাধিকারের হার 2016 এ যেখানে 82.3% ছিল সেখানে 2017 সালে 84.0% হয়েছিল।মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা 2016 তে 87.5% ছিল যা 2017 তে 89.7% এ দাঁড়িয়েছে।2016 সালের একটি পরিসংখ্যান দেখলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

| | |
|---|---|
| Lack of education or illiteracy | 41% |
| Unemployment | 27% |
| Domestic violence | 19% |
| Force of marriage | 13% |
| Lack of right | 12% |
| Poverty | 11% |

তথ্যের আলোচনার পাশাপাশি আমরা যদি তত্ত্বের দিকে নজর দিই তাহলে women empowerment এর ধারণাটি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করে এই ধারণাটি।সমাজের সর্বক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমান অংশীদারিত্বের কথা বলে এই ধারণা।নিজেদের অধিকার গুলির বিষয়ে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি নিজের ও সমাজের প্রতি তার কর্তব্যের কোথাও স্মরণ করিয়ে দেয় এই women empowerment এর ধারণা। k.sayulu, G.sardar, B.sridevi (2005) এঁদের মতে "women empowerment is any process that provides greater autonomy to women through the sharing of relevant information and provision of control over factors affecting their performance."পূর্বে শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়া বা চাহিদার মধ্যেই এই women empowerment এর ধারণাটি সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন-শিক্ষার অধিকার, ভিটাধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চাকরির অধিকার, আইনসভায় নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রভৃতি।অর্থাৎ সমাজে মহিলাদের আইনগত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আইনমূলক সংস্কার সাধনের কর্মসূচি ছিল মূল লক্ষ। কিন্তু বর্তমানে women empowerment ধারিনাটি নারীমুক্তির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপের পক্ষপাতী। যেমন-গৃহের মধ্যে নারীর অধীনতামূলক অবস্থানের অবসান, পরিবারের মধ্যে নারীর ওপর শোষণ পীড়নের অবসান,সমাজ-সংস্কৃতি ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অবদমিত অবস্থানের অবসান।women empowerment এর এই ধারণাটির ক্ষেত্রে 3 টি dimensions লক্ষ করা যায়। (1) Micro level,যা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ক্ষমতায়নের ধারণার ওপর গুরুত্ব দেয়। (2) Meso level, যা গোষ্ঠীগত ক্ষমতায়নএবং (3) Macro level, যা সামগ্রিক ভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষমতায়নের ধারণায় বিশ্বাসী।

আফগানিস্তান এখন ক্ষমতায়নের দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ Meso level এ রয়েছে।যা ধীরে ধীরে তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ Macro level এ উন্নতি ঘটবে বলে আমরা আশাবাদী। যদিও তালিবানদের সময় থেকে আফগানিস্তানে মহিলাদের অর্থ সামাজিক

রাজনৈতিক ভাবে অগ্রগতি হয়েছে।কিন্তু সেখানের মহিলাদের লড়াই এখনো অনেকটা বাকি।ফতিমা,হাবিবা,ফজিয়া,শরিফা রা এবিষয়ে বাকিদের দিশা দেখাবে।ফজিয়ার মতে তালিবানদের এমন অনেক অংশ বা সংগঠন রয়েছে যারা ততটা কট্টর নয়।নারীদের সমন্ধে অনেকটাই উদার মনোভাব নিয়ে চলে তাদের মাধ্যমেই আলোচনা চলছে।যদিও পরবর্তীতে আফগানিস্তান থেকে পুরোপুরি আমেরিকার সেনা চলে গেলে সেখানে পুনরায় অরাজকতার সৃষ্টি হবে কিনা,আমেরিকা বা আফগানিস্তান সরকার তালিবানদের দাবিমত বন্দীদের মুক্তিদিলে তালিবানরা পুনরায় শক্তি অর্জন করে আফগানিস্তানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে কিনা,সেক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার কতটা সুরক্ষিত থাকবে এবিষয়ে ভবিষৎ সময়ে উত্তর পাবো।কিন্তু বর্তমানে তালিবানদের মতো কট্টর মৌলবাদীরা যারা তাদের শাসনকালে মেয়েদেরকে প্রায় ঘরবন্দি করে রেখেছিল তারা আজ মেয়েদের সাথে আলোচনার টেবিলে বসছে ঘটনাটির মধ্যে অভিনবত্ব আছে তো বটেই কিন্তু তার সাথে সাথে আরেকটি প্রশ্ন মনে আসছে বলা ভালো আশার আলো সঞ্চার করছে যে,তাহলে কি তারা মহিলাদের মর্যাদা দিচ্ছে?উত্তর ভবিষ্যতের অপেক্ষায়।

তথ্যসূত্র:

1. Journal of International women's Studies; volume 4/issue 3
2. Afgan Women at the crossroads: Agents of Peace or Its Victims?; Orzala Ashraf Nemat.A Century Foundation Report.
3. www.aljazeera.com.
4. www.bbc.com.
5. www.amnesty.org.uk.
6. Report on The Taliban's War Against women; Released by the Bureau of Democracy; Human Rights and Labor;Nov.17.2001.
7. www.unicef.org.
8. ইতিহাসের আলোয় সমকালীন বিশ্ব, 1945-2014; গৌরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
9. আনন্দবাজার পত্রিকা; 15 সেপ্টেম্বর, 2020
10. আনন্দবাজার পত্রিকা; 9 সেপ্টেম্বর, 2020

# জীবনানন্দের বনলতা সেন কবিতায় চিত্রকল্প ব্যবহারের অনন্যতা

অন্তিমা ভট্টাচার্য
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

**সারসংক্ষেপ :** জীবনানন্দ দাশ আধুনিক কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রধান প্রকৃতিপ্রেমিক ও রোমান্টিক হিসাবে পরিচিত। তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জাগতিক নৈরাশ্যময়তাকে উপমা ও ইমেজ দ্বারা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা। উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অলংকারের সার্থক ব্যাবহারে ও প্রকাশে তাঁর কবিতায় এক অনাবিল ভাবালুতা সৃষ্টি হয়েছে। 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটি তাঁর অন্যতম প্রধান সৃষ্টি। এই কাব্যটির চিত্রকল্পের ব্যবহার বিচিত্র রকমভাবে ঘটেছে। এই চিত্রকল্পগুলির যথাযথ ব্যবহার দ্বারাই তাঁর কবিতাগুলি যথাযথভাবে ব্যঞ্জনার্থকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থটির কবিতাগুলিতে চিত্রকল্পের ব্যবহারের আবেগময়তা কবির মনোভঙ্গির বিশেষত্বকে প্রকাশ করে।

**সূচক শব্দ :** চিত্রকল্প, প্রকৃতি-প্রেমিক, সাহিত্য আন্দোলন, নির্জনতা, ভাবাবেগ, উপমা ব্যবহার, বর্ণময়তা, চিত্ররূপময়তা, বাস্তববাদ, কল্পনাময়তা, প্রতীক ব্যবহার, সৃষ্টিশীলতা,আধুনিক সাহিত্য, ঐশ্বর্যময়তা, যুগচিত্র।

**মূল আলোচনা :**

জীবনানন্দ দাশ বাংলা কাব্য সাহিত্যের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র এক কবি। বাংলা সাহিত্যের সার্থক চিত্রময়তা সৃষ্টিকারী কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি- এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় আমাদের নেই। তাঁর কবিতা রূপকথার মতো আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত ও মুগ্ধ করে। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে অপ্রথাগত প্রকাশভঙ্গি ও ছন্দ প্রয়োগের জন্য সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি হিসেবে জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল- প্রকৃতিপ্রেম, নৈরাশ্যময়তা, উপমা ব্যবহারের বিশেষত্ব ও ইমাজিস্টধর্মিতা। আর এই বৈশিষ্ট্যই রবীন্দ্র যুগের একজন আধুনিক ও রবীন্দ্রবিরোধী কবিরূপে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তাঁর কবিতায় তিনি পবিত্র ও প্রথাগত সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দেননি, সাধারণ মানবজীবনের জটিল-কুটিল-কুৎসিত দিকগুলির বর্ণনাই তাঁর কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয়। কেবলমাত্র বিষয়গত মৌলিকত্বই

না, শৈলীগতভাবেও তা অনন্য। এ যুগের কবিদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা কবিতার কালান্তর' গ্রন্থে বলেছেন, " এদের লক্ষ্য ছিল সমাজচেতনা ও রাজনীতির জটিলতা বর্জন করা, কবিতা যে দৃষ্টিসুন্দর অনুষঙ্গ সৃষ্টি, ছেদচিহ্নের বিলোপ, ব্যাকরণ বিরোধিতা, ছন্দ বিরোধিতা, মুখের ভাষার কাছাকাছি ভাষা ব্যবহার। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোন কাব্য আন্দোলনই বাংলা কাব্যে স্থায়ী রূপ পায়নি। শেষপর্যন্ত বদলে গেছে কবিদের নিজস্ব জীবনদর্শন। কিন্তু আন্দোলন হারিয়ে গেলেও স্পষ্ট হয় এটাই যে, কবিরা সেই সময়ে প্রত্যেকেই খুঁজতে চাইছিলেন ভিন্ন এক পথ।"[১] আসলে 'Image'বা 'চিত্রকল্প' হলো- বহির্জগতের কোনও ঘটনায় আমাদের হৃদয়ের অবচেতন স্তরের স্মৃতি-কল্পনা-আবেগ-অনুভূতি প্রভাবিত হয় যে চিত্ররূপময়তা তথা শব্দচিত্রের সৃষ্টি করে। এজরা পাউন্ড এই বিষয়ে বলেছিলেন,' The image is a pure creation of the mind. It can not emerge from a comparison but only from the bringing together of two more distance realities. An image is that which presents and intellectual and emotional complex is an instant time.' এককথায় জীবনানন্দের কবিতায় চিত্রকল্প ব্যবহারের আধিক্য ও বর্ণময় 'উপমাই কবিত্ব' রূপে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর কবিতায় উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অর্থালঙ্কারগুলির প্রয়োগের দ্বারা, সার্থক শিল্পীর সৃজনশীলতার প্রতিবিম্ব ও মানসলোকের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন।

আসলে 'চিত্রকল্পবাদ' বা 'Imagism'-কেন্দ্রিক আধুনিক সাহিত্য আন্দোলন হল ফরাসি আন্দোলনের বিবর্তিত একটি রূপ । T. E. Hulme ছিলেন এই সাহিত্য আন্দোলনের প্রবর্তক(১৯০৮-১৯১২)। এই সময়কালের মধ্যে ইংরেজ তরুণ কবিরা এই আন্দোলনের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এজরা পাউন্ড 'Poetry' নামক মার্কিন পত্রিকায় ইমাজিস্টদের ইস্তেহার প্রকাশ করেন। এই চিত্রকল্পবাদ আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল- নিরাভরণ ও ঐশ্বর্যহীন ভাষার প্রয়োগ দ্বারা কবিতার বর্ণনা, বাস্তববাদী-পরাবাস্তববাদী ইন্দ্রিয়জ চেতনামূলক বিষয় নির্বাচন, অন্তমিল ত্যাগ করে Verse Libre -এর বহুল প্রয়োগ, নিবিড় চিত্রময়তা দ্বারা দৃঢ়-স্পষ্ট ভাববোধের রূপদান, প্রথাগত একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি, বুদ্ধিদীপ্ত-আবেগঘন কল্পনার দ্যোতনা ইত্যাদি। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে 'Das Imagist' গ্রন্থে অলডিংটোন, ডুলিটল, লাওয়েল, উইলিয়াম প্রমুখ কবিদের চিত্রকল্পবাদী কবিতাগুলি প্রকাশিত হয় ও পাঠকমহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলতে শুরু করে। তবে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে লাওয়েলের নেতৃত্বে

এই চিত্রকল্পবাদী আন্দোলন চলাকালীন ধীরে ধীরে এটি তার তথাকথিত উন্মাদনা হারাতে থাকে। পরবর্তীকালে অনেক সমালোচক সপ্তদশ শতকের মেটাফিজিক্যাল আন্দোলনের সাথে চিত্রকল্পবাদী আন্দোলনের সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। আসলে সাহিত্যে 'ইমেজ' শব্দটির বহুবিধ অর্থ বিদ্যমান। কবিদের চেতনা ও কবিত্বের ঐশ্বর্যময়তার বিস্তৃতি ঘটে কাব্যের চিত্রকল্পের ব্যবহার ও প্রয়োগের যথাযথতায়। এই বিষয়ে R. H. Foggle বলেছেন, " The essential quality and functions of imagery is a kind of creation, by bringing together of diverse objects, states of Mind, or concepts,new relationship... born of the fruitful mating of ideas and things operately disparate and isolated from each other"[২] বাংলা সাহিত্যে 'আবু সয়ীদ আইয়ুব' সর্বপ্রথম ইমেজের বাংলা প্রতিশব্দ রূপে 'চিত্রকল্প' শব্দটির ব্যবহার করেন। পৃথিবীর এমন কোন বিষয় নেই যা চিত্রকল্প হিসাবে সাহিত্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। অনেকে মনে করেন চিত্রকল্পবাদ কেবলই আধুনিক সাহিত্যের অন্তর্গত একটি বিষয় বা ভাবনা। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যায়, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও চিত্রকল্পবাদ-এর পরোক্ষ ব্যবহার ছিল, কিন্তু তা ছিল সীমাবদ্ধ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চিত্রকল্পবাদ ব্যবহারের আধিক্য। পরবর্তীকালে বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কবির রচনার মধ্যেও চিত্রকল্পবাদ প্রয়োগের একটি ধারাবাহিকতা বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম ইত্যাদি কবিদের কবিতার মধ্যেও 'Imagism' কম-বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু জীবনানন্দ দাশের কবিতার মধ্যে 'চিত্রকল্পবাদ' কোথাও যেন একটা 'sound with singing instrument'-এর মতো ব্যবহৃত হতে শুরু করল। তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সাথেই তিনি বাংলা কবিতার ইতিহাসে একটি স্থায়ী এবং অনন্য স্থান লাভ করলেন। এই কাব্যগ্রন্থটির অতিতারল্য সত্ত্বেও কবিতাগুলি কোথাও যেন একটা তীব্র ক্লান্তির গাঢ় অন্ধকারে বিপর্যস্ত। জীবনানন্দের কবিতার উপলব্ধি বেশিরভাগ অংশটুকু জুড়েই প্রকৃতি অবস্থান করে কিন্তু তার মধ্যে একটি প্রকাশবৈচিত্র্য সর্বত্র উপস্থিত। এরপরই তিনি লিখেন 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটি, যেখানে তাঁর স্বপ্নময় জগত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। ৩০ টি কবিতা সম্বলিত এই কাব্যটি তাঁর কবিজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

এই কাব্যগ্রন্থটিতে তাঁর পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থটির সমস্ত বৈশিষ্ট্যই উপস্থিত, তবে তার সাথে যুক্ত হয়েছে চরম বিস্ময়কর রুচির আনন্দময় উপস্থাপনা। উদ্দীপনা ও তীব্রতাময় চিত্রকল্পগুলিকে তিনি প্রত্যেকটি কবিতাতেই যথেষ্ট Intensity,Freshness, Evocativeness সহ অঙ্কিত করেছেন। তাঁর কবিতাগুলি আদিম বিষয়ক হয়েও কোথাও যেন একটা নতুন যুগের সুর-মূর্ছনা ও গভীরতা সৃষ্টি করতে পারে এক কথায় যাকে 'Renaissance of Wonder' বলা যেতে পারে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর লেখা 'কবিতার কথা' গ্রন্থে বলেছেন, "কিন্তু নতুন সময়ের জন্য নতুন ও নতুনভাবে নির্ণীত পুরানো মূল্য; নতুন চেতনা ও ভাবে আবিষ্কৃত পুরানো চেতনার যে একান্ত দরকার শিল্পে ও জীবনে; একালের কোন কোন বাঙালি কবি সেটা বুঝতে পেরেছেন বলেই আজকের বাংলা কবিতা স্বভাবতই বিষয় ও রীতি নিয়ে কোন বিষয়টি নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষার একটা অব্যাহত প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছ। এত পরীক্ষার ভেতর দিয়ে সে সিদ্ধি পাওয়া গেল তা খুব বেশি না হলেও, আমার মনে হয় নিতান্ত কম নয়।"[৩] তাঁর লেখা উক্ত কাব্যগ্রন্থটির প্রত্যেকটি কবিতাতেই তিনি কম-বেশি বিভিন্ন রকমের চিত্রকল্প ব্যবহার দ্বারা মৃদু রংয়ের ক্যানভাস সৃষ্টি করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থটির 'বনলতা সেন', কবিতাটিতে তিনি কীভাবে চিত্রকল্পগুলির ব্যবহার করেছেন- সেই দিকটিতেই আমরা একটু আলোকপাত করব।

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটির কবিতাগুলির মধ্যে তিনি সাধারণ, চেতনামূলক, মানবিক, আগন্তুক, পুঞ্জিত, মহান, ভবিষ্যবাদী, বাস্তববাদী, পরাবাস্তববাদী, অভিব্যক্তিমূলক, কালগত, বিজ্ঞানভিত্তিক ইত্যাদি চিত্রকল্পের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁর এক-একটি জটিল-উজ্জ্বল-অপরূপ চিত্রকল্পের ব্যবহার পৃথক পৃথকভাবে জাপানি 'হাইকু' কবিতার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। কোথাও অভিনব বিশেষণ ব্যবহার করে, কোথাও বা প্রতীকী বিশেষ্যের প্রয়োগ দ্বারাই তিনি আপন কবিত্বের স্বরূপকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর লেখা এক একটি কবিতা পাঠকের হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন রকমের অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। সেগুলির মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্নতার সুর বিদ্যমান থাকলেও, তারা পরস্পর-পরস্পরের সাথে কিন্তু চিত্রগতভাবে কোথাও একাকার হয়ে যায়নি। সেই অর্থে বলা যেতে পারে, তাঁর লেখা প্রত্যেকটি কবিতা পৃথক-পৃথক বৈশিষ্ট্য দ্বারা স্বকীয়তায় মহিমান্বিত হতে পেরেছে। বাংলা সাহিত্যের এহেন আশ্চর্যময় সৌরভের কাব্যটি সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কালের পুতুল' কাব্যগ্রন্থটিতে বলেছেন, " 'বনলতা সেন' কিংবা 'হায় চিল'-এর মত নিখুঁত

গীতিকবিতা সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে অল্পই আছে। 'হাওয়ার রাত','নগ্ন নির্জন হাত' ও 'শিকার' -এই তিনটি কবিতা সুস্পষ্ট-আশ্চর্য স্বপ্নের মতো আমাদের সমস্ত মন অধিকার করে— তার জন্য ভাবতে হয় না, চেষ্টা করতে হয় না বরং তার সম্মোহন কাটিয়ে ওঠার জন্যই চেষ্টা করতে হয়।"[৪]

'বনলতা সেন' কবিতাটির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই কবিতাটির মধ্যে একটি প্রাচীন সময়ের সুস্পষ্টতার ছাপ বিদ্যমান যা তিনি 'হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি' বা 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে সেখানে ছিলাম আমি' পংক্তি দুটির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। আবার এই অংশটিতে কবির কালগতচেতনা চিত্রকল্পতার দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে। আবার কবি যখন বলেন, 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন'—তখন শতাব্দীর ক্লান্তি, নৈরাশ্য, অন্ধকার, বেদনা, সংকট, অমঙ্গল, শূন্যতাবোধ সবকিছু যেন কবিকে পরিবৃত করে ফেলে। বনলতা সেনের রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে, কবির উপমা অলংকারের যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা কবিতাটির সমগ্রতা পরিপূর্ণভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' বা 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য' অংশগুলি 'Images in a poem are like series of mirror set' রূপে আমাদের কল্পনার স্তরকে এক দেশ থেকে আরেক দেশে স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হয়। আবার তিনি যখন বলেন-

*"বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'*

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন-" — কবিতার এই অংশে 'পাখির নীড়' চিত্রকল্পটি কেবলমাত্র নিরাশ্রয়ের কোনও একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকেনা, সেটি ভালবাসার গভীরতাকেও প্রকাশ করে। আবার 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে' বা 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল' ইত্যাদি পংক্তিগুলিতে কবির চিত্রকল্পবাদী ইন্দ্রিয়জচেতনার ভাবাবিষ্টতার অভিব্যক্তি দ্বারা সৃষ্ট কল্পনার প্রতিমূর্তি আমাদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এই সকল সিনেসথিশিয়া পাঠক হৃদয়ে চিত্ররূপময়তা থেকে এক অপূর্ব অনুভূতির সৃষ্টি করে। আবার শব্দচিত্রকল্পগুলির বহুল ব্যবহারে কবিতার মধ্যে কবি তাঁর পরিচিত জীবনের অন্য একটি পারসনিফিকেশনমূলক চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন। রূপকধর্মী চিত্রকল্পগুলির ব্যবহার দ্বারা তাঁর কবিতার ব্যঞ্জনা পাঠকচিত্তে বিশ্লেষণাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তবুও দিনের শেষে, জীবনের শেষে ক্লান্ত জীবন চায় এক টুকরো অবসর আর অন্ধকারের মধ্যেই তিনি এইরূপ জগতের সন্ধান পান। তাঁর কবিতার মধ্যে চিত্রকল্পের অধিক

ব্যবহার কখনোই কবিতাগুলিকে দুর্বল বা অতিরঞ্জিত করে তুলেছে বলে আমাদের মনে হয় না, বরং এ কথা বলাই যুক্তিযুক্ত, তাঁর কবিতার নিতান্ত সাধারণ চিত্রকল্পগুলির ব্যবহার ছাড়া হয়তো কবিতাগুলির মধ্যে এহেন ব্যঞ্জনা যথাযথভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব হতো না।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলির মধ্যে মূল চিত্রকল্প এবং সহযোগী চিত্রকল্পসমূহ কোথাও বা ইন্দ্রিয়জ কোথাও বা বস্তুগত। তবে তারা একটির সাথে আরেকটি মিলিত হয়ে তথা সম্পৃক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ চিত্ররূপময়তার সৃষ্টি করতে পেরেছে। তাঁর প্রবর্তিত সাবলাইম চিত্রকল্পগুলো মহাকাব্যিক চিত্রনায়ক সৃষ্টি করেছে আর ফিউচারিস্টিক চিত্রকল্পগুলো পৃথিবীর পরিবর্তনময়তা, চলমানতা এবং গতিময়তাকে প্রকাশ করেছে। আবার এক্সপ্রেশনিজম বা অভিব্যক্তিবাদ দ্বারা জীবনের প্রতিটি দিককে এক-একরকমভাবে কবি চিত্রকল্পবাদী রূপে অঙ্কন করেছেন। এই ধরনের চিত্রকল্পগুলি ব্যবহারে বোঝানো হয়েছে, জীবনের এমন কিছু জটিলতা ও সমস্যার তীব্রতা বা আবেগ আছে- যার কোনো স্থায়ী সমাধান হয় না। মানবজীবনের অদ্ভূত এক-একটি অভিব্যক্তির অস্পষ্টতা-ধূসরতা-ব্যঞ্জনাময়তা এই সকল চিত্রকল্পের দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে। আবার কবির কালগতচেতনা অতীত এবং ভবিষ্যৎ সময়ের মধ্যে একটি মেলবন্ধন তৈরি করে। বাস্তববাদী এবং অবচেতন মনের থেকে উত্থিত পরাবাস্তববাদী- এই দুই ধরনের বিপরীত ধারার সমান্তরাল ব্যাখ্যা দ্বারা তাঁর কবিতাগুলি গভীর থেকে গভীরতর আবেশময়তার সৃষ্টি করেছে। তাঁর কবিতার চিত্রকল্পগুলি যথাযথ শব্দের অপরূপ বন্ধনে ও যুগচিত্রের অভিজ্ঞতায় অনুপুঙ্খতা লাভ করেছে। চিত্রকল্পময়তা দ্বারা কবিতার বর্ণনায় কোথাও তিনি আত্মনিমগ্ন, কোথাও বা ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য প্রবলভাবে আকাঙ্খিত। চিত্রকল্পের ব্যবহারের আবেগময় পথে কবির অলৌকিক মানসিকতার প্রকাশও কোনো কোনো কবিতার মধ্যে লক্ষিত হয়েছে।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যগুলিতে সচেতনতা ও অচেতনাতার বিচিত্র চিত্র তার বিষন্ন কবি প্রাণেরই ক্ষরণমাত্র। কখনও বা তিনি ব্যর্থতায় নিমজ্জিত হয়েছেন, কখনও বা অমরত্বের শীর্ষে অধিষ্ঠান লাভ করেছেন। অথচ বিস্ময়কর একটি বিষয় হল, তিনি পয়ার ব্যতীত অন্য কোন ছন্দই তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেননি। সেই অর্থে 'বনলতা সেন' কাব্যের কবিতাগুলিতে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ জীবনের পরিচিত সাংসারিক সুখ-দুঃখ, ঘাত-প্রতিঘাতের আত্মনিষ্ঠস্বরূপ বিদ্যমান। তাঁর কবিতা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়, বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা সেগুলি বোঝা যায়না। এই বিষয়ে নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, "জীবনানন্দ বারবার আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হবেন তার রোমান্টিক মনন, আত্মমগ্নতা, বিশিষ্ট ভাষারীতি এবং ছন্দ-স্বাতন্ত্র্য, শব্দ ব্যবহারের নিজত্ব, প্রতীক এবং চিত্রকল্পের প্রয়োগ, জীবনবোধের মৌলিক স্তরের ক্রমোন্নয়ন ও পরিণতি, এগুলো নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হওয়ার জন্যে আরও অনেক চিন্তা নিয়োজিত হবে- অনেক প্রদীপ্ত ভাষ্যকার আসবেন। জনপ্রিয়তার মূলে কোনও কবির কোনও মৌলিক দুর্বলতা আছে কিনা, নিরাবেগ বুদ্ধি তাও নির্ণয় করে দেবে।"[৫] তবুও তাঁর কবিতার চিত্রকল্পগুলিতে মননের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবনাপুঞ্জ যখন একাত্মতা লাভ করে, তখন তা পাঠক হৃদয়ে এক অনাবিল স্বপ্নের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। বাস্তব জগত থেকে সৃষ্ট ক্রিয়াশীল সত্ত্বার সৃজনময়তা তাঁর কবিতায় দীপ্যমান। কবি জীবনানন্দের সৃষ্ট প্রতিটি চিত্রকল্পই জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত। কিন্তু সেগুলি প্রচলিত হয়েও যেন কোথাও অভিনব এবং অপ্রচলিত রূপে বিদ্যমান। তাই জীবনানন্দ দাশ কবি রূপে যতটা না তাত্ত্বিক, তার থেকে অনেক বেশি চিত্রপ্রতিমা-নির্মাণকারী এবং কল্পনা-বিলাসী, একথা সাহিত্য প্রেমীদের স্বীকার করতেই হয়।

**তথ্যসূত্র :**


১. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, বাংলা কবিতার কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর ২০০০, পৃ. ৮৯

২. মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার,বাংলা কবিতার ধারায় চেতনা ও চিত্রকল্পের বিবর্তন, ২য় খণ্ড, সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার(সম্পা.), রত্নাবলী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৩, পৃ.১৬১

৩. দাশ জীবনানন্দ, কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, ১৩৪৫, পৃ.১২৫-১২৬

৪. বসু বুদ্ধদেব, কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিসার্স, চতুর্থ সংস্করণ,বৈশাখ ১৪১৭, পৃ.৩৬

৫. ত্রিপাঠি দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ৬৭

# কিন্নর রায়ের ভাবনার অভিনবত্বে দেশ-কাল-সময় ও সমাজ

কালিপদ বর্মন
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

**বিষয় সংক্ষেপ :** দেশ-কাল-সময় ও সমাজ এই চারটি বিষয় পস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত, জড়িত। কোনো একটিকে বাদ দিয়ে অন্য আরেকটিকে ভাবা যায়না। ফলে একজন আখ্যানকার যখন আখ্যান নির্মাণ করেন তখন সচেতন শিল্পী হিসেবে তিনি তুলে আনেন দেশ-কাল-সময়-সমাজ ও দেশের মানুষ। দেশের মানুষ বাদ দিয়ে যে দেশ হয়না- কিন্নর রায় তাঁর আখ্যানে বারবার এই ধ্রুবকটিকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন। দেশের মানুষ, সমাজ, সময় এবং দেশ-কাল সবই তাঁর লেখায় মিশেছে একটি বিন্দুতে। তাঁর দীর্ঘ লেখক জীবনে তিনি দেশের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সেখানকার মানুষদের স্পর্শ করার এবং ভূপ্রকৃতিকে ছোঁয়ার চেষ্টা করেছেন। এইজন্য তাঁর আখ্যানে বারবার ঘুরেফিরে আসে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং মানুষ। প্রকৃতি-পরিবেশ-সমাজ ও মানুষকে স্পর্শ করতে করতে তিনি এগিয়েছেন নিজস্ব ধ্রুপদিয়ানার ভঙ্গিতে এবং সেই সঙ্গে মিশেছে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, দার্শনিক চিন্তা ও স্বপ্ন কল্পনা। মূলত তাঁর লেখায় নায়ক-নায়িকা কোনো ফ্রেমবন্দী চরিত্র হিসেবে আসেনা বরং তাঁর আখ্যানে উঠে আসে সময়ের নিগূঢ় বর্ণমালা। যে বর্ণমালাকে সম্মান জানিয়ে এই নিবন্ধটি লেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

**সূচক :** মানুষ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, সংগ্রাম, সাম্যবাদ।

দেশ বলতে কী বোঝায়? দেশ মানে কী কোনো মানচিত্র বা একটা ম্যাপ- যার এখানে পশ্চিমবঙ্গ, ওখানে বিহার, এখানে আসাম বা ওখানে উত্তরপ্রদেশ? আমি ভারতবর্ষের কথা ধরে বলছি বা পৃথিবীর মানচিত্র খুলে এখানে ভিয়েতনাম, ওখানে চীন, এখানে মঙ্গোলিয়া, ওখানে রাশিয়া, এখানে ইংল্যান্ড, ওখানে আমেরিকা- এটাই কী শুধুমাত্র একটা দেশের ধারণা? না তা একেবারেই নয়। দেশ মানে একটি বিপুল চেতনা, বিপুল ভাবনা যে ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছিলো, যে ভাবনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষ, সূর্য সেন, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম বসু, চন্দ্রশেখর আজাদ, উধাম সিং বা স্বামী বিবেকানন্দদের ছিলো কিংবা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, রাজা রামমোহন রায়,

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে ভাবনায় আমাদের ভাবিত করতে চেয়েছেন। সেই ভাবনারই একটা আলোর ইশারা বাংলা ভাষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কথাকার কিন্নর রায়ের জীবনের নানা ক্ষেত্রে আছে। তাঁর লেখার মধ্যে ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের চিন্তা চৈতন্য এক হয়ে যেতে থাকে। দেশ-কাল-সময় ও সমাজ কে বাদ দিয়ে তিনি লিখতেই পারেননি। আমরা জানি বিপুল দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে স্কুলে পড়ার সময়েই প্রায় ষোলো-সতেরো বছর বয়সে সত্তরের উত্তাল রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর দুচোখে তখন সমাজ বদলের স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্ন পূরণের তাগিদেই তিনি ঘাড়ে বন্দুক ঝুলিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে লেখাপড়া, ঘরবাড়ি সমস্ত ছেড়ে বেড়িয়ে পরেন। স্বপ্ন দেখতেন একটা সুন্দর সুখী ভারতবর্ষের- যেখানে সমস্ত মানুষ খেতে পাবে, সকলের জন্য সমান স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে, ধনের সমবণ্টন হবে এবং যেখানে গরীব মানুষদের থাকার জায়গার কোনো অভাব হবে না। সেই সব টালমাটাল ঝড় ঝঞ্ঝাময় দিনে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মাশুল হিসেবে বারবার তাঁকে জেলেও যেতে হয়েছে। তাঁর দাদামশাই হরিপদ রায় তিলকের গীতা রহস্য, কৃষ্ণের গীতার ওপর ভাষ্য ব্যাখ্যা করে তাঁকে শোনাতেন। হরিপদ রায়ের দাদা শশধর রায় ছিলেন বরিশাল শঙ্কর মঠের অনুগামী প্রজ্ঞানানন্দজীর শিষ্য। পৈতের ঘর থেকেই তিনি নাকি সন্ন্যাস নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। 'যুগান্তর' দলের সদস্য এই মানুষটি বছরে নমাস জেলে কাটাতেন। তাঁর মা গায়ত্রী রায় ছোটবেলা থেকেই তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের গল্প শোনাতেন। তাঁর বাবা অমরনাথ রায় ছোটবেলায় তাঁকে নিয়ে যেতেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বড় বড় নেতাদের বক্তৃতা শোনাতে। ফলে একটা রাজনৈতিক বাতাবরণ ছোটবেলা থেকেই তিনি পেয়েছেন এবং সত্তর দশকের সেই উত্তাল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে লেখার উপাদান যুগিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে যে কালখণ্ডের মধ্য দিয়ে আমরা গেছি যেমন দাঙ্গা, দেশভাগ, নকশাল আন্দোলন, বাবরি মসজিদ ভাঙার পর দেশজুড়ে এবং দেশের বাইরেও যে ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি কিন্নর রায়কে ব্যাথিত করেছে, বিচলিত করেছে এবং তিনি ভেবেছেন মানুষের কথা, মানুষের কষ্টের কথা কিভাবে বলা যায়। কেননা তিনি মনে করেন বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ নিয়ে যে সামান্য লেখালিখি হয়েছে তাতে দেশভাগের যন্ত্রণার কথা নেই, সবেই ওপর ওপর লেখা। তুলনায় পশ্চিমাঞ্চলের সাদাত হোসাইন মাণ্ট, ইসমাত চুকতাই, ভীষ্ম সাহানি, রাজেন্দর সিং বেদি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে দাঙ্গা, দেশভাগকে বুনেছেন। কিন্নর রায় দেশকে জানার জন্য বা ভারতবর্ষকে

নতুন করে আবিষ্কারের নেশায় একজন পরিব্রাজকের মতো দেশের বিভিন্ন কোণে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এমনকি ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন মেলায় যেমন কুম্ভমেলা, কেন্দুলির বাউল মেলা, পাথর চাকুরির মেলা, পীর গোরাচাঁদের মেলা, শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় তিনি বারবার গেছেন। নানা জায়গায় এভাবে ঘুরে বেড়ানো, যখন তখন বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পরা, পকেটে পয়সা নেই, বিনা টিকিটে রেলগাড়িতে পৌঁছে গিয়ে রাস্তায় গাছতলায় শুয়ে পড়া বা বিচিত্র মানুষজনের সঙ্গে মেশা- সব মিলিয়ে একটা অভিযাত্রা, অভিঘাত তৈরি হয় তাঁর মনের ভেতর। তিনি দেশের মানুষ, দেশের ধূলি ও দেশের কষ্টকে অনুভব করতে পেরেছেন। তাঁর মনে হয়েছে যদি আমরা আমাদের দেশকে ঠিক মতো জানতে পারি, যদি স্বদেশ চেতনার কথা সঠিকভাবে বলতে পারি তাহলে কোনো না কোনো একদিন একটা প্রত্যয় তৈরি হবে মানুষের মধ্যে। যে প্রত্যয় নিয়ে ভবিষ্যতে মানুষ এগোবেন স্বপ্ন ও কল্পনার মধ্যে- যেখানে গড়ে উঠবে সুস্থ সাম্যবাদী সমাজ। তিনি তাঁর সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্বপ্ন-কল্পনা মিশিয়ে একটি শিল্পের অবয়ব তৈরি করেন। এই লেখকের ধারা এবং গতিপথ সম্পূর্ণত ভিন্ন।

কিন্নর রায়ের লেখার মধ্যে দেশ-কাল-সময়ের একটা দীর্ঘ যাত্রা একেবারে শুরু থেকেই আমরা দেখতে পাই অর্থাৎ তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘কাছেই নরক’ যা জেল জীবনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা। পাশাপাশি তিনি দেখাতে চেয়েছেন কিভাবে দেশ-কাল-সময় বদলাচ্ছে। তাঁর প্রথমদিকের ‘রথযাত্রা’, ‘ভোজ’ প্রভৃতি ছোটগল্পেও দেশের মানুষ, দেশের ধূলি, দেশের কষ্টকে প্রাধান্য দিয়েছেন কেননা তিনি মনে করেন দেশ তো সমাজের ওপর নির্ভর করে, যদি সে সমাজ জাগ্রত না থাকে তাহলে সেই দেশ উপস্থিতির দিক থেকে বড় হবে কি করে? ফলে তাঁর লেখায় দেশ এগিয়ে থাকে, দেশ কথা বলে, দেশ জাগরিত হয়, দেশ জাগরিত হতে হতে অন্য অনেক ধরণের বার্তা বা সংলাপ বেড়িয়ে আসে। তিনি বরাবরই বলেছেন যে লেখাটা হচ্ছে একটা দীর্ঘ জার্নি এবং তাঁর লেখা শুরুর কোনো সম্ভাবনা নেই অর্থাৎ শুরুটা যে কোনো জায়গা থেকে হতে পারে। যেখান থেকে পাঠক নব নির্মাণে দ্বিরালাপ করতে পারবে, কথা বলতে পারবে এবং সেটাই হচ্ছে কিন্নর রায়ের লেখার অন্যতম প্রয়াস। তাঁর ‘মৃত্যুকুসুম’ উপন্যাসে একটি রহস্যময় মায়াগাছ প্রতি রাতে জেগে ওঠে জলাশয়ের মধ্যে- যে জলাশয়টি বহুদিন আগে পচিয়ে দেওয়া হয়েছে। সত্তরের দশকে নিহত তিনটি নকশালপন্থী যুবক প্রতিরাতে সেখানে এসে বসে এবং মৃত সরস্বতী মিদ্দের মদের ঠেক

থেকে মদ কিনে খায়, কারণ তারা যে সময় রাজনীতি করতেন তখন মদ খাওয়ার কোনো উপায়ই ছিলোনা। তাই এখন প্রতিরাতে তারা এখানে এসে আড্ডা জমায়, কখনো নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতা নিয়ে তাদের মধ্যে তুমুল তর্ক হয়। কখনো আবার নকশাল আন্দোলনের প্রভাব কেনো স্তিমিত হয়ে পড়লো তা নিয়ে গল্প করতে থাকে। গল্প কিছুটা এগোনোর পর মায়াগাছে বাস করা রুপকথার ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী এবং সাপ বলে ওঠে এ গল্প ঠিক নয়, বলে তারা আরেকটা নতুন গল্প বলতে আরম্ভ করে। এভাবে তাদের গল্প চলতেই থাকে। এই 'মৃত্যুকুসুম' উপন্যাসে পুনর্নবা শাক যেমন বারবার বেঁচে ওঠে বা যেভাবে বেঁচে ওঠে দূর্বা ও অপরাজিত লতা, সেভাবে বাঁচতে থাকে মানুষের সমস্ত রকম অভীপ্সা, ইচ্ছে, লড়াই, সংগ্রাম, পরাজয় ও জয়। ফলে এই সমস্ত কিছুকে নিয়ে একটা অভিনব আঙ্গিকে প্রায় মহাকাব্যিক বিস্তার ও দ্যোতনায় তিনি লিখে গেছেন এই সময়ের শব্দলিপি। অর্থাৎ গোটা পৃথিবী জুড়ে যা হচ্ছে যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে, সেখানে মাফিয়াদের উৎপাত বেড়েছে, সেই সঙ্গে অস্ত্রের ব্যবসা, হিটলারের জীবন কথা, নকশাল আন্দোলনের পর ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা, উত্তরবঙ্গের কথা ফুটে উঠেছে এখানে। ফুটে উঠেছে আরও বহু বহু বহুতর জীবনের কথা। যেমন জেবা নামে একজন পাকিস্তানি রিপোর্টারের কথা আছে। জেবার বাবা ছিলেন একজন পীরের মরিদান যাকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয়। সেইসঙ্গে যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে চেগেভেরার কথোপকথন যে রাষ্ট্র কী, হিংসা কী, কোন ভায়লেন্স কে সমর্থন করা যায় আর কোনটাকে সমর্থন করা যায়না? এই সমস্ত মিলিয়ে একটা গোটা ভারতবর্ষ শুধু নয়, তিনি গোটা পৃথিবীর ছবি এঁকেছেন।

'শ্রীচৈতন্যকথা' নামক মহা আখ্যানে নিমাইয়ের পরিবার অর্থাৎ দাদা বিশ্বরূপ, মা শচী দেবী, বাবা জগন্নাথ মিশ্র ও দাদামশাই নীলাম্বর চক্রবর্তীর কথা ধারাবাহিক ভাবে তুলে ধরেছেন। লেখক নবদ্বীপ, শ্রীহট্ট, নদীর ধারের শ্মশান, সারনাথের বৌদ্ধবিহার- এ সকল স্থান গ্রন্থটির পটভূমি গড়ে তুলতে যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা সমসাময়িক নয়, আবহমানকালের। জগন্নাথ মিশ্র ও শচী দেবীকে সমাজের চালচিত্রে নরম মাটির তাল দিয়ে বানানো মূর্তি করে রাখেননি বরং সমগ্র আখ্যান জুড়ে তাঁরা আটটি সন্তানের মৃত্যু পেড়িয়ে চলেছেন জীবনের পথে। ৪৩২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে লেখক তুলে ধরেছেন সমাজের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের বিপন্নতার দিকগুলি। পাঠককে শ্রীচৈতন্যের জন্ম আখ্যান শোনানোর মধ্য দিয়ে জন্ম মুহূর্তটাকে যেন বেঁধে রাখতে চেয়েছেন চৈতন্যের পারিপার্শ্বিক জীবনগুলোর চলমানতার গল্প শুনিয়ে। এই আখ্যান

একটি সময়কালের পুনর্নির্মাণ, যে কাল আজকের সংকট মুহূর্তে নিঃসন্দেহে ফিরে দেখার যোগ্য। কেননা সেই কালের আটপৌরে জীবনের সাথে মিলেমিশে যায় একালের সমাজ-দর্শন।

‘নিরপেক্ষ’ উপন্যাসে একজন অন্ধ কেরোসিন তেল ডিলার মনিবাবুর পরিবারের কথা উঠে এসেছে। মনিবাবু জন্মান্ধ নন, জীবনের একটা পর্যায়ে এসে অন্ধ হয়ে যান। ফলে জীবনের রুপ, রস, গন্ধ তিনি জানেন না, তার বউও তাকে পাত্তা দেয়না শুধু টাকার জন্য কাছে আসে। মনিবাবু আসলে একটা প্রতীক হিসেবে হাজির হয়েছেন উপন্যাসে- তার যে অন্ধতা সেটা শরীরী অন্ধতা ঠিকই কিন্তু কিন্নর রায় দেখাচ্ছেন মানুষ ক্রমশ ধর্মান্ধ হয়ে যাচ্ছে। ধর্মের নামে অন্ধতা প্রকট হচ্ছে। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদে কিভাবে আর এস এস ক্যাম্প তৈরি হচ্ছে এবং কিভাবে প্রকারান্তরে তা বাড়ছে ইসলাম ধর্মাবলম্বী প্রধান এলাকায় তার বিবিধ বর্ণনা এখানে আছে। সেই সঙ্গে ব্রহ্মপুর অঞ্চলে যেভাবে এক শ্রেণির মানুষ ভেতরে ভেতরে উঠে পরে লেগেছে মুসলমানদের তাড়ানোর জন্য এবং তার ফলে সেখানে যে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে সেটাকে তিনি প্রতীয়মান করেছেন এই উপন্যাসে।

‘দাঙ্গা’ উপন্যাসটি ১৯৬৪ সালের পটভূমিতে লেখা। উপন্যাসে বর্ণিত আশ্রাফ আলি সরকার খুবই সাধারণ এবং সৎ একজন মানুষ। তার একটি জুতোর দোকান আছে যা ভালো করে চলেনা। সে দোকানে খদ্দের যতনা আসে তার থেকে ধার এবং আড্ডা হয় বেশী। সেখানে বসে বসে আশ্রাফ আলি তাদের ছোটবেলায় দেখা ৬৪ সালের দাঙ্গার কথা ভাবে, পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে। মাঝে মাঝেই তার মনে হয় এই যে জীবন যাপন তাতে সে হয়ত ক্রমশ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সে লক্ষ করেছে ইসলাম ধর্মের মানুষদের তৈরি করা সবেদা বাগান, ফুল খেত প্রভৃতি কেটে হিন্দু প্রমটাররা সেই জমিতে কিভাবে বাড়ি তৈরি করেছেন আর সেই বাড়িতে হিন্দুরা বসবাস করেছেন। দাঙ্গার সময় সে দেখেছে তার বাড়ি থেকে কিভাবে জিনিসপত্র নিয়ে গেছে দাঙ্গাকারীরা এবং কিভাবে ভয়ার্ত মুর্গি ওই শীতের সময় ভয়ে লুকিয়ে ছিলো একটা গর্তের মধ্যে। এই সমস্ত স্মৃতি বিজরিত মায়া এবং ঘোরের মধ্যে আশ্রাফ আলি বেঁচে থাকে। সে ভাবে যদি আবার দাঙ্গা হয়, যদি আবার আক্রমণ হয় তাহলে তারা কী করবে! এই দেশ ছেড়ে কি চলে যাবে? দাঙ্গার ফলে তো তাকেও একবার গৃহহারা হতে হয়েছিলো সাময়িক কালের জন্য, তাই গৃহ হারাবার যন্ত্রণা সে অনুভব করতে পারে! এই ভুমিত্যাগ ও ভূমিচিন্তা আশ্রাফ আলিকে বারবার পীড়িত করে। কিন্নর রায় এই

উপমহাদেশের ধর্মীয় সংকট ও ধর্মীয় অবস্থানকে বিবৃত করার চেষ্টা করেছেন তাঁর 'দাঙ্গা' উপন্যাসে। মূলত ১৯৬৪ সালের ভয়াবহ দাঙ্গা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখালিখি হয়নি সেজন্যই কিন্নর রায়ের এই উপন্যাসটি অনেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন।

'স্বপ্নপুরাণ' উপন্যাসে ইসলামিক মৌলবাদের কীভাবে উত্থান হচ্ছে, ওসামাবিন লাদেন কীভাবে ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে আফগানিস্থানে উঠে আসা তালিবানদের সঙ্গে আফগান মানুষদের সংঘর্ষ বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা অঞ্চল যা পরে কলকাতার মধ্যে ঢুকে পরে তার একটা মানচিত্র এঁকেছেন লেখক। সেখানে শিবু নামের একজন পাইকারি ব্যবসাদার আছেন যে একটি সবজির ঠেক চালায়। রোজই তার দোকানে বড় করে আড্ডা বসে, সেখান থেকে নানারকম গল্প পল্লবিত হয়, পল্লবিত হতে হতে স্বপ্ন তৈরি হয়, নতুন পুরাণের নির্মাণ হয়, পুরাণকে নস্যাৎও করা হয়, নস্যাৎ করে আবার নতুন আর একটি পুরাণ তৈরি করা হয়। কারণ যে কাহিনির মধ্য দিয়ে আমরা যাই সেই কাহিনির বিবৃতিতে আর একটা কাহিনি সূত্র লেখক তৈরি করেন, সেজন্যই আফগানিস্তানের তোরাবোরার প্রভাব আসে, ওসামাবিন লাদেনের কথা আসে এবং আফগানি যোদ্ধাদের কথাও উঠে আসে। সার্বিকভাবে গোটা দুনিয়াজুড়ে যে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান- কিন্নর রায় তার একটা চিত্রভাষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আখ্যান নির্মাণের মধ্য দিয়ে।

'অগ্নিপুরুষ' উপন্যাসে পার্সিদের জীবনের দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে অর্থাৎ যারা ইরান থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কিন্নর রায় এই উপন্যাস লেখার আগে প্রখ্যাত যন্ত্রবিদ ভি বালসারার সঙ্গে বহুবার দেখা করে পার্সি জীবন সম্পর্কে জেনেছেন এবং কলকাতার বেশ কয়েকটি পার্সি পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। আবার কলকাতার বাঙালি বৌদ্ধদের যে ক্রাইসিস তা বর্ণিত হয়েছে তাঁর 'তুষিত স্বর্গের আলো' নামক উপন্যাসে। 'মহাজাগতিক' ও 'নির্বাণ' নামের ছোটগল্প দুটিও বাঙালি বৌদ্ধ জীবন নিয়ে লেখা। ভারতের শেকড় খুঁজতে গিয়ে তিনি শুধুমাত্র একটি ধর্মকে প্রাধান্য দেননি, তিনি একই সঙ্গে ইসলাম, খ্রিস্ট, জৈন, বৌদ্ধ, পারসিক প্রভৃতি সমস্ত ধর্মকে তুলে এনেছেন তাঁর কলমে।

'রেড করিডরের জানালা' নামক উপন্যাসে রয়েছে মাওবাদী নেতা কিষানজিকে দুপক্ষ থেকেই হত্যার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তার একটা শিল্পিত উচ্চারণ। কিষানজি একজন যোদ্ধা হিসেবে, সমাজচ্যুত ও স্বপ্নদেখা একজন মানুষ হিসেবে এই

আখ্যানে উপস্থিত হন। যদিও কিষানজির রাজনীতিকে কিন্নর রায় সমর্থন করেননা কিন্তু কিষানজির যে বিবরণ তা মহাভারতের কর্ণের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। অভিশাপের ফলে কর্ণের রথের চাকা যেভাবে মেদিনী গ্রাস করে এবং তিনি দিব্যাস্ত্রের নাম ভুলে যান তার একটা বিবরণ এবং বয়ান লেখক এখানে উপস্থাপিত করেন। তথাকথিত 'জঙ্গলমহল' কে লেখক 'জঙ্গলমহল' বলে বিশ্বাসই করেন না, তিনি মনে করেন মানুষ শহরেও যেমন থাকেন তেমনি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জায়গাতেও থাকেন ফলে হঠাৎ একটা অঞ্চলকে জঙ্গল মহল বলে ঢেকে দেওয়ার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয়না লেখকের। তিনি মনে করেন এরা সেই ব্রিটিশ আমলের একটা ধারাবাহিকতার ফসল। 'রেড করিডরের জানালায়' এই বিষয়টি সম্পূর্ণত ফুটে ওঠে একটি কল্পনা ও ভাবনার আঙ্গিকে।

কিন্নর রায়ের 'ধর্মসংকট' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় সেখানে কোনো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যাপার নেই, আছে সাম্প্রদায়িকতার উৎস খোঁজার চেষ্টা। আসলে আমাদের ঘৃণাটা কোথায়? অবিশ্বাস কোথায়? কোথায় আমাদের ভেতরের ফারাক? এই প্রশ্নগুলো একটা আবহ হিসেবে 'ধর্মসংকট' গল্পগ্রন্থে উঠে এসেছে। 'ধর্মসংকট' গল্প সংকলনের একেবারে শুরুতে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'অদ্ভুত আঁধার-একি সাময়িক?' শিরোনামে যা লিখেছেন তার থেকে কয়েকটি বাক্য তুলে ধরলাম- 'কিন্নর রায়ের গলার স্বর নামানো, এই গোলমাল আর ডামাডোলে কতটাই বা চিৎকার সমীচীন হতো, কিংবা শব্দের বিশৃঙ্খলার মধ্যে কানে পৌঁছুতো? অনেক সময় তুলকালাম শব্দ দূষণের ভেতর ফিশফিশ করে বলা কথাও অন্য আরেক রকম আয়তন লাভ করে। কিন্তু নিছক এই নিচু গলায় বলার কৌশলই যে কিন্নর রায় আয়ত্ত করেছেন তা নয়, পাঠক দেখতে পাবেন তিনি অতীব তুচ্ছ খুঁটিনাটিও একের পর এক সংকলিত করে যাচ্ছেন ..... এই গল্পপর্যায় আদ্যপ্রান্ত পড়ে যাবার পর মনে হয়, সত্যি এদের দরকার ছিলো, এই এতসব অনুপুঙ্খের। কেননা সাম্প্রদায়িকতার নাগপাশ কোনো শূন্যের থেকে এসে আস্টেপৃষ্ঠে আমাদের বাঁধছে না, বেঁধে ফেলেছে একটা সময়ে সমাজে- আর সেই সমাজটার চেহারা ছিরি ফুটিয়ে তোলবার জন্যই হয়তো মন্তব্য ব্যতিরেকেই শুধু খুঁটিনাটিগুলো জড়ো করে রাখা জরুরি ছিল। .....তাঁর চরিত্ররা এসেছে সমাজের নানা স্তর থেকে, তাদের বয়েস বা অভিজ্ঞতাও ভিন্ন, শিক্ষারও স্তরভেদ আছে তাদের যেমন আছে জীবিকার স্তরভেদ, কিন্তু সব সত্ত্বেও তারা শিকার হয়ে গেছে অবস্থার, সাম্প্রদায়িকতা ডালপালা ছড়িয়েছে জীবনযাপনের সমস্ত আনাচে-কানাচে'

আসলে 'ধর্মসংকট'- এর সবকটি গল্পই হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের টানাপোড়েন নিয়ে, এখানে কোনো তথাকথিত বানানো সম্প্রীতি নেই। কিন্নর রায়ের সাহিত্য যাত্রাটা কিন্তু স্বদেশ যাত্রাই। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম যে ভাবনায় আমাদের ভাবিত করতে চেয়েছেন, সেই ভাবনারই একটা আলোর ইশারা কিন্নর রায়ের জীবনের নানা ক্ষেত্রে আছে। সেই ইশারাটুকু তিনি যেখানে পান সেখানে তাঁর কথা বলতে সুবিধে হয়। না পেলে তর্কও করেন এখনো। তবে লেখার মধ্যে তিনি কখনও পিছিয়ে আসেননি। ফলে তাঁর লেখা এভাবেই একটা সংলগ্ন সাঙ্গীকরণ হয়ে দাঁড়ায় যেখানে ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের চিন্তা চৈতন্য এক হয়ে যেতে থাকে। একজন লেখক যখন লেখেন তখন তিনি স্বাভাবিক ভাবেই দেশ কাল সমাজ সময় নিরপেক্ষ হতে পারেন না। তবে এর বাইরে গিয়েও অনেকে লেখেন কিন্তু সেই চর্চার সঙ্গে কিন্নর রায়ের যে আখ্যান চর্চা তার কোনো মিল নেই ফলে একজন লেখকের ভূখণ্ড ও তাঁর ভাবনা চৈতন্যের কথা আবিষ্কার করতে করতে এক নতুন দিগন্তের উদ্ভাস পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. রায় কিন্নরঃ মৃত্যুকুসুম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং।
২. রায় কিন্নরঃ শ্রীচৈতন্যকথা, জানুয়ারি ২০১৮, দে'জ পাবলিশিং।
৩. রায় কিন্নরঃ নিরপেক্ষ, জানুয়ারি ১৯৯৮, দে'জ পাবলিশিং।
৪. রায় কিন্নরঃ দাঙ্গা, ২০০৩ কলকাতা বইমেলা, এন. ই. পাবলিশার্স।
৫. রায় কিন্নরঃ স্বপ্নপুরাণ, জানুয়ারি ২০০০, দে'জ পাবলিশিং।
৬. রায় কিন্নরঃ অগ্নিপুরুষ, জানুয়ারি ২০০২, দে'জ পাবলিশিং।
৭. রায় কিন্নরঃ তুষিত স্বর্গের আলো, ২০ জানুয়ারি ২০০৬, দে'জ পাবলিশিং।
৮. রায় কিন্নরঃ রেড করিডরের জানালা, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, দে'জ পাবলিশিং।
৯. রায় কিন্নরঃ ধর্মসংকট, ৬ই মে, ১৯৯৩,নবজাতক প্রকাশন।
১০. রায় কিন্নরঃ শ্রেষ্ঠ গল্প, ২৮ জানুয়ারি ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং।

# কাব্য সৃষ্টির ধারায় গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী : অভিনবত্বের বারান্দা

উত্তম বিশ্বাস
সহশিক্ষক, মালোপাড়া উচ্চবিদ্যালয়

উনিশ শতকের কবিকূলের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রসমা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী কাব্যরচনায় আপন অভিনবত্বের গুণে বাংলা কাব্যগগণে দীপ্ত হয়ে আছেন। কাব্যক্ষেত্রে তাঁর অভিনবত্ব দুটি দিক থেকে উল্লেক্ষ্য—এক. উনিশ শতকের কাব্যধারায় বলিষ্ঠ মহিলা কবির আত্মপ্রকাশ দুই. কাব্য রচনায় তাঁর বিশেষত্ব।

তাঁর আত্মপ্রকাশের অভিনবত্বের দিকটি আলোচনা প্রসঙ্গে সেইসময়কার সামাজিক প্রেক্ষাপট একটু বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। আমরা জানি উনিশ শতকের প্রথম থেকেই নানা প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে নারী শিক্ষা ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে থাকে। সেক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তন্মধ্যে বেথুন সাহেব, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় প্রমূখের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদানে শ্মশানসম বাংলায় যে প্রাণ প্রতিষ্টা হয়েছিল তার অব্যাহত গতি বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান। স্ত্রী শিক্ষা প্রচলনের হাত ধরে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলা লেখিকার আবির্ভাব ঘটল। সেই বঙ্গতনয়া গুণী লেখিকারা হলেন-অন্নদাসুন্দরী দেবী, নবীনকালী দেবী, বিরাজমোহিনী দাসী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, রাসসুন্দরী দাসী, নয়নতারা দে, বিনয়কুমারী বসু, রাধারাণী লাহিড়ী, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ। তাঁদের সম্মিলিত লেখনী ধারায় একাধারে আমাদের জঙ্গম সমাজ চলমানতা ফিরে পেয়েছিল অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেইসঙ্গে তাঁরা নারীর আত্মগৌরব সমাজে খানিকটা সুপ্রতিষ্টিত করতে পেরেছিলেন।

নানাবিধ শাস্ত্রীয় সংস্কারে ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কতৃক নির্মীত বিধিনিষেধের নাগপাশে জীবন বাঁধা থাকলেও প্রবল আত্মবিশ্বাস ও দূরাতিক্রম্য সাহসকে পাথেয় করে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী কাব্যচর্চায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ থেকে দূরে থেকে ও অন্তপুরচারিনীর জীবনযাত্রা নির্বাহ করেও তিনি ব্যক্তিগত হৃদয়ের অনুরনণকে কাব্যের আঙিনায় চিত্রণ করলেন।যা একান্তই তাঁর নিজস্ব। সামাজিক প্রতিবন্ধকতার

ধাপগুলিকে অতিক্রম করে, পারিবারিক ও দাম্পত্য পবিত্রতা বজায় রেখে তিনি কাব্যে যে নিজস্ব আকাশ সৃজন করেছেন তা অভিনবত্বের দাবি রাখে। সমকালীন যুগপরিবেশে নিজে একজন মহিলা হয়েও তিনি যে যেভাবে আপন সূক্ষ্ম অনুভূতিকে কাব্যের দর্পণে শিল্পসুষমামন্ডিত করে তুলেছেন তা যথেষ্ট সাহসীয়ানার পরিচায়ক। তিনি সর্বকুসংস্কারমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে আপন মনোধর্মকে কাব্যে ক্রিয়াশীল করেছেন।

তাঁর কাব্যের অভিনবত্বের বিষয়টি পরিস্ফুট করতে গিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কাব্য বিচরণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে আমরা তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা পর্যালোচনা করে বিশেষত্ব নির্ণয় করবো।‘কবিতাহার’ কাব্যগ্রন্থের ‘বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা’ কবিতাটি সেই সময়কার নারী জাতির অবরোধ জীবন নির্বাহের একখানি অসামান্য দলিল।পুরুষশাসিত সমাজে নীতি আবেষ্টনীর মরু ক্ষেত্রে পড়ে বঙ্গমহিলাদের জীবন কীরূপ শুকিয়ে গিয়েছিল তারই বাস্তবনিষ্ঠ বর্ণনা তিনি এই কবিতাটিতে চমৎকার দৃষ্টান্ত সহযোগে দিয়েছেন। নিজের শক্তিতে সমাজে বলীয়ান হওয়ার বাসনা নিয়ে প্রভুত্বকারী পুরুষদের সতর্ক করে লিখেছেন---

“ভাবুন মহাত্মগণ সবে একবার,
চিরদুখী বঙ্গবালা আছে কি প্রকার।
আপনারা সদা কী করেন বাসনা,
চিরদিন সবে মোরা সহি এ যাতনা?”

‘বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা’,/ ‘কবিতাহার’

আবার নারীর দূর্গতির জন্য নারীর মূঢ়তাকেও দায়ী করেছেন। তিনি নিজে একজন নারী হয়ে আত্মকথনে যেভাবে আপন কূলের দোষত্রুটিকে সর্বসমক্ষে নিয়ে এলেন তাতে তাঁর সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক, শৃঙ্খলাপরায়ণ মনের দিকটিকে স্পষ্ট করে তোলে। তাঁর মানসভূমিতে সত্যাসত্যের বিগ্রহ বর্তমান বলে তিনি এই কাজটি করতে পেরেছিলেন।

‘ভারতকুসুম’ কাব্যে তিনি প্রকৃতির উপাদানগুলির সম্বন্ধ নির্ণয়ে অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন। ‘নদীর প্রতি’ কবিতায় তিনি নদীকে ‘রত্নাকর তব স্বামী’ বলে উল্লেখ করেছেন। ‘প্রাবৃট্ কমল’ কবিতায় পদ্মকে রবির প্রণয়ী রূপে কল্পনা করে লিখেছেন---

“এই তো জগতে রীতি, পতি-পার্শ্বে সুখী সতী
আনন্দে দম্পতি ভাসে সুখের সাগরে।
বিরহিণীসম হেরি সুধাই লো তোরে;
প্রণয় কি নাই রবির সংহতি?”

'প্রাবৃট্ কমল',/ 'ভারতকুসুম'

প্রকৃতির প্রতি তাঁর দরদী মনোভাব প্রকৃতির রহস্যময়তার অনাদি ঐশ্বর্যের সংযোগ-সান্নিধ্য-সম্বন্ধ নির্ণয়ে সহায়ক করেছে। তাঁর এইসব মহার্ঘ চিন্তারাজি তাঁর স্বতন্ত্র কাব্যবৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে।

মৃত্যুকে নিজের সমার্থক মনে করে উত্তম পুরুষে তিনি মৃত্যুর যে গুণাবলী তুলে ধরেছেন তা অভিনব। কবিতাটির শুরুতেই তিনি লিখেছেন---

"আহা! সুখ-পূর্ণ অবনী মন্ডলে
আমি মৃত্যু না থাকিলে এই ধরাতলে
পাইত কি শান্তি-সুখ হতভাগা নর?
হত কি ধরণী হেন প্রমোদ-আকর?"

'মৃত্যু',/ 'ভারতকুসুম'

মানুষ মৃত্যুকে যতই ভয় পাক তিনি তাকে 'বিপদের সখী' বলেছেন। মানুষ যখন নিরন্তর রোগ-ভোগের যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়, আত্মসুখপরায়ণতার অতি সংকীর্ণ জীবন উদ্গত অশান্তি দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়, হতাশার ধূর্ণিঝড়ে নিরাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে তখন মৃত্যু এসে মানুষকে বিপদমুক্ত করে। যখন একজন হতভাগা বিধবা দারিদ্র্য-দুঃখে নিজের সন্তানের ক্ষুধা নিবারনার্থে হীন বৃত্তি আশ্রয় করে তখন সমাজ তাকে কুলটা, তস্কর বলে নিন্দিত করে। মৃত্যুই পারে তাঁর এই লজ্জা, পীড়ন, রুগ্ন, ব্যধিত জীবন থেকে মুক্তি দিতে। মৃত্যুর অনুভূতি বিষাদের কালো মেঘ বয়ে আনে এই ধারণাকে তিনি ভ্রান্ত প্রমানিত করলেন। আত্মস্বরূপে তিনি 'মৃত্যু' কবিতায় মানুষের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেছেন---

"তবুও অখ্যাতি মোর কেন এ জগতে?
হায়! হায়! কিছু আমি না পাই ভাবিয়া
কেন নর করে ডর আমায় দেখিয়া?
দেখে যেন মূর্তি মোর – রাক্ষসী আকার।
আমার গমনে কেন উঠে হাহাকার?"

'মৃত্যু',/ 'ভারতকুসুম'

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'অশ্রুকণা' কাব্যের প্রাসাদগুনে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বাংলা কাব্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এই কাব্যখানি শোককাব্য রূপেই বিশেষ পরিচিতি পেয়েছে। এর আগে শোকজনিত কবিতা নানা পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। একজন মহিলা কবি রূপে তিনিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ শোককাব্য রচনা

করলেন। সেদিক থেকে কাব্যটি একটি আলাদা বিশেষত্বের দাবীদার। তাঁর এই কাব্যটি স্বনামে প্রথম প্রকাশ। কাব্যটি প্রকাশের অব্যবহিত পরেই 'The Calcutta Review' যে মন্তব্য করেছিল তা এই কাব্যটির বিশেষত্বকেই প্রতিকায়িত করে। মন্তব্যটি এরকম-

> *"Ashrukana is the history of the soul of a nobel Hindu Women."*

স্বামী নরেশচন্দ্র দত্তের অকালমৃত্যুতে বিরহতুরা হয়ে হৃদয়প্লাবী বিচ্ছেদ যন্ত্রণা নিয়ে তিনি এই কাব্যটি রচনা করেছেন। কাব্যটির নামকরণেও কবি হৃদয়ের শুভ্র বুকে জমে ওঠা অসহনীয় বেদনার কালিমাকে বুঝিয়েছেন।

উনিশ শতকের সামাজিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে একজন মহিলা কবি সর্বসমক্ষে যেভাবে নিজের অশ্রুধারার অন্তরঙ্গ আলোচনা করেছেন তা যথেষ্ট কৃতিত্বের। আপন জনের অকাল প্রয়াণে কবির জীবন কেমন মরুভূমিতুল্য শুষ্কতায় পরিণত হয়েছিল তার গভীর অভিব্যক্তি প্রকাশ লাভ করেছে এই কাব্যে। কম্পিত হৃদয়ের শোকের উত্তাপে হৃদয়াশ্রু প্রথমে বাস্পীভূত হয়েছে পরে হৃদয়-বিদারক আকুলতায় ঘনীভুত হয়ে অশ্রুধারায় পরিণত হয়েছে। জীবনের অপূর্ণতায় উদ্বেল হয়ে তিনি 'উপহার' কবিতায় লিখলেন---

> "এ শোকাশ্রু! নিরাশার যাতনা-গরল-মাখা।
> এ শোকাশ্রু! বাসনার অনন্ত-পিপাসা-মাখা।
> এ শোকাশ্রু! হৃদয়ের উত্তাপ আবাহন।
> এ শোকাশ্রু! জীবনের জন্মান্ত আলিঙ্গন।"
>
> 'উপহার',/ 'অশ্রুকণা'

স্বাভাবিকতার পথ ধরেই একজন মেয়েমানুষের জীবনে কামনা-বাসনার যে ফল্গুস্রোত প্রবাহিত হয় তাকে তিনি গোপন করেননি। করুণ রসের আবহে তিনি কামনা –বাসনার বহ্নিশিখাকে সচেতন প্রজ্ঞার সাথে কবিতায় বিধৃত করলেন। তাঁর এই শোকাশ্রু বাঙ্গালী ঘরের হাজার হাজার যন্ত্রণাবিধুর বিধবা রমনীর শোকাশ্রু। তাই কবিতাটি ব্যক্তিনুভব হয়েও সর্বজনীনতার সীমা স্পর্শ করেছে।

'ধ্রুব' কবিতায় কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী লিখেছেন---

> "কে বলে দেবে গো মোরে, পাব কতদিন পরে?
> নিকটে কি আছে দূরে,কোথা সে আমার!
> অনন্ত নেপথ্য-মাঝে, সে যেন কোথায় আছে!

মাঝে-মাঝে ডাকিতেছে—আয়, আয়, আয়!"

'ধ্রুব',/ 'আশ্রুকণা'

প্রয়াত স্বামীর উদ্দেশ্যে কবি হৃদয়ের এই আর্তনাদ আমাদের উদ্বেলিত করে। কবির বিচলিত মন প্রেমিক পুরুষের উদ্দেশ্যে বারংবার ধাবিত হয়েছে। তাকে নিজের অভিন্ন সত্তা মনে করে 'আমার জীবন যে গো শুধু তোমা-ময়' ('তুমি',/ 'অশ্রুকণা') বলেছেন। এভাবেই জীবনাভূতির দুকুলপ্লাবী ভাবনাস্রোতে তিনি তাকে অমরত্ব দান করেছেন। স্মৃতির মন্দিরে তিনি তাকে দেবতা রূপে পূজা করেছেন। একরকম হালকা আধ্যাত্মিক আবহে তিনি কাব্যে শিবপার্বতীর মঙ্গলসুন্দর বিশুদ্ধ প্রেমের গৌরব ফুটিয়ে তুলেছেন। যা তাঁর কাব্যোৎকর্ষতাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

প্রেমের অপ্রতিরোধ্য শক্তি দিয়ে স্বপ্নে তিনি প্রেমিক পুরুষকে বাঁধতে চেয়েছেন। প্রেমোৎকণ্ঠা নিয়ে তিনি সৌন্দর্যের মোড়কে সাজানো স্বপ্ন কামনা করেছেন। কিন্তু কবির এমনই দুর্ভাগ্য যে সেই স্বপ্নের সান্নিধ্য ভাগ্য পাননি।পূর্ব আদরের স্মৃতিতে মথিত হয়ে তিনি 'স্বপ্ন' কবিতায় লিখেছেন---

"অতীতের রূদ্ধ-দ্বার ভাঙি কি কুহক- বলে,  
গত-সুখ-রঙগুলি  
ধীরে-ধীরে লয়ে তুলি  
টেনে যাও সেই রেখা—আঁধার হৃদয়- তলে!"

'স্বপ্ন',/ 'অশ্রুকণা'

বিরহিনী কবি ধন-সম্পদ-প্রসাধনের উপাসনা করেননি। তিনি প্রিয়কে পূজাপুষ্প করে তুলেছেন। মিলন লীলার অসাধারণ রাগরক্তরূপে তিনি প্রিয়কে বন্দনা করেছেন---

"এস, নাথ এস – এস, চির-নব প্রেমরূপে,  
সজল-করুণ আঁখি, হাসি- বিকশিত মুখে!  
এস হে ব্রক্ষান্ডপতি, এস মৃত্যুর সম্পদ!  
শোকের নয়ন-জলে ধোয়াই কমল- পদ!"

'আবাহন',/ 'অশ্রুকণা'

কবি জীবনসাথীকেই আরাধনার দেবতা করে তুলেছেন। মিলনের সুখবিলাসে তিনি প্রেমবরেষুকে বারবার স্মরণ করেছেন। এই ক্ষণ-জীবনে চিরন্তন প্রেমের বাণীধারায় তিনি প্রেমর নাম জপ করতে করতে তন্ময় হয়ে পড়েন। এভাবেই তাঁর প্রেম প্রগাঢ় ও প্রকৃষ্ট হয়েছে।যা দিগন্তে আকাশের পৃথিবীকে স্পর্শ করার মতোই তাঁদের মিলনকেই

সূচিত করে। আবার ‘শূন্য করিলে যদি এ হৃদয় সুখালয়’ (‘আবাহন’,/ ‘অশ্রুকণা’) উক্তির মাধ্যমে নিজের বিরহ বেদনাকে ব্যক্ত করেছেন। এই বিরহের পূর্বপটে মিলনপূর্ণ প্রেম বজায় ছিল। বিরহ মিলনের এই দ্বৈত পটে তাঁর প্রেম পূর্ণতা পেয়েছে। তাঁর মিলনের স্বপ্নকেন্দ্রিকতা যেমন আমাদের মনে সুরসাম্যের জন্ম দিয়েছে তেমনই বিরহ বেদনার ভাবাচ্ছন্নতা বিচলিত করেছে।

বিরহ বিচ্ছেদের ধাক্কায় মিলন তরঙ্গ বিক্ষুব্দ হয়ে কবিহৃদয়ে মিলনের বেগশক্তি দ্বিগুণ হয়েছে। তিনি বিরহ-ছত্র দিয়ে মিলনবৈরী রচনা করেছেন। কবিহৃদয় থেকে সদা উৎসারিত আত্মিক শুভ্রপরিণামী প্রেমের বিগলিত ধারা কাব্যের ছত্রে ছত্রে ঝরে পড়েছে। মিলনের নিরাকার ঐক্যানুভূতি শেষ পর্যন্ত ক্রন্দনধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। বিরহ-চেতনার আবহে তিনি আসলে মিলন-চেতনাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাঁর রোমান্টিক চেতনায় বিরহ মিলন একই কক্ষে অবস্থান করেছে। বিরহের গভীরতম শোকে তাঁর ভাবতরঙ্গ শেষ পর্যন্ত মরনান্ত হাহাকারে পরিণত হয়েছে। নানা বর্ণের সমারোহে শিল্পকর্মে বৈচিত্র সৃষ্টি করা কোন শিল্পীর পক্ষে কঠিন নয়, কিন্তু একটি বর্নের সাহায্যে শিল্পকর্মে বৈচিত্র সৃষ্টি করা মহান শিল্পী ছাড়া সম্ভব নয়। তাও যদি সেই রঙটি কালো হয় তবে তা আরো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ‘অশ্রুকণা’ কাব্য নির্মাণে সেই দুঃসাধ্য কর্মটি সম্পন্ন করেছেন। যা তার স্বকীয় প্রতিভাকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে।

ভারতীয় কাব্যগগনে অদ্যাবধি নানান কবির ভাবনায় বর্ষা ঋতুর বিচিত্র সমারোহ লক্ষ্য করা গেছে। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীও নিপুন চেতনাপ্রয়োগে সেই ধারাকে কাব্যে স্থান দিয়েছেন। মনোহর কেকাধ্বনিসহ ময়ূরকূল যেমন বর্ষাকে বরণ করে তেমনি কবিও প্রকৃতির কোলে বর্ষার আবাহন করেছেন। বর্ষার আগমনে প্রাণীকূলের হাস্যোচ্ছটাপূর্ণ প্রফুল্লতা প্রকাশ পেয়েছে। ‘আষাঢ়ে’ কবিতায় কবি তারই বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন---

“অনিল স্বন-স্বন, বজর নিপতন,
তিমির দিকে-দিকে চির!
নিবস তরুতল, পথিক দলে-দল
চাতক পুলক গীত;
দিবস নিশিসম, বরষা ঝম-ঝম,
যুবক-যুবতী প্রীত।”

‘আষাঢ়ে’,/ ‘শিখা’

প্রকৃতি ও মানবমনে বর্ষার প্রতিক্রিয়ার বর্ণনায় একাত্ম হয়ে কবির চোখে ঘুম নেমে এসেছে। কবি বর্ষাকে নিছক জড় আবেষ্টনীতে গড়ে তোলেননি। তার নানা স্তরে যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়াকারী শক্তি নিহিত আছে তা কবি অনুমান করতে পেরেছেন। বর্ষা তো শুধুমাত্র উন্মত্ত আনন্দরূপ নয়, তার আরো একটি বিপরীতধর্মী নিজস্ব স্বভাব আছে—সে মানুষের অগাধ নিঃসঙ্গ বেদনাকে জাগিয়ে তোলে। কবির ক্ষেত্রেও তার প্রত্যব্যয় হয়নি। বর্ষার সান্নিধ্যে তিনিও অপরিমেয় বেদনায় নিমজ্জিত হয়েছেন। তারই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে 'বর্ষাসঙ্গীত' কবিতায়---

"কেন ঘন ঘোরমেঘে
এমন পরান মাতে?
কি লেখা লিখেছো কে গো
সজল জলদপাতে!
শত বিরহীর হিয়া,
ওর মাঝে মিশাইয়া,
আপন গোপন ব্যথা
লুকায়ে দিতেছে তাতে।"

'বর্ষাসঙ্গীত',/ 'শিখা'

কবিতাটিতে কবির ব্যক্তিগত বিরহচেতনা নির্বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। বর্ষা শুধুমাত্র ভাবপ্রকাশক উদ্দীপক নয় তা কবির অব্যক্ত বেদনারও শরীক। বর্ষার সমাচ্ছন্ন দিনে কবিহৃদয় বিরহে ভাবাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কবিতায় তারই সরল প্রকাশ ঘটেছে এইভাবে---

"যেন, জগৎ জড়িত করে
নিবিড় বাহুর পাশে;
শুধু, একাকী আকুল হিয়া
বিরহ-অকূলে ভাসে!"

'বর্ষাসঙ্গীত',/ 'শিখা'

কাব্যরচনায় তিনি অতিরঞ্জন বা অত্যুক্তির বাড়বাড়ন্ত দেখাননি। বিরহশয্যায় অবস্থান করে তিনি মনশ্চাঞ্চল্য, ব্যাকুলতাকে কাব্যে ঠাঁই দিয়েছেন। বিরহগ্নিতে পুড়ে যে প্রেমাশ্রু ঝরে পড়েছে তাই-ই তাঁর কাব্যোপজীব্য। তাঁর কয়েকটি কবিতায় বৈরাগ্যশতক ও শৃঙ্গারশতকের সহাবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর কাব্যে এক আকুল নৈরাশ্যের রূপ ধরা পড়েছে। তাঁর মানসিক পীড়া আত্মার ক্রন্দনে পরিণত হয়েছে। তিনি উচ্চকণ্ঠে

বিরহের আত্মঘোষণা না করে কাব্যরেখায় যে বিরহিনীমূর্তি নির্মাণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। এই বিরহ-ব্যাকুলতা জনিত ভাবপ্রেরণা থেকে জন্ম নিয়েছে কূলপ্লাবিত প্রেমের প্রগাঢ় রূপ। তাঁর বিরহবেদনার মর্মপীড়া গভীরতর হয়ে প্রাণ-নিঙড়ানো অশ্রুধারায় বাহিত হয়েছে। এভাবেই তাঁর জীবনের অশ্রুকণা হয়ে উঠেছে অশ্রুপ্রতিমা।

তাঁর কাব্যে উন্নততর ভাবাদর্শ, দর্শন, উপস্থাপন হয়তো সেভাবে দেখা যায়নি, কিন্তু যা পাওয়া গেল তা হল বিশুদ্ধ ভালোবাসার গৌরব। বিরহ-ই যে প্রেমের নিকাশ পাথর তা তার কাব্যপাঠে প্রমানিত হয়। তিনি অন্তরের দীপশিখা ও ধূপের ধোঁয়ায় কাব্যসাধনা করেছেন। কাব্যে সুচিরাগত ঐতিহ্য বজায় থাকলেও আত্মনিবেদনের উচ্চারণে তা সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। তাঁর এই আত্মমগ্ন উচ্চারণ নতুনত্বের দাবী রাখে। তাঁর কাব্যপ্রতিভার কথা স্মরণ করে ‘নব্যভারত’ পত্রিকায় যা লেখা হয়েছিল তা তাঁর স্বনন্ত্র লেখনী সত্তাকে মর্যাদা দিয়েছে---

> “এরূপ প্রতিভাময়ী ললনার আবির্ভাবে বাঙালা আজ ধন্য। এতদিনে এ দেশে স্ত্রী শিক্ষার সুফল ফলিয়াছে। এ দেশে গিরীন্দ্রমোহিনীর সমতুল্য মহিলা কবি আরও আছেন বলিয়া আমরা জানি না।”

**তথ্যসূত্র:**


১. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভারবি, কলকাতা, ২০০১

২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮

৩. অলোক রায়, 'সন্ধিক্ষণের কবিতা', পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ২০০২

৪. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'কবিতার কী ও কেন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪

৫. শ্রী অরবিন্দ, 'ভবিষ্যতের কবিতা', অনুবাদক- রামেশ্বর শ', শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরি, ১৯৯৫

৬. বুদ্ধদেব বসু, 'সাহিত্যচর্চা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬

# নারী পাচার- সামাজিক সমস্যা : বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে অভিজিৎ সেনের উপন্যাস

সুশীল মালিক
গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

**সারসংক্ষেপ :**
মুর্শিদাবাদ একসময়ের রাজধানী ও নবাবের জেলা হলেও পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্রতম জেলাগুলির মধ্যে একটি। এখানের অর্ধেকের বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন, মেয়েদের বেশিরভাগ অক্ষরজ্ঞান শূন্য, বাল্যকাল থেকেই উপার্জনের পথ খুঁজতে হয় ফলে গ্রাম থেকে অল্পবয়সী মেয়েরা কাজের খোঁজে বেরিয়ে অথবা হারিয়ে গিয়ে স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় দেহোপজীবিনী হচ্ছে। দেশের অন্য প্রদেশের বেশ্যালয়ে এই জেলার মেয়েদের দেখা যায়। মেয়েদের ভুলিয়ে, লোভ দেখিয়ে যে কোনো অঙ্গীকারে তার প্রেমিক, স্বামী, স্বজন বা কোনো স্বার্থপর বিবেকশূন্য স্ত্রী-পুরুষ দ্বারা হস্তান্তর হয়। এসব মেয়েদের কোনো এনজিও ও পুলিশের ক্ষেত্রে উদ্ধার করা ও সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা চ্যালেঞ্জের। এই চ্যালেঞ্জ এবং মেয়েদের হারিয়ে যাওয়ার হালহদিশ অভিজিৎ সেনের 'সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল' ও 'শিরিন এবং তার পরিজন' উপন্যাসের আখ্যান। তথ্য ও বিষয়ের অভিনবত্বে বাস্তবতার প্রতিরূপ উপন্যাস দুটি।
**মূলশব্দ :** লালআলো, স্বেচ্ছাসেবী, মূলস্রোত, অত্যাধুনিক, প্রদেশ, আখ্যান, দেহব্যবসা।

**মূল আলোচনা**

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পরবর্তী নারীরা আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার দাবি করেনি, ভাগ্যকে জয় করে বিজয় নিশান স্থাপন করেছে। শিক্ষা, স্বভাবে, সাহসে, কর্মে শুধু সাংসারিক চৌহদ্দি নয় রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করার সাহসে পাখনা বিস্তার করেছে। তবুও একবিংশ শতকেও চোরাস্রোত ধরে অনেক নারীর জীবন ও স্বপ্ন অন্যপথে ধাবিত হচ্ছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে সকলেই মনকে অত্যাধুনিকরূপে তৈরি করেছে এমন নয়, এখনো মানুষ বোকা বনে, প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে। সমাজে কিছু লোভী, হৃদয়হীন চতুর ব্যাবসায়ী নারীকে নিয়ে রমরমিয়ে ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে, গ্রামের অথবা শহরের অভাবী নারীদের ফুসলিয়ে এনে বেশ্যাবৃত্তি, বিপজ্জনক কাজে লিপ্ত করে। সাধারণত অভাব এইসব মেয়েদের ভাগ্যবিপর্যয়ের কেন্দ্রবিন্দু। মেয়েদের জন্য একটা গোপন

বাজার তৈরি হয়ে আছে। 'নারী এমন এক বিক্রয়জাত পণ্য যার বাজার সবসময় খোলা।' নারী পাচার সমাজের বৃহত্তর ক্ষত, এই ক্ষত নিবারণে সদর্থক পদক্ষেপ সরকার বা প্রশাসনের তরফ থেকে নেওয়া হলেও সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করা সম্ভব হয়নি। নারী-শরীরের পসরা সাজিয়ে ব্যাবসা কোনো অত্যাধুনিক ব্যাপার নয়, বহুযুগ আগে থেকেই চলে আসছে। লাল আলো এলাকার প্রতিটি মেয়ের প্রায় একইরকম অতীত থাকে বাস্তবক্ষেত্রের সেই অতীত খুব সরল নয়। বিভিন্ন দেশের ও প্রদেশের মেয়েরা একই ছত্রছায়ায় হঠাৎ আসেনি, তার একটা পূর্ব প্রেক্ষাপট থাকে, পথ নির্মানের কাহিনি থাকে, নানা পথের অভিজ্ঞতা নিয়ে, বিচিত্র সব মানুষের কাছে শোষিত হওয়ার অভিজ্ঞান শরীরে বয়ে নিয়ে আসে। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় যেসব মেয়েরা দেহ ব্যাবসায় এসে পড়ে তাদের কপাল পোড়ার কাহিনি কথাসাহিত্যে এসেছে তবে কখনো মূল কাহিনির পাশে উপকাহিনি হিসাবে অথবা দু-একটি চরিত্রের মাধ্যমে। বিস্তৃত ভাবে খুব কমই দেখা যায়, অভিজিৎ সেন মুর্শিদাবাদ জেলাকে কেন্দ্র করে নারী পাচার ও নারীদেহ ব্যাবসার সমস্ত প্রেক্ষাপটকে তথ্যসহ তুলে এনেছেন। মুর্শিদাবাদের গ্রামের মেয়েদের পাচার, হস্তান্তর, পরিণতি এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা পুলিশের ভূমিকা এসব বিষয়ের অঙ্কুরোদগম দেখা যায় অভিজিতের 'সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল' উপন্যাসে যা মহীরুহ হয়ে দাঁড়ায় 'শিরিন এবং তার পরিজন' উপন্যাসে। এছাড়াও ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের প্রেক্ষাপটে লেখা 'মৌসুমী সমুদ্রের উপকূল' উপন্যাসে মগ দস্যুদের লুণ্ঠিত নারী পুরুষকে বিভিন্ন দেশের দাস বাজারে চালানের দীর্ঘ কাহিনি বর্ণনা করেছেন তিনি। সমাজের অন্যান্য বৃহত্তর আবেদনের মাঝে নারীর সুরক্ষায় বিরাট থাবা বসানো নারী পাচার বড় প্রতিকুলতা, ব্যাপারটা সাহিত্যেও গুরুত্বের দাবি রাখে। অভিজিৎ এই সিরিয়াস সমস্যাটা শুধুই জানতেন না, সমস্যাটার গোড়ায় পৌঁছেছেন, এক্ষেত্রে কল্পিত কাহিনি অপেক্ষা বিষয়টাকে বাস্তবতা দিতে লেখককে সাহিত্যিকের সঙ্গে সাংবাদিকের ভূমিকাও পালন করতে হয়েছে। সত্তর দশকের কথাকার অভিজিৎ মুক্ত ঘরানায় বিচরণ করেছেন। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য অভিজিতের উপন্যাসের আখ্যান বিন্যাস সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন- 'আখ্যানের গ্রন্থনায় বিপুল পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। লেখক কখনো কথকের ভূমিকা নিচ্ছেন, কখনো বা পরে নিচ্ছেন ভাষ্যকারের আঙ্রাখা আর কখনো সাংবাদিকের জোব্বা।'[১] অভিজিৎ কলম উঁচিয়ে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা দেখিয়েছেন এই জাতীয় লেখার মধ্য দিয়ে।

‘সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল’ উপন্যাসে অধ্যাপক অদিতির সমস্ত অতীত বর্তমান জুড়ে সেইসব নারীরা এসেছে যারা চোখের সামনে থেকে হঠাৎ করে হারিয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার অপারেশন টেবিলে যাবার সময় জয়া নামের আয়াকে দেখে অবাক হয় অদিতি। কারণ সহকর্মী বিজন এনজিওর মারফৎ হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের উদ্ধার করে, এই মেয়েদের মধ্য থেকেই মাধুরীকে অদিতির বাড়িতে কিছুদিনের জন্য কাজে দিয়েছিল বিজন, সেই মাধুরীর মতো হুবহু দেখতে জয়াকে। অদিতি জয়ার কাছে মাধুরীর বম্বে যাওয়ার স্বপ্ন কীভাবে কাটিহার, বেগুসরাই, সাহেবগঞ্জ হয়ে জীবনটাকেই শেষ করে দেয় সেই গল্প শোনায়, আসলে জয়া যে মাধুরীর জমজ বোন সেকথা প্রথমত অস্বীকার করেছিল জয়া কারণ সে হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের কালিমা জানে। মাধুরীও অদিতিকে বলেছিল ‘সেসব কথা জানলে তুমি আমাকে ঘেন্না করবে, কাকিমা।’ সমাজ তাদের কীভাবে দেখে সেটাও জানে এরা তাই গোপনীয়তা রেখে যতটা মানুষের বাঁকা দৃষ্টি থেকে রেহাই পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করে এরা। অদিতিও ইতিমধ্যে জেনেছে মন্দ মেয়ের উপাখ্যান কীভাবে রচিত হয়। এরপর অদিতি জোর করেনি মাধুরীর অতীতকে জানতে।

মুর্শিদাবাদের একটি গ্রামের মুসলমান পরিবারের তেরো চোদ্দ বছরের বাড়ন্ত মেয়ে ছিল মাধুরী। সালারে তার খালার বাড়িতে আসে, রেলস্টেশন সংলগ্ন এই শহরে ভালো মন্দ পাপ পূণ্য সবই ছিল। খালার জ্ঞাতি সালেহা বেগম টোপ দেয় মাধুরীর খালাকে। ‘তোমার শালির বেটির তো বাবু ঘরের মেয়ের মতো চেহারা।’ কলকাতায় বড় বাড়িতে কাজ, ভালো মাইনে, অগ্রিম টাকা পেতে পারে মাধুরী। খোন্দকারদের মেয়ে শায়রার বিয়ে ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা সালেহা করেছে। এই প্রমাণ দেখে সালেহাকে উপেক্ষা করার সাহস হলো না মাধুরীর তাই একদিন সালেহার সঙ্গে গোপনে ট্রেনে উঠল। বড় বাড়িতে কাজ করতে গেলে কাজের দক্ষতা লাগে নাকি সুন্দর চেহারা লাগে তা সালেহার মতো পেশাদার দালালরা জানে। এরপর মাধুরীর বাবা মায়ের হাতে টাকা আসতে থাকে। পরে টাকা আসা অনিয়মিত হয়, বাবা-মা মেয়ের খোঁজ নিলে সালেহা জানায় সে ভালো আছে, কিছুদিন পরে বলে কলকাতা থেকে সে গ্রামে আসতে চাইছে না, তার কিছুদিন পর বলে মাধুরী কোন ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। এভাবেই মাধুরী হারিয়ে যায়। পুলিশ জানে এসব কেসে বেশি কিছু হয় না, এনজিওর চাপে শুধু সৌজন্যতা দেখায়। মাধুরী উদ্ধার হলেও মামলার ঝামেলার মধ্যেও অচেনা লোকের প্রলোভন, হুমকি আসতেই থাকে। এসব মেয়েদের খুঁজে পাওয়া গেলেও একসূত্রে

রাখাও চ্যালেঞ্জের। সমাজের ভয়, সম্মানের ভয় নানাবিধ কারণে কেউ এই ঝামেলা থেকে ছিটকে যাওয়াটা আশ্চর্যের নয়। মাধুরীর কাছে নতুন প্রস্তাব আসতে শুরু করে, ফেলে আসা দিনগুলো চোখের সামনে ভাসে তাই আবার উধাও হয় মাধুরী। এরপর– ‘বিহারের গ্রামেগঞ্জে হাটে মেলায় ঘুরল তিন মাস। নৌটংকি, গান নাচ, আর সস্তা যৌনতার রাস্তা ঘুরে ফের কলকাতা।... কিন্তু ততদিনে মাধুরী কিংবা মাধুরীর মত কারো কারো মনের ভিতরে এ ধারণার ভিত পাকা হয়ে বসে গেছে যে, চেষ্টা করলে, অধ্যাবসায় থাকলে শ্রীদেবী কিংবা মাধুরী দীক্ষিত না হলেও, কিছু একটা হওয়া সম্ভব। অন্তত প্রচুর টাকাপয়সা, গহনা এবং কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া যায়।’[২] একটা কর্তৃত্ব, কিছু টাকা ভালো শাড়ি গহনা পেলে যে কোনো নারীর রূপ ঝলমলিয়ে উঠবে একথাকে সহজে অবিশ্বাস করা যায় না। চিরকাল অভাবে অভুক্ত যুবতীর শরীরে কোনোদিন একখাবলা তেল জুটলে তার রূপ ঝলমলিয়ে ওঠে একথা অভিজিতই লিখেছিলেন। মাধুরীর বোন জয়াও হয়তো সিনেমার জয়া হতেই ঘর ছেড়েছিল সে জয়া না হলেও ‘কিছু একটা’ হবে তারপর আরও অন্য মেয়েরা।

অদিতি চিঠিতে জেনেছিল একটা নাচের দলের সঙ্গে কাটিহারে গেছে মাধুরী। প্রতি শো বাবদ একশো টাকা, খাওয়া থাকা ফ্রী। স্তম্ভিত হয়ে যায় অদিতি, নাচের দলে যাওয়া মাধুরী কবেই যে নাচ শিখল তা অদিতির স্বামী দিবাকরের কাছে প্রশ্ন। সমাজ যখন পশ্চিমি আদর্শে চলছে, সামাজিক রীতিরেওয়াজ ফেলে নষ্টামির প্রতিযোগিতায় নেমেছে সাংস্কৃতিক জগৎ- ‘সবদিকে শাড়ি, গাড়ি, গয়না, বাংলো, খাওয়া-দাওয়ার এই প্রবল সীমাহীনতার মধ্যে মাধুরীরাই বা বঞ্চনার শিকার হয়ে পরের বাড়িতে কাপড় কেচে বাসন মেজে অর্ধভুক্ত, অপূর্ণসাধ বেঁচে থাকবে কেন?’[৩] ব্যক্তিজীবনের অনেক গ্লানি নিয়েও অদিতি বিজনের এনজিওর মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের উদ্ধারে জীবন সমর্পন করে, জয়ার খোঁজ দিয়ে সেই কাজ শুরু করে। এসব মেয়েরা অনেকেই সমাজে ফিরতে চায় না, নিজেদের এই অন্ধকার জগতকে মানিয়ে নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায়। কারণ তারা মনে করে- ‘যেখানে আছি, সেখানেই ভালো। আবার কেউ ভাবে যদি ঘরে ফিরে যাই, সেখানে গিয়ে কী পাব? সেই তো পুরানো আধপেটা-খাওয়া পুরানো জীবন! উপরন্তু নষ্ট মেয়ের দাগ লেগে যাবে।’[৪] অভিজিৎ এই উপন্যাসে শুধু ‘নষ্ট মেয়ের’ গল্প শোনাননি, তাদের এই পথে আসার কারণ, পারিবারিক অভিব্যক্তি, এনজিওর ভূমিকা এবং লোভের উৎস ও নিজেদের মনোভব খুব সংক্ষেপে দুই বোন মাধুরী ও জয়ার মধ্য দিয়ে বলেছেন। মাধুরী সিনেমার মাধুরী হতে পারেনি, ঘৃণার

জীবন পেয়ে অজানা রোগে মারা গেছে, জয়াও সে পথ ধরেছে। পরিবর্তমান সমাজ-সংস্কৃতির অত্যাধুনিকীকরণ মানুষকে আরও প্রলোভিত করে- 'বেশ্যাবৃত্তি আদিমতম সামাজিক ব্যবসা। পৃথিবীর কোনও সমাজই এই ব্যবসাকে উৎখাত করতে চেয়েছে কিনা, এখন সেই প্রশ্নটাই উঠছে।... উচ্চতর সমাজ ব্যাপকভাবে এসব ব্যবসায়ে নেমেছে এবং সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি কোটি কোটি ডলারের বানিজ্য চলছে এসব নিয়ে। আমাদের মাধুরীরা কী দোষ করল?'[৫]

অভিজিৎ কম পরিসরেও সমাজের অন্ধকার জগতের হালহদিশ দিয়ে গেলেন এই উপন্যাসে। উপন্যাসের বিষয়ের অভিনবত্বের সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের চেতনায় সজোরে আঘাত করলেন, এপথের সমস্ত অশুভ শক্তির রূপকে চেনালেন। দেখালেন, সমাজ এইসব নারীদের সঙ্গে সেই ব্যবহার করে না যা সম্বল করে মাধুরী ও জয়ারা নতুন করে মূলস্রোতে বাঁচতে পারে। সমাজই আয়োজন করে এই অন্ধকারের আর সমাজই এই জগতের মানুষকে উপেক্ষা করে তাই হয়তো বার বার নিরুদ্দেশ হতে হয় এইসব মেয়েদের সমাজ থেকে পৃথিবী থেকে।

অভিজিৎ সেনের 'আনোয়ারা খুন হয়েছে' গল্পের পরিবর্ধিত রূপ 'শিরিন এবং তার পরিজন' উপন্যাস। এতেও মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামের গরীব মেয়েদের উধাও হয়ে যাওয়া ও তাদের নিয়ে আইনি-বেআইনি যেসব ঘটনা ঘটে তা উপজীব্য। মুর্শিদাবাদের মহালগঞ্জ গ্রামের মেয়ে শিরিন কলকাতায় ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করে। কলকাতায় বসে শিরিন মায়ের চিঠির শেষ বাক্যে মহালগঞ্জ ও আশেপাশের গ্রামের উল্লেখযোগ্য খবরগুলো পেত। যেমন 'আয়েষা এবং করিমা পাঞ্জাব কিংবা কাশ্মীরে চালান হয়ে গেছে', আবার 'শেখপাড়ার লালি, বেবি এবং নাসিমাকে তাদের বাপের বয়সী মানুষেরা বিয়ে করে কোথায় যেন নিয়ে গেছে।' এসব বাস্তবে দেখে অধ্যাপনার সঙ্গে নিজের গ্রামের মেয়েদের উদ্ধারকার্যে নামে শিরিন। এই উপন্যাসে আনোয়ারা সেই মেয়ে যে দারিদ্র্যের সঙ্গে, সংসার উদাসীন, বদমেজাজি, ধর্মভীরু পিতার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে খুন হয়ে যায়। আনোয়ারার জীবনের প্রেক্ষাপট দেখলে বোঝা যাবে মেয়েটি কীভাবে খুন হয়। তাবলীগে যোগ দেওয়া উলেমা গোছের পিতার নিত্যদিনের অত্যাচারে আর সাংসারিক অভাবে অতিষ্ট আনোয়ারাকে বারে বারে অন্ধকার অথচ রঙিন পথ হাতছানি দেয়। ফলে যে কোনো কাজের খোঁজে আনোয়ারা লালগোলার জাফর আলির সঙ্গে যোগাযোগ করে, এই লোকটি গরু পাচারের সঙ্গে গুজরাট, দিল্লি, পাঞ্জাবের কনস্ট্রাকশন সাইটে লেবার যোগান দিত, গরুর জায়গার এখন নারী পাচার করে।

আনোয়ারা- 'যেকোনো ধরনের কাজের খোঁজে দিল্লি যাচ্ছিল।... দিল্লিগামী দলে তার কোনো প্রেমিক কিংবা বোঝাপড়া হওয়া পুরুষসঙ্গী ছিল।'[৬] তার বাবা অন্য দায় দায়িত্ব না নিলেও ধর্মীয় অনুশাসনের নিগড়ে বেঁধে রাখার চেষ্টা করতো তার পরিবারকে। আনোয়ারা বাবা গোলাম রসুলের কোনো অনুশাসন না মেনে 'বে-ইছলাম' কাণ্ড করে এবং জানিয়ে দেয়- 'আমার কথা কোনো খোদার বান্দা আমির ছাহেবের ভাবতে হবে না। আমার ভাবনা আমি নিজে ভাবব। এই শরীর আমার, এই শরীরের ভিতরে যে-জান আছে, তা-ও আমার। আমার জান-মান-দেহ নিয়ে আমার যা খুশি আমি তাই করব।'[৭] আনোয়ারার এই প্রতিবাদ বাবার কর্ণকূহরে প্রবেশ করলেও কোনো দায়িত্ববোধ জাগেনি বরং আনোয়ারার কপালে প্রহার জুটত। শিরিনের কাছে একটা সিনেমা বিষয়ক পত্রিকা পড়ে আনোয়ারা শিরিনকে প্রশ্ন করেছিল, যে সব মুসলমান মেয়েরা সিনেমা, মডেলিং, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শরীর দেখিয়ে প্রায় উলঙ্গ হয়ে নোংরা অঙ্গভঙ্গি করে নাচে তারা তো কোরান-হাদিস মানে না? এইসব প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারেনি শিরিন ও শিরিনের আধুনিক শিক্ষা। দারিদ্র্যতার সঙ্গে আনোয়ারার মনে এবং শরীরে একটা দাবদাহ তৈরি হয়েছিল। মাদ্রাসার শিক্ষক জাকির হোসেন ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার শরীরকে জাগিয়ে দিয়েছিল। আনোয়ারার কথায় 'সে আমার লাভার নয় কিন্তু সে আমাকে কিস করে, সবকিছু করে।' যুবতী আনোয়ারা এই ব্যাপারটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

'সে মুম্বাই যাবে, নাচ শিখবে, গান শিখবে, হোটেলে মদের দোকানে নাচবে, অনেক অনেক টাকা রোজগার করবে- দুবাই যাবে- আম্মান যাবে- আমেরিকা, কানাডা যাবে-'[৮] আনোয়ারার এসব সাধ পূরণ হয়নি। আনোয়ারা জেদ করেছিল সে যাবেই, তার বাবা তার গলায় হেঁসো চেপে ধরে বলেছিল 'ফের বল' আনোয়ারা বলেছিল 'যাব যাব যাব' তারপর গোলাম রসুলের হেঁসো থেমে থাকেনি। আনোয়ারা পাচার হয়ে যায়নি, কিন্তু সমস্ত সম্ভাবনা ছিল, হারিয়ে যাবার পথ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই পথেই তার তিন বোন নাসিফা, জাহানারা, আলিমা হারিয়ে যায়। তাদের নিয়ে গেছে মহালগঞ্জেরই মেয়ে লালি, সিরিনকে যে জানিয়েছিল 'আমার বে হয়েছে লখনৌ শহরের এক রইস ফেমিলিতে। আমার বরেরা নবাবের বংশ'। লালি দিনমজুর বাপের জন্য গ্রামে বড় বাড়ি তৈরি করে, আনোয়ারার খুনের প্রসঙ্গ উঠতে সে শিরিনকে জানায়- 'আন্নুকে আমি বলেছিলাম, আমার সঙ্গে চল, ভালো জায়গায় বিয়ের ব্যবস্থা করে দেব। পয়সার মুখ দেখতে পাবি। ভালো থাকবি, ভালো পরবি, ভালো খাবি। ও রাজি হয়নি।'[৯]

নিজের বোন শায়রাকেও সেই পথে এনেছিল এবং ছোট বোন পারভিনকেও নিয়ে যাবে পরিকল্পনা করেছিল লালি। বাংলার গ্রামের মেয়েদের দুর্গতির মাঝে লালি সৌভাগ্যবতী হয়েছিল। এই সৌভাগ্য তারা খুঁজে ফিরছিল একথা বললে একেবারে ভুল হবে না। কারণ- 'না খেয়ে না পরে মুসলমানি ইজ্জতে পরদা ঢেকে বছর বছর রোগাভোগা বাচ্ছা পয়দা করে জীবন কাটাতে এখন আর অনেকেই রাজি নয়।'[১০] লালি এই জীবন মেনে নেয়নি, সে এখন নারী সরবরাহকারিণী। নাসিফা, জাহানারা আলিমাকে সে নিয়ে যাবার পর দু-মাস সময় নেয় বলি দিতে, এই দু-মাসে পেট ভরে খাইয়ে তাদের রূপকে দিগুন করে। যেমন 'বৃষ্টির জল পাওয়া কচি পাটগাছ' তারপর দেড় লক্ষ টাকায় বিক্রি করে। পুলিশের অনুমান লালি কোনো শক্তিশালী মানুষের সংস্পর্শে আছে, হায়দ্রাবাদ ও উত্তরপ্রদেশে থাকলেও তার কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই। নাসিফাকে কোনো ব্যক্তি বিয়ে করে কুয়েতে নিয়ে গেছে, জাহানারাকে হায়দ্রাবাদের বেশ্যাপল্লি 'সোহেলা মঞ্জিল' এর কর্তা ধর্মা রাও নিজের জন্য ভালো দাম দিয়ে লালির থেকে কিনেছে। তাকে নিয়ে ধর্মা রাও মুম্বাই গোয়া হয়ে আরও কোথাও ঘুরছে। কিংবা মেন্তি নামের মেয়েটি যে তার প্রেমিকের সঙ্গে মালদায় কিছুদিন থাকে তারপর অন্তঃসত্ত্বা হলে মালদা শহরের বেশ্যালয়ে বিক্রি হয়ে যায়। এইসব মেয়েরা সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে চাইলেও তাদের পরিবার ও সমাজ গ্রহণ করার মতো স্বাভাবিকতা বা উদারতা দেখাতে পারেনি এখনো তাই অনেকেই মুর্শিদাবাদ নদীয়ার সীমান্তে ৩৪নং ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে মালা, মমতাজ, পার্বতী, বিলকিস, সুচিত্রা, মাগদালির মতো পথবেশ্যা হয়েই রয়ে গেছে। রাস্তার দুধারে আড়াই হাজার এমন পথবেশ্যার ভরসা দুরপাল্লার ট্রাক চালকরা। এদের প্রত্যেকের অতীত প্রায় একইরকম। মালার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গেছে, নিজে বাঁচতে সন্তানকে মানুষ করতে সে এই পথে এসেছে। মমতাজের বাড়ি বাংলাদেশে, 'বাংলাদেশের মেয়েদের বে-আইনি এবং অনৈতিক পাচারের একটা বড় রাস্তা মুর্শিদাবাদের দেড়শো কিলোমিটার' ফলে বসিরহাট সীমান্ত দিয়ে তার ভারতীয় প্রেমিক তাকে নিয়ে আসে তারপর স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে কিছুদিন কাটিয়ে বউবাজারের মাসির কাছে বিক্রি করে দেয়।

অভিজিৎ মুর্শিদাবাদের কয়েকটি গ্রামের নারীদের কথা বলতে গিয়ে সাংবাদিকের মতো তথ্য তুলে ধরেছেন অনেকক্ষেত্রেই, ভারতের শতকরা বিয়াল্লিশ জন পাচার হওয়া নারী পশ্চিমবঙ্গের, এই সংখ্যার অধিকাংশ মুর্শিদাবাদের। ইউনিসেফের বক্তব্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি ও ভারতের মধ্যে সংযোগ রক্ষা

করে, পশ্চিমবঙ্গে তেইশটি এমন জনবহুল শহর আছে যেগুলো নারীপাচার কেন্দ্র। এবং আরও জানায় এই রাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান সীমানা রয়েছে ফলে আন্তর্জাতিক পাচারের কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত এই রাজ্য। লালি, জাহানারা, আলিমা, নাসিফা, মেন্তি, শায়রা গ্রামের মেয়ে। সুন্দর চেহারা ও নরম স্বভাবের এই বাঙালি মেয়েরা উত্তরপ্রদেশ ও কাশ্মীরের মতো জায়গায় বিয়ের বাজারের চাহিদা মিটিয়েছিল। বাবা মায়েরা কেউই সঠিকভাবে জানে না তাদের জামাই কেমন দেখতে, মেয়েকে নিয়ে কোথায় থাকে, এমনকি এরা জামাই বাড়ি যায়নি কোনদিন। শুধু জানে তাদের মেয়েরা 'নসিব' ফেরাতে গেছে। এনজিও ও পুলিশি তৎপরতায় ব্যাপারগুলো গুলিয়ে ওঠে। পুলিশ বাস্তবটা তুলে ধরে এইসব অভিভাবকদের সামনে। 'নন্দিনী' সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিরিন তার গ্রামের মেয়েদের উদ্ধার করতে চায়, পুলিশের সাহায্য নিয়ে হায়দ্রাবাদের পতিতাপল্লি থেকে শুধুমাত্র আলিমাকে উদ্ধার করতে পেরেছিল। এমন অনেক আলিমা দেশে বিদেশে কারো সেবাদাসী বা যৌন দাসী, কিংবা রাস্তার ধারে কোনো ট্রাক চালকের নেশাগ্রস্ত শরীরের নীচে তাদের সপ্নসহ নিষ্পেষিত হচ্ছে। লাল আলো অঞ্চলের পরিবেশ, কর্তা, দালাল সবমিলিয়ে যে গমগমে পরিস্থিতি তা থেকে পুলিশ বা এনজিওর ক্ষেত্রে একটা মেয়েকে উদ্ধার করা সহজ কাজ নয়, আইন সক্রিয়ভাবে কাজ করতে চাইলেও পারে না সাবালিকা মেয়েদের জোর করে উদ্ধার করা আইনের ফ্যাকরায় আটকে যায়। যুগ যুগ ধরে নারীর পতিত হওয়ার যে ধারা চলে আসছে তার জন্য একটা নয়, একাধিক ব্যবস্থা দায়ী। প্রশাসন, পুলিশ, সরকারি, বেসরকারি সংগঠন, টেলিভিশন, আদালত কেউই এসব মেয়েদের পরিণতি ও বিপর্যয়ের ধারাবাহিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। শিকারীর চোখ যেমন অতন্দ্র থাকে তেমন শিকার যখন একবার ঝলমলে আলো, নাচ গান সিনেমা, ভালো থাকা খাওয়া হাতে নগদ টাকা এসব পেয়েছে তখন অতীতের হাড়ভাঙা পরিশ্রম, আধপেটা খাওয়া, স্বামীর লাঞ্ছনা এসবে ফিরতে চায় না। তাই স্বাভাবিক জীবনে এদের ফিরিয়ে আনাটাও বড় চ্যালেঞ্জের। অভিজিৎ তথ্য দিয়ে বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর উপন্যাসের আখ্যানকে একাত্ম করেছেন, পাচারের হিসাবে কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম উল্লেখযোগ্য স্থান ধরে রেখেছে, বাঙালি মেয়েদের দিল্লি হরিয়ানা মুম্বাই হায়দ্রাবাদে প্রবল চাহিদার কথা, পশ্চিম বাংলা থেকে সংগ্রহ করা একটা মেয়ের জন্য কুড়ি হাজার টাকা খরচ করলে তাকে আড়াই লক্ষ টাকায় বিক্রি করা যায়। এসব কী উপন্যাসের কাহিনির অঙ্গ নাকি সমীক্ষাজাত তথ্য। আনোয়ারা খুন হয়েছে গল্পের চরিত্র ও কাহিনি যে বিস্তার চাইছিল

তা অকারণ নয় সত্যি বিস্তারের প্রয়োজন ছিল, সমাজের একটা গোড়ার সমস্যাকে জানতে, তা থেকে সমাধানের উপায় খুঁজতে, নারীকে রক্ষা করতে, আমাদের সচেতন হতে সর্বোপরি অভিজিৎ সেনের লেখনীর অভিনবত্বকে জানতে।

**তথ্যসূত্র :**


১. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'অভিজিৎ সেন-এর ঔপন্যাসিক সন্দর্ভ' 'বাংলা উপন্যাস : বীক্ষা ও অন্বীক্ষা' সুবল সামন্ত সম্পাদিত, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১১, পৃষ্ঠা- ২০৬

২. অভিজিৎ সেন, 'নগ্ন নির্জন হাত', 'সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল', স্বস্তিক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৯৪

৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৯০

৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৬

৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৯০

৬. অভিজিৎ সেন, 'শিরিন এবং তার পরিজন', অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৬০

৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৯

৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৯

৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪০

১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২২


**সহায়ক গ্রন্থ**


১. সুবল সামন্ত সম্পাদিত। 'বাংলা উপন্যাস : বীক্ষা ও অন্বীক্ষা'। এবং মুশায়েরা। কলকাতা। ২য় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১১।

২. https://bn.vikaspedia.in/social-welfare

# বার্ধক্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এক অভিনব মননশীল দৃষ্টিভঙ্গী

শর্মিষ্ঠা ঘোষ
সহঅধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ফকির চাঁদ কলেজ

**সারাংশ :**

"জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে?" –

জীবজগতের ধর্মই এই - জন্ম হলে মৃত্যু অনিবার্য। 'মানুষ' এই জীবজগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী। তারও জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। তবে জীবন শুরুর একটা নির্দিষ্ট সময় থাকলেও শেষটা কিভাবে হবে, কোথায় হবে সেটা কেউ বলতে পারে না। এই জীবন ও মৃত্যুর মধ্যেকার যে সময় মানুষ তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করে বার্ধক্যে এসে পৌঁছায়। বার্ধক্য মানব জীবনের শেষ স্তর। বার্ধক্য কোন দুঃখ নয়, বার্ধক্য দেহের ধর্ম, মানব জীবনের অনিবার্য এক পর্যায়। তবে বার্ধক্যের কিছু সমস্যা অবশ্যই আছে। বার্ধক্যের সমস্যা হল শারীরিক ক্ষমতা হ্রাস, রূপহানি প্রভৃতি, এগুলিই বার্ধক্যের অনিবার্য এক অবস্থা, তবুও বার্ধক্য দুঃখ নয়। বার্ধক্যের ঐশ্বর্য, বা মূলধন অভিজ্ঞতা (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪১০; ৪৫৪), যা জীবনকে এক নতুন দৃষ্টভঙ্গী প্রদান করে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে বার্ধক্যের এই অভিজ্ঞতা ও গভীরতম জীবনবোধকে সমাজে কল্যানার্থে কাজে লাগানোর কথা বলেছেন। সুতরাং বার্ধক্য কোন নৈরাশ্যজনক অবস্থা নয়, বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন বার্ধক্য জীবনকে এক নতুন রূপ দেয়, উক্ত প্রবন্ধে বার্ধক্যের এই নতুন রূপের আস্বাদ নেওয়ার চেষ্টা করবো।

**মূলশব্দ :** মানবকল্যাণ, বার্ধক্য, আয়ু, জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, দুঃখ প্রমুখ।

**ভূমিকা :**

বার্ধক্যের ধারণাটি ১৯৬৯ সালে রবাট বাটলার প্রথম ব্যবহার করেন। মানুষের একটি শ্রেণীগত চরিত্র এবং যারা বৃদ্ধ নয় তাদের সঙ্গে বৃদ্ধদের বৈষম্যের কথাও এই ধারণাটির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সুতরাং 'বার্ধক্য' শব্দটি বৈষম্যের সূচক একথা বলা যেতে পারে। সাধারণভাবে বলা যায়, বার্ধক্য একটি স্বাভাবিক জৈবিক ঘটনা এবং মন্থর আনুক্রমিক গতিতে এগিয়ে আসা দৈহিক অবক্ষয় যার ফলে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মক্ষমতা এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর অবধারিত পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু।

সাধারণভাবে বার্ধক্য দ্বারা প্রায়ই বয়োবৃদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। এটি অবশ্যম্ভাবী জৈবিক বাস্তবতা, এর একটা নিজস্ব গতি রয়েছে এবং বিভিন্ন প্রতিরোধক আবিস্কার সত্ত্বে তা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। প্রকৃতপক্ষে এককথায় বার্ধক্যের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। সংখ্যাতাত্ত্বিকদের মতে বার্ধক্য এমন একটি বয়সের সম্মুখীন হওয়া যা হল মানুষের অবসরপ্রাপ্ত জীবনের সূচনাকাল। বর্তমান দিনে ৬০ বছর বয়সকেই অবসর গ্রহণের বয়স অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়স হিসাবে ধার্য করা হয়।

সাধারণ মানুষ 'বার্ধক্য' বলতে এক নঞর্থক অবস্থাকে বুঝে থাকে, যে অবস্থায় শারীরিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, পূর্বের ন্যায় রূপের বিনাশ ঘটে, এছাড়া এই বয়সই অবসর গ্রহণের বয়স। ফলত 'বার্ধক্য' এক অক্ষমতার সূচক। প্রকৃতপক্ষে বার্ধক্য মানব জীবনের শেষ পর্যায়, যেখানে মানুষ তাঁর অভিজ্ঞতা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, বার্ধক্য কোন নঞর্থক অবস্থাও নয়। বার্ধক্য একটি স্বাভাবিক জৈবিক ঘটনা, যা কালগত; বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মক্ষমতা এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায় ঠিক, তবে তার জন্য বার্ধক্য কোন হতাশাজনক অবস্থা বা দুঃখ নয়। বার্ধক্যের মূল ধন অভিজ্ঞতা। বার্ধক্য সম্পর্কে এইরূপ কিছু সদর্থক মননশীল কথা বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে। ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট রূপকার হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। যদিও তিনি কেবল সাহিত্যকার ছিলেন না, তিনি একাধারে দার্শনিক, সমাজবিদ ও স্বদেশপ্রেমিও ছিলেন। দুর্ভাগ্য বশত ১৩০০ বঙ্গাব্দে মাত্র ৫৬বছর বয়সে তাঁর আয়ুঃসূর্য অস্তমিত হয়। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত জীবিত না থাকলেও তিনি বার্ধক্য বিষয়ক কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'বুড়া বয়সের কথা', 'একা' প্রমুখ। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধগুলিতে বার্ধক্য সম্পর্কে প্রচলিত দুটি বক্তব্যই দেখতে পাওয়া যায়, একটি সদর্থক এবং অপরটি নঞর্থক। নঞর্থক দিকটিতে বৃদ্ধ বয়সের অক্ষমতার কথা অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক জগতে যে চিত্র দেখতে পাওয়া যায় তাই বর্ণিত করেছেন। আর সদর্থক দিকটিই তাঁর নিজ বক্তব্য, যেখানে তাঁর এক অভিনব মননশীল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বার্ধক্য সম্পর্কে সেই অভিনব মননশীল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা করেছি।

**মূল আলোচ্য বিষয় :**

বঙ্কিমচন্দ্র 'বুড়া বয়সের কথা' প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন যে, কোন বয়সকে আমরা বার্ধক্য বলে উল্লেখ করব? এ প্রসঙ্গে কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্র 'বুড়া বয়সের কথা' প্রবন্ধে বলেছেন –"প্রাচীনতা বয়সেরই ফল, আর কিছুরই নহে। ধাতু বিশেষে কিছু তারতম্য

হয়, কেহ চল্লিশে বুড়া, কেহ বিয়াল্লিশে যুবা"।[১] কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিতে যেন প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বক্তব্য প্রতিধ্বনিত হয়েছে। 'প্রাচীনতা' বলতে এখানে বার্ধক্যকে বোঝানো হয়েছে। 'প্রাচীনতা বয়সের ফল' একথার দ্বারা তিনি কালজ জরা বা বার্ধক্যকের ইঙ্গিত করেছেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে দু-ধরনের বার্ধক্যের কথা বলা হয়েছে – কালজ বার্ধক্য ও অকালজ বার্ধক্য। যে বার্ধক্য যথাসময়ে স্বাভাবিক ভাবে দেখা যায় তা কালজ বার্ধক্য। আর যে বার্ধক্য সময়ের পূর্বে, অন্য কোন অসুস্থতা বা বাহ্যিক কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাকে অকালজ বার্ধক্য বলা হয়। সহজ কথায় কালজ বার্ধক্য হল স্বাভাবিক এবং তাকে কোনভাবেই কোন ওষুধের মাধ্যমে এড়িয়ে যাওয়া যায় না; কিন্তু কালজ বার্ধক্যকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মাধ্যমে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে কালজ বার্ধক্যের কথাই বলেছেন। এছাড়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মতোই 'ধাতুর তারতম্য' এর কথা বলেছেন। চরক ও শুশ্রুত সংহিতায় ধাতুর সাম্যবস্থা নাশকে বার্ধক্যের কারণ বলা হয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে যখন বার্ধক্য নিয়ে আলোচনা করছেন তখন বার্ধক্য বলতে কালজ বার্ধক্য বা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে বোঝাছেন, জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির কথা বলছেন না। এছাড়া তিনি 'বয়োবৃদ্ধ' বলতে অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিদের কথা বলেননি, যেসকল ব্যক্তির যৌবনের সূর্য সবেমাত্র পশ্চিমে হেলেছে সেইরূপ ব্যক্তিদের কথাই এখানে বলা হয়েছে। তিনি নিজে বলেছেন – "আমি অন্ত্র-দন্তহীন ত্রিকালের বুড়ার কথা বলিতেছি না – তাঁহারা দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত। যাঁহারা আর যুবা নাই বলিয়াই বুড়া, আমি তাহাদিগের কথা বলিতেছি"।[২] বার্ধক্যের এই দুটি বিভাগ প্রাচীন শাস্ত্রেও দেখতে পাওয়া যায়। মনুসংহিতার মেধাতিথিভাষ্যে 'জরা' বলতে মানব জীবনের চতুর্থ পর্যায়কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু 'বৃদ্ধ' বলতে মানব জীবনের তৃতীয় স্তরকে বোঝানো হয়। গার্হস্থ্যাশ্রমের পরবর্তী বানপ্রস্থাশ্রমের সময়ই মানব জীবনে বার্ধক্য উপস্থিত হয়। কারণ 'বলী', 'পলিত', ও 'অপত্যস্য অপত্যং' শব্দের দ্বারা মানব জীবনের যে স্তরকে বোঝানো হয়, তা 'বৃদ্ধ' শব্দের সূচক। এই কারণ বশত বলা হয়েছে – "The third of these stage vanaprastha refers to young old age".[৩] উপরের আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে, বানপ্রস্থ ধর্ম যে বয়সে গ্রহণ করা হচ্ছে তা 'বৃদ্ধ' শব্দের বোঝানো হয়, অর্থাৎ তা Young-Oldage। আর জরা হল মানব জীবনের চতুর্থ পর্যায়, যা Old-Oldage বা অতি-বার্ধক্য। অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী মানব জীবনের তৃতীয় পর্যায়, বার্ধক্যের প্রথম স্তর 'বৃদ্ধ' শব্দের দ্বারা বোধিত হয়েছে। আর মানব জীবনের চতুর্থ পর্যায়, বার্ধক্যের

দ্বিতীয় স্তর 'জরা' শব্দের দ্বারা বোধিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে অতি বৃদ্ধব্যক্তি(Old-Oldage) বা জরায় উপনীত ব্যক্তিদের কথা বলেন নি, বৃদ্ধদের(Young-Oldage) কথা বলেছেন।

বার্ধক্য বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি শরীরের জীর্ণতা, অবসাদ প্রমুখ এক দুঃখজনক অবস্থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রও বার্ধক্য সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে প্রথমে এক নৈরাশ্যের কথাই বলেছেন। তাঁর মনে প্রথম যে প্রশ্ন উঠেছে সেটা হল, বার্ধক্য সম্পর্কে লেখা পাঠক পাওয়া যাবে না। কারণ তিনি মনে করেন বৃদ্ধরা অধ্যয়ন পছন্দ করেন না আর যুবকেরা বৃদ্ধের রচনা পড়বে কিনা সন্দেহ। তৎসত্ত্বেও তিনি যখন দেখলেন যে, তিনি নিজে এই স্তরের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছেন, তখনই তিনি 'বুড়া বয়সের কথা' প্রবন্ধটি রচনা করেন। এছাড়াও তিনি বলেছেন বার্ধক্যে দৈহিক বা মানসিক সুখ বলে কিছু থাকে না। তিনি বলেছেন –"সে সরল, সে ভালবাসাপরিপূর্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌহার্দ্দে স্থির, অপরাধেও প্রসন্ন, সে বন্ধু হৃদয় কই? নাই, কার দোষে নাই? আমার দোষ নহে। বন্ধুরও দোষে নহে। বয়সের দোষে অথবা যমের দোষে"।[৪] বার্ধক্যে আশা, ভরসা, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব কিছুই থাকে না। যৌবনের সেই মনও থাকে না। 'একা' নিবন্ধে দেখা যায় কমলাকান্তকে হারানো যৌবনের স্মৃতিচারণা করতে। এই অতীত স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন –"যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পত্রমর্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল"।[৫] বর্তমানের কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন – "এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে, মনুষ্য হৃদয়ে আত্মাদর আছে"।[৬] এখানে কণ্টক, কীট, বিষ প্রভৃতির সাথে বার্ধক্যকে তুলনা করা হয়েছে। কোমল পল্লবে কণ্টকের মতো, ফলে বিষের মতো, উদ্যানে সর্পের মতোই মানব জীবনে বার্ধক্য। অর্থাৎ বার্ধক্য মানব জীবনের কোন সুখকর অবস্থা নয়। এটা হল মানসিক দিক। বার্ধক্যে দৈহিক সুখও থাকে না। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র দাসু মিত্র ও গদার মার কথা বলেছেন। বর্তমানে দাসু মিত্র তার রূপ যৌবন হারিয়েছেন, যৌবনে তিনি জলযোগে ব্রান্ডি ও মুরগি ভক্ষণ করতেন, বর্তমানে বয়সের জন্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং তাই মাছের ছোঁয়াও খেতে পারেন না। তাঁর জীবনে আর বাকি কি আছে সুখের? গদার মার ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। যৌবনে গদার মাকে দেখে কমলাকান্তের মনে হত নন্দন কাননের সচল পুষ্প, আজ

বয়স হওয়াতে তার বর্ণনা করছেন এভাবে –" বকাবকি করিতে করিতে চাল ঝাড়িতেছে – মলিনবসনা, বিকটদর্শনা, তীব্ররসনা, দীর্ঘাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, লোলচর্ম্ম, পলিতকেশ, শুষ্ক বাহু, কর্কশকণ্ঠ"।[৭] এর থেকে বলা যায় বার্ধক্যে মানসিক ও দৈহিক কোন সুখই থাকে না।

বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু বার্ধক্য সম্পর্কে এইরূপ নৈরাশ্যজনক মন্তব্যই দেননি। তিনি সমাজের সাধারণ চিত্রটি তুলে ধরতে গিয়ে বার্ধক্যের দুঃখের কথা বলেছেন। কিন্তু মূলত বার্ধক্য সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য ইতিবাচক, আশাবাদী ও অভিনব। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে প্রকৃত কাজ হল পরের জন্য কোনো কাজ করা। আর বার্ধক্যই হল সেই কাজের প্রকৃত সময়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন – "যৌবন কর্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ ভালো হয় না, একে বুদ্ধি অপরিপক্ক, তাহাতে আবার রাগ, দ্বেষ, ভোগাসক্তি এবং স্ত্রীগণের অনুসন্ধানে তাহা সতত হীনপ্রভ; এজন্য মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্য্যক্ষম হয় না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং ভোগাসক্তির অনধীন, এজন্য সেই কার্যকারিতার সময়। এইজন্য আমার পরামর্শ যে, বুড়া হইয়াছি বলিয়া, কেহ স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির ভান করিবে না। বার্ধক্যেও বিষয় চিন্তা করিবে"।[৮] বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপলব্ধি 'একা' নিবন্ধেও দেখতে পাওয়া যায়। "এই গভীরতর উপলব্ধি আসলে বঙ্কিমেরই প্রৌঢ় ঋতুর ফসল। এর মধ্যে আছে একদিকে উপনিষদের আত্মজ্ঞান বা আত্মপ্রসার, অপরদিকে পাশ্চাত্য মানবপ্রেমের এক অপূর্ব সমন্বয়। যৌবনের আনন্দ আশার রঙিন কাচেঁর অপেক্ষা রাখে। ভিত্তিহীন যুক্তিহীন অলীক স্বপ্ন রচনায় বিভোর যৌবনে যে স্ফূর্তির যোগান থাকে, বেশি বয়সে তা আর থাকে না বটে, কিন্তু পরিবর্তে এই সংসারের যে কঠিন অভিজ্ঞতা সংগৃহীত হয় তাই থেকে মানুষ আরো লাভবান হতে পারে"।[৯] একথা সত্য যে, একজন ব্যক্তির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভীরতর জীবনবোধ জাগ্রত হয়। যৌবনে অনেক বন্ধনের মধ্যে কাজ করতে হয়, আর সে সময় অভিজ্ঞতা কম থাকায় সেই গভীর জীবনবোধ জাগ্রত হয় না। অপরদিকে বার্ধক্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে এবং জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে থাকে। ফলে বার্ধক্য কাজের উপযুক্ত সময়, যখন ব্যক্তি পরের জন্য কিছু করতে পারে। নিজের অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধকে সমাজের কল্যাণে লাগাতে পারে, এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন – "যৌবনে যে কাজ করিয়াছ, সে আপনার জন্য; তারপর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ"।[১০] একথা শুনে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, বার্ধক্যে কি নিজের কাজ

থাকে না? নিজের কাজ কি শেষ হয়ে যায়? কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, মানুষের জীবনের আয়ু লক্ষবর্ষ হলেও নিজের কাজ করা শেষ হবে না। তাই তিনি বলেছেন –"বার্দ্ধক্যে আপনার কাজ ফুরাইয়াছে বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর"।[১১] বঙ্কিমচন্দ্র বার বার বলেছেন পরের জন্য কাজ করেই আনন্দ পাওয়া যায়। তাই আমরা বলতে পারি বার্ধক্যে আনন্দ পাওয়ার পথ হল পরের জন্য কিছু করা।

বঙ্কিমচন্দ্রের বার্ধক্য সম্পর্কে যে বক্তব্য সেখানে তাঁর ধম্মতত্ত্বের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেখানে তিনি বৃদ্ধব্যক্তিকে পরহিতে রত হওয়ার কথা বলছেন, সেখানে পরিস্কার ভাবে ধম্মতত্ত্বের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধর্মতত্ত্বে আত্মপ্রীতি ও জাগতিকপ্রীতিকে একরূপে দেখেছেন। তাঁর মতে "ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন; এজন্য সর্ব্বভূতের হিতসাধন আমাদের ধর্ম্ম, কেন না, বলিয়াছি যে – সকল বৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করাই মনুষ্যজন্মের চরম উদ্দেশ্য। যদি সর্ব্বভূতের হিত সাধন ধর্ম্ম হয়, তবে পরের হিত সাধন যেমন আমার ধর্ম্ম, তেমনি আমার নিজেরও হিতসাধন আমার ধর্ম্ম। কারণ আমিও সর্ব্বভূতের অন্তর্গত; ঈশ্বর যেমন অপর ভূতে আছেন, তেমনি আমাতেও আছেন। অতএব পরেরও রক্ষাদি আমার ধর্ম্ম এবং আপনারও রক্ষাদি আমার ধর্ম্ম। আত্মপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি এক"[১২] । বঙ্কিমচন্দ্র তাই বার্ধক্যকে বেঁচে নিয়েছেন পরের জন্য, সমাজের জন্য কাজ করার সময় হিসাবে। যৌবনে কাজে অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকে, সেই কাজ নিজের জন্য; বার্ধক্য জীবনের পরিণতির সময়, যখন অভিজ্ঞতা দ্বারা, জ্ঞানালোকের দ্বারা মানুষ উদ্ভাসিত, সেই সময়ই প্রকৃত সময় পরের জন্য কিছু করার। আর এই কাজ করার মধ্যে দিয়ে বার্ধক্যের একাকীত্বতা, হতাশা, অবসাদ দূর হতে পারে, বার্ধক্য অবহেলার নয়, প্রকৃত কাজের সময়; নিজের প্রগাঢ় অভিজ্ঞতাকে সমাজের কল্যাণের স্বার্থে কাজে লাগানোর সময় এই বার্ধক্য। পরের জন্য কাজ করা – বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যের মধ্যে মিলের হিতবাদ ও অগাষ্ট কোঁৎ এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অগাষ্ট কোঁৎ এর মতে মানব চিন্তা মতে মানব চিন্তা ঐতিহাসিকভাবে ধর্মতাত্ত্বিক স্তর থেকে অধিবিদ্যার স্তর অতিক্রম করে দৃষ্টিবাদী স্তরে উপনীত হয়েছে। তাঁর মতানুসারে, মানবজ্ঞানের ধর্মতাত্ত্বিক স্তরে মানুষ সর্বপ্রাণবাদ ধারণা থেকে ক্রমান্বয়ে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। উক্ত চিন্তার বশবর্তী হয়েই তিনি মানবতার ধর্মের(Religion of Humanity) ধারণাটির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অগাষ্ট কোঁৎ সমাজকে 'মানবদেবী' রূপে কল্পনা করেছেন তাঁর কথার নির্য্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে

দেখতে পাওয়া যায়, "সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মানুষের যত গুণ আছে – সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দন্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া অগাষ্ট কোঁৎ 'মানবদেবীর' পূজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নেই"$_{১৩}$। বঙ্কিমচন্দ্র মিল-এর 'হিতবাদের' সমর্থক তো বটেই, কিন্তু কোঁৎ প্রদশিত প্রত্যক্ষবাদের মধ্যেই 'হিতবাদ' সমাহিত। শুধু অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ হিতসাধন নয়, সমগ্র মানব সমাজেরই কল্যাণসাধনের কথা প্রত্যক্ষবাদের বলা হয়েছে, তাই বঙ্কিমচন্দ্র কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদ অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। অগাষ্ট কোঁৎ এর এই একেশ্বরবাদ, মানবতার ধর্ম, প্রত্যক্ষবাদ প্রমুখের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের বার্ধক্য সংক্রান্ত বক্তব্যগুলির মধ্যে। বার্ধক্যে অভিজ্ঞতার দরুণ যে গভীরতর জীবনবোধ জাগ্রত হয়, সেই গভীরতর জীবনবোধকে পরের কাজে অর্থাৎ সমাজের কল্যণে কিছু করার সময় হল বার্ধক্য।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধর্ম্মতত্ত্বে বৃদ্ধব্যক্তিদের রক্ষার কথাও বলেছেন, "যাহারা আপনাদের রক্ষায় অক্ষম, মনুষ্য মাত্রেরই তাহাদের রক্ষক। স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, অন্ধ খঞ্জাদি, অঙ্গহীন, ইহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম। ইহাদের রক্ষার্থ প্রাণ পরিত্যাগ ধর্ম্ম"। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বৃদ্ধব্যক্তিদের রক্ষাকে ধর্ম বলছেন, তখন হয়তো তিনি অতি বৃদ্ধব্যক্তিদের কথা বলছেন। 'বুড়া বয়সের কথা' প্রবন্ধে তিনি অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিদের কথা বলছেন না, তা তিনি ঐ প্রবন্ধেই বলেছেন। অর্থাৎ অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিদের রক্ষা করা সমাজ বা মনুষ্যের কর্তব্য, আর যারা সবে মাত্র বার্ধক্যে উপনীত হইয়েছেন তাঁরা সমাজের মঙ্গলের জন্য নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবেন।

**উপসংহার :**

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে বার্ধক্য নিয়ে আলোচানা করতে গেলে দুটি দিক পাওয়া যায়। এক, যে ব্যক্তি সবে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে (young old age), তাঁরা নিজের কাজ ভুলে এই সময় নিজের অভিজ্ঞতাকে সমাজের উন্নতির কাজে লাগাবে। এক্ষেত্রে তিনি বলেন, "বৃদ্ধ তার অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের সাহায্যে মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারে। এই হল যর্থাথ মুনিবৃত্তি"। দুই, যারা অতিবৃদ্ধ তাদের সমাজ রক্ষা করবে। তাই বলা যায় বঙ্কিমের দৃষ্টিতে বার্ধক্য কোন নৈরাশ্যজনক বা দুঃখজনক অবস্থা নয়, আবার বার্ধক্য উপস্থিত হলে জীবনের সব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে কেবল ধর্মের আশ্রয়ে

জীবন যাপন করতে হবে – এমনও নয়। বার্ধক্য মানব জীবনের এক অনিবার্য অবস্থা, তাকে দুঃখ ভেবে সমাজ থেকে দূরে না থেকে বরং বৃদ্ধাবস্থার প্রথমাবস্থায় সমাজের জন্য কাজ করতে হবে, পরবর্তী অবস্থায় অর্থাৎ অতিবার্ধক্যে সমাজ বৃদ্ধব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করবে। সুতরাং বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের বার্ধক্য সংক্রান্ত আলোচনায় অভিনবত্ব এইখানেই যে, তিনি নিজে বার্ধক্যে উপনীত না হয়েও অনুভব করেছিলেন একজন বৃদ্ধব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের দ্বারা এক গভীর জীবনবোধ জাগ্রত হয়, যা ঐ ব্যক্তি সমাজের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারে। এর ফলে সমাজ যেমন উপকৃত হবে, বার্ধক্যে উপনীত ব্যক্তিও সম্মানিত ও একই সঙ্গে বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার জন্য নিজেকে অবহেলিত, উপেক্ষিত ভাববে না। সমাজে তাঁর এখনও কিছু করার আছে সে কথা বুঝতে পারবে। তাই বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে একজন বৃদ্ধব্যক্তি, তাঁর বার্ধক্যের সার্থক উপলব্ধির আলোয় নিজেকে, সমাজ ও সংসারকে দীপ্তিমান করে তোলে।

[1]ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে –"স ব্রুয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্যতি ন বধেনাস্য হন্যতে এতৎ সত্যং ব্রক্ষপুরমস্মিন কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পো... (৮/১/৫)। অর্থাৎ দেহই অনিত্য, আত্মা নয়। দেহ জরাযুক্ত হলে যেমন আত্মা জরাযুক্ত হয় না, তেমনি দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না।

[২] ঋগ্বেদ সংহিতায় বলা হয়েছে, "জরা যেরূপ রূপ বিনাশ করে তুমি সেইরূপ শম্বরের নগরসমূহ বিনাশ করিয়াছিলে"(৪/১৬/১৩)

[৩]"শরীরস্থ বায়ু প্রকুপিত হইলে শরীর নানাবিধ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়; তখন শারীরিক বল, বর্ণ, সুখ ও আয়ু প্রভৃতির বিঘ্ন উপস্থিত হয়"।১০

[৪]জরা মানব জীবনে বার্ধক্যের পরের স্তর এ কথা মহাভারতের শান্তি পর্ব্বেও দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে –

সতস্য সহজাত স্যসপ্তমীংনবমীংদশাম্।
প্রাপ্নুবন্তিততঃপঞ্চনভবন্তিশতায়ুষঃ।।৬

এরঅর্থহল – গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, পৌগন্ড, যৌবন, বার্ধক্য, জরা, প্রাণরোধ ও বিনাশ এই দশটি দশা দেহের হয়ে থাকে। অর্থাৎ এখানেও দেখা যাচ্ছে যে দেহের সপ্তম দশা বার্ধক্য ও অষ্টম দশা জরা। যেহেতু মহাভারতেও দেখাযাচ্ছে  যে প্রথমে

বার্ধক্যের কথা বলা হয়েছে, তারপর জরার কথা বলা হয়েছে, সেহেতু অনুমান করাই যেতে পারে যা, এখানেও জরা বলতে অতি-বার্ধক্যকে বোঝানো হচ্ছে। সুতরাং বলাই যায় মহাভারতের দৃষ্টিতেও বার্ধক্যও জরা সমার্থক শব্দ নয়। জরা হল বার্ধক্যের দ্বিতীয় স্তর। মানব জীবনের তৃতীয় স্তরে বানপ্রস্থা শ্রমের সূচনা লগ্নে বৃদ্ধাবস্থার আসে, একে ‘বার্ধক্য’ বা ‘বৃদ্ধ’ শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়।

[৫] ‘বঙ্গদর্শন’ শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল, পৃ ১২

**তথ্যসূত্র :**


১. বঙ্কিমচন্দ্রচট্টোপাধ্যায়, বুড়াবয়সেরকথা, বঙ্কিমরচনাবলী (দ্বিতীয়খন্ড), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা ৯, পৃষ্টা ৫২।
২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বুড়াবয়সেরকথা, বঙ্কিমরচনাবলী (দ্বিতীয়খন্ড), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা ৯, পৃষ্টা ৫৪।
৩. Pratima Verma, Social Philosophy of The Mahabharata and The Manu Smriti, ClassicalPublishing Company, New Delhi, 1988.
৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বুড়া বয়সের কথা, বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয়খন্ড), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা ৯, পৃষ্টা ৫৪।
৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, একা, বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয়খন্ড), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা ৯, পৃষ্টা ১২।
৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, একা, বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয়খন্ড), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা ৯, পৃষ্টা ১২।
৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বুড়া বয়সের কথা, বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয়খন্ড), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা ৯, পৃষ্টা ৫৩।
৮. ঐ, পৃষ্টা ৫৪।
৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, একা, বঙ্কিমরচনাবলী (দ্বিতীয়খন্ড), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা ৯, পৃষ্টা১২।
১০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বুড়া বয়সের কথা, বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয়খন্ড), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা ৯, পৃষ্টা ৫৪।
১১. ঐ, পৃষ্টা ৫৪।
১২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ধর্ম্মতত্ত্ব, আত্মপ্রীতি, বঙ্কিম রচনাবলী, পৃ. ৫৫৭।
১৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ধর্ম্মতত্ত্ব, প্রথমভাগ, ১১শ অধ্যায়, ঈশ্বরেভক্তি, বঙ্কিমরচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড)।

# রবীন্দ্র-চেতনায় সমবায় ভাবনা ও পল্লিউন্নয়ন : চিঠিপত্রের আলোকে

প্রহ্লাদ রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

**সারসংক্ষেপ :**
গ্রাম-বাংলায় উপার্জনের মূলক্ষেত্র মূলত— কৃষিকাজ। তবে ক্ষেত্র বিশেষে কুটির শিল্পের গুরুত্বও বর্তমান। সর্বজনগ্রাহ্য এই দ্বিবিধ কর্মের মধ্য দিয়ে সাধারণ গ্রামীণ মানুষ নিজেদের প্রাত্যহিক জীবন অতিবাহিত করে। তবে এই চাষি-শিল্পীরা প্রত্যেকেই দরিদ্র হওয়ায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আধুনিকভাবে কৃষিকাজ কিংবা কুটিরশিল্পের মাধ্যমে নিজেদের তথা গ্রামের উন্নয়ন সম্ভবপর নয় । কিন্তু সমবায়-প্রণালীর মাধ্যমে তা সম্ভব। অর্থাৎ ব্যক্তিগত উপার্জন পদ্ধতিকে একত্রিত করে (উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায়) সমবায়-প্রণালীতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তার সূত্র ধরে গ্রামের উন্নয়ন সম্ভব। এই ভাবনা সমাজকর্মী ও জমিদার রবীন্দ্রনাথের চেতনায় ছিল। যে চিন্তা-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ সাহিত্যের পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত বিভিন্ন চিঠিপত্রের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। সমবায়-প্রথার মাধ্যমে পল্লিউন্নয়নের ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে কীভাবে রূপলাভ করেছে তার বিশ্লেষণই এই নিবন্ধের আলোচ্য।

**সূচক শব্দ :** সমবায়-প্রণালী, পল্লিপুনর্গঠন, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র, গ্রামীণ-অর্থনীতি।

**মূল আলোচনা :**

রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র সাহিত্যস্রষ্টাই নন, একজন বড় মাপের কর্মী ও চিন্তক। এই দ্বিবিধ সত্তার পরিচয় তাঁর প্রবন্ধের মতো চিঠিপত্রেও বিশেষ মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। চিঠিপত্র ব্যক্তিগত ভাব বিনিময়ের একটি অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ভাব বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন চিঠিপত্রে মনের অন্তঃস্থলে লালিত যাবতীয় ভাবনা-চিন্তা, তথ্য কিংবা মঙ্গলময় কোন বিষয় সম্পর্কে নিজের ব্যক্তিগত মন্তব্যকে অনায়াসে প্রকাশ করেছেন। আর সেই সমস্ত টুকরো টুকরো ভাবনা-চিন্তার মধ্যে অন্যতম— সমবায়-প্রণালীর মধ্য দিয়ে পল্লিউন্নয়ন বা পল্লিসঞ্জীবন। কারণ— পল্লিউন্নয়ন বা পল্লিপুনর্গঠনই ছিল জমিদার রবীন্দ্রনাথের প্রধান কাজ। কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে তার বিশেষ পরিচয় মেলে— ‘দেশকে কোন দিক থেকে রক্ষা করতে হবে, আমার

তরফ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমার ওই কাজের মধ্যে। ... কিন্তু এই কথা মনে রেখো ... শিক্ষা সংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।'[১] বিভিন্ন সময়ে একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট চিঠিপত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সমবায়-নীতি ও এই নীতিকে অবলম্বন করে পল্লিউন্নয়ন সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনাকে ব্যক্ত করেছেন। নির্বাচিত চিঠিপত্রের আলোকে সেই ভাবনা-জগতের বহিঃপ্রকাশই আমাদের এই নিবন্ধের অন্বিষ্ট।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে, সমবায়-প্রণালী কী ? উত্তর প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সাধারণভাবে গ্রামীণ গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের একত্রিত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করার প্রথা-ই Co-Operative System বা সমবায়-প্রণালী। এই নীতির মধ্যদিয়েই যে দেশকে দারিদ্রের করালগ্রাস থেকে রক্ষা করা সম্ভব, তা রবীন্দ্র-চেতনায় ছিল। কারণ, দারিদ্র দূরীকরণ আসলে পল্লিপুনর্গঠনেরই একটি অংশ। 'সমবায় নীতি' প্রবন্ধগ্রন্থে তার পরিচয় মেলে— 'আমার কাছে মনে হয়, এই কো-অপারেটিভ প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়।'[২] প্রবন্ধের মতো তাঁর এই ভাবনার সাক্ষ্য মেলে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা একটি পত্রে—

> চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদায় আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে— জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর; দ্বিতীয়ত, সমবায় নীতির অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্রিত করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না।[৩]

গ্রাম-জীবনে উপার্জনের মূলক্ষেত্র মূলত— কৃষি। সুতরাং, সমবায়-প্রথার মাধ্যমে কৃষির উন্নতি সাধনের পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে পল্লিপুনর্গঠনেরই একটি অন্যতম প্রয়াস।

রবীন্দ্রনাথের পল্লিউন্নয়ন সংক্রান্ত ভাবনার একটি বিশেষ দিক উদ্ভাসিত ১৯০৩ সালে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা একটি চিঠিতে। তিনি লিখেছেন— 'জমির সন্ধান করো, ভবিষ্যতে বিশেষ কাজে লাগবে। সন্তোষকে ও রথীকে Agriculture-এর জন্যই তৈরি করা স্থির করেছি। ওরা দুজনে মিলে চাষবাস করবে।'[৪] এই ভাবনা আসলে প্রথমে নিজের জমিদারিতে ও পরে সর্বত্র কৃষিকাজে বিপ্লব আনারই প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন উন্নত প্রযুক্তিতে এবং সমবায়-প্রণালীতে চাষ কৃষিকে আরো উন্নয়নমুখী করে তোলে। এই উন্নতির জন্যই ১৯০৫ সালে পতিসরে কৃষি-সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। সমবায় প্রথাকে অবলম্বন করে চাষ করার প্রসঙ্গ নিয়ে জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি লিখেছেন— 'দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের উন্নতি বিধান

করাই এখন যথার্থ দেশের কাজ। চাষাদের সঙ্গে কো-অপারেশনে চাষ করা, ব্যাঙ্ক করা, তাদের ... ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ... এমন কত কাজ আছে তার সীমা নেই।'[৫] তাছাড়া এই সমবায়- প্রণালীতে চাষ করে চাষীরা যে প্রচুর লাভবান হয়েছে তা অতুলচন্দ্র সেনকে লিখিত পত্রে উল্লেখ করেছেন— 'এই তো চাই। এমনি করিয়া এক জায়গায় কাজ আরম্ভ হইলে সব জায়গাতেই হইবে। এই বৎসর প্রজারা প্রচুর ফসল পাইয়াছে বলিয়া স্ফূর্তিতে আছে— এখনি তোমার কাজের আসর বসিবে ভালো।'[৬]

শিলাইদহ, প্রতিসর পর্বের পরেই ১৯২৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনে সাংবাৎসরিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ গ্রামের সমস্যা-অভাবকে বাইরে থেকে খণ্ড খণ্ড করে না দেখে, তাকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করে সকলের সহযোগিতায় অর্থাৎ সমবায়-প্রথার মাধ্যমে সমাধানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং এই সময়পর্বেই বিশ্বভারতী সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গড়ে তুলেছেন। যার মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চাষীদের কৃষিঋণ ও অন্যান্য সহায়তা দান সম্ভবপর হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ, তাদের কৃষিকাজ আরো সমৃদ্ধি লাভ করে। আর কৃষকদের উন্নয়ন আসলে গ্রামেরই উন্নয়ন। যা প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশকে প্রেরিত ভিভিন্ন চিঠিপত্রে লক্ষ্য করা যায়। এপ্রসঙ্গে একটি চিঠির খণ্ডাংশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য— 'কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রতি তোমার মমতা নেই— আমি ওটাকে খুব আবশ্যক বলে জানি— ওর উন্নতির সঙ্গে আমাদের পল্লির কাজের ঘনিষ্ঠ যোগ।'[৭]

এখন পর্যন্ত সমবায়-প্রণালীর মাধ্যমে কৃষিকাজ করে গ্রামোন্নয়নের ভাবনা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন চিঠিপত্রের মুকুরে লক্ষ্য করা গেল। কিন্তু ভৌগোলিক পরিবেশের রুক্ষতার কারণে যে সব অঞ্চলে বছরে একবার চাষ-আবাদ হয় (বিরাহিমপুর, কালীগ্রাম পরগণা প্রভৃতি), সেই সমস্ত স্থানে কৃষির পরিবর্তে সমবায়ের মাধ্যমে কুটিরশিল্প, ডেয়ারীশিল্পে মনোনিবেশ করে গ্রামবাসী কর্তৃক নিজেদের দারিদ্রতা দূর পূর্বক গ্রামের উন্নতি সম্ভব তাও রবীন্দ্র-চেতনায় ছিল। সেকারণে জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে (আয়ার্ল্যান্ডে থাকাকালীন) একটি চিঠিতে ডেয়ারীশিল্প সংক্রান্ত কাজের প্রণালী সম্পর্কে ভালোভাবে আবগত হতে বলেছেন—

> শুনতে পাই আয়ার্ল্যান্ডে এই সমবায় মণ্ডলীর খুব প্রচলন এবং উন্নতি হয়েছে। সেখান থেকে কো-অপারেটিভ ডেয়ারী প্রভৃতি কাজের প্রণালী যদি কিছুদিন দেখে-শুনে আসতে পার তাহলে এ দেশে সেটা খাটাতে পার। আয়ার্ল্যান্ডের অবস্থা নানা কারণে

> অনেকটা আমাদের দেশের মতো। তারা রক্ষা পাওয়ার জন্য কীরকম চেষ্টা করেন তা দেখে এলে বোধ হয় সে অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগবে।[৮]

বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম পরগণার শক্ত এঁটেল মাটি কৃষিকাজের পক্ষে তেমন উপযোগী না হওয়ায় ঐক্যত্রিকভাবে (সমবায়ের মাধ্যমে) মাটির কাজ অর্থাৎ Pottery শিল্প কিংবা কোন কুটির শিল্পের (যেমন ছাতা তৈরি) মাধ্যমে সেখানকার গ্রামবাসীরা আর্থিকভাবে সাবলম্বী হয়ে ওঠে। আর এই সাবলম্বন পক্ষান্তরে নিজেদের গ্রামকে আরো উন্নত তথা সমৃদ্ধ করারই বীজমন্ত্র। এ-ভাবনাও রবীন্দ্র-মননে লালিত হয়েছে ; যার প্রকাশ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে পরিস্ফুট— 'এখানে চাষাদের কোন Industry শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না— এদের থাকবার মধ্যে কেবল এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottery জিনিসটাকে Cottage Industry রূপে গণ্য করা চলে কিনা। একবার খবর নিয়ে দেখিস— অর্থাৎ ছোটখাটো Furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কিনা। ... আর একটা জিনিস আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো ... যাই হোক ধানভানা কল, Pottery-র চাক ও ছাতা তৈরির শিক্ষকের খবর নিস— ভুলিসনে।'[৯] গ্রামোন্নয়নের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে কতটা আত্মিক-যোগ ছিল তা এই 'ভুলিসনে' শব্দটিই তার অন্যতম চিহ্নায়ন। উক্ত কুটিরশিল্প ও ডেয়ারীশিল্পের মাধ্যমে পল্লিপুনর্গঠনের কাজ পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন সংলগ্ন শ্রীনিকেতনে সুষ্ঠুভাবে রূপলাভ করে। এপ্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠির খণ্ডাংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

> সন্তোষ পাঁচটি গোরু নিয়ে বোলপুর বিদ্যালয়েই একটি ছোটখাটো Dairy খুলেছে। ... আরও যদি গোটা-দশেক গোরু আনা যায় তাহলে ঐ জায়গাতেই ১৫০/২০০ টাকা খরচ বাদে পাওয়া যেতে পারে। ... দেশে গোরুর উন্নতি করার বিশেষ প্রয়োজন। নইলে আর কিছুদিন পরে চাষের ভয়ানক দুর্গতি হবার আশঙ্কা আছে।[১০]

শুধু তাই নয়, গ্রাম-বাংলার স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য স্বাস্থ্য-সমবায় গঠনের চিন্তা-ভাবনাও রবীন্দ্র-চেতনার মুকুরে প্রকট। প্রমথ চৌধুরী, ডা. যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রেরিত একাধিক পত্রে তা স্পষ্টিকৃত। পূর্ববঙ্গে নিজের জমিদারিতে যে বৃহৎ দাতব্য-চিকিৎসালয় জমিদার রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্টা করেছিলেন তার

দ্বারা গ্রামের সাধারণ মেহনতী মানুষেরা প্রভূত উপকৃত হয়। সে কথা তিনি উল্লেখ করেছেন প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠিতে—

> ডাক্তার এবং ডাক্তারখানায় আমাদের জমিদারীর এবং তারও চতুষ্পার্শে লোকের বিশেষ উপকার হয়েছে এই কথা যখন শুনতে পাই তখন সকল অভাবের দুঃখের উপর ঐ সুখটাই বড় হয়ে ওঠে। বিরাহিমপুরে প্রজাহিতের এই একটিমাত্র কার্য্যে সফল হয়েচি।[১১]

হেলথ কো-অপারেটিভ নির্মাণ করে চিকিৎসার সুব্যবস্থা সারা ভারতবর্ষে প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সূচনা করেছিলেন। ফলস্বরূপ, এই ব্যবস্থার (স্বাস্থ-সমবায়) মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা দ্রুত বিবিধ ব্যাধির কবল থেকে আরোগ্য লাভ করে। এবং পল্লির উন্নয়নের স্থানাঙ্ক দ্রুত লয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তী সময়পর্বে এই ভাবনা শ্রীনিকেতনেও বাস্তবায়িত হয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি আরও অধিক মাত্রায় উন্নয়নমুখী হয়ে ওঠে। কালীমোহন ঘোষ, অতুলচন্দ্র সেন প্রমুখকে লেখা বিভিন্ন চিঠিপত্রে তার পরিচয় মেলে। অতুলচন্দ্র সেনকে লিখিত একটি চিঠির অংশ বিশেষ কবির উক্ত অভিপ্রায় প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বের দাবীদার— 'দরিদ্র চাষী প্রজারা একত্র মিলিয়া নিজেদের দারিদ্র্য— অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞান দূর করিতে পারে ... এই আমার অভিপ্রায়।'[১২]

আলোচনার শেষ দাঁড়ি টানার আগে বলা যায় যে, সমবায়-প্রণালীকে অবলম্বন করে কৃষিক্ষেত্রে, কুটিরশিল্পে, ডেয়ারীশিল্পে প্রভূত উন্নতি সম্ভব সেকথা রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন। আর এই সম্পূর্ণ পক্রিয়াটিকে সুসম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং একাধিক উপযোগী কাজ তিনি সম্পাদন করেন। সেকারণে, পতিসর, শিলাইদহে এবং পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতন ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের উন্নতি সম্ভবপর হয়। যা থেকে জমিদার রবীন্দ্রনাথের সমাজকর্মী ও প্রজাদরদী মনের পরিচয় খুব সহজেই আমাদের চোখের সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও রবীন্দ্র-পার্ষদ প্রমথ চৌধুরীর তাই বলতে পারেন—

> রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসেবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য আজীবন কী করে এসেছেন তা আমি সম্পূর্ণ জানি,— কেননা তাঁর জমিদারি-সেরেস্তায় আমিও কিছু দিন আমলাগিরি করেছি। ... রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবেও যেমন জমিদার হিসেবেও তেমনি Unique।[১৩]

**তথ্যসূত্র :**


১. পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, চিঠিপত্রের রবীন্দ্রনাথ : বিচিত্রের দূত, কাছের মানুষ; সম্পাদক— উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, রাতের তারা দিনের রবি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ : ১ বৈশাখ ১৩৯৫, পৃ. ৩৬৬।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমবায় নীতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯, পৃ. ১৫।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪২০, পৃ. ২৬।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, দেশ, সম্পাদক— সাগরময় ঘোষ, ২৪ মে ১৯৮৬, পৃ. ৭।

৫. জয়শ্রী চক্রবর্তী, রবীন্দ্রপত্র : রবীন্দ্রভাবনা, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা ১৩৯৭, পৃ. ৯৮।

৬. সুবোধ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা-০৯ প্রথম প্রকাশ : ৮ আগস্ট ২০১০, পৃ. ১০০।

৭. প্রশান্তচন্দ্র পাল (সম্পাদিত), কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পত্র সংকলন), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা-২০, পৃ. ৬০।

৮. জয়শ্রী চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত রবীন্দ্রপত্র : রবীন্দ্রভাবনা, পৃ. ৯৮।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র-২, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-১৭, প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৪৯, পৃ. ১৯-২০।

১০. প্রবালকান্তি হাজরা, রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন ভাবনার আলোকে আজকের গ্রামোন্নয়ন, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ : ৯ মে ২০১১, পৃ. ২৮।

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র-৫, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৫২, পৃ. ২৩২।

১২. সুবোধ চৌধুরী, পূর্বোক্ত রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা, পৃ. ১০১।

১৩. প্রমথ চৌধুরী, প্রবন্ধ সংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-১৭, সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ৫২০।

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :**

১. আভা নাথ, সমাজচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ, টেগর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা-২৬, প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৪০৭।

২. গৌরচন্দ্র সাহা, রবীন্দ্র-পত্রাবলী : তথ্যপঞ্জি, পরিবেশক : দে'জ পাবলিশিং ও বোলপুর পুস্তকালয়, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৬ জুন ১৯৮৪।

৩. দীক্ষিত সিংহ, রবীন্দ্রনাথের পল্লিপুনর্গঠন-প্রয়াস, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা-২০, সংশোধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১১।

৪. পুলিনবিহারী সেন, রবীন্দ্রায়ণ-২, বাকসাহিত্য, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১২ পৌষ ১৪১৪।

৫. বীণা মুখোপাধ্যায়, চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ, নাভানা, কলকাতা-১৩, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬৫।

৬. মহাদেব ঘোষ, ভিন্ন এক মধ্যস্বত্বভোগী, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বদেশী সমাজ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৬৯।

৮. সতী চট্টোপাধ্যায় ও দেবীরানী ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র : নির্দেশিকা-১, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, কলকাতা-২৬, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০৯।

৯. সতী চট্টোপাধ্যায় ও দেবীরানী ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র : নির্দেশিকা-২, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, কলকাতা-২৬, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৬।

**সহায়ক পত্র-পত্রিকা :**

১. বলাকা, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র আলোচনার আলোকে, সম্পাদক— ধনঞ্জয় ঘোষাল ; বর্ষ ২৫, সংখ্যা ৩৪ : এপ্রিল ২০১৬।

২. বিশ্বভারতী পত্রিকা, সম্পাদক— উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, নবপর্যায়-৬ : কার্তিক-পৌষ ১৪০৪।

# অভিনবত্বের আঙ্গিকে বাদল সরকারের 'সারারাত্তির' নাটক

বিপ্লব কুমার দে
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

**সারসংক্ষেপ :**
বাদল সরকারের সারারাত্তির নাটকে আমরা তিনটি চরিত্র- স্ত্রী-পুরুষ ও বৃদ্ধের সংলাপের মধ্য দিয়ে তাদের ভালোলাগা, চাওয়া পাওয়ার এক অভিনব আখ্যান লক্ষ করি। নাটকে বৃদ্ধ রাতের পর রাত জেগে এক প্রবল জীবন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়ে তার সমাধানের চেষ্টা করে। বৃদ্ধের সংস্পর্শে এসে স্ত্রী চরিত্রটির মধ্যেও জেগে ওঠে প্রবল আত্মজিজ্ঞাসা। নাটকে স্ত্রী বৃদ্ধের মধ্যে খুঁজে পায় রঞ্জনকে। যে রঞ্জন আনন্দের, মুক্তির প্রতীক। স্ত্রী ও বৃদ্ধের এই জীবন জিজ্ঞাসা আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মত নয়, একটু আলাদা।  আসলে বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা মানুষের আর্থসামাজিক, মানসিক জীবনে নিয়ে আসে এক চরম বিপর্যয়। মানুষের মধ্যে এক নেতিবাচক প্রভাব কাজ করতে শুরু করে। এই নেতিবাচক মনোভাব জন্ম দেয় অ্যাবসার্ড নাট্যধারার। যার প্রভাব পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের সাহিত্যেও সুস্পষ্টভাবে পড়েছিল। সারারাত্তির নাটকে এই নেতিবাচক তথা অ্যাবসার্ডের প্রভাব থাকলেও রয়েছে সেখান থেকে উত্তরণের প্রয়াস। কারণ নেতিবাদের মধ্যে কোন সার্থকতা নেই, সার্থকতা রয়েছে বেঁচে থাকার মধ্যে।

**মূল শব্দ : বিশ্বাস, আনন্দ, ভালবাসা, রাত, বিশ্বাসহীনতা।**

**মূল আলোচনা :**

বদ্ধ ঘরের নিস্তব্ধ ভালোবাসায় হতাশা বাড়ে। হতাশা ডেকে আনে নৈরাশ্যকে। নিজেদের যত্নে গড়ে তোলা সাজানো বাগান অযান্তেই নষ্ট হয়ে যায়। পাশাপাশি নিঃশ্বাস ফেলা দুটি আত্মার মনের খবর কেউ রাখেনা। দুজনেই চায় তাদের খবর অন্যজন রাখুক কানে কানে এসে বলুক ভালো আছো।  এই ভালো থাকাটা আর হয়ে ওঠে না, না পাওয়া মানুষ দুটো একে অপরকে তরজা করতে ব্যস্ত। নিজেদের মধ্যে ধীমে ধীমে জ্বলতে থাকা ভালোবাসার ওম নিয়ে কেউ চিন্তিত নয়। একসময় নিজেদের সম্বিৎ ফিরে

আসে, নিজেদের যত্নে লালিত ভালোবাসার ঘর তারা আবার গোছাতে থাকে। বাদল সরকারের সারারাত্তির নাটকে দু'জন মানুষ যেন তাদের ভালোবাসার ভাঙ্গা-গড়ার গল্প শোনাল।

প্রত্যেক পুরুষের মানসে থাকে নারী আর নারীর পুরুষ। উভয়ের মিলিত প্রয়াসেই জীবন হয়ে ওঠে সুস্থ সুন্দর ও মধুময়। আবার এই মধুর জীবনের পাশাপাশি কিছু বেখাপ্পা জীবনও দেখা যায়। যেখানে প্রিয়ার কটাক্ষ চাহনিই সর্বস্ব নয়, বেঁচে থাকার রসদ সেখানে খোঁজা হয় জীবনের এক অতলস্পর্শী অমৃতকুম্ভে। অচেনা এক বোধ,প্রবল আত্মজিজ্ঞাসা সর্বক্ষণ যেন তাড়া করে বেড়ায় সেখানে --

আলো অন্ধকারে যাই - মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, - কোন এক বোধ কাজ করে ;
স্বপ্ন নয় - শান্তি নয় - ভালোবাসা নয়
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয় ; ১

কি সেই বোধ? কি সেই জীবন জিজ্ঞাসা? যা মানুষকে সাধারণ জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত করে এক অচেনা জগতের অধিবাসী করে তোলে ; সারারাত্তির নাটকে মূলত সেই আলোচনাই করব-

'সারারাত্তির' নাটকটি বাদল সরকার লিখেছেন ১৯৬৩ সালে। একই বছর আরো একটি নাটক 'এবং ইন্দ্রজিৎ' লিখেছেন তিনি। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' আগে কলকাতায় বসে লেখা আর 'সারারাত্তির' পরে ফ্রান্সে, জুলাই-আগস্টে লেখা। নাটক দুটির মৌলিকত্ব প্রসঙ্গে পবিত্র সরকার মন্তব্য করেছেন--

> "এগুলিতে নাট্যকারের নিজের ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বেশি প্রক্ষেপ ঘটেছে। নাটকে নাট্যকার নিজেকে লুকিয়ে ফেলেন, কখনোই ধরা দিতে চান না, নানা objective correlative কে সামনে তুলে ধরে অন্যের গল্প বলেন। কিটসের নৈরাত্মসিদ্ধি বা negative capability কথাটিও এ প্রসঙ্গে বারংবার উচ্চারিত হয়।"২

এবার একটু নাটকের ভেতরে প্রবেশ করা যাক, নাটকটির মুখবন্ধে নাট্যকার নিজেই লিখেছেন -

"নাটকটি ফ্রান্সের পূর্ব সীমানার একটি শহরে বাস করার সময় লেখা। তিনটি মাত্র চরিত্র, তাদের নামের উল্লেখ নেই নাটকে, অতএব চরিত্র লিপি নিষ্প্রয়োজন।"৩

অর্থাৎ নাটকে নামহীন তিনটি চরিত্র --স্ত্রী, পুরুষ ও বৃদ্ধ। এক বাদলা রাতে মাঠের মাঝখানে পোড়ো বাড়িতে নিশ্চিত মাথা গোঁজার আশ্রয়ের আশায় স্ত্রী ও পুরুষের আবির্ভাব দিয়েই নাটকের শুরু। কিঞ্চিৎ ভৌতিক আবহের মধ্য দিয়ে হলেও বৃদ্ধের ক্রমশ প্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই ভীতির অবসান হয়। কাহিনীর সময়সীমা এক রাত্রির। নাটকে বৃদ্ধের অতিথি আপ্যায়ন ও স্ত্রী, পুরুষের প্রয়োজনীয় জিনিসের যোগান দিয়ে তাদের কাছে রহস্যজনক ভাবে প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছে। একা থাকলেও বৃদ্ধের অতিথি আপ্যায়নে প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব হয় না এখানে বৃদ্ধকে রহস্যজনক মনে হয় এই কারণে- প্রথমত, বৃদ্ধ এক পোড়ো বাড়িতে রহস্যজনকভাবে একা থাকে। দ্বিতীয়ত, বৃদ্ধ আগন্তুকদের মনের সব কথা আগে থেকেই জানে বলে মনে হয়। কিন্তু তা নয়, বৃদ্ধ অভিজ্ঞ লোক। তার চিন্তাভাবনা, কথা বলার ধরন আলাদা।

নাটকে বৃদ্ধের থেকেও বেশি রহস্যময় রাত। এই রাত এক অদৃশ্য শক্তির মত নাটকে বিরাজমান। রাতকে ভালো করে জানাই যেন বৃদ্ধের লক্ষ্য। রাতের রহস্যই যেন ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে নাটকে। যে রাত অনেক কিছু বোঝায়, চেনায়, শেখায়। বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করে বৃদ্ধ তা জেনেছে। বৃদ্ধের কথায় -

"সারারাত্তির! সারা রাত্তির!
সারারাত্তির খোলা দুই চোখে
জমে থাকা বিষ ছোবলে ছোবলে
বিষাক্ত যত কথার ছোবলে
কত হলাহল চেতনার বিষ
সারারাত্তির এই দুটি চোখে নিয়েছি।
পুষে রাখা কথা জমে থাকা কথা
চেতনার বিষে বিষাক্ত কথা
এই ঘরে এই বিষের আধারে
সারারাত্তির ছড়িয়ে ছড়িয়ে গিয়েছি।"[৪]

অপরদিকে স্ত্রী চরিত্রটি রাত জাগলেও রাতের প্রকৃত রহস্য উদ্ধার করতে পারেনি। বৃদ্ধই তাকে রাতের প্রকৃত স্বরূপ চিনিয়েছে। আসলে এই রাত যেন জীবনের অঙ্গ। রাত জেগে বৃদ্ধ ও স্ত্রী যেন জীবনকে চিনেছে বেশি করে। নাটকে একটা বিষয় আমাদের চমকিত করে, তা হল বৃদ্ধের বয়স সম্বন্ধে থিওরি ; সাত বছরের থিওরি। বৃদ্ধের কথায় -

> "আমার মনে হয়, সাত-বছরটা মানুষের জীবনের একটা একক। একটা ইউনিট, বা মডিউল, বা মাপকাঠি - যা বলেন। সাত এক্কে সাত,সাত দুগুনা চোদ্দ, তিন সাত্তে একুশ, চার সাত্তে আঠাশ, পাঁচ সাত্তে পঁয়ত্রিশ- বয়স গুলো কল্পনা করুন? সাত, চোদ্দ, একুশ, আঠাশ, পঁয়ত্রিশ, বিয়াল্লিশ।"৫

সত্যি এই বয়সগুলো মানুষের জীবনে এক একটা turning point, পালাবদলের পালা। বয়সের এক একটা সন্ধিক্ষণ। শারীরিক, মানসিক উভয় অবস্থায় পরিবর্তন হয়। একটা চেতনার অবসান হয়ে নতুন চেতনার উন্মেষ হয়। এই বয়সে পুরনো যত চাওয়া পাওয়ার হিসেব খতিয়ে দেখে মানুষ। কাজেই এই বয়সগুলোর একটা গুরুত্ব মানবজীবনে রয়েছে, যা নাট্যকার সুন্দরভাবে সারারাত্তির নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

তাস খেলার প্রসঙ্গ নাটকে একটা আলাদা মাত্রা যোগ করে। নাটকের শেষ ঘটনার একটা ইঙ্গিত যেন এখানে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ ম্যাজিক দেখিয়ে যে তাসটা অদৃশ্য করে ফেলে, সেই হারিয়ে যাওয়া তাস প্রসঙ্গে বৃদ্ধের স্ত্রীকে বলা একটি মন্তব্য -

> "আপনি বেছে নিয়েছিলেন। হারিয়ে গেছে। খুঁজলেই কি পাওয়া যাবে।"৬

বক্তব্যটি তাস কে নিয়ে হলেও তা যেন অনেকটা জীবনকেন্দ্রিক। মানুষ অনেক সময় প্রিয়বস্তু বা প্রিয় মানুষকে বেছে নেয় নিজের ভাললাগার জায়গা থেকে। কিন্তু এক অদৃশ্য শক্তির তাগিদে তা হারিয়ে যায়। নাটকও স্ত্রী ও পুরুষ সাত বছর একসাথে ঘর করেছে। একে অপরকে ভালোবেসেছে,বিশ্বাস করেছে। কিন্তু বৃদ্ধের জীবন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়ে তাদের সেই বিশ্বাস ভেঙ্গে গেছে। দীর্ঘদিন একসাথে থাকলেও তারা একে অপরের মনের খবর রাখেনা। জানেনা একে অপরের চাওয়া পাওয়া। নাটক স্ত্রী পুরুষের সংলাপে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য –

> "স্ত্রী: তবে আমাকেও বোঝনা।
> পুরুষ: তোমাকে বুঝি না?
> স্ত্রী: না, বোঝো না। বুঝতে চাও না। বুঝতে চাওনি কোনোদিন।
> পুরুষ: বুঝতে চাইনি?
> স্ত্রী: না চাও নি। যা কিছু বলতে চেয়েছি, ছেলেমানুষি বলে পাগলামি বলে থামিয়ে দিয়েছো।

পুরুষ: ছেলেমানুষি করেছো তাই থামিয়ে দিয়েছি। যদি ছেলেমানুষি ছেড়ে একটু বড় হবার চেষ্টা করতে তাহলে তুমিও অনেক কিছু বুঝতে পারতে।

স্ত্রী: তার মানে?

পুরুষ: তুমি জানো আমার সব কথা? তুমি খবর রাখো আমি কি চাই না চাই?"৭

এ এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব মানুষের। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দীর্ঘ দিন একসাথে বসবাস করলেও একে অপরের মনের খবর রাখা হয় না। ভালোবাসায় সাজানো সুন্দর বাগান ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়, বোঝা হয়ে ওঠে না একে অপরকে। জীবন হয়ে ওঠে এক দুর্বিষহ নরক যন্ত্রণার সামিল।

বাদল সরকার যে সময় পর্বে 'সারারাত্তির' নাটকটি রচনা করেছেন, তা বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি। এই প্রেক্ষাপটে মানুষ একদিকে যেমন যুদ্ধের ভয়াবহতায় ভীত, অপরদিকে রয়েছে সেই ভীতি থেকে উত্তরণের প্রয়াস। যার সাক্ষ্য বহন করেছে তৎকালীন শিল্প-সাহিত্য। কর্মসূত্রে প্রবাসে বাস করার ফলে বাদল সরকারের সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব খানিকটা পড়েছিল। ফলত তিনি বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। 'সারারাত্তির' নাটকটিতেও এই মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। বাদল সরকারের প্রথম দিককার নাটকগুলোতে প্রথাগত নাটকের ছাপ লক্ষ্য করা গেলেও পরবর্তীতে তিনি সেখান থেকে সরে এসে ধীরে ধীরে বিষয় পরিবর্তন করেছেন। বিশ্বযুদ্ধের সবথেকে বেশি প্রভাব পড়েছিল সমাজের মধ্যবিত্ত মানুষের ওপর। পারিবারিক নানা সম্পর্কের সংকট, আত্মবিচ্ছেদ, উদাসীনতা, নিঃসঙ্গতা এই সব কিছুই সাহিত্যে উপজীব্য হতে লাগল। একদিকে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানুষের হাহাকার, দারিদ্র্যতা, নাগরিক সভ্যতার বিবর্তন ও সেই সঙ্গে মানুষের মনস্তত্ত্বের খুব দ্রুত পরিবর্তন হতে লাগলো এই সময় পর্বে। 'সারারাত্তির' নাটকে স্ত্রী, পুরুষ ও বৃদ্ধ চরিত্র গুলি এই কাল পর্বেরই সৃষ্টি। এক বিচিত্র জীবন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন এই চরিত্রগুলি। জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রের সূক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ তারা করে। বৃদ্ধ রাতের পর রাত জেগে এই জিজ্ঞাসার সমাধান করে। স্ত্রী চরিত্রটি রাত জেগে এই জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হলেও সমাধান পায়নি। কিন্তু তার এলোমেলো চিন্তা ভাবনা গুলো একটা সূত্র খুঁজে পায় বৃদ্ধের নির্জন ঘরে। স্ত্রীর ভাবনা যে, তার এই আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তার প্রাপ্তি কতটুকু? বৃদ্ধের কথায় -

"ভাবেন- এতটা বয়স হল- কি পেলাম? সত্যি কিছু পেলাম কি?"৮

এ যেন এক নৈরাশ্যবাদী ভাবনা ক্রমশ নাটক ঘনীভূত হয়ে উঠেছে স্ত্রী ও বৃদ্ধ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। কিন্তু না, এরপরই নাটকে আমরা দেখি রঞ্জন এর প্রসঙ্গ। রঞ্জন এর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি কিন্তু নাটকে দেখা যায় না। তার কথা আমরা নাটকে উপস্থিত তিনটি চরিত্রের মুখেই শুনি। তার পরিচয় প্রসঙ্গে বৃদ্ধের উক্তি -

"মনে হচ্ছে চিনি। সে কে তা জানি না। তার চেহারা কিরকম জানিনা। .... সে আমার উত্তরপুরুষ। আমি হয়েছি সে হবে। আমি জেনেছি সে জানবে। আমি জেগে থাকি সে জেগে থাকবে।" ৯

এই রঞ্জন আনন্দের প্রতীক। তাকে পাবার জন্য জীবন থেকে সুখ শান্তি বিসর্জন দিতে হয়। তাকে পাবার উপযুক্ত শর্ত বৃদ্ধ বুঝিয়ে দিয়েছে স্ত্রীকে -

"তাকে নির্বোধ হতে হবে। চূড়ান্ত নির্বোধ হতে হবে। একটা কারণহীন যুক্তিহীন বুদ্ধিহীন ভালোবাসায় তাকে ভালোবাসতে হবে। চাইতে হবে রঞ্জন কে একমুখী একান্ত নির্বোধ চাওয়া দিয়ে।"১০

এই রঞ্জনের প্রসঙ্গ আমরা রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকও পাই। অর্থাৎ এক মুক্তির প্রতীক যেন সে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে সর্বত্যাগী, সর্বগ্রাসী, সর্বাঙ্গীক চাওয়া দিয়ে তাকে চাইতে হবে, তবেই সে ধরা দেবে। নাটকের শেষে দেখা যায় এই রঞ্জনকে পাওয়াই যেন স্ত্রী চরিত্রের চরম লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। তাকে পাবার জন্য জীবনের সমস্ত কিছু -ভালোবাসা, বিশ্বাস, লজ্জা এমনকি স্বামীকেও ছাড়তে রাজি স্ত্রী চরিত্রটি। নাটকের শেষে দেখা যায় বৃদ্ধই স্ত্রীর কাছে রঞ্জন হয়ে ধরা দিয়েছে। স্ত্রী বৃদ্ধকে রঞ্জন হিসাবে বরণ করে নিয়ে তাকে দেহমন সব সমর্পন করেছে। মানুষের জীবনে সাধারণ কিছু চাহিদা ছাড়াও বেঁচে থাকার জন্য আরও কিছু প্রয়োজন। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান ছাড়া হয়তো বেঁচে থাকা অসম্ভব। কিন্তু এসব কিছু ছাড়াও আরো কিছু চাহিদা মানুষের থাকে - যা নাটকে ফুটে ওঠে রঞ্জন, বৃদ্ধ ও স্ত্রী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। রঞ্জন এখানে ইতিবাচক মনোভাবের পরিচায়ক। স্ত্রী চরিত্রের হতাশা, নৈরাশ্যের মধ্যে এক আশার প্রদীপ রূপে প্রজ্জ্বলিত রঞ্জন।

সমাজে কিছু মানুষ থাকে যারা খুবই সাধারণ জীবন-যাপন করে। দশটা-পাঁচটার অফিস করে স্ত্রী পরিবার নিয়ে সুখে জীবন যাপন করে। জীবনের দুঃখে তারা কাঁদে আবার সুখে হাসে। জীবনের গভীরে তারা যেতে চায় না। জীবনের গড্ডালিকা প্রবাহে কেবল ভেসে চলা, সেই শ্রেণীর মানুষ নাটকের পুরুষ চরিত্রটি। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ

থাকে যারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের খবর রাখে। সাধারণ মানুষের মতো তাদের জীবন যাপন নয়। জীবন জিজ্ঞাসার তীক্ষ্ণ বাণে তারা জর্জরিত। নাটকে স্ত্রী ও বৃদ্ধ সেই প্রকৃতির মানুষ। বৃদ্ধ সারারাত না ঘুমিয়ে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্র হিসাব করে দেখেছে বুঝেছে জেনেছে। বৃদ্ধের কথায় -

"সারারাত্তির সারারাত্তির
সারারাত্তির জেগেছি দেখেছি
দুই চোখ মেলে জেগেছি দেখেছি
তন্দ্রা বিহীন দুই চোখ মেলে
সারারাত্তির জেগেছি দেখেছি জেনেছি।"১১

কিন্তু সাধারন মানুষের এই সত্য জানতে নেই। যা জানলে শান্তি নষ্ট হয়, সান্ত্বনা ধ্বসে পড়ে, স্বপ্ন গুড়িয়ে যায়, সহজ আনন্দময় সাধারণ জীবনে এসে যায় তীব্র ঘূর্ণিপাক। তাই আগন্তুক স্ত্রী পুরুষের সাথে বৃদ্ধের পরিচয় হলে বৃদ্ধের প্রশ্নবানে তারা আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

নাটকে পুরুষ চরিত্রটি বাস্তববাদী মানুষ। সে নৈরাশ্যবাদী মনোভাবকে অতিক্রম করে অনেকটা ইতিবাচক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। পুরুষ তার স্ত্রী'কে বৃদ্ধের সাথে মিলনরত দৃশ্য দেখলেও সে কিন্তু স্ত্রীকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি, বরং নিজের কাছেই রেখে দেয়। চিরাচরিত প্রথা থেকে বেরিয়ে এসে এক আধুনিক মনস্কতার পরিচয় দেয় সে।

'সারারাত্তির' নাটকটিকে অনেক সমালোচক অ্যাবসার্ডধর্মী নাটক বলতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বক্তব্য যে, অ্যাবসার্ড নাটকের যে বৈশিষ্ট্যসমূহ রয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ প্রভাব আলোচ্য নাটকে  না পড়লেও অল্প কিছু প্রভাব অবশ্যই পড়েছে। অ্যাবসার্ড নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য হলো communication crises বা যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা।

এই বৈশিষ্ট্য আমরা নাটকের স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রে  দেখতে পারি। দীর্ঘদিনের সম্পর্কেও  তাদের মধ্যে এই communication crises প্রধান সমস্যা হয়ে উঠেছে। যার প্রভাব পড়েছে স্ত্রী চরিত্রটির উপর। এর ফলেই হয়তো স্ত্রী'র রাতজাগা ও প্রবল আত্মসমীক্ষা। এই অ্যাবসার্ডের দিক থেকে বিচার করতে গেলেও আলোচ্য নাটকে অভিনবত্বের ছোঁয়া রয়েছে। বাংলা উদ্ভট নাটকে জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদী ভাব প্রচার করা হলেও পাশ্চাত্য উদ্ভট নাটকের বক্তব্য পুরোপুরি তা নয়। কারণ, অ্যাবসার্ডের সূত্রপাত স্যামুয়েল বেকেট এর 'Waiting for Godo' নামক বইয়ে উদ্ভট জীবন দর্শন শূন্যতা নয়, বরং শূণ্যতার মধ্যেও আশা আছে।১২

নেতিবাদের মধ্যে কোন সার্থকতা নেই। জীবনের নৈরাশ্য, হতাশার মধ্যেই খুঁজতে হবে বাঁচার পথ। এরকমই এক নাটক 'সারারাত্তির' নাটকটি। অ্যাবসার্ডের কিছু বৈশিষ্ট্য নাটকটিতে থাকলেও, রয়েছে তা থেকে উত্তরণের প্রয়াস।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মানব জীবনে নানা বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও তত্ত্বের প্রভাবে একের পর এক আঘাত আসতে থাকে। তার উপর বিশ্বযুদ্ধ গোটা পৃথিবীকে এক বীভৎস রূপ দেখিয়েছিল। এই উত্তাল পরিস্থিতি মানুষের চিন্তাজগতে এক নবযুগের সূচনা করেছিল।  যার প্রভাব সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় সুস্পষ্টভাবে পড়েছিল। সাহিত্যে মানব জীবন সম্পর্কে ব্যর্থতা বোধ, বিশ্বাসহীনতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, নৈরাশ্য প্রভৃতি বেশি করে স্থান পেতে লাগল। মানবজীবনে স্নেহ-প্রেম-দয়া-মায়া প্রভৃতি অন্তঃসারশূন্য হয়ে কেবল কথার বেড়াজালেই আটকে থাকল। বাদল সরকার মানব জীবনের এই দৈন্য দশার চিত্র অঙ্কন করেছেন সুন্দরভাবে।

ভালোবাসা মানব জীবনে এনে দেয় এক চরম স্বর্গীয় সুখ। দুটি মানুষের বিশ্বাসের উপরেই টিকে থাকে ভালোবাসা। বিশ্বাসহীনতায় নষ্ট হয়ে যায় এই ভালোবাসাও। একদিন যার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বাজি রাখা যেত, সেই ভালোবাসায় একদিন আসে বিতৃষ্ণা। আসলে মধ্যবিত্ত মানসিকতায় পারিবারিক নানা জটিলতার মধ্যে পড়ে মানুষের মনের পরিবর্তন হয়ে চলেছিল খুব দ্রুত। সহজ সরল জীবনযাপন একদিকে যেমন সাহিত্যে স্থান পেতে লাগল, তেমনি অন্যদিকে নানা দ্বন্দ্বময় জীবন, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় পরিপূর্ণ বিচিত্র মানব আখ্যানও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে লাগলো। এরকমই এক মানব মনস্তত্ত্বের আখ্যান বাদল সরকারের 'সারারাত্তির' নাটক। যেখানে পারিবারিক সংকট বিশেষত দাম্পত্য সম্পর্ক বা সম্পর্কহীনতা, মধ্যবিত্তের প্রচলিত ধ্যান ধারণা থেকে বেড়িয়ে এসে এক বিস্তৃত আধুনিক মননের প্রতিষ্ঠা, মানব জীবনের নানা সংকটময় পরিস্থিতি- এই সবকিছু মিলিয়ে বাদল সরকার 'সারারাত্তির' নাটকটিতে বিষয়গত ও আঙ্গিকগত ভাবে এক নতুন ধরনের গল্প আমাদের শোনায়।

**তথ্যসূত্র :**

১. দাশ, জীবনানন্দ। "বোধ"। *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*। জীবনানন্দ দাশ, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,কলকাতা ৭৩, ভারবি, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬১, মে ১৯৫৪,  পৃ : ১৭।

২. ভূমিকা, '*বাদল সরকার নাটক সমগ্র*' প্রথম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৩, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬ পৃ: দশ।

৩. মুখবন্ধ, ' সারারাত্তির ' ,*বাদল সরকার নাটক সমগ্র*। প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬।

৪. প্রাগুক্ত, সূত্র- ৩, পৃ: - ৩৪৪।

৫. প্রাগুক্ত, সূত্র- ৩, পৃ: - ৩২৪।

৬. প্রাগুক্ত, সূত্র- ৩, পৃ: - ৩২৮।

৭. প্রাগুক্ত, সূত্র - ৩, পৃ: - ৩৪৩।

৮. প্রাগুক্ত, সূত্র - ৩, পৃ: - ৩৩৩।

৯. প্রাগুক্ত, সূত্র - ৩, পৃ: -৩৩৪।

১০. প্রাগুক্ত, সূত্র - ৩, পৃ: -৩৪৯।

১১. প্রাগুক্ত, সূত্র - ৩, পৃ: -৩৩২।

১২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস,* দ্বিতীয় খন্ড। ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০১২, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭১, পৃ: ৬৮৪।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ঘোষ, অজিত কুমার। *বাংলা নাটকের ইতিহাস*। বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৫, মাঘ ১৪১১,চতুর্থ সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০১৪, আশ্বিন ১৪২১।

২. বসু, সৌমিত্র। *বাকি ইতিহাস অন্য ভাবনায়*। ৫৫ ডি, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ : রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪১৩।

৩. ঘোষ,অজিত কুমার। *নাটক* ও *নাট্যকার*। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,কলকাতা ৭০০ ০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০০০।

৪. বন্দোপাধ্যায়, অসিত কুমার। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*। ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ: ২০১০ - ২০১১।

# উত্তর পূর্ব ভারতের কোচ জনজাতির লোকগান

কৃষ্ণকান্ত রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সাপটগ্রাম মহাবিদ্যালয়, ধুবরী, আসাম

সারসংক্ষেপ (Abstract) :
উত্তর পূর্ব ভারতের এক অতিপ্রাচীন জাতি কোচজনজাতি। প্রাচ্য ও পাশ্চ্যাত্ব, ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ, ভাষাবিদ, সমাজতত্ত্ববিদদের মতে কোচ জনজাতি মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর। কোচ জনগোষ্ঠী প্রাচীনকাল থেকেই তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু ক্রমশ বিশ্বায়ন ও মিশ্র সংস্কৃতির ঘূর্ণাবতে হারিয়ে যেতে বসেছে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি। সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা - পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মীয় জীবনেও পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত। সামাজিক রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা সবের মধ্যেই চিরন্তন কৌম সমাজ ভাবনা শিথিল হচ্ছে। আধুনিক মানসিকতায় মশগুল। জীবন যাপন, খাদ্যাভাস, পোষাক পরিচ্ছদ, চলনে বলনে, বাচনের মধ্যে নিজস্বতাকে ঝেড়ে ফেলে সপ্নীল কোলাজে নিমগ্ন। তবে লক্ষনীয় প্রত্যন্ত গ্রামীন সমাজের মধ্যে এখনও চিরন্তন লোকসত্তা জিইয়ে আছে। গ্রামের সহজ সরল, সাদাসিধে কোচ সমাজের মানুষেরা পালন করে চলেছে লোকসংস্কৃতির নানা অনুসঙ্গকে।

সূচক শব্দ (Keyword) :
পাবনী পূজা, বাউছরায় পূজা, হাঙাই হাউনি উৎসব, চায়বাচক বা কন্যাকান্না গান, হকোচায় গান, ঝুম চাষ, সাতপারী, বুরা বাউছ বা বুড়া দেবতা, শীতলি, কাতুলি।

মূল আলোচনা (Discussion) :
উত্তর পূর্ব ভারতের এক স্বতন্ত্র নৃ-গোষ্ঠী কোচ। ভারতীয় সমাজে ছটি প্রজাতীয় উপাদানের শেষ অর্থাৎ মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর এক বিশেষ শাখা কোচ জনজাতি, যদিও পন্ডিতদের মধ্যে মতের পার্থক্য দেখা যায় তথাপি কোচ জনজাতি আদিম মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। যদিও উনবিংশ শতকের শেষ দিকে কোচ জনজাতির পরিচয়ে সংকট নেমে আসে। কোচ সকলে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে কোচ নামের পরিবর্তে রাজবংশী বা অন্য পদবী বা নাম গ্রহণ করে। এবং ''বাংলার জনসমাজে আর্যধর্ম এবং আর্যসংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ঠ হওয়ার ফলে বাংলাব্যাপী সমাজ সংস্কারের প্রতি আকৃষ্ঠ হওয়ার ফলে বাংলা ব্যাপী সমাজ সংস্কারের ঢেউ বাংলা সীমান্তবর্তী কোচ অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রায় ১০ম্ শতক বা তার আগের থেকেই স্পর্শ করে, আর তার ফলস্বরূপ, তারা দলে দলে চিন-তিব্বতীয় কোচ ভাষা, ধর্ম এবং জাতির নাম বর্জন করে রাজবংশী ভাষা গ্রহণ করে ও জাতির নাম রাজবংশী হিসাবে গ্রহণ করে।''(১)

'কোচ' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হীন জাতি বোধ ভাবনা আসে। আসলে তা একেবারে সত্য নয়, আসলে আর্যরা সংস্কৃত গ্রন্থ মধ্যে কুবাচ, কম্বোচ, পানি কবচ ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। কুবাচের উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে (১-১৭৮-৭), পদ্মপুরাণ (সৃষ্টিখন্ড ৫৭), যোগিনীতন্ত্র (১১/৬০, ১২/১৬), কম্বোজ সামবেদের বংশ ব্রাহ্মণ, রামায়ণ (কিষ্কিনধ্যা কান্ড, ৪০/১১), মহাভারত (সভাপর্ব ২৬/২৩, ৫১/৫); কবচ শব্দ পাওয়া যায় (ঋগ্বেদ, ৭/১৮/১২, ১০/৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪ ঋগ্বেদেরঐত্তেরীয় ব্রাহ্মণ ২-৮-১ (কাষীতকি ব্রাহ্মণ ১২-৩, মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব ৯৩/৭, ১৬৫/২২ কোচ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, সৃষ্টিখন্ড, পুরাণ, ভ্রামরী তন্ত্র), উত্কচ (ব্রহ্মানন্দ পুরাণ ৮/১২/২০), কোচ্ছ (জৈনগ্রন্থ ভাগবতী।''(২)

ঋগ্বেদ পরবর্তী ব্রাহ্মণ সাহিত্যে কবচ হিসাবে 'কোচ'এর উল্লেখ লক্ষ করা যায়। কুবাচ যেভাবে 'কোচ'এর সংস্কৃত রূপ, কবচ শব্দটিও 'কুবাচ'র সংস্কৃত রূপ। দিনাজপুরের বাণগড় শিলালীপি ৮৮০ শক (৯৬৬ খ্রী) গৌড়ের কম্বোজ জাতি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া যায়। আসলে এই 'কম্বোজ' শব্দ সেই সময়ে 'কোচ'দেরকেই চিহ্নিত করে। কোচ-কুবাচ অর্থে সংস্কৃতে কু-ভাষা অর্থেই চিহ্নিত করে। কোচদের আগমন, শব্দগত বিন্যাস পন্ডিতমহলে বহুমত থাকলেও বর্তমানে কোচরা আসাম-মেঘালয় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কোচ বসতিপূর্ণ মেঘালয়ের পশ্চিম গারো পাহার জেলার যেসব স্থানে অবস্থান করে আছেন সেগুলো - গোসাইঝোরা, বাথান পাড়া, ভেরভেরি, বালুঝোরা, বগাকোনা, খারীগাঁও, দমদমা, মেরেংগাপারা, শিলভূই, গুঠলিবাড়ি, নেকিকোনা, পেরাডাংগা, বেকেরাডোবা, হলদিবাড়ি, উত্তর শালবিল, কলছীডুবি, গোলাগিরি, খারচেংপাড়া, কালুমালু পাড়া, তংতাংপাড়া, আন্দারকোনা, ঢামাগুড়ি, নুনমাটি, করাইতোলা, হাড়ীগাঁও, ডুমুলীগাঁও, পুটিমারি, সোনামতী, লুতুবাড়ি, বেতাসিং, বরকোনা, চান্দভূঁই, হালচতি, বাতাবাড়ি ইত্যাদি। অসমের ধুবরী ও গোয়ালপাড়া জেলার কোচ বসতিপূর্ণ গ্রামগুলি হল - ওক্রাপাড়া, বিরুপাড়া, গোপালপুর, বাঘাপাড়া, ছেবাড়ি, চকোরভাসা, রংডোবা, হাসডোবা, বিলাপাড়া, বেছরকোনা, খারদাং, শিমুলতোলা, গারৈমারী, দছরাপাড়া, দুধণে, চেঁচাপানী, ধাইগাঁও, টিপলাই, পাটপাড়া, আমবাড়ি, ধূপধরা, পাহাড়তলী ইত্যাদি। ২০০১ সনের লোকগণনা অনুযায়ী মেঘালয়ের মোট জনসংখ্যা ২৩,০৬,০৬৯ জন। এর মধ্যে কোচ জনজাতির সংখ্যা ৭০,০০০ জন। অপরদিকে, মেখলির কোচ এ্যাসোসিয়েশন-এর সমীক্ষামতে বর্তমানে কোচ জন সংখ্যা ৫০,০০০ জন।

মেঘালয়ের গারোপাহাড় জেলা ও পশ্চিম অসমের গোয়ালপাড়া, ধুবরী, দক্ষিণ শালমারা জেলার কোচ জনজাতির নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি এখনও প্রচলিত আছে। সাম্প্রতিক সময়ের অভিঘাতেও লোকপরম্পরা ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে চলছেন। কোচেরা মূলত মাতৃতান্ত্রিক। মাতৃতান্ত্রিক নানা ভাগ দেখা যায়। এ সম্পর্কে ভাষাবিদ গিয়ার্সন কোচদের ছটি শ্রেণির কথা উল্লেখ করেন (৩) - ১. ওয়ানাং, ২. হারিগাইয়া, ৩. সাতপারিয়া, ৪. দশগাইয়া, ৫. চাপ্রা, ৬. তিনঢেকিয়া। আবার ইন্দ্রমোহন কোচ কোচদের

ছটি শ্রেণির কথা বলেন(৪) - ১. ওয়ানাং, ২. হারগিয়া, ৩. তিনটেকিয়া, ৪. চাপ্রা (মার্গান বানায় দশগাইরা) ৫. সাতপরিয়া, ৬. সংকর কোচ।

আদিমকালে মানুষের জীবনচর্চায় সুরই ছিল একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম। ভাষার ব্যবহার এসেছে অনেক পরে। সহজাত অনুকরণ বৃত্তির মাধ্যমে মানুষ পশু, পাখি, নদ-নদী, প্রকৃতির নানা স্বর শব্দ আয়ত্ব করেছে। সামগ্রিক শব্দের উদ্ভব-সঙ্গীতের সূচনা। পর্যায়ক্রমিক নানা বিবর্তন ধারা অতিক্রম করে সঙ্গীত নানা বিভঙ্গে এগিয়ে গেছে। লোকসঙ্গীত মূলত লোকজীবনের গান। নিজস্ব আঞ্চলিক পরিবেশ, ধর্ম, পূজা-পার্বন, বিশ্বাস-সংস্কারের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে লোক সঙ্গীত - ''যে অঞ্চলের গান, সেখানকার ভৌগলিক পরিবেশ, সামাজিক পটভূমিকা, ক্ষেত্রবিশেষে সুনির্দিষ্ট কিছু শ্রম প্রক্রিয়া এবং ধর্ম বিশ্বাস, লোকাচার ইত্যাদি বিষয় মিলে-মিশে তার নিজস্বতা গড়ে ওঠে সুরে, কথায় এমনকী লয়েও।''(৫)

কোচ জনজাতির লোকগান চিরসবুজ অরণ্যে ঢাকা মেঘমালা, চারদিক পাহাড় বিস্তৃর্ণ সবুজ অরণ্য আর সমতলে সবুজ সোনালী ফসল। এক অনন্য মোহ মুগ্ধতা এক লহমায় হৃদয়ের অন্তস্থলে জায়গা করে নেয়। তাদের মনের ইচ্ছা, আকাংখ্যা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আবেগ-অনুভূতির পরশে জড়িয়ে আছে গানগুলি। কোচ জনজাতির লোকগানগুলিকে আমরা এভাবে ভাগ করতে পরি। যথা :-

১) আচার অনুষ্ঠান মূলক গান [বিয়ের গান, হাঙাই, হাউনিগান, হকো গান।]

২) ধর্মীয় অনুষ্ঠানমূলক গান [পাবনীপূজা, বাউছবায় পূজা]

৩) সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বলিত আখ্যান মূলক গান [ইতিহাসমূলক, কিংবদন্তিমূলক, কাল্পনিক মূলক, বারোমাসী গান]

৪) শ্রমকেন্দ্রিক গান [মাছ ধরা গান]

৫) শিশু ঘুমানো গান।

১) আচার অনুষ্ঠান মূলক গান :- কোচ জনজাতির মধ্যে বহুরকমের আচার রীতি-নীতি মুলক অনুষ্ঠান দেখা যায়। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, কৃষি আচার পালন করে সেখানে গান প্রধান মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয়। কোচ সমাজে বিয়ের গানের তিনটি ভাগ - ক. চায়বাচক, খ. ফাচুয়ালী গান, গ. ছারি বা জারি চায় গান।

ক. চায়বাচক বা কন্যা কান্নার গান :- কোচ সমাজে বিয়ের আগমুহূর্ত থেকে কন্যাকে বিদায় দেওয়া পর্যন্ত গান পরিবেশিত হয়। এই গানগুলিতে প্রকাশ পায় এক বিশেষ অনুভূতি। নারীমনের অচেনা অজানা পরিবেশে গিয়ে মেনে নিতে পারবে কিনা একটা সংশয় থাকে। তাছাড়া পরম আদরের মা বাবার কোল থেকে সমস্ত স্মৃতি নিয়ে চলে যাবে এই অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ হৃদয় বিদারক কান্নার রোল। এ গানে নৃত্য নেই। এরূপ গান -

| | |
|---|---|
| ১. অ' জনম হাওনি আবা | বাংলা : |
| আতানিবাদে বাইর রেকজোকবো | ও আমার জন্মদাতা, কি কারণে আমাকে ঘরের বৌ হিসাবে পাঠিয়েছে |

| | |
|---|---|
| ২. অ’ জনম হাওনি আবা | ও আমার জন্মদাতা পিতা, |
| আং তংনি বাদেরে কোল লোবা মুকচাজেক | আমি তোমার কাছে আছি তাই তোমার শোভা নেই |
| রাইজি শোবা মুকচা জোক | পাড়াপ্রতিবেশিরোও শোভা নেই। ও আমার |
| অ’ জনম হাওনি আবা।(৬) | জন্মদাতা পিতা। |

পাড়া প্রতিবেশির ছোট বড়ো সবার সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক গভীর। তাই মেয়েটির বিদায় বেলায় প্রতিবেশিরাও কান্না থেমে রাখতে পারেনি। গানের কথায় উঠে আসে এমন আবেগঘন অনুভূতি। গান -

কোচ ভাষায় ঃ

অ’ পরছিয়া বাপো ভাইওরংতিনিধূরা

পরা কপালিয়াজু দেশান্তরী দুয়িমুন ঝড়ায় লিতোবো।

বাংলা ঃ

ও আমার প্রতিবেশি কাকা, দাদা আজ অভাগিনী নারী নিজ জন্মভূমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

খ. ফাচুয়ালী গান :- বিবাহ মূলত আনন্দ উৎসব মূলক এক মেয়েলি রীতি। বিয়ে উপলক্ষে বহু রকমের হাসি ঠাট্টা, রং তামশা মূলক গান থাকবেই। কোচ সমাজেও এমন বহু গান আছে যেখানে নারী পুরুষকে, কিংবা ছেলেমেয়েকে নিয়ে রং তামশা প্রকাশ করে গানের মধ্য দিয়ে। এরূপ গান পরিবেশনের সময় নৃত্য থাকবেই। যেমন ছেলেরা মেয়েদের উদ্দেশ্য করে গান গাইছে -

কোচ ভাষায় :

পান কংক্রেক বা কংক্রেক

অ’ জানুংদে উরান কাব্যিলাম

চুবাশালীয়ে কেলকেলারা

অ’ জানুংদে উবান মিচলাকাম।(৭)

বাংলায় :

গাছের ডাল বাঁশের ডাল

ও বোন সেও বান্দরের বাট

কুয়ার পাড়ে কলকলানি

সেটিই মেয়েদের কাম।

গ. ছারি বা জারি চায় গান :- ছারি বা জারি অর্থে জারীগান। বিয়ে উপলক্ষে এ গান করে। মূলত তাৎক্ষণিক ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে গান রচনা ও নৃত্যসহযোগে গান করে। একটি গান -

কোচ ভাষায় :

রসচালানি রুম্বাইরুম্বাই
বিয়া বছাতো
মায় মাকা চকতমাকা
হুচুর-হুচিং রান্তো।

বাংলা :

বিয়া মন্ডব তলে তলে
বিয়ার নাচ নাচছে
সদনেই ভাত নেই
ঠোট মুখ শুকিয়েছে।

হাঙাই হাউনি গান ঃ- কোচ সমাজ মূলত কৃষিজীবি, কৃষি উৎপাদনের বহু আচের পালন করে। হাঙাই হাউনি মূলত কৃষি উৎসবের গান। উৎসবের অন্যতম দেবী চরাবুরি, যার পূজায় মুরগী উৎসর্গ করার রীতি প্রচলিত। এই উৎসব পালনের মূল উদ্দেশ্য শস্য উৎপাদন যাতে ভালো হয়। একারণে উপাস্য দেবংদেবীকে সন্তুষ্ট করার গান করে। একটি গান -

ফাই আবে ইন্দ্ররাজা ফাই আবা ফাই
নিং বুরা কালাংতো ফাই হাঙায়বুই
ফাগুন মাসনি জল ফল, মায় কায়না ফাই
অ' জানাও অ' আনাও হুন কায়না ফাই।(৮)

বাংলা :- হে ইন্দ্র দেবতা, এসো পিতৃদেবতা আসো। আমি ঝুম চাষের জন্য তোমার কাছে বৃষ্টি কামনা করছি। আমরা সবাই তোমাকে আহ্বান করছি। আমাদের জমিতে আসো। আমরা ভাই বোন সকলে মিলে ধানের বীজ রোপন করছি। এই ফাগুন মাসে বৃষ্টি দাও।

হকোচায় গান :- কোচ সমাজে হকোগান মূলত মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। তারা শ্রাদ্ধ উৎসবকে কাঠুয়ারী উৎসব বলে। কাঠুয়ারী উৎসব দু'ধরণের - নেমাকাম (নেমা-শুভ, কাম-শ্রাদ্ধ) অর্থাৎ শুভশ্রাদ্ধ আর কামমাতা (কাম - শ্রাদ্ধ, মাতা - বড়ো) অর্থাৎ বড়ো শ্রাদ্ধ। নেমকাম সমস্ত শ্রেণির লোকের মৃত্যুর পর করা হয় আর কামমাতা কোন বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তির মৃত্যুর পরে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত করা হয়। নৃত্যসহযোগে গাওয়া হয় এই গান। কাঠুয়ারী উৎসবে গাওয়া গানকে 'হকোচায় আর নাচকে 'হকোবছানি ' বলা হয়। এই উৎসবের নাচ ও গানের সময় পুরুষেরা পরম্পরাগত বস্ত্র পরিধানের সঙ্গে হাতে ঢাল তরোয়াল নিয়ে থাকে আর নারীরা নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র অলংকারে সুসজ্জিত হয়। তারা নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে মৃত আত্মার সদগতি কামনা করে।

কামমাতা অনুষ্ঠানে গাওয়া হকোগান : -

লুঙ গায়না ছিরী
হান গায়না গায়না

মাতা মুরব্বী রিয়াজো কদে
নিনা চাং গায়না - অ' হিয়ৌ।
বাংলা ঃ আলু, কচু বুনতে আমরা ছেলেরা আছি।
কিন্তু আমাদের বুনতে কোন জন আছে।

উপরোক্ত শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে হকোগান গাওয়ার উপরেও অন্য সময়েও গাওয়া হয়। এসময় হকোগানে উঠে আসে প্রেম, ভালোবাসা। স্থান হিসাবে বেছে নেওয়া হয় উন্মুক্ত মাঠ-প্রান্তর, সেখানে যুবক-যুবতী একে অন্যকে ঠাট্টা তামশার মধ্য দিয়ে গান পরিবেশন করে। কথায় বলা হয় গোলাপ ফুল তুলতে গেলে কাঁটা লাগবেই। তদরূপ সুন্দর ফুল তুলতে গেলে কাঁটার আঁচর খেতে হবেই ঠিক তেমনি প্রেমের স্পর্শের মধ্যেও যন্ত্রনা আসবে। সেই যন্ত্রনা দগ্ধ মন প্রেমের কোমল অনুভূতির পাপড়ি ছিড়ে যেতে পারে। এ কারণে প্রেমিকা আপনজনকে সজাগ করে দেয়। প্রস্তুত করে তোলে প্রেমের প্রথম পাঠ, যাতে করে সমস্ত বাঁধা বিঘ্ন, যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে পারে। এমন একটি গান -

পার পেলেং মুকিমুন
তকপাই ঘুরাই ঘুরাই চাই,
যদি পারো পুরুন ছায়া পান মালিচা
পার পিরাই পাঙ্খু তোওয়া
পারে থালাও চাক
নাং পারে চাক হাওনাং
চাকে খাতনা পাঙ্খু।(৯)
বাংলা ঃ সুন্দর ফুল দেখে পাখি ঘুরে ঘুরে দেখে
ছাগলে কুল খেলে কচিপাতে ফুল না ফুলে
ফুলের ডাটিতে কাঁটা আছে
হাত দিওনা
হাতে কাটা বিঁধবে।

২. ধর্মীয়ি অনুষ্ঠানমূলক গান ঃ- উনিশ শতক কোচদের মধ্যে আর্যসংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। তবে কৌম ঐতিহ্যের ধারা এখনও বর্তমান। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তা লক্ষ্য করা যায়।

পাবনৌ পূজার গান :- নতুন বছরের শুরুতেই কোচ সমাজ পাবনী পূজা উৎসব পালন করে। পাবনী পূজার মূল উদ্দেশ্য নতুন বছরের শুভ আগমন, শস্য-ধন বৃদ্ধি, রোগ ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার সঙ্গে সুখ-শান্তিতে গ্রামের সকলে ভালো থাকে।

কোচ সমাজ 'পাবনীদেবীকে' প্রাকৃতিক শক্তির অধিকারিনী এবং প্রেম উৎসসৃজনী দেবী হিসাবে বিশ্বাস করে। পাবনী পূজার নির্দিষ্ট স্থানকে পাবনীশালী বা বাউছ-বাউশালী বলে। পূজার দিন সাধারণত বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথি। পাবনী দেবতাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয় পুরনো উঁচু গাছের গোড়ায়। গাছের চারপাশে বাঁশের তৈরি নির্মিত

হস্তশিল্পের কারুকার্য চোখে পড়ে। তাদের বিশ্বাস পাবনীদেবতা চন্দ্র, সূর্য, বৃষ্টি ও অন্য জাগতিক বিধির একমাত্র অধিকর্তা। তিনিই সবার রক্ষক। এ প্রসঙ্গে কোচ রাজবংশী সমাজের গারামথান ঠাকুরের সঙ্গে গভীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পাবনী দেবতার সঙ্গে বুড়া বাউচ, শিতলি, কাতুলি, লক্ষী আমে, চকাবুড়ি, বাঙাল রায় বা শাহ কামাল, বারো দেবতা ইত্যাদি দেবতাও পূজিত হন। পূজায় ছাগল, পায়রা বলি দেয়। সমগ্র পূজা নিয়ন্ত্রিত হয় দেউচি ও চাথুংলাউনি, চেলাকদার এর দ্বারা। পূজা শেষে নিজ হাতে তৈরি ‘ডেপাচকত, চিটিচকত (এক প্রকার মদ) খেয়ে মাতাঢাকী বা হেমমাতা (চড়ো ঢোল) খান্দিং (বাঁশি), মুছিকরং (মোষের শিঙের তৈরি বাঁশি), তালিং (করতাল), তাকতাক (টোকারী) ইত্যাদি বাদ্যের তালে নেচে নেচে মনের আনন্দে গান ও নৃত্য পরিবেশন করে। গান -

কোচ ভাষায় :-
আইয়া আইয়ারে
মিচলা মুকি বাঠায়রংনি
নে মিতি কাইয়ারে (১০)

বাংলায় :-
এস এস
যুবতী মেয়ে দেখে ছেলেদের
মৌরিস পড়ে রে।

বাউছার পূজার গান :- কোচ সমাজ কার্তিক মাস শুরুতেই ধান গর্ভবতী হওয়ার পূর্বেই গ্রামের সকলে মিলেমিশে পূজা করে। পূজার মূল উদ্দেশ্য শস্য দেবীকে তুষ্ট করা ও সমূহ গ্রামের মঙ্গল কামনা। পূজার দিন দেউচি বা আজেঙ ধানক্ষেতে গিয়ে একগোছা ধানগাছ এনে লক্ষ্মীদেবীর বেদীতে রাখে। এরপর শুরু হয় পূজা। পূজা উপলক্ষে দেবীর উদ্দেশ্যে ছাগল, শূকর, মুরগী, কচ্ছপ উৎসর্গ করে। পূজা শেষে ধানের গুচ্ছ পুনরায় ধানের ক্ষেতে পুতে রাখার রীতি দেখা যায়। এসময়েই সবাই মিলে নাচ ও গান করে। একটি গান -

কোচ ভাষায় :-
ফাই মায় ফাইহুন
তালাকাই ফাইচানেঙ
নেয়াবুই ফাই
ফাই মায় ফাই
ফাই হুন ফাই।(১১)

বাংলা :-
এস এস মা ধান গোছা
তাড়াতাড়ি না এলেও
দেরি করে এসো
এস, এস মা ধান এসো

এস, এস, ধান গুচ্ছ এসো।

সাত জানুংনি চায় : কৃষিকর্মের অন্যতম উপাদান বৃষ্টি, বিশেষ করে জমিতে ধানের চারা বোনার সময় বৃষ্টি লাগবেই। যদি দেখা যায় বৃষ্টি হচ্ছে না, অনাবৃষ্টিতে চাষের জমি খাঁ খাঁ করছে, জমিতে ফসল উৎপাদন না হলে বেঁচে থাকা দায়, এরূপ সময়ে কোচেরা স্মরণ নেয় কান্টাভূঞার (বৃষ্টির দেবতা বরুনদেব) কাছে। তাদের বিশ্বাস মতে - কান্টাভূঞা কোন কারণে পাষাণ রূপ ধারণ করেছে। পাষাণরূপি কান্টাভূঞা দেবকে যদি সাতজন অবিবাহিত যুবতী মেয়ে সাতকলসি জল ঢেলে নাচ ও গান করে তাহলে তিনি খুশি হবেন এবং বৃষ্টি দেবেন। এ প্রসঙ্গে কোচ রাজবংশী সমাজেও এরূপ অনাবৃষ্টি পরিবেশে উলঙ্গ নারীরা কোন নির্জন স্থানে জল ঢেলে হুদুম দ্যাও নৃত্য পরিবেশন করে বৃষ্টি আনে। এমনকি নেপাল, বাংলাদেশেও হুদুম দ্যাও পূজা, গান ও নৃত্যের প্রচলন আছে। আবার উত্তর দিনাজপুর অঞ্চলে অনাবৃষ্টির কারণে পালন করে জলমাঙ্গা ব্রত। আসলে, এটি একটি যাদুমূলক ক্রিয়া - যা উর্ব্বরতার দিককে নির্দেশ করে। এরূপ একটি গান :-

ও আবা লাম্ফার ফুই, ফুই আবা ফুইবো ফুই
হাদু হাও বারজু ছাউতো ফুই আবা ফুই
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম নিংনানা পাওতো
ও, আবা লাম্বার ফুই আবা ফুই
ও, আবা মেঘনাথ ফুই আবা ফুই
ও, আবা কান্টাবুড়া আতা বুর্দ্দি রেকনাবো রেকন
ও, আবা মহবুড়া আতা উপায় দংনা
ও, আবা কান্টাবুড়া চাথুং লাউতো নানিবো
ও, আবা মহবুড়া চাথং লাউতো নানি
রাং মাকা, তিকা মাকা, হা দাত্তি দংনাবো দংনা
ও, আমে ও, আমে হা দাত্তি দংনা
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম নিং ননা চাইজোক
সাত জানুংনি নাওনা তিকা ওথুলুক হাওনা।

বাংলা : -

হে পিতৃদেব বাতাস তুমি আস। কেচো মাটি খুঁড়ে জমি নষ্ট করছে, তুমি আস। হে মাতৃ সৃষ্টির অধিকারিনী দেবী তুমি আস। হে পিতা মেঘনাদ তুমি আস। হে পিতৃদেব কান্টাবুড়া আমরা সবাই কি করবো, হে পিতৃদেব মহবুড়া কি উপায় হবে। তোমাদের পা ধরছি, বৃষ্টি নেই, জল নেই, মাটি ফেটে ফেটে যাচ্ছে। আমরা সাত বোন মিলে তোমার চারদিকে ঘুরে জল দিয়ে স্নান করব আর নাচব।

৩. সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বলিত আখ্যান মূলক গান :- যে গান কাহিনীর আকারে গাওয়া হয়, সেই শ্রেণীর গানকে আখ্যানমূলক গান বলা হয়। কাহিনীগান যাকে ইংরেজিতে Ballad নামে পরিচিত। কোচসমাজে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বলিত আখ্যান গানগুলিতে কোচ জাতির জন্ম রহস্য, বিশ্বসৃষ্টির রহস্য ইত্যাদি কাহিনী দেখা যায়। একটি গান -

কোচ ভাষায় :-
কচ নকনি আইদি ছেকনি চায়বু
নিং গায়ি লিনাবো লিনা আবা লিনা
ও আবা নিনি কচ জাতেনি
কর গায়ি লিনাবো লিনা।
নিং বারা রাছান মুকপ্রাক কাংকারে
রাছান লামপার আয়েবো
আজা বাছা নেরে রূপো
জন্ম দেয়াবো দোয়া আবা দোয়া
রাছানাবো ছাগলঙাবো
নেরে মাৎজু বদেছে আনে সোনা আনে
তেছে বারা মুকদি-কুনদি মুঙাবো
তানাবো তানা আবা তানা
আজা বাছা আব্রুবো চাতং বাংনিংতাই
গাবাঙিমুন তানাবো তানা আবা তানা
বেন কুনদি ঋষিয়াবো, ছালগঙাবো
কচো জাতনি মুং, তানাবো তানা আবা তানা।(১২)

বাংলায় :-

কোচজাতির আদিপুরুষের গান আমি গেয়ে যাব। ও বাবা আমি কোচজাতির কথা গেয়ে যাব। শিলাময় পাহাড়ের সূর্য আর বাতাসের সংমিশ্রণের যা সূর্যের আলোর প্রথম রশ্মি স্পর্শ করে, সে স্থানই কোচদের উৎপত্তি স্থান। সূর্য্যের উত্তাপ আর বাতাসের সংস্পর্শে আদিতে দুই বোনের জন্ম হয়। প্রথম জনের নাম কুমদি আর দ্বিতীয় জনের নাম কুনদি। বস্ত্র অবিহনে দুই বোন লজ্জা নিবারণের জন্য দুই হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ঢাকতে চেষ্টা করে এরূপ এক সন্ধিক্ষণে সূর্য আর শিবের সাক্ষাত হয়। দুইজনে লজ্জায় সংকোচিত হয়ে মুর্চ্ছা যায়। লজ্জায় কাচুমাচু হয়ে মুসরে যায় বলেই ‘কোচ ’ শব্দের সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করে। এই আখ্যানটি আজও কোচ জাতির সৃষ্টি রহস্যের মূল বলে প্রচলিত।

৪. শ্রমকেন্দ্রিক গান :- কোচেরা মূলত কৃষিজীবি। অতি প্রাচীন কাল থেকেই তারা ঝুমচাষ করে কৃষি উৎপাদন করে। পাহাড়ের গাছ, বন জঙ্গল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে পরিস্কার করে চাষের উপযোগি জমি তৈরি করে। এ সময়েই তারা সকলে মিলে চক (মদ), কান (মাংস), মায় আক্ক (বরা চালের ভাত) খেয়ে নাচ, গান গেয়ে আনন্দফূর্তি করে। আসলে শ্রমকে লাঘব করা এবং নতুন জমি নিজের অধীনে আনার ভাবনাই এ আনন্দের বহিঃপ্রকাশ।

পাহাড়ের গাছ কাটার সময় যে গান তারা পরিবেশন করে সেটি এরূপ -

কোচ ভাষায় :-
ও পান বুঢ়া, ও পান মাতা

গছা ডাল্লাছি হাজার ডাল্লা দংফায়নি
তানিয়া তাখাম, তা বগা তাখাম
নানান গাল্লাং জুরি লাখাহা
হি হুই হুই।
বাংলা :-
ও বুড়াগাছ, ও বুড়া গাছ, একটি ডাল থেকে শ ডাল হয়ে আস, শ ডাল থেকে হাজার ডাল হয়ে যাও, কাটতে ভয় খাবেনা, ভয়ে শিউড়ে উঠবে না।
মাছধরা গান : - মাছ কোচদের প্রিয় খাদ্য। মাছ ধরার জন্য তারা বহুরকমের কৌশল অবলম্বন করে। বাঁশ দিয়ে নানা রকম যন্ত্র তৈরি করে মাছ ধরে। সমবেতভাবে অথবা এককভাবে মাছ ধরার সময় গান পরিবেশন করে। পুরুষ নারী উভয়েই মাছ ধরে। মাছ ধরার একটি গান যা কোচ সমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত -
ও, মামা তেংকো
নাংনা লাউতো।
কালো নদী করচা করচা
নাংনা লাউ তংতো
ও, মামা তেংকো
নাংনা মানীজ পাওতো
মামা মামীজুন পাওতো
দিন হেচা মামা নানা মানীজ পাওতো
ও, মামা তেংকো
দিন হেচা মামা নানা মিন্জু পাওতো
ও, মামা
দিন হান্দার মুকিমুং বগা উরাই লিতো
ও, মামা বগা উরাই লিতো
ও, মামা তেংকো।(১৩)
বাংলা :- ও মামা তেংকো, তুমি মাছ ধরছো। মামা তেংকো, মামী তোমাকে ডাকছে, মামীও তোমাকে ডাকছে। আবহাওয়া ভাল নয় মামা, তাই মামী তোমাকে ডাকছে। আবহাওয়া অন্ধকার দেখে বগী উড়ে উড়ে যাচ্ছে। ও, মামা তেংকো বগীরা সব উড়ে যাচ্ছে।
৫. শিশু ঘুমানো গান :- কোচ ভাষায় শিশু ঘুমানো গানকে ‘ছাবেত তমকনি চায়’ বলা হয়। শিশুকে ভোলানোর জন্য বা বোঝানোর জন্য প্রকৃতি (চাঁদ, সূর্য, গাছ, ফুল, ফল, আকাশ, তারা) ও নানারূপ জীবজন্তুর কথা গানের সঙ্গে বেঁধে গান গাওয়া হয়। মা তার সন্তানকে বুকের স্নেহ দিয়ে গানের মাধ্যমেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। গানগুলিতে প্রকৃতি, জীবজন্তুর কথার সঙ্গে ইতিহাস, সমসাময়িক ঘটনার কথাও উঠে আসে। তাই গানগুলিতে থাকে অনুভূতির স্পর্শ ও লোকশিক্ষামূলক ভাবনা। ছোটো বাচ্চারা যখন কান্না করছে তখন গানের সুরে বলা হয় -

কোচ ভাষায় :-
তাখেপ নুনু তাখেপ
কোল কারঙিতো
তাখেপ নুনু তাখেপ
মাছা কাবনা লায়তো
হাউ ফাইতুঙ জোক
বাংলায় :-
কেঁদোনা সোনা কেঁদোনা
শিয়াল হোক্কা দিচ্ছে
বাঘে কামড়াতে চাচ্ছে
এই সোনা কেঁদোনা বাঘ এসেছে।

অনেক সময় দেখা যায় শিশুরা ক্ষিদের জন্য কান্না করছে, কোন মতেই চুপ করানো যাচ্ছে না, তখন শিশুকে বোঝানোর জন্য গাওয়া হয় -

নানি আমায় ফাইতো
কাতায় কাড়াই বাকতো
মাহুং বাজুম চাইতো
নন কারাই লাইতো।
বাংলা :
তোমার মা এই আসছে
এখানেই কাছাকাছি কথা বলছে
মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে আছে।

জ্যোৎস্না রাত। শিশু চাঁদের আলো দেখে আনন্দে উৎফুল্ল। রাত অনেক। তবুও সে ঘুমতে চায় না। তাই শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য মা সন্তানকে কোলে নিয়ে গাইতে থাকে -

ফাই, মামা ফাই
নাংরেত মামা ফাই
আনি আনাও হাবুকনা
তিনি ফার দাপাংনা।
বাংলায় :-
আয় মামা আয়
চাঁদ মামা আয়
আমার সোনা তোমাকে জড়িয়ে ঘুম যাবে
সারারাত ধরে।

আধুনিক বিশ্বায়নের ছোঁয়া প্রত্যন্ত গ্রামেও লেগেছে। যুগ ও জীবনের চাহিদা মানুষকে গ্রাস করছে অনবরত। নিজ ঐতিহ্যের পরম্পরাকে অস্বীকার করছে অনায়াসে। কোচ সমাজও এর ব্যতিক্রম নন। তারাও আজ শিক্ষা, অর্থনীতি, সামাজিকতায়

অনেকটা এগিয়ে গেছে। তাই উঠতি প্রজন্ম লোক ঐতিহ্যের পরম্পরাকে ধরে রাখতে অপরাগ। যুগ ও সময়ের চাহিদা ঢুকে যায় লোকায়নে। শুরু হয় এক দ্বান্দ্বিকতা। নানা ঘাত প্রতিঘাত অনবরত চলছে, চলবে। তবে লোকসংস্কৃতি কখনো হাঁরিয়ে যায় না। নানা রূপান্তরের মধ্যদিয়ে আবার ঘুরে ফিরে আসে। নিজস্ব নিয়মে লোকমননের অন্তস্থলে সজীব হয়ে থাকে। কোচ সমাজে প্রচলিত লোক ঐতিহ্যের গানগুলি এখনোও সমানভাবে সমানতালে চলছে। অন্তত ক্ষেত্র সমীক্ষায় এই তথ্যই উঠে আসে। তবে আক্ষেপের বিষয় কোথাও কোথাও এর ঘাটতি চোখে পড়ে।

তথ্যসূত্র :

১. Gait, E : 1 bid, 1926, P-45.
২. কোচ, শিবেন্দ্র নারায়ণ, কোচ সকলের আদিদেশ বা বাসস্থান, স্মৃতি গ্রন্থ দারো, মে.লয়, কোচ এছোসিয়েসন, ২০১০, পৃ-৯।
৩. Grieson, GA, Lingustic Survey of India, Vol III, Pt. III, 1967, P-65.
৪. কোচ, ইন্দ্রমোহন, কোচ জনগোষ্ঠীর সামাজিক কৃষ্টি-সংস্কৃতির পরম্পরা, ভাষা ও ঐতিহাসিক রূপরেখা, স্মৃতিগ্রন্থ, মেঘশ্রী, ২০০৯, পৃ-২৯।
৫. সেনগুপ্ত পল্লব, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপনি, ১৯৯৫, পৃ-২০৪।
৬. তথ্যদাতা : কোচ, সুরেশ (৫০), শালগুড়ি, মেঘালয়, তাং ১০.০৯.২০১৯।
৭. তথ্যদাতা : কোচ, জীবন (৫০), সম্পাদক, কোচ এ্যাসোসিয়েশন, মেঘালয়, ১০.০৯.২০১৯।
৮. তথ্যদাতা : মন্ডল, ড. আব্দুল বাতেন, (কোচ গবেষক), সহযোগী অধ্যাপক, ০৪.১০.২০১৯।
৯. আলী আশরাফ (সম্পাদনা), স্মৃতিগ্রন্থ মানকাচর আরক্ষী থানার শতবর্ষ, নভেম্বর, ২০০৬, পৃ-৮০।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ-৮৫।
১১. তথ্যদাতা : কোচ, সুরবোত (৫২), মেঘালয়, তাং ১১.০৯.২০১৯।
১২. তথ্যদাতা : কোচ, জনান্ধন (৪৮), মেঘালয়, তাং ১২.০৯.২০১৯।
১৩. তথ্যদাতা : কোচ, অম্বিকা (৫৭), দক্ষিণ গারো হিলস্, মেঘালয়, তাং ১৩.০৯.২০১৯।

# জীবনস্মৃতির অভিনবত্ব

দেবাশিস ঘোষ
সহঅধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উলুবেড়িয়া কলেজ

**অভিনব/অভিনবত্ব – আভিধানিক অর্থ :** A new and strange, novel, unfrecedented, new and amazing, new fashioned, new tangied, gn. Novelty or different from what was know or usual before.

যে সৃজনের মধ্যে মৌলিকতা এবং নতুনত্ব থাকে তাই হল অভিনব। বিষয় ও প্রকরণ উভয়ক্ষেত্রেই সৃজনীকার তাঁর অভিনব ভাবনা এবং রীতিকে প্রয়োগ করেন, তাই শিল্প সাহিত্যে অভিনবত্ব। লেখকদের নিজত্ব Styleই অভিনবত্ব। তাঁকে অন্যের থেকে আলাদা করে তাঁর রচনার স্বরূপ, বৈশিষ্ট্যকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও ব্যক্তিনামে স্টাইল প্রচলিত হয়ে আছে। যেমন – বঙ্কিমী স্টাইল, রাবীন্দ্রিক স্টাইল, প্রথম চৌধুরী স্টাইল ইত্যাদি। প্রত্যেক লেখকের একটি নিজস্ব ধারা আছে। লেখকের বক্তব্যে তাঁর স্বভাব বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। সৃজনীকার তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তাঁর রচনার মধ্যে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় রাখেন।

সাহিত্যের সামগ্রী প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন – 'যে সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ের সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের  কাছে সুর রঙ ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, তাহাই সামগ্রী। 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে তিনি 'আরোও বলেন, ভাব সেইরূপ মানুষ ও সাধারণের কিন্তু তাহাকে বিশেষ মূর্তিতে সর্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায় রচনাই লেখকের কীর্তি।' অর্থাৎ ভাবকে নিজের করে সকলের করে তোলার মধ্যে সাহিত্য ও ললিত কলার সার্থকতা এর মধ্যেই অভিনবত্বের বৈশিষ্ট্যও লুকিয়ে আছে।

**সারসংক্ষেপ :**
এই প্রবন্ধে আমার আলোচ্য বিষয় হল 'জীবনস্মৃতির' অভিনবত্ব নিয়ে আলোকপাত করা। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার আত্মজীবনী এবং আত্মস্মৃতিকথার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটি।

আত্মজীবনী মূলতঃ লেখকের নিজের জীবনের ক্রমিক ঘটনাগুলি, তাঁর পূর্বপুরুষ, পরিবার এবং তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সমাহার। কিন্তু আত্মস্মৃতিকথার সেই

ধরনের বাধ্যবাধকতা নেই। লেখক তাঁর নিজের জীবনের বিভিন্ন স্মৃতির সংকলন করেন স্মৃতিকথায়। তা নিজের জীবনের পাশাপাশি তাঁর দেখা কোনো ঘটনা, বিভিন্ন মানুষ এবং বিভিন্ন অনুভূতিকেও স্থান দিতে পারেন। বাস্তব ঘটনার অনুকরণ না করে বাস্তব জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করেও আপনার নিজস্ব কল্পনার রং এ শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করে সাহিত্য পদবাচ্য করে তোলেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে দাঁড়িয়ে জীবনের প্রথম পঁচিশ বছরের স্মৃতির রোমন্থন করেছেন তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে। জীবনস্মৃতি গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশিত হয় **১৯১২** সালের জুলাই মাসে। 'জীবনস্মৃতি'-তাঁর জীবনের নানা ঘটনার ইতিহাস নয়, বরং তা যেন চিত্রকরের ছবি। রবীন্দ্রনাথকে 'জীবনস্মৃতি' লিখতে গিয়ে স্মৃতির টুকরোগুলিকে কিভাবে শিল্প সুষমামন্ডিত করা যায় আর সেই কারনেই চলেছে স্মৃতির সম্পাদনা এক সুষম, স্বয়ংসম্পূর্ণ অবয়ব তৈরীর প্রচেষ্টা, জীবনস্মৃতিকে সাহিত্যরূপে সুখপাঠ্য করা ও তার কবিসত্তার ক্রমবিকাশের রূপরেখাটিকে চিত্রিত করা। 'জীবনস্মৃতি'তে স্মৃতিকথাকে সুখপাঠ্য করতে কখনো নাট্যগুন কখনো বা কাব্যধর্মী করে তুলেছেন। সেই কারণেই জীবনস্মৃতির শিক্ষারম্ভ থেকে শুরু করে 'কড়ি ও কোমল পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশটি অধ্যায় জুড়ে তাঁর স্মৃতিকথাগুলি যে ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাতে বিষয় ভাবনা ও প্রকাশের কৌশল বৈশিষ্ট্যে সৃজনের অভিনবত্বে পাঠকের কাছে সমুজ্জ্বল হয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

**সূচক শব্দ :** স্মৃতিকথা, আত্মস্মৃতি, 'জীবনস্মৃতি', শিল্পসুষমা মন্ডিত, সাহিত্য পদবাচ্য।

**মূল আলোচনা :**

কোনো একজন ব্যক্তির জীবনকে অবলম্বন করে রচিত বাস্তব ঘটনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত গদ্যরচনা হল জীবনী। জীবনীগ্রন্থে ব্যক্তি জীবনের কথা সতর্ক তথ্যনিষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হয়। তাতে ব্যক্তির জীবনকে কেন্দ্র করে সমকালীন সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রনীতি-সংস্কৃতি প্রভৃতি দেশ-কালের চিত্রও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকাশ পায়। যদি কোনো লেখক নিজের জীবনকে অবলম্বন করে নিজের কথা লেখেন, তখন তাকে আত্মজীবনী বলে। আত্মজীবনী ও জীবনীগ্রন্থের মধ্যে একটা পার্থক্য হল, জীবনীগ্রন্থে বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্য থেকে ব্যক্তিপুরুষের বহিঃরঙ্গ দিক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেলেও ব্যক্তির অন্তর্লোকের স্বরূপ যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত নাও হতে পারে, সেদিক থেকে ব্যক্তির অন্তর্জীবনের যথার্থ চিত্রণ আত্মজীবনীতেই সম্ভব।

যখন সুনির্দিষ্টভাবে সময়ক্রম অনুসারে জীবনী না লিখে, লেখক জীবনের বা ঘটনার টুকরো টুকরো স্মৃতি অবলম্বন করে কিন্তু আলেখ্য রচনা করেন, তখন তাকে স্মৃতিকথা বলে। আবার লেখক যখন নিজের জীবনের টুকরো টুকরো স্মৃতি অবলম্বন করে এইরূপ আলেখ্য রচনা করেন, তথন তাকে আত্মস্মৃতিকথা বলে।

আত্মজীবনী এবং আত্মস্মৃতিকথার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য এই আত্মজীবনী প্রধানত অবলম্বন করে লেখকের নিজের 'জীবনের ক্রমিক ঘটনাগুলি, তাঁর পূর্বপুরষ, পরিবার এবং তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সমাহার। কিন্ত আত্মস্মৃতি কথায় সেই ধরণের বাধ্যবাধকতা নেই। লেখক তাঁর নিজের জীবনের বিভিন্ন স্মৃতির সংকলন করেন স্মৃতিকথায়। তা নিজের জীবনের পাশাপাশি তাঁর দেখা কোনো ঘটনা, বিভিন্ন মানুষ এবং বিভিন্ন অনুভূতিকেও স্থান দিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'কে আমরা আত্মীজীবনী না বলে, আত্মস্মৃতিকথা জাতীয় রচনাই বলব।

'জীবনস্মৃতি'র সূচনাপূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্ত যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা-কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত, তাহার কাজই ছবি আঁকা ইতিহাস লেখা নয়।'[১] 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রজীবনের ঘটনার কালানুক্রমিক বিবরণ নয়। জীবনের মধ্য বয়সে পৌঁছে শৈশব-বাল্য-যৌবনের দিনগুলি মধুররূপে প্রতিভাত হয়। সেই মধুর দিনগুলিতে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণে মনের মধ্যে এক প্রকার-আক্ষেপ কাজ করে, যা আসলে নস্টালজিয়াবোধ। এইসব মিলিয়ে অতীতে দিনগুলি আরো মধুররূপে উদ্ভাসিত হয়। তাছাড়া জীবনের মধ্যবয়সে দাঁড়িয়ে অতীত চারণের অবকাশও তিনি পাচ্ছেন। ফলে স্মৃতিকথা যেন তাঁর কাছে চিত্ররূপে উদ্ভাসিত হচ্ছে। বর্তমানের সঙ্গে সংযুক্ত যা কিছু আমাদের মনে চিত্ররূপে উদ্ভাসিত হয় না, তা আমাদের প্রত্যেক্ষের প্রয়োজনের বা গতানুগতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, চিত্র সৃষ্টিতে কিছুটা অবকাশেরও প্রয়োজন, অতীতের স্মৃতি চিত্ররূপে ফুটে উঠতে মনের অবকাশেই বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'যখন পথিক যে-পথটাতে চলিতেছে বা যে-পান্থশালায় বাস করিতেছে, তখন সে-পথ বা সে-পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে; তখন তাহা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত অধিক প্রত্যক্ষ। যখন প্রয়োজন চুকিয়াছে, যখন পথিক

তাহা পার হইয়া আসিয়াছে, তখনই তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়। জীবনের প্রভাতে যে-সকল শহর এবং মাঠ, নদী এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে, অপরাহ্নে বিশ্রামশালায় প্রবেশের পূর্বে যখন তাহার দিকে ফিরিয়া তাকানো যায়, তখন আসন্ন দিবাবসানের আলোকে সমস্তটা ছবি হইয়া চোখে পড়ে।'[২]

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির সূচনাপত্রে প্রথমেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন, 'জীবনস্মৃতি' তাঁর জীবনের নানা ঘটনার ইতিহাস নয়। সন-তারিখ দিয়ে কালানুক্রমিকভাবে তিনি তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া বাস্তব ঘটনাসমূহের বিবৃতি দিতে চান নি। শৈশব-বাল্য ও যৌবনের স্মৃতিকেই তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে রোমন্থন করেছেন। তবে কবি তাঁর জীবনের স্মৃতিকথাগুলিকে নীরস অসম্পূর্ণ বিবৃতি আকারে পাঠকের সামনে প্রকাশ করতে চান নি। অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি যেভাবে তাঁর স্মৃতিতে উদয় হচ্ছে সেই অবিকল রূপটিকে 'জীবনস্মৃতিতে তিনি বজায় রাখেন নি। তিনি তাঁর স্মৃতিকথাকে শিল্পগুণ সমন্বিত করে পাঠকের কাছে সুখপাঠ্যরূপে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। চিত্রকর যখন ছবি আঁকেন, তিনি যেমন বাস্তব ঘটনার অবিকল অনুকরণ করেন না, বাস্তৱ জগৎ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেও, আপনার নিজস্ব কল্পনার রং-এ তাকে শিল্পসুষমায় মন্ডিত করেন, তেমনিভাবে রবীন্দ্রনাথ নিজের ' স্মৃতিকথাকে সাহিত্যরপে প্রকাশ করতে চান। আর তা করতে গিয়ে তিনি বাস্তবের হুবহু অনুকরণ করেন নি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তিনি কোনো ঘটনাকে প্রকাশ করেছেন, আবার কোনো ঘটনার উল্লেখ করেন নি। আবার জীবনের কোনো ছোট ঘটনাকে তিনি বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করেছেন, কখনো বা জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো বড় ঘটনাকে তিনি সামান্যরূপে প্রকাশ করেছেন। এর কারণ হিসাবে বোঝা যায় তাঁর জীবনের প্রিয় ঘটনা, কোনো ভালো অনুভূতি বা তাঁর জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে জড়িত যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, বা যা তাঁর হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করে তাকেই তিনি পাঠকের সামনে বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আবার জীবনের ঘটে যাওয়া অপ্রিয় সত্য কথা অনেক সময়ই সকলকে জানানো যায় না। এমন সব অনুভূতি বা বেদনাদায়ক অনুভূতি যা রবীন্দ্রজীবনে সত্য হলেও তাঁর জীবনের গতিপথ পরিবর্তিত করে দিয়েছে, কাজেই পাঠককে না বললেও নয়, তখন জীবনের সেই অপ্রিয় বা বেদনাদায়ক ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে স্বল্প কথায় ব্যক্ত করাই আত্মজীবনীকার বা আত্মস্মৃতিরচনাকার মনে করেন। আবার এমন অনেক ঘটনা আছে যা প্রকাশ করলে নিজের বা পরিবারের বা অপরের কোনো ক্ষতি বা অপবাদ বা ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা আছে, সেক্ষেত্রে আত্মজীবনী বা আত্মস্মৃতি রচনাকার সেগুলি

হয় এড়িয়ে যান বা সামান্য কথায় ব্যক্ত করেন। এইরূপে স্মৃতিতে উদয় হওয়া বৃহত্তর ঘটনাও স্বল্পরূপে প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথকে 'জীবনস্মৃতি' লিখতে গিয়ে এইসব দিকগুলি নিয়ে যেমন ভাবতে হয়েছে, তেমনই তিনি ভাবছনে, স্মৃতির টুকরোগুলিকে কিরূপে শিল্পমণ্ডিত করা যায়। আর সেই কারণেই চলছে স্মৃতির সম্পাদনা এক সুষম, স্বয়ংসম্পূর্ণ অবয়ব তৈরীর প্রচেষ্টা, অবশ্য সাহিত্য রস সৃজনের দিকে লক্ষ রেখে। স্মৃতিতে কখন কোন ঘটনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, তা পূর্ব পরিকল্পিত নয়, সেখানে বর্তমান সময়ের সাপেক্ষে সুদূর অতীতের ঘটনা পরে, আবার নিকট অতীতে ঘটনা আগেও উদয় হতে পারে। তাতে স্মৃতিকথা জাতীয় গ্রন্থের কোনো হানি হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অবচেতনে মনে রয়েছে তাঁর 'জীবনস্মৃতি'কে সাহিত্যরূপে সুখ পাঠ্য করা ও তাঁর কবিসত্তার ক্রমবিকাশের রূপরেখাটিকে চিত্রিত করা, সেই কারণেই 'জীবনস্মৃতি'র শিক্ষারম্ভ থেকে শুরু করে 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশটি অধ্যায় জুড়ে তাঁর স্মৃতিকথাগুলি যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে।

স্মৃতিকে প্রকাশ করতে গিয়ে যতটুকু যেভাবে মনে পড়েছে, সেইরূপেই তিনি ব্যক্ত করছেন না। অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া স্মৃতিকে সুখপাঠ্য করে তোলার জন্য ভাবে কল্পনার রঙ লাগাচ্ছেন, তৈরি করে নিচ্ছেন এমন এক আবহ, যেখানে স্মৃতিকে সুমধুর রূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। রবীন্দ্রনাথ: শৈশবে পড়েছিলেন 'জল পড়িতেছে পাতা নড়িতেছে'[৩] এই স্মৃতিটুকরোটিকে স্বভাবোক্তিরূপে ব্যক্ত করলে তাতে তথ্য পাওয়া যেত, তা সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠতো না. কিন্ত এই একটি মাত্র বাক্য তা তো রবীন্দ্রনাথের গতানুগতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষালাভের সঙ্গে জড়িত হয়ে নেই। এই বাক্যটির সঙ্গে মিশে আছে পঞ্চাশোর্ধ রবীন্দ্রনাথের শৈশবের দিনগুলির প্রতি প্রবল আকর্ষণ, যে পথ তিনি উঠতে হয়। হৃদয়ের পরিপূর্ণ আনন্দকে প্রকাশ করতে গিয়ে কবি কল্পনার পোঁচ লাগালেন, আর ফুরিয়েও ঝংকারটা ফুরায় না, এবং মিলটাকে নিয়ে কালের সঙ্গে মনের খেলা চলতে থাকে। “এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।”[৫] এক অনির্বচনীয় আনন্দের আবহ সৃষ্টি করে নিলেন রবীন্দ্রনাথ।

জীবনের মাঝ বয়সে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন জীবনের প্রথম পঁচিশ বছরের কথা। শৈশবের কথা লিখতে গিয়ে শৈশবের অনুভূতি অকৃত্রিমরূপে ব্যক্ত হচ্ছে না অনেকক্ষেত্রেই। শৈশবের সখ-আহ্লাদ পরিণত মনের দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে,

উপনীত হচ্ছে পরিণত মননের বোধের জগতে এমন কি দার্শনিক প্রজ্ঞার জগতেও। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে---. 'ঘর ও বাহির" অধ্যায়ে রয়েছে, 'বাহির সংস্রব আমার পক্ষে যতই দুর্লভ থাক, বাহিরের আনন্দ আমার পক্ষে হয়তো সেই কারণেই সহজ ছিল। উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুঁড়ে হইয়া পড়ে, সে কেবলই বহিরের উপরই সম্পূর্ণ বরাত দিয়া বসিয়া থাকে, ভুলিয়া যায়, অনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর। শিশুকালে মানুষের সর্বপ্রথম শিক্ষাটাই এই। তখন তাহার সম্বল অল্প এবং তুচ্ছ, কিন্তু আনন্দলাভের পক্ষে ইহার চেয়ে বেশি তাহার কিছু প্রয়োজন নাই। সংসারে যে হতভাগ্য শিশু খেলার জিনিস অপর্যাপ্ত পাইয়া থাকে তাহা খেলা মাটি হইয়া যায়।'[৬]

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি যেখানে দার্শনিকতাও যুক্ত হয়েছে, তা নিশ্চয় বালক রবীন্দ্রনাথের নয়। বালকের সখ-আহ্লাদ, চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাজ্ফা, তুপ্তি-অতৃপ্তি চাপা পড়ে আছে পরিণত মনের পরার আড়ালে। "কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল, বড়ো হইলে কোনো এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিষ্যতের 'জিম্মায় সমর্পণ করিয়া বসিয়া ছিলাম।"[৭] এই অতুপ্তিই তো সর্বকালের সর্বদেশের সকল শিশুর চিরপুরাতন অথচ চিরনতুন অতৃপ্তি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুমনের সেই দিকটিকে অকৃত্রিমরূপে ফুটিয়ে তুললেন না, যে শিশুমনে রয়েছে অপ্রাপ্তিজনিত চিত্তবিক্ষোভ, তুললেই হয়তো ভালো করতেন, সেক্ষেত্রে আমরা সকল শিশুর চিত্তবিক্ষোভের 'সঙ্গে শিশু রবীন্দ্রনাথের চিত্তচাঞ্চল্যের সমন্বয় করে আনন্দ পেতাম। কারণ শিশুর ন্যায়-অন্যায় বোধ নেই, তার মন নির্বোধের মতোই প্রবাহমান। খরস্রোতের বেগেই তা স্বচ্ছ, সেখানে লোভ-লালসা, পাপ-পুণ্য কোনো কিছুই পঙ্কিল করতে পারে না। তাই শিশুর চিত্তক্ষোভ চিত্তচাঞ্চল্য আমাদের ভাবনার কারণ হয়ে ওঠে না, বরং তা আমাদের অনুভূতিতে আনন্দের সঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে যখন 'জীবনস্মৃতি' লিখছেন, তখন কবি-সাহিত্যিকরূপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে, তাই হয়তো বাল্যবয়সের অতৃপ্তিজনিত চিত্তবিক্ষোভের কোনরূপ পরিচয় না দিয়ে তিনি পরিণত দৃষ্টিতে প্রজ্ঞার আলোকে শৈশবের অতৃপ্তিকে সম্পাদনা করে নিলেন।

জীবনস্মৃতির রাজেন্দ্রলাল মিত্র অধ্যায়ে রয়েছে---- "যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভায় আহ্বান করিবার জন্য গেলাম, তখন সভার উদ্দেশ্য-ও সভ্যদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি পরামর্শ দিতেছি, আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ করো---

'হোমরাচোমরাদের লইয়া কোনো কাজ হইবে না, কাহারো সঙ্গে কাহারো মতে মিলিবেনা।" এই বলিয়া তিনি এ সভায় যোগ দিতে রাজি হলেন না।

"জীবনস্মৃতি'র বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক অধ্যায়ে রয়েছে "সেই লড়াইয়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার ভারতীও প্রসারে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে---- যদি থাকিত তবে পাঠকরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কোঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলে"।[৯]

বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শ নিয়ে যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁর উল্লেখ করে তিনি পাঠকদের মধ্যে কৌতুহল সৃষ্টি করলেন, বিরোধের গতিপ্রকৃতি নিয়ে কিছুই বললেন না। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র প্রদত্ত চিঠিটি হারিয়ে গেলেও কিরূপে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিরোধের অবসান ঘুচিয়ে ছিলেন তা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ নীরব। হতে পারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথা তথ্য দ্বারা ভারাক্রান্ত করতে চান নি, এছাড়া হয়তো সেই বিরোধের বিস্তারিত বিবরণ দিলে পাঠক ভুল বশতঃ অপব্যাখ্যা করত বা অপব্যাখ্যার সুযোগ থাকত, যা বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের সুসম্পর্কের মধ্যে মলিনতা সৃষ্টি করত। তাই হয়তো রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মরণশক্তি থেকে উপাদান নিয়ে এ বিষয়ে আর বিস্তারিত. বিবরণের দিকে গেলেন না। অপরিণত বয়সে তিনি যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো এক বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে গিয়েছিলেন, সেই স্মৃতি হয়তো জীবনের মাঝ বয়সে এসে রবীন্দ্রনাথকে ততটা পীড়া দেয় নি, কারণ প্রথমতঃ তিনি, বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করতেন এবং দ্বিতীয়তঃ আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে মনের স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার প্রসার ঘটে। সেইসঙ্গে বঙ্কিমের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই আলোচনার সুযোগ রবীন্দ্রনাথের হয়তো পরিণত বয়সে এসে পরম সৌভাগ্য বলেই মনে হয়েছে, তাই তিনি তা উল্লেখ করেছেন মাত্র শ্রদ্ধাবনত চিত্তে।

জীবনের অপ্রিয় সত্যকথা, দুঃখের স্মৃতি থাকে যা আত্মজীবনীকার বা আত্মস্মৃতি রচনাকার বলতে চান না, ফলে সেইসব কথা তিনি হয় এড়িয়ে যান বা সংক্ষেপে বলেন। রবীন্দ্রজীবনের গঠনে যাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাদের মধ্যে কাদম্বরী নিঃসন্দেহে অন্যতম। রবীন্দ্রজীবনে তিনি যেন ধ্রুবতারা স্বরূপ। রবীন্দ্রজীবন যখন 'কড়ি ও কোমল' পর্বে বৃহত্তর মানুষের সঙ্গে মিলতে চাইছে, যখন তাঁর সৃষ্টি নিজস্ব পথে

এগিয়ে চলেছে, সেই সময়ে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু নিশ্চয় তাঁর জীবনে অপরিমেয় ক্ষতি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কিন্ত আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়।"[১০] কিন্তু কাদম্বরীদেবীর, মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তিনি নীরবই থেকেছেন। এর কারণ জীবনের অপ্রিয় সত্য কথা এবং চরম দুঃখের কথা অপরের কাছে তুলে ধরতে আমাদের সকলেরই কুণ্ঠা বোধ হয়। তাছাড়া পারিবারিক জীবনের ঐতিহ্যের উপরও বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে। আবার এমন কিছু সুখ-দুঃখের সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকে যা. একান্ত আপন, তা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে মন চায় না। কারণ অপর ব্যক্তির কাছে আপনার সুখ-দুঃখের একান্ত অনুভূতি সমান মান্যতা পায় না। কাজেই এখানেও চলেছে স্মৃতির সম্পাদনা, আপন মনের শূণ্যতা জনিত হাহাকারকে পাঠকের সামনে সরাসরি বিবৃতির মাধ্যমে তুলে ধরলে, তা অনেক সময়ই পাঠক মনকে সার্বিকভাবে স্পর্শ করতে পারে না। সেই কারণেই হৃদয়ের বেদনার ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ ঘটিয়েছেন যাতে পাঠকমনকেও তা যথার্থরূপে স্পর্শ করে। "আবার, সকলাবেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম, আমার মনের চারিদিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে, কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে, জীবনালোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।"[১১] স্মৃতিকথা এইরূপে সাহিত্য পদবাচ্য করে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথাকে পাঠকের কাছে নানাভাবে আকর্ষণীয় করে তুলতে চেয়েছেন। তাই স্মৃতিকথাকে বিবৃতিমূলক বর্ণনা না করে, কখনো তার মধ্যে নাট্যগুণ সঞ্চার করেছেন। নাটকের মধ্যে রয়েছে কার্য-কারণসূত্রে সম্পাদনের মাধ্যমে, চরিত্রের ছন্দ, সংলাপের তীক্ষ্ণতায় নাটক আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির বর্ণনায় কোথাও কোথাও সেই নাট্যগুণ সঞ্চার করে স্মৃতিকথাকে পাঠকের সামনে উপাদেয় ও সাহিত্যগুণান্বিত করে প্রকাশ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়---- "যে রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে!" তখনই বউঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি তাহাকে র্ভৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন---- পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের

জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল, কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না।”[১২]

দাসীর চীৎকার করে কেঁদে ওঠা, বউঠাকুরাণীর তাকে ভসনা করে সরিয়ে দেওয়া এবং স্তিমিত প্রদীপের আলোয় বালক রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ বুকটা দমে যাওয়ার ঘটনায়, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা নাট্যগুণান্বিত হয়েছে। ছোটবেলায় মাকে হারানোর বেদনা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির সৌন্দর্য ও আনন্দের মধ্যে গভীরতর ব্যঞ্জনা দান করেছেন, যে তা পাঠক হৃদয়কে স্পর্শ করা যায়---- “ইহার পর বড়ো হইলে যখন বসন্ত প্রভাতে একমুঠা অনতিস্ফুট মোটা মোটা ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত, আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম, যে স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; জগতে তাহার আর অন্ত নাই, তা আমরা ভুলিই আর মনে রাখি”।[১৩] রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি তাঁর প্রকাশ দক্ষতায় কাব্যধর্মী হয়ে উঠেছে। 'জীবনস্মৃতি'র মৃত্যুশোক অধ্যায়ে রবীন্দ্রজীবনের দুই প্রিয়জনের মৃত্যু কবির মধ্যে যে উপলব্ধির সঞ্চার করেছে তিনি তাঁকেই প্রকাশ করেছেন। তাঁর মা এবং কাদম্বরী দেবী কবে, কিভাবে সারা যাচ্ছেন তার কোনো কথা এখানে নেই। সন-তারিখ দিয়ে মৃত্যু দিবসকে সকলের কাছে স্মরণীয় করার কথা ভাবেন নি। কোনো তথ্য দ্বারাই তিনি তাঁর বর্ণনাকে ভারাক্রান্ত করতে চান নি। বরং স্মৃতিকথাকে সুখপাঠ্য করতে কখনো নাট্যগুণ কখনো বা কাব্যধর্সী করে তুলেছেন।

জীবনের মধ্যপর্বে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর বাল্যকালকে নিরীক্ষণ করেছেন তখন তিনি এমন অনেক ঘটনাকে দেখেছেন যা বর্তমান সময়ের সাপেক্ষে তাৎপর্যহীন হলেও শৈশবে সেই সামান্য ঘটনাগুলি তাঁর কাছে বিশেষগুরুত্ব পেয়েছিল। শুধু তাই নয় সেই সব তুচ্ছ ঘটনাগুলির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা মহীরুহ হয়ে উঠেছে। তাই পরিণত বয়সে সেই সামান্য ঘটনাকে 'জীবনস্মৃতি'তে স্থান দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সেই সামন্য ঘটনাকেও বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করে বালকের মনে তার গুরুত্বকে নির্দেশ করেছেন। 'কাব্যরচনাচর্চা' অধ্যায়ে রয়েছে, বালক বয়সে স্কুলের সুপারিন্টেডেন্ট গোবিন্দবাবুর কাছ থেকে কবিতা লেখার আদেশ নিঃসন্দেহে তাঁর কাছে গর্বের বিষয়। তাই তিনি বিস্তরিতভাবে এই স্মৃতিকে তুলে ধরতে গিয়ে প্রথমেই গোবিন্দবাবুর চেহারা পদমর্যাদা, তাঁর স্বভাববৈশিষ্ট্য এবং তাঁর সঙ্গে মানানসই পোশাক পরিচ্ছদের বর্ণনা দিলেন। এমন কি গোবিন্দবাবুর সঙ্গে তাঁর আলাপ কিরূপে হয়েছিল, তিনি বালক

রবীন্দ্রনাথকে কিরূপ চোখে দেখতেন, গোবিন্দবাবুর চোখে বালক রবীন্দ্রনাথ যে স্কুলের সকল বালকদের চেয়ে স্বতন্ত্র স্থান পেয়েছিলেন, তাও স্পষ্টরূপে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন। এরপর এল গম্ভীর প্রকৃতির গোবিন্দবাবুর কাছ থেকে কবিতা রচনার আদেশ এবং তা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, সেই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, “একদিন ছুটির সময় তাঁহার ঘরে আমার হঠাৎ ডাক পড়িল। আমি ভীত চিত্তে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি নাকি কবিতা লেখ।" কবুল করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলাম না। মনে নাই কী একটা উচ্চ অঙ্গের সুনীতি সম্বন্ধে তিনি আমাকে কবিতা লিখিয়া আনিতে, আদেশ করিলেন। গোবিন্দবাবুর মতো' ভীষণ গম্ভীর প্রকৃতির লোকের মুখ হইতে কবিতা লেখার এই আদেশ যে কিরূপ অদ্ভুত সুললিত, তাহা যাঁহারা তাঁহার ছাত্র নহেন তাহারা বুঝিবেন না। পরদিন লিখিয়া যখন তাঁহাকে দেখাইলাম তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ছাত্রবৃত্তির ক্লাসের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিলেন, বলিলেন পড়িয়া শোনাও। আমি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া গেলাম।”[১৪] তবে এখানেও রবীন্দ্রনাথ দু'একটি তথ্য গোপন করে গেলেন. কি বিষয় নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছিলেন, তা তিনি জানালেন না। আসলে এই অপরিণত বয়সের রচনার প্রতি পরিণত বয়সে এসে তাঁর যেমন দরদ নেই, তেমনি তিনি জানেন কোনো তত্ত্ব, উপদেশ, সুনীতি প্রচার করা কবিতার উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া তাঁর কবিতা পাঠ শুনে গোবিন্দবাবু কোনো প্রশংসা করেছিলেন কি না তাও তিনি জানান নি। পরিণত বয়সে আত্মপ্রশংসা সম্পর্কে নীরব থাকাটাই হয়তো তিনি বিনয়ের প্রকাশ ভেবেছিলেন। এইরূপেই ‘জীবনস্মৃতি’তে রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কোনো কথা বড়ো হয়ে যাচ্ছে কখনো বা কোনো কথা সামান্য রূপে প্রকাশ পাচ্ছে।

‘জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রজীবনের বৃত্তান্ত নয়, তথ্যের ভারে তা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি। তাঁর স্মৃতিকথায় এমন অনেক অনুভূতিও প্রকাশিত হয়েছে, যা তাঁর একান্ত নিজস্ব, কোন তথ্য দ্বারা তা বিচার করা যাবে না।

“জীবনস্মৃতি”র প্রত্যাবর্তন” অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের শৈশবের এক মধুর অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে –

> ‘পৃথিবীসুদ্ধ লোকে কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ পড়িয়া জীবন কাটায়, আর, আমি পিতার কাছে স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকির স্বরচিত, অনুষ্টুভ ছন্দের রামায়ণ পড়িয়া আসিয়াছি, এই খবরটাতে মাকে সকলের চেয়ে বেশি বিচলিত করিতে পারিয়াছিলাম। তিনি অত্যন্ত খুশি হইয়া

বলিলেন, “আচ্ছা, বাছা, সেই রামায়ণ আমাদের একটু পড়িয়া শোনা দেখি।”[১৫]

মা ও বালকের মধুর সম্পর্ক, মায়ের কাছে বালকের আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা, তা একান্তভাবেই কোনো তথ্য দ্বারা যাচাই করা যাবে না। বালক রবীন্দ্রনাথের এই অনুভুতি তাঁর স্মৃতিকথা থেকেই আমাদের জানতে হবে।

“জীবনস্মৃতি”র অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে রয়ে গেছে সমাজ-দেশ-কাল-ইতিহাসের কিছু কথা। তবে সেগুলি বর্ণিত হয়েছে গল্প বলার মেজাজে। ইতিহাসের নীরস বিবরণ বা তথ্য হয়ে ওঠে নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ‘স্বদেশিকতা’ অধ্যায়ে আছে “দেশের সমস্ত খর্বতা, দীনতা, অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন”।[১৬] পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষের অত্যাচারের কাহিনি, প্রতিবাদ আন্দোলনের বাস্তব তথ্য দিয়ে তিনি তাঁর স্মৃতিকথাকে ভারাক্রান্ত ও নীরস করেন নি বরং কৌতুকের মধ্য দিয়ে সাহিত্যরস সঞ্চার করেছেন। যেমন - “অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, “আমাদের কলে এই গামছার টুকরো তৈরী হইয়াছে।” বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তান্ডব নৃত্য!- তখন ব্রজবাবুর মাথায় চুলে পাক ধরিয়াছে।’[১৭]

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি” সাহিত্যরূপ লাভ করেছে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি, কল্পনাশক্তি, জীবনদর্শন প্রভৃতির সমন্বয়ে। পাঠকের সামনে স্মৃতিকথাকে সাহিত্যগুণান্বিত করে তুলতে তিনি যেমন স্মৃতিকথাকে সম্পাদনা করেছেন, তেমনি কল্পনাকে মিশ্রিত করেছেন। আর সেই কারণেই তিনি বলেছেন, “পটের উপর যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।”[১৮]

শৈশবে কৈশোরের মধুর দিনগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ প্রবল। কিন্ত দিনগুলি আর ফিরে আসবে না, এই আক্ষেপও তাঁর স্মৃতিকে আরো মধুররূপে প্রতিভাত করেছে। এ কথা যেমন সত্য, তেমন যা অনুভব করা হচ্ছে তা পাঠকের কাছে সাহিত্যগুণান্বিত করে প্রকাশের আনন্দও তাঁর মনে কাজ করছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “মনের মধ্যে যে ঔৎসুক্য জন্মিল তাহা কি কেবলমাত্র নিজের অতীত জীবনের প্রতি স্বাভাবিক মমত্ব-জনিত। অবশ্য, মমতা কিছু না থাকিয়া যায় না। কিন্তু ছবি বলিয়াই ছবির একটা আকর্ষণ আছে। উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কে সীতার চিত্তবিনোদনের জন্য লক্ষ্মণ যে ছবিগুলি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাদের সঙ্গে সীতার

জীবনের যোগ ছিল বলিয়াই যে তাহারা মনোহর, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে।”[১৯] অর্থাৎ আপন স্মৃতিকথাকে সাহিত্যগুণান্বিত করে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষাই এখানে ধরা পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতি কথাকে সাহিত্যরসে উত্তীর্ণ করার প্রসঙ্গে বলেছেন যা ভালো করিয়া অনুভব করিয়াছি তাহাকে অনুভবগম্য করিয়া তুলিতে পারিলেই, মানুষের কাছে তাহার আদর আছে। নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।”[২০]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাকেই পূর্ণতা দিয়েছেন সাহিত্যরসোত্তীর্ণ আত্ম-স্মৃতিকথামূলক ‘জীবনস্মৃতি’ প্রকাশের মাধ্যমে।

**সূত্র নির্দেশ :**

১. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ৯

২. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ৯

৩. রবিজীবনী (১ম খণ্ড), প্রশান্ত কুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা – ৭০০০০৯, ২য় সংস্করণ, পৌষ ১৪০০, পৃ. ৫২

৪. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ১১

৫. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ১১

৬. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ১৮

৭. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ১৪

৮. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ১৩৬

৯. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ১৪৯

১০. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ১৫৩

১১. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ১৫৫

১২. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ১৫১

১৩. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ১৫২

১৪. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ৩৬

১৫. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ৬৭

১৬. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ৯১

১৭. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ৯০

১৮. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ৯

১৯. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ১০

২০. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১১, পৃ. ১০

**গ্রন্থপঞ্জি :**

**ক) বাংলা আকর গ্রন্থ**

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা ১৭, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র, ১৪১১

২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, (খণ্ড ১-১৪), বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা ৯, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮

খ) বাংলা সহায়ক গ্রন্থ

১. ঘোষ দেবকুমার, প্রসঙ্গ জীবনস্মৃতি, শিলালিপি, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৭

২. চট্টোপাধ্যায় কুন্তন, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, কলকাতা ৯, পঞ্চম পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৫

৩. ঠাকুর সৌম্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের গান, বৈতানিক প্রকাশনী, কলকাতা ২০, সংশোধিত ও পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৯৬

৪. দেবনাথ ধীরেন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ৫০, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০

৫. পাল প্রশান্ত কুমার, রবিজীবনী (খণ্ড ১-৪), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৌষ ১৪০০

৬. বিশ্বাস অহনা ও ঘোষ প্রসূন (যৌথ সম্পাদনা ও সংকলন), অন্দরের ইতিহাস নারীর জবানবন্দী (খণ্ড ৩), গাঙচিল, কলকাতা ১১১, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬

৭. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার, বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০০

৮. মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, সংশোধিত সংস্করণ পৌষ ১৩৬৭

৯. রায় আশুতোষ, বাংলা আত্মচরিত সাহিত্যের ধারা, অরুণা প্রকাশন, কলকাতা ৮৪, প্রথম প্রকাশ বিজয়া দশমী ১৪১৪

গ. সহায়ক বাংলা পত্র-পত্রিকা

১. ঘোষ তারাপদ ও মজুমদার দিব্যজ্যোতি (প্রধান সম্পাদক ও সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ (রবীন্দ্রসংখ্যা), তথ্য অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা ১, বর্ষ ৩১, সংখ্যা ৪১-৪৬, ১৪০৫/মে ১৯৯৮

২. ভৌমিক তাপস (সম্পাদনা), রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন ভারতীয় ব্যক্তিত্ব, কোরক, কলকাতা ৫৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১

## ঘ. ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ

১. Britannica Ready Reference Encyclopedia, Volume 6, text selected from Britannica Concise Encyclopedia by the editors of Encyclopedia, © 2005 Encyclopedia, Britannica Inc., Encyclopedia Britannica, Britannica Ready Reference, Encyclopedia Britannica (India) Pvt. Ltd., New Delhi and Impulse Marketing, New Delhi.

# সুন্দরবন অঞ্চলের লৌকিক দেব-দেবী

দীপঙ্কর ঘোষ
গবেষক, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া চর্চা বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য 'সুন্দরবন'। ভারতের অংশে ৯,৬৩০ বর্গকিলোমিটার ভূ-খণ্ড এবং বাঁকি দুই তৃতীয়াংশ ভূ-খণ্ড বাংলাদেশের অন্তর্গত। সুন্দরবন নামকরণ নিয়ে নানান মতপার্থক্য আছে, তবে সুন্দরী বৃক্ষের আধিক্যের জন্য 'সুন্দরবন' নামকরণটি অধিক প্রচলিত। ভারতীয় অংশে সুন্দরবনে মোটদ্বীপের সংখ্যা ১০২টি। এর মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে মনুষ্য বসতি গড়ে উঠেছে বাকি ৪৮টি দ্বীপ সংরক্ষিত আছে বন্যপ্রাণীদের জন্য। পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা থাবা বসিয়েছে পৃথিবীর বিখ্যাত লবণাম্বু ও ম্যানগ্রোভ অরণ্যের সুন্দরবনের উপর। ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত মিনাখাঁ, হাড়োয়া, সন্দেশখালি-১, সন্দেশখালি-২, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ তৎসহ দক্ষিণ ২৪ পরগণার অন্তর্গত গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং-১, ক্যানিং-২, জয়নগর-১, জয়নগর-২, কুলতলি, পাথরপ্রতিমা, নামখানা, সাগর, কাকদ্বীপ, মথুরাপুর-১ ও মথুরাপুর-২ অর্থাৎ মোট ১৯টি ব্লক-অঞ্চল নিয়ে সুন্দরবনের জনবসতি।[১] এখানে ২৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী জীব, ২৩৪ প্রজাতির পাখি, ৫৭ প্রজাতির সরীসৃপ, ৩ প্রজাতির কচ্ছপ দেখা যায়। এছাড়া কাঁকড়া, কুমির, হরিণ, বাঘ ইত্যাদির সন্নিবেশে ১৫৮৬টি প্রজাতির প্রাণী এ পর্যন্ত সুন্দরবন খাড়িতে পাওয়া গেছে। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন পরিমণ্ডলের জন্য বিশ্ব সংস্থা (UNESCO) ১৯৮৯ সালে সুন্দরবনকে Biosphere Reserve হিসাবে ঘোষনা করে এং ২০০১ সালে সুন্দনবন পেল Global Biosphere Reserve এর তকমা। সুন্দরবনের এই খ্যাতির অন্যতম কারণ এখানকার শ্বাপদ প্রাণী রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। ২০১১ সালের গণনা অনুযায়ী সুন্দরবনে ১৮০টি বাঘ আছে।[২]

বৈচিত্র্যপূর্ণ সুন্দরবনের মানুষকে প্রতিটি মুহূর্তে সংগ্রাম করে জীবন রক্ষা করতে হয়। জলে কুমির, হাঙর স্থলে বাঘ এই উভয় সঙ্কট নিয়ে তাদের পথ চলতে হয়। গ্রামীন সুন্দরবনের বৃহৎ সংখ্যক মানুষ কৃষি ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাদের মধ্যে শিক্ষার হার খুবই কম বস্তুত বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারের দ্বারা তারা চালিত হয়। এই অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে ঐক্য অনেক সুদৃঢ় কেননা এরা মূল ভূ-খণ্ড

থেকে বিচ্ছিন্ন বস্তুত প্রতিকূলতা তাদেরকে আপন করেছে। নিত্য বিপদমুক্তির আশায় সুন্দরবনের মানুষ আশ্রয় নিয়েছে লৌকিক ধর্মের ছত্র ছায়ায়। এই অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া অন্ত্যজ শ্রেণীর নিরক্ষর অবহেলিত মানুষদেরকে বনুয়া বলা হত, তারা এবং জেলে, মেছুয়া, মৌলে, কামার, কুমোর, ফকির, কাঠুরিয়া, গায়েন, পাতাকুরানী, গোলপাতা সংগ্রহকারী বাউরিয়া তৎসহ বৃহৎ সংখ্যক কৃষক কুলকে নিয়ে গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের গ্রামীন পরিবেশ। সমাজের এই বৃহৎ সংখ্যক প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষগুলি লোকধর্মের ছত্র ছায়ায় একত্রিত হয়েছে। সঙ্গত কারণে সুন্দরবন অঞ্চলে একাধিক লৌকিক ধর্মের ও দেব-দেবীর অস্তিত্ব বর্তমানেও বিদ্যমান। বিপদমুক্তির জন্য এখানকার মানুষ বনবিবি, দক্ষিণরায়, নারায়নী, কালুরায়, মাকালঠাকুর, আটেশ্বর, ওলাইচন্ডী, শীতলা, মনসা, পাঁচু ঠাকুর, সর্বপরি সত্যপির ও মানিক পিরের পূজা করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার বিশ্বায়নের ফলে বর্তমান সুন্দরবন অঞ্চলে আধুনিক সভ্য সমাজের দেব-দেবীর অর্থাৎ দূর্গা, কালী প্রভৃতির পূজা সাড়ম্বরে হচ্ছে।

সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের প্রধান প্রতিবন্ধকতা বাঘ তাই এখানকার মানুষ বাঘের দেবতা হিসাবে দক্ষিণরায়কে পূজা করে। আলোচ্য অঞ্চলের মানুষদের থেকে জানা যায় দক্ষিণরায়ের পূজা এ অঞ্চলের খুবই প্রাচীন এবং জনপ্রিয়। মূলত কাঠুরিয়া, মৌলে (মধু, মোম সংগ্রহকারী), মৎস্যজীবী ও কাঁকড়া সংগ্রহকারীরা তৎসহ ভক্তিপ্রাণ গ্রামবাসী ও কৃষকেরা দক্ষিণরায়ের পূজা করে। পৌষ সংক্রান্তি বা তার পরদিন ১ মাস দক্ষিণরায়ের পূজা হয়। পূজার সময় মন্ত্র হিসাবে বলা হয়-

চন্দ্রবদন চন্দ্রকায়
শার্দূল বাহক দক্ষিণরায়,
ঢাল তলোয়ার টাঙ্গি হস্তে
দক্ষিণরায় নমোহস্তুতে।

দক্ষিণরায়ের পূজা উপলক্ষে দক্ষিণরায়ের পালাগান গাওয়া হয়। দক্ষিণরায়ের সঙ্গে বড়খাঁ গাজির যুদ্ধের কথাই এই পালাগানের মূল বিষয়। কোথাও বা দক্ষিণরায়ের কাহিনি অবলম্বনে যাত্রাপালা হয়।[৩] যদিও পরবর্তীকালে দক্ষিণরায়ের গৌরবময় স্থান গ্রহণ করেন বনবিবি। আমরা বনবিবির পূজা প্রসঙ্গে আসবার পূর্বে আলোচনার সুবিধার্থে আলোচ্য অঞ্চলের আরও কিছু লৌকিক দেব-দেবীর কথা আলোচনা করব। মৎস্যজীবীরা কুমিরের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কালুরায়কে পূজা করে অর্থাৎ কালুরায় হলেন কুমিরের দেবতা। মকর সংক্রান্তির গভীর রাতে কালুরায়ের পূজা হয়।

দক্ষিণরায়ের সহচর দেবতারূপে কালুরায়কে ভাবা হয়। বুনোঝাউ ফুলের নৈবেদ্য লাগে এই পূজাতে। অপর আবশ্যিক নৈবেদ্য হল মদ। দক্ষিণরায়ের মা হিসাবে নারায়নীকে মানা হয়। ইনি খুবই জনপ্রিয় লৌকিক দেবী। পৌষ সংক্রান্তি বা ১ মাঘ জাঁকজমক সহকারে এঁর পূজা হয়। এঁর মূর্তি ব্যাঘ্রবাহিনী।[৪] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সুন্দরবন অঞ্চলের একাধিক লৌকিক দেব-দেবীর নামের সঙ্গে 'রায়' উপাধি সংশ্লিষ্ট রয়েছে এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন – "শুধু দক্ষিণরায় নয়, হরিরায়, বিষমরায়, কালুরায় ইত্যাদি। এইরকম 'রায়' উপাধিধারী অনেক দেবতা আছেন রাঢ় অঞ্চলে হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূমে। এঁরা অনেকেই হয়ত আঞ্চলিক সামন্তরাজা, জমিদার ও যোদ্ধা ছিলেন এবং পরে গ্রাম্য লোকদেবতার মহিমা আত্মসাৎ করে দেবত্বের বেদীতে উন্নীত হয়েছেন।"[৫]

সুন্দরবনের অপর গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হলেন মাকালঠাকুর। ইনি মৎস্যজীবীদের উপাস্য লৌকিক দেবতা। এই ঠাকুরের কোনো মূর্তি বা থান নেই। মৎস্যজীবীরা একটি মাটির বেদি তৈরি করে তার উপর একটি অথবা দুটি মাটির স্তূপ বানিয়ে এই ঠাকুরের পূজা করে। এর উপকরণ চাল-কলা-বাতাস প্রভূতি। পূজায় কোনো মন্ত্র উচ্চারিত হয় না। মাকাল ঠাকুরকে নতুন কলকে ও গাঁজা দেওয়া হয়। এই অঞ্চলের অন্যতম আদিম লোকদেবতা আটেশ্বর। আটেশ্বর গ্রামের মানুষ ও গৃহপালিত পশুদের রক্ষা করেন এই বিশ্বাস করেন গ্রামবাসীরা। আটেশ্বরের পূজার অন্যতম উপকরণ গাঁজা। সুন্দরবনে জলে কুমির ডাঙায় বাঘ ছাড়াও আরও একটি জীবের কারণে বছরভর প্রচুর মানুষের জীবনহানি ঘটে সেটি হল বিষধর সাপ। বর্ষাকালে মাঠে জল ভরে গেলে সাপেরা উঁচু জায়গা অর্থাৎ রাস্তা বা ভিটে বাড়িতে আশ্রয়গ্রহণ করে। মাঠে কৃষিকাজ করতে গিয়ে বা অন্যান্য কারণে প্রচুর মানুষ সর্পাঘাতে মারা যান। সাপের হাত থেকে রেহাই পেতে সমগ্র সুন্দরবনবাসী সর্পদেবী মনসার আরাধনা করে। প্রায় প্রতি বাড়িতে মনসার থান দেখা যায়। ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে মনসাপূজা উপলক্ষে রান্নাপূজা বা অরন্ধনের চল আছে। মনসা পূজার প্রধান উপকরণ দুধ-কলা-বাতাসা। বাড়িতে বাড়িতে মনসার থানে মনসা সেঁজি গাছকে বসিয়ে পূজা করা হয় আবার মূর্তি পূজারও চল আছে। মনসাপূজা উপলক্ষে মনসার ভাসান গান বা পালা সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে মা মনসার থান লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সুন্দরবনকে আঠারো ভাটির দেশ বলা হয়। এর অর্থ হল যে এই অঞ্চলের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে আঠারোটি ভাটার প্রয়োজন হয়। সঙ্গত কারণেই আলোচ্য অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের

কাছে নৌকা অতি পবিত্র বস্তু। বস্তুত প্রত্যেক দিন সকালে উঠে নৌকা স্নান করিয়ে নৌকার গলুই মাথায় ধূপ-ধুনো-বাতাসা দিয়ে পূজা করা হয়। তবে এই কঠোর নিয়ম জঙ্গলের মধ্যে অবস্থানকারী মৎস্যজীবীরা যতটা মানে সাধারণ নদীনালায় মাছ ধরা মানুষেরা ততটা মানে না।[৬]

গবেষিকা সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর ‘‘দক্ষিণ ২৪ পরগণার সমাজ-সংস্কৃতি ও মেলা-পার্বন’’ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বড় খাঁ গাজির আগমন হয়েছিলো। এই বড় খাঁ গাজি হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষের কাছে ব্যাঘ্র দেবতারূপে বরণীয়। পূর্বে উল্লেখিত বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়ের সঙ্গে বড় খাঁ গাজিল মিলনাত্মক ও বিয়োগান্তক সম্পর্ক ছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, কৃষিকার্যে গবাদি পুশুর সংকট যেমন রোগমুক্তি, দুগ্ধবতী হওয়া ও পশু হারানো প্রাপ্তি এইসব জটিলতা নিবারণের জন্য ও পশু সুস্থ রাখতে আজও এ অঞ্চলের মানুষ গোরক্ষক দেবতা সত্যপির ও মানিক পিরের পূজা করেন। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের আপামর চাষি ও গৃহস্থ পরিবারের মানুষেরা সত্যপিরের থানে পূজা করে থাকেন। এই সত্যপিরের সাথে হিন্দু দেবতা সত্য নারায়ণের সমন্বয় ঘটেছে কালক্রমে। ১লা মাঘ দক্ষিণ ২৪ পরগণার অনেক পিরের থানে উৎসব হয়। এই উপলক্ষ্যে পালাগান বসে ও জেলার সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সমাগম হয় আজও। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে নদীর গভীরতা মজে যাবার ফলে এবং অনেক জলাশয় মজে যাবার কারণে জলনিকাশি ব্যবস্থা বন্ধ হতে শুরু করে। এছাড়া কাটা খালগুলি সংস্কার না করায় মজা খালে বৃষ্টির জল জমে জলঘটিত রোগের জীবানু সংক্রমন ঘটত। যার জন্য কলেরা, ওলাওঠা, বসন্ত ও ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি। এসব অসুখে এই অঞ্চলের বহু সংখ্যক মানুষের জীবনহানি ঘটেছিল। এই সমস্ত রোগের থেকে উপশমের জন্য লৌকিক দেবতার আবির্ভাব ঘটে। যার মধ্যে অন্যতম ওলাইচণ্ডী বা ওলাবিবি, সাতবিবি, শীতলার মতো গ্রাম্য দেবদেবী। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও অপুষ্টির জন্য আলোচ্য অঞ্চলে শিশুর মৃত্যু হতো এই শিশু মৃত্যু রোধ করবার জন্য শিশু রক্ষক দেবতা পাঁচু ঠাকুরের আরাধনা করা হতো।[৭]

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯টি ব্লক নিয়ে গঠিত সুন্দরবন অঞ্চল এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ কৃষি ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে তাদের নিয়োমিত বনে-জঙ্গলে প্রবেশ করতে হয় কিন্তু ডাঙার নিয়মকানুন বনে-জঙ্গলে

খাটে না। জঙ্গলের নিয়মকানুন সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষ সবাই এই নিয়ম মেনে চলে। নিয়মগুলো হলো-

১. জঙ্গলের মধ্যে মৌলেরা (যারা বন থেকে মধু ও মোম সংগ্রহ করে) কেউ কারও নাম ধরে ডাকে না, 'কু' শব্দ করে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেয়। নৌকো খাঁড়িতে রেখে মৌলেরা জঙ্গলের বেশি ভেতরে প্রবেশ করে না। খাঁড়িতে বাঁধা নৌকো থেকে 'কু' যতদূর পর্যন্ত পরিস্কার শোনা যাবে ততদূর পর্যন্ত যায়।

২. জঙ্গলের মধ্যে মৌমাছিকে মৌলেরা 'পোকা' বলে এবং যে দক্ষতার সঙ্গে 'পোকা'র সন্ধান করে, সে হলো 'পোকা চালোক'। মৌলেরা মৌচাকের সন্ধান পেলে 'মৌচাক' না বলে ''আল্লা' 'আল্লা' বলে চিৎকার করে মৌচাকের সন্ধান পাওয়ার কথা সকলকে জানান দেয়।

৩. মৌলেরা সরাসরি জঙ্গলের মাটিতে প্রাকৃতিক কর্ম সম্পন্ন করে না। এমনকি থুথুও পর্যন্ত ফেলে না। গাছের পাতা ছিঁড়ে ওই কাজে তা ব্যবহার করে।

মৌলেরা যখন জঙ্গলে প্রবেশ করে তখন তাদের দলে একজন করে গুনিন থাকে। এই গুনিন জঙ্গলে যাত্রার দিন বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বনবিবির নাম নিয়ে ডান পা আগে আগে ফেলে হাঁটতে থাকেন। তারপর গুনিন ও তার সহযোগী মৌলেরা নৌকায় উঠে জোরে জোরে বলে-

''বনবিবির নাম করে আল্লা আল্লা বল,
সত্যপীরের নাম করে হরি হরি বল,
রায়ঠাকুরের নাম করে হরি হরি বল।''[৮]

তারপর জঙ্গলে নেমে গুনিনকে 'মাল' সারতে হয়। মালে অর্থাৎ মাটিতে হাত দিয়ে গুনিনকে বলতে হয়-

''হিমসাগর গঙ্গারানী
ভাঙন ভেরে করছে পানি
সমর দেচ্ছে সীতা, অগ্নি উঠল চিতা
না ফোলে না ফাটে, না করে ঘা
বাঘ, তুই এ মাল ছেড়ে, অন্য বনে যা
কার আঙ্গে, মা বনবিবির আঙ্গে
এ মালে যত বাঘ আাছে, তাদের মুখ আটকে যাকগে।''[৯]

মৌলেদের বিশ্বাস এভাবে গুনিন বনবিবির পূজা করে বাঘের মুখ বন্ধ করে দলকে বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে থাকেন। মা বনবিবির নাম নিয়েই কাঠুরিয়া ও মৌলেরা জঙ্গলে প্রবেশ করেন এবং জঙ্গলের মাটিতে কোনও থুতু ফেলে না, পাতায় থুতু ফেলে মাটিতে দেন। জঙ্গলে গেলে হিন্দু-মুসলিম এক নিয়ম, কিন্তু ফিরে এসে যে যার ধর্ম মেনে চলেন। অর্থাৎ মা বনবিবির কাছে হিন্দু-মুসলিম সব এক হয়ে যায়। মা বনবিবিই তাদের রক্ষা করেন।[১০]

এবার আমরা উল্লেখ করবো এই বনবিবি আসলে কে, পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণরায়ের ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য আস্তে আস্তে খর্ব হতে থাকে। তার জায়গায় পূজিত হতে থাকেন বনবিবি। তিনি এই অ্ঞ্চলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। হিন্দুদের কাছে তিনি বনচন্ডী এবং মুসলমানদের কাছে বনবিবি। পৌষ সংক্রান্তির পর থেকে সারা মাস জুড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মানুষ মেতে ওঠেন বনবিবির বার্ষিক পূজায়। পূজা-হাজোত উপলক্ষ্যে মেলা বসে বিভিন্ন অঞ্চলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বনবিবির পূজাকে হাজোত বলে। জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত মেলা চলে। কোথাও বাঘের পিঠে ও কোথাও মুরগির পিঠে আরুঢা ব্যাঘ্রদেবী সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে আজও খুব জনপ্রিয় ও সমাদৃতা। খাল-বিলের ধারে ঘন জঙ্গলে প্রায় সর্বত্র দেখা যায় বনবিবির থান বা প্রতীক মূর্তি। বনবিবিকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মৈত্রীবন্ধন এখনও অটুট। বনবিবির মাহাত্ম্য দিয়ে তৈরি হয়েছে নাটক, পালাগান ও যাত্রাগান।[১১] বিশিষ্ট গবেষক বিনয় ঘোষ তাঁর গ্রন্থে বনবিবি প্রসঙ্গে লিখেছেন, - "দক্ষিণরায় অথবা বড়-খাঁ গাজী যে যাই হন না কেন, দক্ষিণাঞ্চলের প্রকৃত অধিকারী হলেন বনদেবী চণ্ডী যিনি সুন্দরবনে 'বনবিবি' নামে পরিচিত।... বনবিবিকে অগ্রাহ্য করে দক্ষিণে কারও প্রভুত্ব সম্ভব নয়।"[১২] হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে বনবিবির পূজা বা হাজত করে। সুন্দরবনের মানুষের বিশ্বাস ও ভক্তির কেন্দ্রে আছে বনবিবি। বনবিবি অরণ্যের বা জঙ্গলের যিনি বিবি বা কত্রী। 'বন' শব্দটির অর্থ হল গাছপালা বা বৃক্ষাদির ঘনসমাবিষ্ঠ অঞ্চল এবং দ্বিতীয় শব্দ 'বিবি' বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে আগন্তুক বিদেশি ফারসি শব্দ। এর অর্থ মুসলমান মহিলা বা মুসলমানের কুলবধূ।[১৩]

বনদেবী চন্ডীর আদলে কল্পনা করা হল বনবিবিকে। ১৮৭৭-৭৮ সালে বয়নুদ্দিন রচিত 'বনবিবি জহুরা নামা' পুথির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ১৮৮০ সালে লেখা হচ্ছে মুন্সী মহম্মদ খাতেরের 'বোন বিবি জহুরা নামা'। বয়নুদ্দিনের পুঁথির সন্ধান না মিললেও

খাতেরের পুঁথি এখনও গত্তসিয়া লাইব্রেরি থেকে মুদ্রিত হয়। যদিও ধরেও নেওয়া হয় বয়নুদ্দিন রচিত পুঁথিটিই বনবিবির কাহিনি নিয়ে রচিত প্রথম গ্রন্থ, তাহলে বনবিবির আবির্ভাবকাল দাঁড়াচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। তবে তারও বহু বছর আগে বনদেবী চন্ডীর মাহাত্ম্যের কথা বাংলা সাহিত্যে লেখা হয়েছিল। লোকমুখে চন্ডীমঙ্গলের দেবী চন্ডী পরিবর্তিত হতে হতে বনবিবির রূপ নেয় এমন ভাবাও খুব অসঙ্গত নয়।[১৪] সুকুমার সেন লিখছেন-"নিম্মবঙ্গের অরণ্য অঞ্চলে ব্যাঘ্র ভীতির উল্লেখ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে যেভাবে আছে তাহাতে দক্ষিণরায়ের দেবত্ব প্রাপ্তির পূর্ব অবস্থার একটু ইঙ্গিত পাই।"[১৫] বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক ওয়াকিল আহমদের কথাতেও একথার সমর্থন মেলে, "বনদুর্গাই আদি দেবী; বনবিবি তাঁর মুসলিম সংস্করণ। মধ্যযুগে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ও ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পর বনদুর্গা বনবিবিতে রূপান্তরিত হয়েছেন।"[১৬] হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় ভেদে বনবিবির দুই প্রকার মৃন্ময়মূর্তি দেখা যায়। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে বনবিবি দেখতে হন কিশোরী মুসলিম বালিকার ন্যায় – মাথায় চুলের বিনুনি, টিকলি ও লতাপাতা – আঁকাটুপি, গলায় হার ও বনফুলের মালা, পরনে লেহাঙ্গা বা ঘাঘরা, গায়ে পাতলা ওরনা; তাঁর বাম কোলে একটি বালক (দুঃখে বলে অনুমিত), ডান হাতে আসাদন্ত, ঝান্ডাও দেখা যায়। তাঁর বাহন মুরগি বা বাঘ।... হিন্দু প্রধান অঞ্চলেও বনবিবি বাঘের ওপর উপবিষ্ট, হরিদ্রাভ তাঁর গাত্রবর্ণ, মাথায় মুকুট, গলায় হারও মালা, অন্যান্য অঙ্গেও নানারূপ অলংকার, কোলে একটি শিশু, হাতে আসাদন্ড বা কোন অস্ত্র নেই।[১৭]

১৮৮০ সালে লিখিত মুন্সী মহম্মদ খাতেরের 'বোন বিবি জহুরা নামা' থেকে বনবিবির যে জন্মপরিচয় মেলে তা নিম্নরূপ, - আরবের মক্কা শহরে বেরাহিম বা ইব্রাহিম নামে এক ফকির ছিলেন তার প্রথম স্ত্রীর নাম ফুলবিবি এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম গুলাল বিবি। উল্লেখিত গুলাল বিবির গর্ভে বনবিবি ও তার আপন ভাই শা জঙ্গলির জন্ম হয় কিন্তু ইব্রাহিমের প্রথম স্ত্রী যেহেতু নিঃসন্তান ছিলেন সেহেতু তার নির্দেশে বনবিবি এবং শা জঙ্গলিরকে বনবাসে পাঠানো হয়। তাঁদের প্রতি আল্লাহের দয়া হয়। ৭ বছর বাদে পিতা বেরাহিম বা ইব্রাহিম তাদেরকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে বনে গেলেন কিন্তু বনবিবি তাঁর পিতার সাথে বাড়ি ফিরলেন না কেননা তিনি বলেন আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিয়েছেন বঙ্গের (অবিভক্ত বাংলা) আঠারো ভাটির (সুন্দরবন অঞ্চল) যেতে-

শা জঙ্গলিকে হেঁকে বলে কোথা যাও ভাই
মা-বাপের সাথে যাওয়া আবশ্যক নাই।।

আঠারো ভাটিতে যেতে হবে আমাদের।...
খোদার হুকুম এয়ছা আমাদের পরে।
আমাদের জহুরা জাহের সেথা হবে।।[১৮]

তিনি এবং তাঁর ভাই সুন্দরবন অঞ্চলে প্রবেশ করলে এই অঞ্চলে বাঘের দেবতা দক্ষিণরায় ক্রুদ্ধ হয় ফলে দক্ষিণ রায়ের মা নারায়নী তিনি বনবিবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ব্যার্থ হয়ে শখ্যতা স্থাপন করে এবং উল্লেখিত অঞ্চলে বনবিবির কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। এই যুগসন্ধিক্ষনকালে সুন্দরবনের বরিজহাট গ্রামের ধোনাই নামে এক সম্পন্ন ব্যক্তি গ্রামেরই দরিদ্র দুখে নামে একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে যায় কিন্তু দক্ষিণরায় ধোনাইকে স্বপ্নে বলেন নরবলি দিলে তবেই সে ৭ ডিঙ্গা মধু ও মোম পাবে। লোভী ধোনাই দুখেকে কেঁদোখালির বনে ছেড়ে দেয় যাতে দক্ষিণরায় বাঘের রূপ ধরে তাকে উদরস্থ করে নরবলির মানত পূর্ণতা পায়। দুখের এই করুন অবস্থা দেখে বনবিবি এবং তার ভাই শা জঙ্গলি সেখানে উপস্থিত হয়ে দক্ষিণরায়ের গ্রাস থেকে দুখেকে বাঁচায়। পরবর্তীকালে এই দুখে গ্রামে ফিরে আসে এবং বনবিবির মাহাত্ম্য প্রচার করে। পরাজিত দক্ষিণরায় সুন্দরবনের বড় খাঁ গাজী পীরের মধ্যস্থতায় বনবিবির পায়ে আত্মসমর্পন করে এবং প্রতিশ্রুতি দেয় জঙ্গলে প্রবেশ করে কেহ যদি বনবিবিকে স্মরণ করেন তাহলে দক্ষিণরায় তাঁদের কোন প্রকার অনিষ্ঠ করবে না। এই ঘটনার পর থেকে সুন্দরবন অঞ্চলে বনবিবির পূজা শুরু হয়।[১৯]

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মউলে, কাঠুরে এরা বনে যাওয়ার আগে বনবিবির মানত ও হাজত দেয়। বসন্তের আগমনে মাঘ মাসের এক তারিখ থেকে বনবিবির পূজা বা উৎসব শুরু হয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত চলে। বনবিবির পূজায় বৈদিক মন্ত্র বা আচারের প্রভাব চোখে পড়ে না। বনবিবির পূজার একটি নির্দিষ্ট পুঁথি আছে। হিন্দু মেয়েরা যেমন পাঁচালি পড়ে তেমনি বনবিবির পাঁচালি যে কেউ পড়তে পারে। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ উভয়েই পূজা করতে পারে। তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের ছোঁয়াচ আছে বলে অনেক স্থানে কোন মুসলিমকে ডেকে এনে পুঁথি পড়ান হয়।[২০] প্রবীন গুনিনরাও পুঁথি পড়ে বনবিবিকে তুষ্ট করতে পারেন। সন্ধ্যা নামার পূর্বেই বনবিবির পূজা শেষ হয় তার পর সন্ধ্যায় বনবিবির যাত্রা পালা শুরু হয়। বর্তমানে সুন্দরবন অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ লৌকিক দেবী হিসাবে বনবিবি বিবেচিত হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের দ্বারা ইনি পূজিত হন। পূজার অঙ্গ হিসাবে ভক্তরা মোরগ বা মুরগি জঙ্গলে ছেড়ে দেয় একে ‘বনবিবির মুরগি’ বলে।[২১] মানতের মুরগিকে আঘাত করা বা হত্যা করে মাংস খাওয়া

নিষিদ্ধ। সুন্দরবন অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহাবস্থানের পিছনে বনবিবির পূজা বিশেষ গুরত্বের দাবিদার।

তথ্যসূত্র :

১. পবিত্র কুমার মিস্ত্রী, 'সুন্দরবন অঞ্চলের জনজীবনে লোকসংস্কৃতির প্রভাব', পরীক্ষিৎ বালা ও বরুণকুমার চক্রবর্তী এবং অন্যান্য (সম্পা.), *লোকশ্রুতি ৪৯*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পঃ বঃ সরকার কর্তৃক আর্ট ও প্রিন্ট, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৯৭।

২. এষা দেবনাথ, 'বনবিবির পালা : সেকাল একাল', ধ্রুব কর (সম্পা.), *ইতিহাস চর্চা-১*, রূপালী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ৫৭।

৩. পবিত্র কুমার মিস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২।

৪. তদেব, পৃ. ১০২।

৫. বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৩১।

৬. পবিত্র কুমার মিস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩।

৭. সুমিতা চক্রবর্তী, 'দক্ষিণ ২৪ পরগণা : সমাজ-সংস্কৃতি ও মেলা-পার্বন', প্রিয়দর্শী চক্রবর্তী ও নীলেন্দু সেনগুপ্ত এবং অন্যান্য (সম্পা.), *ইতিহাস চেতনা প্রবাহ*, নক্ষত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২২০।

৮. শেখর রায়, 'সুন্দরবনের মৌলেদের জীবনকথা', প্রণব সরকার (সম্পা.), *স্বদেশচর্চা লোক গোষ্ঠী সমাজ সম্প্রদায়* ২, ডি. ডি. এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা, পৃ. ১৭৬।

৯. তদেব, পৃ. ১৭৭।

১০. তদেব, পৃ. ১৮০।

১১. সুমিতা চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭।

১২. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

১৩. সনৎকুমার মিত্র (সম্পা.), *বাঙলা গ্রামীণ লোক নাটক : আলোচনা এবং সংগ্রহ*, পুস্তক বিপনি, ২০০০, পৃ. ২১৬।

১৪. হিমাদ্রি মণ্ডল, 'বনবিবিরপালা : সেকাল ও একাল', পরীক্ষিৎ বালা ও বরুণকুমার চক্রবর্তী এবং অন্যান্য (সম্পা.), *লোকশ্রুতি ৫০*, লোকসংস্কৃতি ও

আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পঃ পঃ সরকার কর্তৃক আর্ট ও প্রিন্ট, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৯৭।

১৫. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ২৬১।

১৬. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার পীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, বইপত্র, ঢাকা, ১৪২৩, পৃ. ১১৬

১৭. তদেব, পৃ. ১১৬।

১৮. তদেব, পৃ. ১১৮।

১৯. তদেব, পৃ. ১২১।

২০. এষা দেবনাথ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

২১. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭।

# প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাবনার আলোয় সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসচর্চা

সাথী নন্দী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপঃ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। কেননা মানুষ অরণ্যে থাকতো। ধীরে ধীরে মানুষ চাষবাস শিখল, গুহা থেকে বেড়িয়ে এসে ঘরে থাকা আরম্ভ করলো। কৃষিজমির পরিমাণ কমতে লাগলো এবং সবুজের ধ্বংস সাধন করে গড়ে তোলা হলো শিল্প। নর্মদা নদীর ওপর বাঁধ নির্মিত হলো। নির্বিচারে স্যালো পাম্প বসিয়ে সবুজ বিপ্লব ঘটানোর স্বপ্নে বুঁদ হয়ে আর্সেনিক দৈত্যকে সাদরে আহ্বান জানানো হলো। কারখানা তৈরি হলো পরিবেশ আইনকে তুচ্ছ করে এবং লগ্নিপুঁজির কাছে ক্ষমতার সকল উপকেন্দ্রগুলি স্বার্থের বাঁধনে বাঁধা! তবুও প্রতিবাদ থেমে থাকে না- পরিবেশবাদী আন্দোলন তীব্রতা পায় এবং ক্ষমতাতন্ত্রের সৌম্য মুখোশ খসে পড়ে। কথাকার সাধন চট্টোপাধ্যায়ের আখ্যানে এই প্রেক্ষাপট প্রাণবন্ত চেহারা নিয়ে উপস্থিত। এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে উন্মোচিত প্রকৃতি-পরিবেশ ও লগ্নিপুঁজির বিপরীত মেরুর সম্পর্ক এবং তথাকথিত উন্নয়নী যজ্ঞের আসল রুপ। সেইসঙ্গে লগ্নিপুঁজি ও ক্ষমতাতন্ত্রের বিভিন্ন উপকেন্দ্রগুলির স্বার্থঘন সম্পর্ক এবং এসবের চাপে পিষ্ট ব্যক্তিমানুষের সকরুণ পরিণতি।

সূচকঃ ধ্বস্ত-সময়, বিপন্ন-মানুষ, নষ্ট-সমাজ, দূষণ, পুনরুদ্ধার।

মানুষের সঙ্গে অরণ্যের সম্পর্ক নিবিড় কেননা মানুষ অরণ্যবাসী ছিলো, গুহাবাসী ছিলো- পর্বত, নদী, সমুদ্র সবকিছুই ছিলো তাঁর জীবন যাপনের সঙ্গী। মানুষ যবে থেকে প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন হয়েছে তবে থেকে তার জীবন এবং মনে নানা ধরনের কুরোগ বাসা বেঁধেছে। আসলে প্রকৃতির সংলগ্নতাই হচ্ছে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার অন্যতম চাবিকাঠি। ফলে সমুদ্র, নদী, পাহাড়, পর্বত প্রভৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ যখন ক্রমশ শহুরে এবং ঘরবন্দী হলো তখন তারা প্রকৃতির সঙ্গে সংলগ্নতা হারালো। এই সংলগ্নতা হারানোটাই হচ্ছে একটা বড় অভিশাপ এবং যার ফলে মানব সভ্যতা ক্রমশ পীড়িত, ক্রমশ অসুস্থ অসুখময় হয়ে উঠছে। প্রকৃতির সঙ্গে আজ মানুষের সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন বলেই আমাদের জীবনে এসেছে অনেক ধরণের সংকট। সেই সংকট সভ্যতার অংশ হিসেবে পরিগণিত

হচ্ছে আমাদের সামনে। আমরা দেখতে পাচ্ছি অরণ্য ধ্বংস করে, নদী বুজিয়ে, সমুদ্রকে দূষিত করে, জল নষ্ট করে, সমস্ত সবুজকে ধ্বংস করে মানুষ নিজের সমাধি নিজে খুঁড়ছে। সত্তর দশকের অন্যতম প্রধান কথাকার সাধন চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে এই প্রেক্ষাপট প্রাণবন্ত চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তাঁর একের পর এক উপন্যাস ও ছোটগল্পে তিনি উন্মোচিত করেছেন পরিবেশ ও লগ্নিপুঁজির বিপরীত মেরুর সম্পর্ক, স্পষ্ট করেছেন তথাকথিত উন্নয়নী যজ্ঞের আসল রূপ। ব্যক্ত করেছেন লগ্নিপুঁজি ও ক্ষমতাতন্ত্রের বিভিন্ন উপকেন্দ্রগুলির স্বার্থঘন সম্পর্ক এবং এসবের চাপে পিষ্ট ব্যক্তিমানুষের সকরুণ পরিণতি। আমরা জানি মহাশ্বেতা দেবী ও তাঁর অনুসারী বেশ কিছু বাঙালি লেখক সত্তর দশকের অগ্নিগর্ভ সময়ের ভূমিতে দাঁড়িয়ে নতুনতর পথ খোঁজায় প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং রাজনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে নতুনতর ধারণার পরিসর জন্মাচ্ছিলো। পঞ্চাশ-ষাট দশকের বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত প্রচলিত ধারা তখন নিশ্চিত অবলুপ্তির পথে। সামন্ততান্ত্রিক-বুর্জোয়া রাজনীতি-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করে সাম্যবাদী সমাজ গঠনের স্বপ্ন তখন বিপুল আবেগের শক্তি নিয়ে বাস্তবের ভূমিতে সাকার হওয়ার জন্য প্রবল সক্রিয়। অলিগলিতে শোনা যাচ্ছিলো বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ। এই বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে নতুন আঙ্গিক, নতুন বিষয় ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্য রচনা ছিলো সে সময়ের দাবী। এই দাবীকে প্রথম সম্মান জানিয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবী এবং বাংলা ভাষায় প্রকৃতি চর্চা, পরিবেশ সচেতনতা, পরিবেশ দূষণ, পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন ও গ্রিন হাউস এফেক্ট- এই সমস্ত কিছুকে বিষয় হিসেবে বেছে নিয়ে প্রথম উপন্যাস লেখেন কিন্নর রায়। তাঁর 'প্রকৃতি পাঠ' (১৯৯০), 'মেঘপাতাল' (১৯৯৫), 'হনন ঋতু' (২০১০), ব্রহ্মকমল' (২০০৯) প্রভৃতি উপন্যাস এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও অমর মিত্রের কৃষ্ণগহ্বর' (১৯৯৮), সৈকত রক্ষিতের 'আকরিক' (১৯৯৮), সুকান্তি দত্তের 'জুধান কথা' (২০০১) এবং সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'জলতিমির' (১৯৯৮), 'বিন্দু থেকে বৃত্তে' (২০০০), 'শেষ রাতের শেয়াল' (২০০২) প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে পরিবেশ ধ্বংসের ভয়াবহতা ও পরিবেশ-সচেতনতা আখ্যানের প্রতিবেশ ও মূল অনুষঙ্গ হিসেবে উঠে এসেছে। এছাড়াও নদীর ভাঙন বিষয়ে শচীন দাশ লিখেছেন 'নদী তরঙ্গের আয়না' (২০০৫), 'অন্ধ নদীর উপাখ্যান' (২০০৪)। উপন্যাস দুটিতে পরিবেশের বিপন্নতার দিকগুলোকে আখ্যানের মূল ডিসকোর্সে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আমরা আলোচনা করবো সাধন চট্টোপাধ্যায়ের পরিবেশ ভাবনার অভিনবত্ব বিষয়ে। কথাসাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের পরিবেশ চেতনা বা পরিবেশ

ভাবনার অভিনবত্ব বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে যে কয়েকটি উপন্যাসের কথা আমাদের মনে পড়ে সেগুলো হলো- ‘জলতিমির’, ‘বিন্দু থেকে বৃত্তে’, ‘গহিন গাঙ’, ‘শেষ রাতের শেয়াল’ এবং ‘পানিহাটা’।

সাধন চট্টোপাধ্যায় ‘জলতিমির’ উপন্যাসে পশ্চিমবঙ্গের আর্সেনিক দূষণকে মিথের আশ্রয়ে সামনে এনেছেন। আর্সেনিক দূষণ নিয়ে পাঁচপোতা এবং আশেপাশের গ্রামের মানুষদের সচেতন করতে প্রচারে নামেন বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মীরা। সেই প্রচারকে পার্টির স্থানীয় ক্ষমতাবলয়ের কর্তাব্যক্তিরা ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখে এবং একে বিরোধীপক্ষের ষড়যন্ত্র মনে করে তাদের প্রচারে বাধা দেয়। লেখকের মুন্সিয়ানায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে আসে কায়েমি স্বার্থভোগী ক্ষমতাতন্ত্রের নানা বিন্যাস ও প্রতিরোধের নানা চিত্র। এই কায়েমি স্বার্থভোগীরা যে সমাজের প্রকৃত উপকার করতে অপারগ এবং তাদের উদাসীনতায় ঔদ্ধত্যে ভালো কাজগুলিও যে অনেক সময় করা যায়না তা লেখক এখানে স্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন। ‘কালীয়দমন’ পর্ব থেকেই লেখক মূল সমস্যায় প্রবেশ করেছেন। রবিদাস পাড়া সন্নিহিত একটি বড় অঞ্চলে পানীয় জলে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। ‘সময়ের পুরাকীর্তি’ এবং ‘গ্রাম্য গোধিকারা পর্বে এই দূষণ ছড়ানোর বিস্তৃত বিবরণ আছে। আছে বাণীতলা বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যার আর্সেনিক নিয়ে প্রচারাভিযানের কথাও। এ প্রসঙ্গেই এসেছে গ্রামের মানুষের অবর্ণনীয় দারিদ্র্য এবং গ্রাম্য রাজনীতির বাস্তবতা। উপন্যাসের আখ্যানে আর্সেনিকের সংকট লেখক উপস্থাপিত করেছেন এইভাবে-

‘জলের মধ্যে আমরা আর্সেনিকের চার রকমের মূর্তি দেখতে পাই। ১.আর্সেনাইট ২.আর্সেনেট ৩.মিথাইল আর্সেনিক অ্যাসিড ৪.ডাই মিথাইল আর্সেনিকো অ্যাসিড। .... বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পানীয় জলে আর্সেনিকের পরিমাণ অনুমোদন করেছে .০১ মিলিগ্রাম/লিটার অর্থাৎ ১ লিটার জলে ১ মিলিগ্রামের একশ ভাগের একভাগ আর্সেনিকের পরিমাণ থাকলে, তা পান করা যেতে পারে নির্ভাবনায়। ..... গবেষণায় জানা গেছে প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ভূ-স্তর – যা আর্সেনিকপুষ্ট এবং কাদা পলিদ্বারা গঠিত – ভূ-তল থেকে ৭০ এবং ২০০ ফুট গভীরের মধ্যে অবস্থান করছে। এই স্তরটি আমাদের ভাগীরথী-হুগলী নদীর নিম্নাঞ্চল ধরে বাংলাদেশের ওপাশেও ছড়ানো। গবেষকরা জানতে পেরেছেন, গ্রীষ্মের শুখা দিনে সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের বিপুল পরিমাণ ব্যবহারই ঐ স্তরটির মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এলোপাথাড়ি ডিপ এবং স্যালো নলকূপ দিয়ে জল টেনে তুলবার ফলে

ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত – যখন বৃষ্টি হয়না – জলতল অত্যন্ত নিচে নেমে যাওয়ায় পাইরাইট নামে এক ধরণের মিনারেল, আর্সেনিক মিলেমিশে লুকিয়ে থাকে যার মধ্যে, জলতলের শূন্যস্থানে বায়ুর সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিষে পরিণত হয় এবং ছড়িয়ে গিয়ে সমস্ত স্তর আক্রান্ত করে'১

সাধন চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসটিতে দেখিয়েছেন, গাজন ও পাঁচপোতা অঞ্চলের মানুষ ৭ মিলিগ্রামের বেশি মাত্রার জল পান করে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি বিজ্ঞানমঞ্চের আর্সেনিক দূষণ নিয়ে সক্রিয়তা স্থানীয় রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দেয়। সরকারী ও বেসরকারি দুই দলই এর থেকে ফায়দা তোলার চেষ্টা করে। এসবের মাঝে কালীয় রূপ আর্সেনিক আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানব্রতীদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রামপ্রসাদ আর্সেনিকের বিষের শিকার হয়। এরপর সর্দার পাড়ার শ্যামা হালদার বলি হয়, অন্নপূর্ণাও অকালে মারা যায়। এরই মধ্যে সরকারের সঙ্গে জাপানের চুক্তি অনুসারে যমুনার জল পরিশুদ্ধ করে পাইপে টেনে অঞ্চলের জনগণের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য পাইপ বসে কিন্তু সেখানেও পড়ে রাজনীতির থাবা। তাই রবিদাস পাড়া, গাজন এবং সর্দার পাড়ায় পাইপ ঢোকে না। এই মানবকেন্দ্রিক বাস্তব আখ্যানের পাশাপাশি সন্নিবেশিত হয়েছে কালীয়দহ সংক্রান্ত মিথ কাহিনি। মিথ এখানে নিয়ন্ত্রক হিসেবে দেখা দিয়েছে। মিথ-পুরাণ যেকোনো দেশ বা জাতির শেকড়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর তাই আমাদের স্মৃতিতে, মননে, হৃদয়ে তা সঞ্চারিত অনায়াস গতিতে, নীরব স্বাচ্ছন্দ্যে। হৃদয়ের গভীরে সঞ্চারিত বলেই মিথ এখনও আধুনিক পাঠকৃতির বিষয় হয়ে ওঠে। বর্তমানকে বুঝে নিতে, উত্তরাধুনিক সমস্যাকে ব্যাখ্যা করতে, তার রসসন্দর্ভ নির্মাণ করতে বর্তমানের সাহিত্য রচয়িতা বারংবার তাই মিথের সাহায্যপ্রার্থী। সাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়ও তাই তাঁর 'জলতিমির' উপন্যাসে বর্তমান সমস্যাকে ব্যাখ্যা করেছেন দেশীয় মিথেরই আশ্রয়ে। উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে এভাবে-

'সর্পদেহী কালীয় যে হলাহল বহন করতো ... তার বিষে সমস্ত হ্রদের জল বিষাক্ত হতে থাকলো। ক্রমে কালিদহের জল হয়ে উঠলো কৃষ্ণবরণ, গরল-আঁধার। কালিদহের চারপাশে ছিল কিছু জনপদ। নিষাদ, ধীবর, গঙ্গতা, দুসাদ, মুচি বাস করত। এইসব পরিবারে অবাধ যাতায়াতে কৃষ্ণ টের পেলেন এদের হাত-পা, মুখমণ্ডলে কালো ছোপ-ছোপ, চোখের কোলে ক্লান্তি। তিনি অবশ্য টের পাননি, দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোও- ফুসফুস, লিভার, কিডনি- ক্রমান্বয়ে নিঃশব্দে ধসতে শুরু করেছে। জানতে পারলেন না বারোমাস এরা সর্দি-শ্লেষ্মা, অজীর্ণ-আমাশয়ের দাপটে নিস্তেজ। মাঝেমাঝেই

কাশিতে রক্ত ওঠে এবং হঠাৎই যায় মরে। অঞ্চলের গড় আয়ু অত্যন্ত কম। এ অঞ্চলে পানীয় জলের অন্য কোনও উৎস নেই। ধীবর, নিষাদ কিংবা দুসাদরা বারোমাস বছরের পর বছর এই হ্রদের জল পান করতে বাধ্য। অঞ্চলটি নগর থেকে বহুদূরে, তাই পয়ঃপ্রণালী, শৌচাগার বা অন্যান্য স্বাস্থ্যসম্মত বিধি কিছু নেই। চাষবাস, গবাদিপশুর চান, মানুষের ঘরের কাজ, রান্নাবান্না, বাসনমাজা, পিপাসার জল- সবই কালিদহের হ্রদে। মূল উৎসে বিশেষ কেউ আসেনা। ভয় পায়, সেখানে দীর্ঘকালের ভোগদখলের ফলে কালীয়র একছত্র অধিকার। তার পছন্দ নয় দ্বিতীয় কেউ এর সীমানায় প্রবেশ করুক'২

আমরা মহাভারতে দেখেছি কৃষ্ণ কালিয়নাগকে শাস্তি দিয়ে সকল মানুষকে বিপদমুক্ত করেছিলেন কিন্তু একালের কালিয়নাগের বিষ থেকে কারোর রক্ষা নেই। আলোচ্য উপন্যাসে তাই আর্সেনিক দূষণ জয়যুক্ত হল। আধুনিক কৃষ্ণের দল (বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরা) শত চেষ্টাতেও আর্সেনিক সমস্যার সমাধান করতে পারলেন না। ফলত রামপ্রসাদের মতো সাধারণ ঘরের মেয়ে অন্নপূর্ণাও আর্সেনিকের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করে। পুরাণের ঘটনা বা মিথকে ব্যবহার করে এই নতুন তাৎপর্যে নতুন বিশ্ব গড়ার এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে লেখকের ভাবনার স্বাতন্ত্র্যকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে পরিবেশবাদী 'জলতিমির' নিশ্চিতভাবেই ল্যান্ডমার্কের সম্মান পাবে। আর্সেনিক দূষণ যে কতটা ভয়াবহ তা সাধারণ মানুষ ততটা জানে না। জানে না বলেই ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গুর মতো আর্সেনিক নিয়ে তাদের ভাবনা বা দুর্ভাবনা তেমন চোখে পড়ে না। তাই জনপ্রতিনিধি থেকে সরকার, প্রশাসন একে উপেক্ষার নজরে দেখে। আমরা জানি ২০০০ সালে মালদহে বেশ কয়েকজন আর্সেনিকের বলি হয়। ওই বছরই বেহালায় আর্সেনিক থাবা বসায়। একটি সমীক্ষায় জানা গেছে বালি থেকে বাঁশবেড়িয়া আর্সেনিক প্রবণ অঞ্চল। ডানকুনির একটা বড় অংশের মানুষকে জলের বোতলের পেছনে যে এত অর্থ প্রতিদিন খরচ করতে হয় তার কারণ আর্সেনিক। আর্সেনিক আক্রান্ত একদিনে মরে না। ধীর এর বিষক্রিয়া। প্রতিদিন বাড়তে থাকে এর বিষক্রিয়ার মাত্রা। একসময় ভূ-গর্ভস্থ এই বিষ সেই আক্রান্তের প্রাণ হরণ করে। গোটাটাই দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া। এই ভয়ঙ্কর দূষণই সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'জলতিমির' উপন্যাসের প্রকৃত কেন্দ্রীয় চরিত্র বা protagonist character।

'বিন্দু থেকে বৃত্তে' উপন্যাসটির মূল উপজীব্য বিষয় হল বিভিন্ন ক্ষমতাতন্ত্রকে বশীভূত করে লগ্নিপুঁজির ধ্বজাধারীদের পরিবেশ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে

পরিবেশ সচেতন জনৈক ব্যক্তিমানুষের প্রতিবাদ এবং তার পরিণাম। উপন্যাসটির ক্ষুদ্র বৃত্তে উপস্থাপিত হয়েছে সাম্প্রতিক পশ্চিমবাংলার এক নগ্ন বাস্তবতা। তবে শুধু পশ্চিমবাংলা নয় কখনও কখনও মনে হয় উপন্যাসটি গোটা তৃতীয় বিশ্বের নগ্ন বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গে লগ্নিপুঁজির সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্রের মিত্রতার সম্পর্ক বাম শাসনকালের মধ্য লগ্নে এক অন্য মাত্রা পায়। বড় শিল্পপতিদের টেনে আনতে গিয়ে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে সাধারণের স্বার্থ এবং পরিবেশের স্বার্থ। সেইসঙ্গে যুক্ত হয় অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র ব্যবসাদারদের সঙ্গে সরকারি দল, পুলিস-প্রশাসনের মাখামাখি। ফলত আমারা দেখতে পাই পরিবেশ আইনকে তুচ্ছ করে জলাভূমি ভরাট, যথেচ্ছভাবে জমির চরিত্র বদল। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই কপালে জোটে তীব্র অবজ্ঞা ও উপেক্ষা। আসলে অর্থ যেখানে সব, পরিবেশ সেখানে যে তুচ্ছ তার উদাহরণ আমাদের চারপাশে সর্বত্র দৃশ্যমান। উন্নয়নের রথচক্রে বিনষ্ট হচ্ছে অরণ্য। উন্নয়নের নামে 'তিন ফসলি' জমি গ্রাস করতেও সরকারের বাঁধছে না। বস্তার থেকে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম সর্বত্রই এই প্রবণতার বিস্তার। হাতে অর্থ থাকলে লোকালয়ে পরিবেশের বারোটা বাজিয়ে এরাজ্যে কারখানা অবলীলায় তৈরি হয়ে যায় এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেও বিশেষ লাভ হয় না। পৌরসভা, পুলিশ-প্রশাসন, পরিবেশ-দপ্তর সবাই রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতের পুতুল। 'বিন্দু থেকে বৃত্তে' উপন্যাসে সুধাময় নামে এক পরিবেশ সচেতন মানুষকে সামনে রেখে এই বাস্তবতাকেই লেখক তুলে এনেছেন ঐতিহাসিক নিষ্ঠায় বা বলা যেতে পারে উপন্যাসটি এক পরিবেশ সচেতন মানুষের একক নিঃসঙ্গ সংগ্রামের কাহিনি। উপন্যাসের আখ্যান সংহত হয়েছে স্বয়ং কথক এবং প্রতিবেশী নিখিলানন্দ ও তার পুত্র নিন্তুর বিবাদকে কেন্দ্র করে। তাদের বিবাদের কারণ জমিতে নির্মীয়মাণ কারখানা। নিখিলানন্দের দিক থেকে এই বিষাদের উৎসমূল তার বা তাদের ব্যক্তিস্বার্থ, অন্যদিকে কথকের দিক থেকে এই বিবাদের কারণ পরার্থপরতা। কারখানা লোকালয়ে নির্মিত হলে শব্দদূষণ হবে, জল দূষিত হবে- এই ভাবনাই তাঁকে আত্মকেন্দ্রিকতার বিন্দুবৃত্ত থেকে বৃহৎ পরিসরে টেনে আনে। তবে এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে সুধাময়কে প্রতিপদে প্রশাসনিক উদাসীনতা, ষড়যন্ত্র, এমনকি হেনস্থার মুখোমুখি হতে হয়। পুলিশ প্রশাসন এবং আইন ভঙ্গকারীদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে অশুভ আঁতাত আমরা প্রত্যক্ষ করি তারই মুখোমুখি হয় সুধাময়। এমনকি পরিবেশ দূষণ বোর্ডের কর্তা ব্যক্তিরাও নিন্তুদের হয়ে কথা বলে। অর্থনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্রই যে সবকিছুর নিয়ন্ত্রক তা এখানে আরেকবার স্পষ্ট হয়ে যায়। ভুলক্রমে স্থানীয় পৌরসভার

চেয়ারম্যানকে চটিয়ে নিন্তুরা বিপদে পড়ে। চেয়ারম্যানের সাহায্য পেয়ে সুধাময় নতুন করে লড়াই শুরু করে। এতে ফলও মেলে কিন্তু আসে নতুন আপদ- অবাঙালি ব্যবসায়ী নামধারী মাফিয়া। তারা বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে যায় এবং এর কিছু পূর্বেই মাফিয়ারা সুধাময়ের দাদাকে খুন করে। এরই যৌথ প্রতিক্রিয়ায় সুধাময়কে আতঙ্ক ঘিরে ধরে। তবে আতঙ্ক, অবসাদ শেষ কথা বলে না। সুধাময় দুরন্ত সাহসে বুকবেঁধে উঠে দাঁড়ায়। তাঁর আত্মশক্তির নির্ভীক উদঘাটনেই লেখক আখ্যানের সমাপ্তি টেনেছেন। উপন্যাসটি এককথায় পরিবেশ চেতনার মহতী আখ্যান।

সাধন চট্টোপাধ্যায় ‘শেষ রাতের শেয়াল’ উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছেন পুঁজিবাদী সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ঐতিহ্য, নিজস্ব সংস্কৃতি সমস্ত কিছু ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। উন্নয়নের নামে নদী গ্রাস করে সভ্যতার সর্বভুক ফণা। আর এই বাস্তবতাকে পূর্ণাঙ্গ রুপ দিতে উপস্থাপিত করেন ফ্যান্টাসি। যেখানে বেঁচে থাকা মানুষ ও মৃত মানুষের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না। আর সেজন্যই বাস্তবের সোনাই নদী আজকে ‘Unreal’। কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র তরুবালার জবানীতে গোটা ঘটনা বিবৃত হয়েছে। গ্রীনবেঞ্চে সোনাই নদীর একদা অস্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত হওয়া জনস্বার্থ মামলার প্রসঙ্গ দিয়ে কাহিনির সূচনা। তরুবালার কথা থেকেই জানা যায় জনৈক ভাস্কর নাইয়া তাঁর মনে প্রোথিত করেছিলো এককালের পরিচিত নদী সোনাই-এর পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন।

‘সেই নদীটির নাম সোনাই। ভাস্কর নাইয়া যে-নদীটি খুঁজে পুনরুদ্ধারের গোপন মন্ত্রণা দিয়ে গেছিল, তার নাম সোনাই। পুনরুদ্ধার কেনো? প্রশ্ন শুনে ও বলেছিল, যা ছিল, যা এখন নেই, তা খুঁজে পাওয়াই পুনরুদ্ধার!’৩

অন্তর্গত রক্তে সঞ্চারিত সেই স্বপ্নকে সাকার করতে ওঁরাও জনগোষ্ঠীর Cultivated তরুণী তরুবালা সোনাই নদী পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে মামলা শুরু করে। ভাস্কর নাইয়া মিথ্যে মামলায় আড়াই বছর ধরে জেলে রয়েছে। আর তরুবালা সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা, হুমকি অতিক্রম করে তার গতি অব্যাহত। নদী বাঁচানোর জন্য তরুবালার এই মামলা আন্দোলন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বাস্তব বিষয়। এই বাস্তবতার ভিতেই লেখক গড়ে তোলেন এক তথাকথিত Unreal আখ্যান। একদা নদীর কতটা কে কীভাবে দখল করে রেখেছে তা দেখতে বেরিয়ে পড়ে তরুবালা। তার এই যাত্রার সূত্র ধরেই Unreal আখ্যানের জন্ম হয়। পথে বেড়িয়ে তার সঙ্গে প্রথমে দেখা হয় সুন্দর কুণ্ডুর এবং তারপরে দেখা হয় ফণীবাবুর সঙ্গে। তারা তরুবালাকে জানায় হারিয়ে যাওয়া নদী সোনাই কোনো রুপকথার গল্প নয়। এককালে সে সত্যি সত্যিই ছিল। পথ

চলতে চলতে চলতে এই কথোপকথন চলতেই থাকে, পথচারীর সংখ্যাও বাড়ে এবং আসে শৈল, মাধব। চলতে থাকে কথোপকথন। এই কথোপকথনের মাঝে ফণীবাবু হঠাৎ একটি সরু গলি ধরে মিলিয়ে যান। মাটির পথ হঠাৎই বরফের পথে রূপান্তরিত হয়। সে পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে যায় শৈল। পরে ঠিক একইভাবে মিলিয়ে গেলেন সুন্দর কুণ্ড এবং মাধব। চলতে চলতে তরুবালা নিজের বাড়ির গলির মধ্যে এসে পড়ে। এতক্ষণ সে যেন ঘোরের মধ্যে ছিল। এইমাত্র বাস্তবে ফিরে আসে। তার মনে পড়ে সুন্দরবাবু বলছিলেন বাস না চলার কথা অথচ বাস্তবে বাস চলছে। তরুবালার এসব দেখে মানসিক স্থিতি বিপন্ন হয় এবং সুন্দরবাবু বহুদিন পূর্বেই মারা গেছে এই সত্য জানার পর তার মানসিক স্থিতি আরও বিপন্নতায় পড়ে। তার মনে হতে থাকে সাবাই 'মৃত'। একসময় গ্রীনবেঞ্চে মামলা উঠলে তরুবালা তার অঞ্চলে পূর্বে অবস্থিত  দরগার প্রমাণ দিতে না পারায় বিচারক নদী উদ্ধারের পুনরায় রায় দান স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। লক্ষণীয়, লেখক 'অতীত' বলে কোনো স্থির অচল অটল ধারণায় বিশ্বাসী নন। তাঁর কথায়-

'আজকে যা অতীত তা একসময় বাস্তব ছিল। আজ সেকাল বা সেকালের মানুষগুলি হয়তো আর নেই, কিন্তু আছে তাদের অশরীরী অস্তিত্ব- স্মৃতিতে, কর্মপ্রবাহে কিংবা ভবিষ্যতের, বর্তমানের অন্তর্গত রক্তে'৪

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের এই বিশিষ্ট জীবনবোধ উপন্যাসটির পরিণতিতে ভাষা পেয়েছে। ফলে নদীটি নেই কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জনপদ রয়ে গেছে। রয়ে গেছে তার রেশ সেই জনপদের মানুষের স্মৃতিতে, সংস্কৃতিতে। একইভাবে সুন্দর কুণ্ডু, ফণীবাবু, মাধব, শৈল, আজ মৃত হলেও একদা তারা এই পৃথিবীর নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠা জনপদেরই বাসিন্দা ছিল। তাই বাস্তবে নয় স্মৃতির সরণি বেয়ে তারা নেমে আসে মাটির পৃথিবীতে। এইভাবে নদী ও এই মানুষগুলি একই ভূমিতে এসে যায়। ম্যাজিক্যাল উপাদান ও রিয়েলের মেলবন্ধনের মুন্সিয়ানায় লেখক তাঁর পাঠকৃতিটিকে তাৎক্ষণিক সময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে শাশ্বত জগতের ছাড়পত্রও বোধহয় এনে দেয়। আসলে সাধন চট্টোপাধ্যায় ঘোষিতভাবেই পুঁজিবাদী সভ্যতা, কর্পোরেট কালচার ও ব্যবসায়িক আগ্রাসনের বিরোধী। ফলে এই উপন্যাসটিও কর্পোরেট পুঁজিবাদী কালচারের বিরুদ্ধে তোলা একটি স্পষ্ট তর্জনীপাত। আজকের দিনে কর্পোরেট লগ্নিপুঁজি তার সুবিধার্থে সব কিছু মুছে দিতে চায়- স্বতন্ত্র সমাজ, সংস্কৃতি। এখানেই লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ। আর এই প্রবণতা রুখতেই তিনি বারংবার শিকড় সন্ধানী,

এখানেও সেই সন্ধান আব্যাহত নিরঙ্কুশ বলিষ্ঠতায়। জাদুবাস্তবতার মায়াবী আলো সেই উদ্দেশ্যকে আড়াল করে না বরং তাকে আরও স্পষ্টতা দেয়।

সাধন চট্টোপাধ্যায় রচিত আলোচ্য উপন্যাস তিনটি শুধু পরিবেশ সচেতনতা আনার লক্ষ্যেই রচিত হয়নি। আসলে লেখক পরিবেশ দূষণের পশ্চাতে ক্ষমতার কুটিল খেলার নগ্ন রূপটি সকলের সামনে আনতে চেয়েছেন। এদেশের রাজনৈতিক দল থেকে সরকার, পুলিশ-প্রশাসন সকলেই যে পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে অসচেতন, তাদের কাছে ক্ষমতাটাই যে বড়- এই সত্যকে তিনি তাঁর আখ্যান চর্চায় তুলে ধরতে চেয়েছেন। ক্ষমতাকেন্দ্রের কুশীলবদের হীনমনোবৃত্তি কালীয়নাগের মতো দূষণের ভয়ঙ্কর সাপটিকে অবাধে বাড়তে দেয় নিজ স্বার্থে। আর তার বলি হয় বারংবার সাধারণ মানুষ। এই সত্যও সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে জীবন্ত। পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে লেখক লড়ার ডাক দিয়েছেন। দেখিয়েছেন অসমযুদ্ধ জয়ের স্বপ্ন। আর সেজন্যই 'বিন্দু থেকে বৃত্তে' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হার মানে না। সব হারিয়ে, মানসিকভাবে ধ্বস্ত হয়েও যুদ্ধ জিততে সংকল্পবদ্ধ হয়। তার এই মানসিকতাই লেখকের মানসিকতাকে চিনিয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায় সাধন- উপন্যাস সমগ্র-১, প্রথম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ, ১৪১৮, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৯৬-৩৯৭ ।

২. প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৪৭-৩৪৮ ।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ- ২১৫ ।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ-২৪৫ ।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. মজুমদার অরুণ- বাংলা উপন্যাসের রুপ ও রীতির পালাবদল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি-২০১১ ।

২. দাস অরুপকুমার- ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, অক্টোবর-২০১২ ।

৩. দাস সঞ্জীব- সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস, ক্ষমতার অন্তঃস্বর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, অক্টোবর, ২০১৯।

# মানদা দেবীর 'শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত' : প্রসঙ্গ পতিতা নারীর চোখে নারী বিশ্বের অন্তর্মুখী চিত্রায়ণ

মানিক মৈত্র
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সমাজ ও জীবনের ইতিহাস প্রাচীন। সমাজ ব্যবস্থার সমস্ত উদ্যোগ ও সৃষ্টির মূলে প্রধান ভূমিকা রয়েছে নারী ও পুরুষের। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের সামাজিক ব্যবস্থায় প্রাচীনকাল থেকেই পুরুষ তার যোগ্য স্থান পেলেও নারী তার প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার কোনদিনই পায়নি। তারা নানাবিধ সামাজিক অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের শিকার হয়েছে। শুধুমাত্র শিকার হয়েছে বললে ভুল বলা হবে, বর্তমান সময়েও প্রত্যেকদিন খবরের কাগজে চোখ রাখলেই দেখতে পাওয়া যায় নানারকম নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, বধূ হত্যা, পণের দাবীতে শ্বাসরোধ করে স্ত্রী হত্যা, অর্থের লোভে নিজের স্ত্রী কন্যাকে পণ্য স্বরূপ বিক্রি করে দেওয়ার মত নানান ঘটনা। এই সমস্ত ঘটনার পেছনে শুধুমাত্র পুরুষ সমাজ দায়ী – তা নয়, এর পেছনে নারী সমাজের অবদান রয়েছে। অর্থাৎ একদিক থেকে বলতে গেলে বলতে হয় নারীই নারীর শত্রু। এরকম অনেক ঘটনাই দেখতে পাওয়া যায়, নারীই অন্য নারীকে বিপথে চালিত করছে। তবে এরকম ঘটনা নিতান্তই কম। অধিকাংশই পুরুষরা নারীকে নানা প্রলভন দেখিয়ে ধর্ষণ করা, বিক্রি করে দেওয়ার মত ঘটনাই আমরা পাই।

উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাত ধরে নারীর যে অগ্রগতির অধ্যায় সূচিত হয়েছিল তার চূড়ান্ত পরিণতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের সুচনায়। এই সময়ে ঠাকুর বাড়ির অবদান (বিশেষত নারী শিক্ষায়), বাহ্ম সমাজের অবদান বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্কুল-কলেজের সঙ্গে যুক্ত হওয়া থেকে শুরু করে নানাবিধ সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম, সংগঠন, সাহিত্য রচনা, স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ ইত্যাদি সর্ব ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সময়কার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য – স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায়, কমলা চ্যাটার্জী, বিমল প্রতিভা দেবী, পারুল মুখার্জী, জ্যোতিকণা দত্ত, শ্রীমতী মানদা দেবী প্রমুখ। উপরিউক্ত নামগুলির মধ্যে সাহিত্যিক, বিপ্লবী এবং পতিতা উভয় শ্রেণীর মহিলার নামই রয়েছে।

সকলেই উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে শুরু করে বিশ শতকের সূচনাকালের মধ্য জীবন অতিবাহিত করেছেন। সকলেই নারীর দুর্গতি, দূর্দশা, অন্যায়-অত্যাচারকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন। সর্বোপরি বলা যায়, নারী হয়ে নারীর জীবনের কঠিন পথচলা, অনেক বাধা-বিপত্তিকে সামনে থেকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তাঁরা। তাদের একজন বিশ শতকের সূচনার দিকে লেখাপড়া জানা শিক্ষিতা নারী কিন্তু পতিতা, যাঁর নাম মানদা দেবী। তারই নিজের হাতে লেখা 'শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত' এখানে আলোচ্য। গ্রন্থটি অবলম্বনে সমকালীন সময় ও সমাজ প্রেক্ষাপটে একজন নারীর দৃষ্টিতে নারী সমাজের নারীর অবস্থানকে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

মানদা দেবী রচিত ' শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার থেকে ১৩৩৬ আশ্বিন (প্রথম সংস্করণ) বঙ্গাব্দে। উল্লেখ্যে এই বঙ্গাব্দে গ্রন্থটির চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং পরে ক্রমশ হিন্দি ও ইংরাজী সংস্করণও বের হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই গ্রন্থটির খ্যাতি এবং সমকালীন চাহিদা নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকা উচিত নয়। গ্রন্থটিতে সমকালের নানা ঘটনার পাশাপাশি, নারীদের কি করে পাপের পথে ঠেলে দেওয়া হত, নানা রকম লোভ ও প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে পতিতা পল্লীতে বেঁচে দেওয়া হত ; সর্বোপরি এক নারীর চোখ দিয়ে নারীর লেখনি দ্বারা উপলব্ধি করতে পারবো। গ্রন্থটির উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সর্ম্পকে লেখিকা নিজেই বলেছেন –

> "আমার জীবন মোটেই মহৎ নহে, অধিকন্তু ঠিক তাহার বিপরীত ; কিন্তু পুস্তকের উদ্দেশ্য মহৎ। আমি পাপি, কলঙ্কিনী, যশের প্রার্থী নহি – সুতরাং আমার জীবনের খাঁটি কথাগুলি আমি যেমন অকপটে বলিতে পারিব, কোন মহৎই তাঁহার জীবনের ঘটনা তেমন অকপটে বলেন নাই। বলিতে পারেন না। পাপের স্বরূপ চিনিয়া রাখা প্রয়োজন। পাপ জিনিসটা যে কি কৈশোরে তাহা বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই আজ আমি – আমি কেন – আমার মত সহস্র সহস্র নারী পতিতা।"[১]

গ্রন্থটিতে মানদা দেবী সমাজে সাধু বেশ ধারী কিছু পাপীর যেমন পর্দাফাঁস করেছেন তেমনি আবার পতিতা নারী মাত্রেই খারাপ তারা কোন কাজে লাগে না, লাগতে পারে না – এই ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। বলা যায়, দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত থেকে মানদা দেবী

দেখিয়ে দিয়েছেন পতিতা নারীরাও সমাজ গঠনে, দেশ গঠনে অন্যান্যদের মতই ভূমিকা পালন করতে পারে। এপ্রসঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন অংশ থেকে একটি মন্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে -

> "নারী সম্বন্ধে পুরুষের নানা প্রকার হীন ধারণার জন্যই নারী আজ বিশ্বে সমানাধিকার দাবী না করিয়া পারিতেছেন না। যদি তাঁহারা কেবল ইহাই ভাবিয়া থাকেন যে – পতিতার কি বই লিখিবার ক্ষমতা আছে – ইহার উত্তরে বলা যায় যাইতে পারে যে – পতিতগণ যদি বই লিখিতে বা পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারেন তবে পতিতাগণ পারিবে না কেন?"[২]

অংশটুকু উল্লেখ করার দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত – গ্রন্থ রচনায় লেখিকার আত্মবিশ্বাস, দ্বিতীয়ত – বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে শুধুমাত্র পুরুষের পাশাপাশি নারী যে সমান অধিকার করে রয়েছে যে কোন মহৎ কর্মে, তা নয়, সমাজের মূলস্রোত বর্হিভূত পতিতা নারীরাও যে নিজের দ্বারা সমাজের কিছু মঙ্গল সাধন করতে পারে তার ঈঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়।

'শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত' মোট ১১টি অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থটিতে লেখিকা নিজের জীবনের বাল্যকাল থেকে শুরু করে পতিতা জীবনের শেষ পর্যন্ত সূক্ষাতিসূক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথম অধ্যায়ে বাল্যকালের বেশ কিছু ঘটনা বেথুন স্কুলে পড়াশোনা করা, মাতৃহারা হওয়া, গান শেখা, স্বদেশী সভায় যাওয়া থেকে শুরু করে পিতার দ্বিতীয় বিবাহ সবই তিনি করেছেন এবং দেখেছেন। তারপরেই কৈশোর বয়সে পড়াশোনার কারণে তার সঙ্গে পরিচয় হল এক নতুন মাস্টার মশায়ের। এদিকে ঘরে বিমাতা তার থেকে মাত্র এক বছরের ছোট হওয়ার তার (মানদা) মনেও ক্রমেই বিবাহের প্রতি নানান আকাঙ্ক্ষা দেখা দিতে লাগল। সেই সূত্রে মাস্টার মশায়ের সঙ্গে অল্প অল্প করে মানসিকভাবে মানদা জড়িয়ে পরতে লাগল। তারপর একটা সময় নানা অছিলায় মাস্টার তাদের বাড়িতে আসতে লাগল এমনকি মানদাও তাকে মানসিকভাবে জড়িয়ে ধরতে লাগল। তারপরেই তৃতীয় অধ্যায়ে পাই পলায়ন। তথা মাস্টার চাকরির ছুটির নাম করে মানদাকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা করল। এখানে একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। মানদা প্রথম যৌবনে প্রবেশ করেই বাড়িতে দুই যুবক পুরুষকে দেখল – একজন দাদা মুকুল আরেকজন রমেশদা (মাস্টার মশায়)। বাড়িতে নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা করার কারণে তার (মানদার) যৌবনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও উত্তেজনা

দাদাকে ছেড়ে মাস্টার রমেশদার দিকে বাক নিয়েছে। এছাড়াও প্রেমের নানা রিয়ালিস্টিক আলোচনা তাদের পরিবারে ছিল, ছিল না শুধু একটু কড়া শাসন। তাই পরবর্তী জীবনে মানদা দেবী আক্ষেপ করে লিখেছেন ---

> " আজ মনে হয়, আমার মা বাঁচিয়া থকিলে হয়তো এ-পথে আসিতাম না। আমার বাবা যদি একদিনও একটু আদর করে আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেন, অথবা শাসন করিতেন তবে বোধ হয় এ জীবনের গতি ফিরিয়া যাইত।"[৩]

'ভুল-ভাঙ্গিল' নামক চতুর্থ অধ্যায়ে মানদা দেবী নিজের জীবন অভিজ্ঞতা দ্বারা খুব সুন্দর ভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন কিসের বশবর্তী হয়ে তিনি ভুল করেছেন এবং সেই ভুলকে জীবন থেকে সরানোর পথও তিনি সূচনাতেই বলেছেন। মানদা দেবী নির্দ্ধিধায় স্বীকার করেছেন প্রবৃত্তির উত্তেজনায় মোহাচ্ছন্ন ও হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়েই সে বাড়ি ছেড়ে ছিল। এই উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কেবলমাত্র তৎকালীন সময়ে নয় বর্তমান সময়েও প্রতিদিন খবরের কাগজে চোখ রাখলেই দেখা যায় নানান ঘটনা। তাই তিনি সমালোচনা করে বলেছেন ---

> "আমাদের সমাজে বর্ত্তমান সময়ে সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গরই অভাব। তাহার ফলে তরূণ হৃদয়ে অকালে যৌবন সম্মেলনের উদ্যাম কামনা জাগ্রত হইয়া উঠে।"[৪]

আবার তিনিই ছেলে-মেয়েদের সর্বদা সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গ-এ রাখার মধ্য দিয়ে যৌবন চাঞ্চল্যকে বাধা দেওয়ার কথা বলেছেন। এই অধ্যায়ে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় – বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার যে অন্তর্সার শূণ্যতা এবং গল্প উপন্যাস পাঠে যে কেবল কল্পনার বাড়াবাড়ি তা যে বাস্তবতা বর্জিত – বিষয়টি লেখিকা খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখিকার কথায় ---

> "দুই একটা দাঁত উঠিলেই যদি শিশুকে মাছ খাইতে দেওয়া যায়, তবে সে যেমন গলায় কাঁটা বিধিয়া মৃত্যুর মুখে পতিত হয় ; থিয়েটার দেখায় ও নভেল পাঠেও দেশের তরুণ-তরুণীদের সেই মরণদশা ঘটিতেছে।"[৫]

এখানে লেখিকার আরেকটি জীবন অভিজ্ঞতা বর্তমান সময়ের যুব সমাজকে সঠিক পথে চালনা করতে, সহায়তা করতে পারে বলে না উল্লেখ করে পারলাম না ; এমনকি প্রতিদিনের ঘটে চলা বিপদ থেকেও তাদের রক্ষা করতে পারে ---

> "আজ মনে হয়, আমি যদি উপযুক্ত অভিভাবকের অধীন থাকিতাম, তবে আমার ভাল হইত। স্বাধীনতার মধ্যেও যে পরাধীনতার প্রয়োজন আছে, তাহা এখন বুঝিয়াছি।"[৬]

এরপরে এই অধ্যায়ে মানদা আর রমেশের সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ বর্ণিত হয়েছে। মানদা জানতে পারে রমেশ আড়াই হাজার (২,৫০০) টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছে। প্রথমে তারা দিল্লি পৌঁছয়। সেখান থেকে ক্রমে পুলিশের ভয় আরো নানা কারণে পর্যায়ক্রমে লাহোর, অমৃতসর, কাশ্মীর, বোম্বাই, নাগপুর, ভিজাগাপত্তন, ওয়ালটেয়ার, পুরী, কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা, মথুরা পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছে। এই অধ্যায়েই ক্রমে তাদের আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হওয়ার পরিস্থিতি এলে মানদা রমেশের প্রকৃত মূর্তিটি দেখতে পেল। এছাড়া মানদা এক চিঠি মারফত জানতে পারলো, রমেশ যে অফিসে চাকরি করত সেখান থেকে তিন হাজার টাকা নিয়ে সে পালিয়েছে। ক্রমে মানদার সম্মুখে রমেশের লম্পট, চোর, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতকের রূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম 'পাপের পথে'। অধ্যায়ের নাম এবং পূর্ব পরিচ্ছেদের কাহিনী অনুসরণে খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, মানদার জীবনের গতিমুখ ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছে। অধ্যায়ের সূচনাতেই দেখি রমেশ এবং মানদা ভীষণ কষ্টে দিনযাপন করছে। মানদার দাদা মুকুল তাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছে, তার মধ্যেও আটাশ টাকা রমেশ মদ খেয়ে উড়িয়েছে। অর্থাৎ জীবনে চরম ব্যভিচার নেমে এসেছে তাদের। মানদা রমেশকে কোন কাজে কোন রকম বাধা দিলে চরম বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় মানদা গর্ভবতী হয়ে পড়ায় সমস্যা আরো চরমে উঠেছে। যে কদিন মানদার গায়ে গয়না ছিলো, ততদিন তা বিক্রি করে রমেশ মদ খেয়েছে। তারপরে সেই গর্ভাবস্থায় মানদাকে এই বিপুল সংসার সাগরে ভিন রাজ্যে ফেলে রেখে চলেগেছে। এরপরে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা তার উপর দিয়ে গেলে মানদা একটি মৃত সন্তান প্রসব করে পুণঃরায় এক যুবকের প্রেমে পড়েন এবং তাকে প্রেম পত্র লেখেন। তারপরে যে আশ্রমে তার আশ্রয় হয়েছিল সেখান থেকে তাকে কলকাতায় প্রেরণ করে দেওয়া হয়। যেখানে তার জীবন আরো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তবে এই অংশে লেখিকা স্বল্প উত্তেজনার বশে অবৈধ প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে যারা কু-পথে আসে তাদের জীবন অভিজ্ঞতা বর্ণনার মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রজন্মকে হয়তো সতর্ক করতে চাইছেন। নিজের জীবনের সেই অভিজ্ঞতার কথাকে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তিনি বর্ণনা করতে চেয়েছেন এভাবে ---

> "অবৈধ প্রেম উত্তেজনার বশেই জন্মে। উত্তেজনা মাত্রেই ক্ষণস্থায়ী ও তাহা কদাচ বিচার বুদ্ধি প্রসূত নহে। সুতরাং যে প্রেম অল্পেতেই জন্মে – তাহা অল্পেতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার অবৈধ প্রেমে মিলিত নারী-পুরুষের বিচ্ছেদের কারণ __ একের বা উভয়েরই দোষ অথবা অবস্থার পীড়ন। অর্থাভাব, গর্ভসঞ্চার, রূপ-বিকৃতি, এই সব হইল অবস্থার পীড়ন। মদ্যপানের অভ্যাস, অপরের প্রতি আসক্তি এই সব হইল নারী পুরুষের দোষ।"[৭]

এভাবে তিনি তার জীবন অভিজ্ঞতার দ্বারা আমাদের সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন। তিনি বারে বারে অবৈধ প্রেম নিয়ে নানা মন্তব্য করেছেন ; যা নিঃসন্দেহে জীবনের সতর্ক বাণী রূপে গ্রহণ করা যায়। মানদা দেবী তার এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত এমনিই একটি বাক্য হল --- 'অবৈধ প্রেমে যেমন মিলনের স্বাধীনতা আছে --- তেমনি বিচ্ছেদের স্বাধীনতাও আছে।'

ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে মানদার জীবনের নতুন গতিমুখ চোখে পড়ল। কলকাতায় যে আশ্রমে এনে তাকে রাখা হয়েছিল সেখানে সমবয়সী দু-জন নারীর সঙ্গে তার পরিচয় হল --- রাজবালা ও কালীদাসী। আশ্চর্যের বিষয়, সেই আশ্রমে নিযুক্ত পুরুষেরা সেই নারীদের উপর নিজের চাহিদামত শারীরিক অত্যাচার করত। এমতাবস্থায় নারীগণ সেই পুরুষদের বিবাহের প্রস্তাব দিলে পুরুষ সমাজ তাদের থেকে খানিকটা দূরত্ব বজায় রাখতে লাগল। এরপর মানদা দেবী এবং বাকি দু-জন (রাজবালা ও কালীদাসী) আর কোন দিন সেই আশ্রম কর্তৃপক্ষের কুলাঙ্গারদের নিজের ঘরে প্রবেশ করতে দেয়নি। যে কারণে তাদের ওপর নানা রকম অন্যায়-অত্যাচার চলেছে দিনের পর দিন। এর ফলস্বরূপ তারা একটি সিধান্ত নিয়েছে তারা আর এই আশ্রমে থাকবে না। এই সময়কার নিজেদের অবস্থা লক্ষ্য করে মানদা বলেছে ---

> "ভাই যদি রূপ, যৌবন বেঁচতে হয়, তবে লুকিয়ে চোরের মত কেন – একেবারে বাজারে নেমে দর যাচাই করে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করব।"[৮]

উক্তিটির দ্বারা মানদা চরিত্রের বলিষ্ঠতা এবং অমোঘ শক্তি লক্ষ্য করা যায়। এরপরেও তারা আশ্রম থেকে পালিয়ে যেতে পারেনি। শেষে একদিন নানা অছিলায় ব্রাহ্ম সমাজে গিয়ে উপস্থিত হলেন সেখানেও ব্রাহ্ম সমাজের কর্তা হেরম্ব বাবু কর্তৃক বিতারিত হয়ে, মানদার বাল্যবন্ধু কমলার গৃহে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাকে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত

অতরাত্রে সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে রাজবালার পূর্ব পরিচিত এক পতিতালয়ের বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে গিয়ে উঠল। তারপরে সেই পতিতালয়ের বাড়ীওয়ালী তাদের নানা প্রকার বুঝিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করতে সম্মত করালেন। যদিও তাদের কাছে অন্যত্র যাওয়ার মত কোন স্থান ছিল না, তাই তারা বাড়ীওয়ালীর কথায় সম্মত হয়। ভূমিকাতে বলেছিলাম নারীই নারীর শত্রু, প্রসঙ্গটি এখানে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। রাজবালা, কালীদাসী ও মানদা বিপদে পরে সেই বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে এলে বাড়ীওয়ালী স্ত্রী-র উচিত কর্ম ছিল তাদের জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু সামান্য লাভ ও লোভের জন্য সেই মহিলা তা করেনি। বরং তাদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে বেশ্যাবৃত্তির দিকে টেনে এনেছেন। বেশ্যাবৃত্তি প্রসঙ্গে বাড়ীওয়ালীর বিশেষ যুক্তিখানি উল্লেখ্য না করে পারলামনা ----

> "বেশ্যারা স্বাধীন ; ভগবান তাহাদিগকে রূপ দিয়াছেন --- পুরুষকে ভুলাইবার কৌশল দিয়াছেন কিসের জন্য ? --- তাহা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে। উকিল তাহার বুদ্ধি বিক্রয় করে --- পন্ডিত তাহার বিদ্যা বিক্রয় করে --- এমনকি দীক্ষাগুরুও মন্ত্র বিক্রয় করেন ; তবে রূপবতী কেন দেহ বিক্রয় করিবে না ? বিপদ ভয় সকল ব্যবসায়ই আছে। দেশের বড় বড় লোক বেশ্যাদের পায়ে বাঁধা। ধনী লোকদের টাকা বেশ্যাদের ঘরে উঠিয়া আসিয়া পরে। তাহাদের একটা কটাক্ষের মূল্য সহস্র টাকা।"[৯]

বক্তব্যটিতে স্পষ্ট কিরূপে নারীগণকে কু-পথে নিয়ে আসে অপর এক নারী। বর্তমান সময়ের নানান ঘটনাও বিষয়টির সাক্ষ্য দেয়। এরপরে মানদা সামনে বিকল্প পথ না পেয়ে দেহ ব্যবসায় যুক্ত হয়েছে। তবে সমকালীন সমাজ চিত্রের একটি অপূর্ব চিত্র আমরা এখানে পাই। যে বাড়ীওয়ালী তাকে (মানদা) বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়ে গেছে সেই বাড়ীওয়ালীই মানদা যখন বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবেশ করেও মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জর্জ্জরিত হচ্ছিল তখন তাকে চোখে আঙুল দিয়ে বাস্তব সময়কালকে চিনিয়ে দিয়েছিল। যা সেই মহাযুদ্ধের কালে অপরূপ সমাজচিত্র রূপে উঠে এসেছে।

> "মা, এ পথে যখন এসেছ, তখন অনেক নূতন চিত্র তোমার চোখে পরবে। দেখবে সত্যই পিতার সম্মুখে কন্যা বেশ্যাবৃত্তি করছে --- দেখবে সত্যই গর্ভধারিণী মাতা আপন কন্যাকে বেশ্যাবৃত্তি করবার জন্য নিত্য সাজিয়ে গুছিয়ে দিচ্ছে --- দেখবে সত্যই ভ্রাতা, ভগ্নী,

আত্মীয়স্বজন বেশ্যার উপার্জিত অর্থে আত্মপোষণ করছে। পতিতা শুধু আমরা নই --- প্রায় সমস্ত সমাজই অধঃপতিত হয়েছে।”[১০]

গ্রন্থটি পর্যালোচনায় পাঠকবর্গের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বা উপকার হল, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যুব সমাজকে বিপথে যাওয়া থেকে রক্ষা করা পাশাপাশি তৎকালীন সামাজিক জীবন যাত্রা সম্পর্কেও ব্যাপক ধারণা লাভ করা যায়। পরের অধ্যায়টির নামই লেখিকা রেখেছেন ‘সমাজ চিত্র’। সমগ্র অধ্যায়টি জুড়ে খ্যাতনামা বহুলোকের বেশ্যা সংযোগের চিত্র ফুটে উঠেছে। অনেক নামী দামী ডাক্তার, উকিল, ব্যারিস্টার, অধ্যাপক অনেকেই যে গোপনে বেশ্যা সংস্পর্শ রাখে তার একটি বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র এই অধ্যায়ে প্রকাশ পেয়েছে। আরেকটি দিক লক্ষণীয়, মানদা কিন্তু অনেকবারই জীবনের মূলস্রোতে ফিরে যেতে চেয়েছে। কিন্তু বারে বারে তাকে বুঝিয়ে নানা কথা বলে এই কু-পথেই চালনা করেছে বাড়ীওয়ালীদের নারীরা। মানদা এই অধ্যায়েও তাই নিজের জীবন সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন ----

“আমার যে বিদ্যা ছিল, তাহতে আমি কাহারও বাড়ীর ছোট ছেলে, মেয়েদের পড়াইতে পারিতাম, টেলিফোন আফিসে কাজ করিতে পারিতাম --- নার্সের কাজ করিতে --- গান শিখাইতে পারিতাম, কিন্তু এই সকল সৎপথে অর্থ উপার্জন করিবার প্রবৃত্তি এবং সুযোগ কেহ আমাকে দেয় নাই।”[১১]

উক্ত অংশটি থেকে বোঝা যায়, সৎপথে কাজ করবার সদইচ্ছা তার প্রথম থেকেই ছিল। তাইতো বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করেও দেশোদ্ধারের কাজেও তথা স্বদেশী আন্দোলনেও জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। এখানে মানদা দেবী তৎকালীন সমাজ চিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আরেকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিয়েছেন ; সেই সময় বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা যুগান্তর চলছিল। সেটি মানদা দেবী ধরতে পেরেছিলেন। প্রথমেই বলেছি, তিনি যথেষ্ট শিক্ষিতা ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই বাংলা সাহিত্যের অভ্যন্তরে মানসিকতার যে স্তর পরিবর্তনগুলি ঘটে চলেছিল তা তিনি সহজেই অনুমান করতে পারেন। বিশেষ করে কুলটা চরিত্রগুলির বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্রের হাতে যে ক্রম পরিবর্তনগুলি ঘটেচলছিল তা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। তবে কুলটা চরিত্র সম্পর্কে তিনি শরৎচন্দ্র এবং নরেশ সেনগুপ্তের মতামতকে সমর্থন করেছেন। এমনকি তাদের কথা তিনি উদ্ধৃতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

> "বেশ্যারা অসতী হইতে পারে --- কিন্তু তাহারা মনুষ্যত্বের আদর্শে হীন নহে। পতিতা নারীও যখন সরলচিত্ত, ধর্ম্মপ্রাণ, ঈশ্বরভক্ত, দয়াদ্র হৃদয়, দানশীল হইয়া থাকে, তখন তাহারা ঘৃনার পাত্র হইবে কেন ? দোষ সমাজের --- পতিতার নহে।"[১২]

এখানে তার সমকালীন সাহিত্য রুচিবোধ ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় তিনি পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করার পূর্বে বাড়ীওয়ালীর কাছে নারীসুলভ সহায়তা না পেলেও তিনি কিন্তু তার প্রতিবেশী অন্য নারীদের সহায়তা করতে বিন্দু মাত্র সময় নষ্ট করেননি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষ জুড়ে যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৯২০সালের অসহযোগ আন্দোলন তার মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে সেই আন্দোলনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। এই আন্দোলনের প্রভাব এতটাই সুদূর প্রসারি ছিল যে, সমস্ত সমাজের মহিলা-পুরুষ একসঙ্গে এই গুরু দায়িত্বে ঝাপিয়ে পড়েন। মানদা দেবীও কয়েকজন পতিতা নারীকে নিয়ে ছোট্ট একটি দল গঠন করে দেশবন্ধুর কাজে সহায়তা করতে চেষ্টা করলেন। এই কাজে তাদের বাবুগণ পরামর্শ দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করত। যার ফলে পতিতারাও অসহযোগ আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করল। কিন্তু তার ফল যে খুব একটা ভালো হল তা নয়। মানদা দেবী স্বীকার করেছেন, যেহেতু মিথ্যাচার, প্রতারণা, ছলনা, ইন্দ্রিয়পরতা এই সকলই পতিতাদের মূল অস্ত্র ছিল --- তাই এত বড় দেশের কাজে নেমেও তারা তা সহজে বিস্মৃত হতে পারেননি। স্বাভাবিকভাবেই বিপরীত ফল পাওয়া গেল। দলের অভ্যন্তরে যারা কোন দিন নারীর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেনি, তারা ক্রমে বেশ্যাসক্ত হলেন, যারা কোনদিন একটি সিগারেট পর্যন্ত খায়নি তারা বেশ্যাদের কবলে পরে নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। এককথায় মানদা দেবী ব্যাপারটিকে 'শিব গড়িতে বানর' বলেই স্বীকার করেছেন। এমনকি এরকম কার্যে মানদা নিজেও জড়িত ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাস আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু অন্দোলনটির সামাজিক দিকটিকে অনেক বেশি উজার করে দিয়েছে মানদা দেবীর আত্মচরিত। আন্দোলনের ভেতরে কিভাবে সামাজিক অবক্ষয়গুলি প্রবাহিত হয়ে চলে তার একটি জীবন্ত নিদর্শন তিনি আমাদের সম্মুখে রেখেছেন। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, সেই আন্দোলনের অনেক নারী-পুরুষই আর নিজের পরিবারে ফিরে যায়নি। কেউবা স্বামী-স্ত্রী রূপে একসঙ্গে

আছেন, কেউবা নেতার পদ নিয়ে অবৈধ সম্পর্কে আসক্ত রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ---

> "কেহ কোন কার্য আরম্ভ করিয়াছেন --- কেহ বা কোন দেশকর্ম্মীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করিতেছেন। এই সকল দেশকর্ম্মীর আচরণ সকল লোকেই জানে, অথচ তাহারা ভোট দিয়া এই প্রকার সাধু বেশী লম্পট স্বভাব ব্যক্তিদিগকেই কর্পোরেশন, কাউন্সিলে প্রেরণ করে। সমাজের অন্ধতা এতদূর গভীর।"[১৩]

এভাবেই সমকালীন সমাজ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তার ভেতরকার ঘূণে ধরা অবস্থানটিকে আলোকিত করেছেন।

চিত্তরঞ্জনদাশের মৃত্যের পরে উত্তরবঙ্গে ভারি বন্যা হলে সেখানেও মানদা ও তার দল যথেষ্ট তৎপরতা দেখাল। এমনকি বিভিন্ন পতিতা সংগঠন দল থেকে গান করে রাস্তায় ঘুরে ঘুরেও চাঁদা সংগ্রহ করেছে।এরকম নানাবিধ সামাজিক কর্মে গুরু দায়িত্ব পালন করতে পিছুপা হয়নি মানদা দেবী ও তার মত পতিতাগণ। তবে আশ্চর্যের বিষয় তিনি শুধুমাত্র পতিতাদের এই ভালো দিকটি দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। সেই দলে যে অনেকের অনেক অসৎ উদ্দেশ্য ছিল তা উল্লেখ করতেও দ্বিধা করেননি তিনি। তিনি সুন্দরভাবে সেই কায়িক মানসিক ভাবকে প্রকাশ করেছেন ---

> "অসহযোগ আন্দোলনে দেশপ্রীতির ভাব, অথবা বন্যা-পীড়িতের সাহায্যে ভিক্ষা করার কার্য্যে দয়ার ভাব পতিতা নারীদের চিত্তকে বিশেষ অধিকার করে নাই। আমরা নিজেদের লোকের সম্মুখে জাহির করিবার একটা সুযোগ পাইয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছি এইমাত্র। সকলে না হউক অন্ততঃ অনেকে।"[১৪]

এভাবেই পতিতা নারীদের দোষ ত্রুটি গুলিকে নিরপেক্ষভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন। এছাড়াও মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বিষয় ---অস্পৃশ্যতা দূর, চরকা ও খদ্দর। যেভাবে হউক পতিতা সমাজ অস্পৃশ্য দলে প্রবেশ করে গান্ধীজীর এই বিষয়গুলির উপর প্রবল গুরুত্ব দিয়েছিল। তারা এগুলির দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়েছিল যে নিজের বেশ্যালয়েও চরকা রেখেছিল।

মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের জেরের পরে মানদা ও তার দল বেশ কয়েকটি সামাজিক কার্য সাধন করেছিলেন। এর মধ্যে মদের দোকানে পিকেটিং করা অর্থাৎ

নিষিদ্ধ করা, মানদা তা মেনে নিয়ে নিজের বাড়িতে মদ আনা বন্ধ করেছিলেন। এছাড়াও ১৯২৪ সালের বর্ষাকালে তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ। সেখানে গিয়েও মানদা দেবী বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। এই মন্দিরের সত্যাগ্রহে অংশ নিতে এসেও তিনি দেখেছিলেন কিরূপে মন্দির সত্যাগ্রহীর দল অবাধে পতিতা ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে নিশি যাপন করছেন। এই সমস্ত কিছু দেখে তার মনে হতে লাগল --- 'তারকেশ্বরে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই --- তথায় পুণ্যের আলোক নিভিয়া গিয়াছে।' তারকেশ্বর থেকে ফিরে এসে মানদা সোনাগাছিতে একটি ঘর নিয়ে চলে যায়। সেখানে তার নতুন বাবুগণ এবং পরিচিত পতিতা বন্ধুদের সঙ্গে এক 'পঙ্কিল আবর্তে' দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। এই অধ্যায়ে সুকৃতি ও সাবিত্রী নামে দু-জন খ্যাতনামা পতিতার কথা পাই যারা পতিতাদের মধ্যে ঈর্ষনীয়। এছাড়াও সুরুচি ও উষা নামক চরিত্রের মধ্য দিয়ে একটি সামাজিক পাপের কথাও রয়েছে। যেগুলির দ্বারা তিনি সমাজকে সতর্কবাণী শুনিয়েছেন।

দশম পরিচ্ছেদে 'অভিনব পন্থা' নামে মানদা জীবনের পতিতাবৃত্তিতে নেমে শেষ সদ্ভাবটুকু বিসর্জন দিয়েছেন। ইতি পুর্বে মানদা রামবাগানে থাকালীন কখনোই ভদ্র ঘরের লোককে নিজের দালাল  নিযুক্ত করেননি। কিন্তু সোনাগাছিতে এসে নানাদিক থেকে অভাবের তাড়নায় তিনি এবার তার দুই বাবু (একজন উকিল অন্যজন ব্যরিস্টার)-কে নিযুক্ত করলেন। এদের সহযোগীতায় উচ্চশিক্ষিত জমিদার পুত্র, রাজনৈতিক নেতা, খ্যাতনামা চিকিৎসক, সমাজ সংস্কারক থেকে ধনী ব্যবসায়ী সকলেই আসত। এমনকি এদের সহায়তায় বাংলাদেশের বাইরে থেকেও লোক আসত।

পতিতা জীবনের সমস্ত সূক্ষাতিসূক্ষ চোরাগলিগুলিতেমানদা দেবী বিচরণ করে জীবনের গভীর তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতাকে অর্জন করেছেন। সেরকমই একবার মানদা মিস মুখার্জি নামে অন্য পরিচয়ে ভবানীপুরের এক নামী হোটেলে গিয়ে পুর্বোক্ত উকিল দালাল বন্ধুর শ্যালিকা রূপে অর্থোপার্জন করতে লাগলেন। এই ছদ্মবেশ ধরে দালাল বন্ধুদ্বিগের সহায়তায় অনেক নতুন নতুন বাবুদের থেকে অনেক অর্থোপার্জন করতে লাগলেন। তার দালাল বন্ধুদ্বয়ের ব্যবসায় বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় তারাও অর্ধেক ভাগের লোভে বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই দালালি করতে লাগল। এই অংশে মানদার এক নতুন বাবু জুটেছিল। সুদূর আসামের চিরকুমার ব্রতধারী এক যুবক। সেই বাবু নারীর প্রতি অন্তরে অন্তরে কতটা আসক্ত ছিল, তা তার রাতারাতি ধন, মান, যশ, হারিয়ে মানদার  চরণে দাসখত লিখে দেওয়ার মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়। এখানে মানদা

সমাজের ধর্ম ধ্বজা ধারী মানুষগুলির (সকলে নয়) প্রকৃত রূপটি তুলে ধরেছেন ---- কাহিনী আকারে নয় নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা। তিনি লিখেছেন ---

> "যাহারা হিন্দু ধর্ম্মের এমন ধ্বজা উড়ায় তাহারা যে এমন কামান্ধ,
> পরদা পরায়ণ তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।"[১৫]

গ্রন্থটির শেষ পরিচ্ছেদে এসেও মানদা নানান মতলব এটে তার পতিতাবৃত্তি দ্বারা অর্থোপার্জন করে যাচ্ছিলেন। ভবানীপুরে থাকতেই মানদার ঘরে যখন বাবুদের আনাগোনা কমে যাচ্ছিল বুঝতে পেরেছিলেন তখন তিনি আরেক অভিনব পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি নিজেই নিজের ব্যয়ে সব সমাজ থেকে বেশ পয়সাওয়ালা বেছে বেছে (বড় ব্যবসায়ী, বড় চাকুরে, ডেপুটী মুন্সেফ, জমিদার, উকিল, ব্যারিস্টার, স্কুলের শিক্ষক, প্রফেসার, দেশকর্মী, সংস্কারক) কয়েকজন করে নেমন্ত্রণ করে টি-পার্টির আয়োজন করত। এমত উপায়ে মানদা তার বাবু সংগ্রহ করতে লাগল। এইরূপে নানা রকম টি-পার্টি, গার্ডেন পার্টি করে মানদা দেবী অর্থোপার্জন করে যাচ্ছিল। লক্ষণীয় মানদা দেবী এই জাতীয় কর্মে লিপ্ত থাকতে থাকতে একটা সময় এই পাপের পথ থেকে পুনঃরায় বেড়িয়ে আসতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ পূর্বে এই পাপবৃত্তিতে প্রবেশ করবার আগে একবার রাণীমাসী (বাড়ীওয়ালী) একজন নারী হয়েও আরেক নারীকে এই পাপবৃত্তিতে নিয়ে এসেছিলেন। তাই বলেছিলাম নারীই নারীর শত্রু। তবে এবার শেষ পর্যায়ে এসে দেখাগেল উচ্চশিক্ষিত ডিগ্রিধারী পুরষ সমাজকে। মানদা দেবী যখন নানারকম টি-পার্টি, গার্ডেন পার্টি করতে অনিচ্ছুক এমনকি এই পাপবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করবেন বলে স্থির করেছেন --- সেইসময় তার দালাল বন্ধুরা তাকে এই পাপবৃত্তিতেই প্রলুব্ধ করতে থাকে। এই হল আমাদের সমাজ ব্যবস্থা – কেউ যখন খারাপ কাজ ছেড়ে সমস্ত অন্যায়, পাপাচার ভুলে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে চায় তখন এই দেহ লোভী, অর্থলোভী পুরুষ সমাজ তাকে সহায়তা না করে সেই পাপ পথেই প্রলুব্ধ করে। আপাতভাবে উচ্চশিক্ষিত ডিগ্রিধারী উচ্চবংশীয় সন্তানরাও যে এ ধরনের কাজ করতে পারে মানদা দেবী তাতে প্রবলভাবে বিস্মিত। এটাই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতরূপ। এই উচ্চশিক্ষিত ডিগ্রিধারী, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা কিভাবে নিজেদের পৈশাচিক চাহিদা নিবৃত্তি করতে সাধারণ মেয়েদের সর্বনাশ করে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে ঠেলে দেয় --- মানদা দেবী তার এক জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করে গেছেন। এখানেই শেষ নয়, এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের লোভ-লালসা এতটাই বেশি যে নিজেকে ক্ষুদ্র কীটের সমতুল্যও মনে করে না। এই গ্রন্থেও তার ব্যতয় ঘটেনি। সেই দালালদ্বয় মানদাকে দিয়ে এমন একটি উইল

তৈরি করালেন, যেখানে উল্লেখ আছে মানদার অবর্তমানে তার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারি ঐ দুই দালাল। মানদা তার সমর্থন করেননি। লক্ষণীয় পুরুষ জাতির নারী জাতির ওপর লোভ। তাই তিনি তার অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তি হিন্দু ধর্মের সংস্কারক এমন কোন সভা বা মিশনে দান করে যাবেন স্থির করেছেন। তবে দালালদ্বয়ের উক্ত উইল সংক্রান্ত কর্মে তাদের চরিত্রের চরমতম পৈশাচিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যদিও গ্রন্থের শেষ অংশে মানদা দেবী স্বীকার করেছেন তিনি সমস্ত প্রকার পাপ ব্যবসা পরিত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ জীবনের শুরুতে একটি মাত্র ভুলের জন্য সারাজীবন লড়াই করে জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও প্রতিবাদকে জীবন্ত রেখে সেই দালালদ্বয়ের কথায় পাপবৃত্তি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এভাবেই জীবন সংগ্রামে যুদ্ধরত মানদা নিজের জীবন অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করে সমাজের অভ্যন্তরের ভদ্রবেশধারী লম্পটগুলিকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন। এছাড়াও একজন পুরুষ একজন নারীর কাছে কি চায়, ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কেন পুরুষ পতিতা নারীর কাছে যায়, এমনকি সুন্দরী পতিতাদেরই যে কেবল চাহিদা বেশি তাই নয়, অসুন্দরী পতিতাদের কাছে গিয়েও যে পুরুষরা মানসিক শান্তি পায় তার অভ্যন্তরীন মানসিক কারণগুলি খুব সুন্দরভাবে মানদা দেবী এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। জীবন অভিজ্ঞতার অনেক বাস্তব সত্য উপস্থাপিত করে সমাজকে সতর্কবাণী শুনিয়েছেন, আপাতভাবে ব্রতধারী, ধর্মের ধ্বজাধারী এমনকি দেশ স্বাধীনতার জন্য চলা আন্দোলনের ভেতরের চেহারাটিকেও আমাদের সামনে ফ্রেমবন্দি করেছেন। এভাবেই সমকালকে, সমকালের ব্যক্তির স্বভাব, চরিত্র ও তাদের মানসিকতাকে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যা আমাদের বর্তমান সময়ে পথ চলতে সহায়ক, যা প্রতি মুহুর্তে আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১. কুমারী-শ্রীমতী মানদা দেবী প্রণীত – 'শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত', বিশ্বভারতী লাইব্রেরী (প্রকাশনা), প্রথম সংস্করণ – ১৩৩৬, চতুর্থ সংস্করণ – পৌষ ১৩৩৬, পৃঃ- ১।
২. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২।
৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৪৮।
৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৫৩।
৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৫৪।
৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৫৫।

৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৮৩।

৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৮৮।

৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৯৩।

১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৯৭।

১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১০১।

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১১২।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১২৪।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১২৯।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৬৭।

আকর গ্রন্থ

১. কুমারী-শ্রীমতী মানদা দেবী প্রণীত – 'শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত', বিশ্বভারতী লাইব্রেরী (প্রকাশনা), প্রথম সংস্করণ – ১৩৩৬, চতুর্থ সংস্করণ – পৌষ ১৩৩৬।

সহায়ক গ্রন্থ

১. সেন, ক্ষিতিমোহন – প্রাচীন ভারতে নারী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রকাশ কাল – আষাঢ় – ১৩৫৭।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ – বঙ্গ সাহিত্যে নারী (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রকাশ কাল – মাঘ – ১৩৫৭।

৩. সেন, দীনেশচন্দ্র – বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খন্ড), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পদনা), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পর্ষৎ কর্তৃক তৃতীয় মুদ্রণ – আগস্ট ২০০২/বি।

৪. সেন, সুকুমার – বাংলার সাহিত্য-ইতিহাস, সাহিত্য অকাদেমি, নবম মুদ্রণ – ২০১৫।

৫. ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র – সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয় (আদি ও মধ্যযুগ), জয়দূর্গা লাইব্রেরী, ৮এ, কলেজ রোঃ কলিকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ – অগ্রহায়ণ ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ – ফাল্গুন – ১৪১৮।

৬. বিশী, প্রমথনাথ – বাংলা সাহিত্যের নরনারী, মৈত্রী প্রকাশন, ১৩৩এ রাসবিহারী অয়াভিনিউ, কল-২৯, দ্বিতীয় সংস্করণ – ডিসেম্বর ১৯৬৬।

সহায়ক পত্রিকা

১. সোনাগাছি সংখ্যা - রোববার প্রতিদিন, ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৩

# অভিনবত্ব : প্রসঙ্গ মধ্যযুগীয় সাহিত্য

শ্রেয়া মণ্ডল
প্রাবন্ধিক-গবেষক

**সারসংক্ষেপ :** সকলেই প্রায় এ বিষয়ে এক মত হবেন যে সাহিত্যের নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনা, নবসৃষ্টি সমস্ত কিছু আধুনিককালের সৃষ্টি। তবে আধুনিক কথাটি যেহেতু আপেক্ষিক, তাই যুগে যুগে আধুনিক ভাবধারার সৃষ্টি হয়েছে। এককালে যা আধুনিক, পরবর্তীকালে তা-ই প্রাচীন বলে চিহ্নিত হয়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বহু শতাব্দী আগেই যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সূচিত হয়েছিল, তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন সাহিত্যের 'প্রাগাধুনিক' যুগ। যে যুগ প্রায় অন্ধকারের অতলস্পর্শে নিমজ্জিত, সেই সময়কালে কবিরা সূক্ষ্মভাবে পুরানোর মধ্যে নতুনের সংযোগ করেছেন, সমগ্র প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে কবিরা যে নতুন মানসিকতার পরিচয় রেখেছেন, তা যুগের সমাপ্তিতেও বিস্মৃত হওয়ার উপায় নেই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে নবত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

**সূচক শব্দ :** প্রাগাধুনিক যুগ,চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্তপদাবলী, চৈতন্য জীবনী সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য।

**মূল আলোচনা**

বাংলা সাহিত্যের ‘প্রাগাধুনিকযুগ’ সমালোচক,গবেষকদের কাছে অন্ধকার যুগ। কিন্তু এই অন্ধকার যুগের মধ্যেও কবিদের কাব্যে সন্ধান পাওয়া গেছে নতুন সৃষ্টির।মধ্যযুগের বেশ কয়েকটি কাব্যে রয়ে গেছে সেই নব সৃষ্টির অঙ্কুর, যা অন্ধকারের মধ্যেও উজ্জ্বলিত।সেই নব নব দিকের ভাবনা আজও আমাদের ভাবিত করে।

বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন, চর্যাপদ।চর্যাপদের যুগে কবিরা পুরাতন ধারণা থেকে নিজেদের ক্রমে নব ভাবনার সান্নিধ্যে নিজেদের উন্নীত করছেন। একবিংশ শতাব্দীর বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্ক আধুনিক যুগের অন্যতম পরিচয়। সেই পরিচয়ের নিদর্শনই কুক্করীপাদ তাঁর ২ নং পদে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, গৃহবধূ তার কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য গুরুজনদেরকেও অমান্য করেছে, রাতের অন্ধকারে সংগোপনের চিন্তার মধ্যে লুকিয়ে আছে নবত্বের সংস্করণ -

"সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।

..............................................

রাতি ভইলেঁ কামরু জাঅ ।।"[১]

চর্যাপদের যুগেও সাধকরা যে কামনা-বাসনাহীন ছিল তা কখনোই নয়।সমাজ যখন বিবাহ নামক সীমানায় বন্দি, সংস্কারাচ্ছন্ন তখন সাধকরা নারীকে আলিঙ্গন করে মুখ চুম্বন করতে চেয়েছেন। চর্যার ৪ নং পদে গুন্ডরীপাদ বলেছেন যে, ডোমিনী তোর মুখ চুম্বন করে কমলরস পান করতে চাই, তুই ছাড়া জীবন যে বৃথা-

"যোইণি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।। "[২]

বর্তমানকালে নারীদের মধ্যেও যে স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা দেখা যায়, এইরূপ চিন্তা যে কবিদের মনের মধ্যেবহু যুগ ধরে লালিত, তা চর্যাপদের কবিরাই প্রমাণ রেখেছেন।

চর্যার নারীরা যেমন মদ পরিবেশনায় দক্ষ, তেমনি শিল্পকার্যেও নারীরা পটু। বিরুবা তাঁর ৩ নং পদে বলেছেন -

"এক সে শুন্ডিনিনী দুই ঘরে সান্ধ অ।"[৩]

ডোম্বিনী তাঁতের বুনন কার্যেও পারদর্শী, ১০ নং পদে কবি কাহ্নপাদ বলেছেন,

"আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ।
তাম্ভি বিকনঅ ডোম্বী অবর না চাঙ্গতা ।।"[৪]

চিরাচরিত সজ্জায় সজ্জিত নারীদের আভরণ যেন কবিদের দৃষ্টিকে ক্লান্ত করেছে।তাই কবিরা নিজেদের মতোভাবে সাজিয়ে তুলেছেন। শবরী নারীর পরণে ময়ূরপুচ্ছ, কণ্ঠে গুঞ্জফুলের মালায় যেন অনন্যা। ২৮ নং পদে শবরপাদ বলেছেন -

"মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ।"[৫]

কর্ণে শোভিত কর্ণকুন্ডলের অলঙ্কার নারীর সৌন্দর্যকে দ্বিগুণ করেছে,

"একেলী সবরী এবণ হিন্ডই কর্ণকুন্ডল বজ্রধারী। "[৬]

শবরী নারীর হাতে শোভিত কঙ্কণ, একবিংশ শতাব্দীর নারীকে যেন চিহ্নিত করে। ৩২ নং পদে সরহপাদ দেখিয়েছেন -

"হাথে রে কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ। "[৭]

চর্যার নারীর আচার,সজ্জার পাশে একবিংশ শতাব্দীর নারীরাও যেন নশ্বর!

প্রতিটি যুগেই নারীর রূপ সৌন্দর্য পুরুষের আকাঙ্খিত বিষয়।বড়ু চন্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ এক গ্রাম্যনারী রাধার দৈহিক সৌন্দর্যের বৃত্তান্তে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি রাধাকে আধুনিক নারীর রূপ লাবণ্যে সজ্জিত করেছেন, রাধার

ঘনকেশে শোভা পেয়েছে চাঁপা ফুলের মালা, তাঁর সীমন্তে উজ্জ্বলিত সিঁদুরকে কবি তুলনা করেছেন প্রভাতের প্রথম সূর্য উদয়ের সঙ্গে -

"প্রভাত সম এ যেন উয়ি গেল সূর।"[৮]

রাধার কপালের তিলক নবচন্দ্রকলার মতো ঔজ্জ্বল্যমান -

"ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
কুন্ডলমন্ডিত চারু শ্রবণযুগলা।। "[৯]

রাধার অপরূপতা মুনির মনকে বিভোর করে, তাঁর খঞ্জনা পাখির মতো শোভিত দু চোখ-

"নয়নযুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে।
ঈসত কটাক্ষ মোহে মুনিমনে।।"[১০]

বড়ু চন্ডীদাস মানসিকভাবে আমাদের বর্তমান যুগের সমতুল্য ছিলেন। কবি যেখানে সাহসী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন সেখানে কাহিনীর নায়কের আচরণ যে একবিংশ শতাব্দীর অত্যাধুনিকত্বের মতোই হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কৃষ্ণের মধ্যে রয়েছে নারীলোলুপতার বৈশিষ্ট্যে। সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ রাধার যৌবনে আকর্ষিত হয়ে কৃষ্ণ বড়ায়ির মাধ্যমে রাধাকে পান, কর্পূর, ফুল প্রেরণ করেছে, তার সম্মুখপানে কৃষ্ণ জানায় যে সে তার যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট,যে কৃষ্ণ জগত পালন কর্তা, কবি তাঁর মধ্যে প্রেমিক রূপ অঙ্কন করলেন,

"তোর যৌবনের বস চক্রপাণী ।"[১১]

অন্দরমহলে বন্দি নারী যেন কবির ক্লান্তির কারণ, তাই রাধা গৃহ বন্দিনী নয়,স্বাধীন,অর্থ উপার্জিতা নারী রাধা, ঘি, দুধ, দগ্ধি নিয়ে মথুরা নগরীতে যায় বিক্রি করতে,

"নিতি নিতি দধি বিকে মথুরাক জাএ।।"[১২]

এই কাব্যে কবি দেখিয়েছেন নারী, পুরুষ একে অন্যের কাজের সহযোগী।রাধা সূর্য কিরণে যখন প্রায় ক্লান্ত, কৃষ্ণ তার সহকারী হয়েছে—তার ছত্রবহনকারী হয়েছে,

"ছত্রি ধরি আইসু কাহ্নাঞি দিবোঁ আলিঙ্গনে।।"[১৩]

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর সমাপ্তি ঘটেছে ঠিকই কিন্তু নতুনত্ব অন্বেষণের সমাপ্তি ঘটে নি। 'বৈষ্ণব পদাবলী'র মধ্যেও নানাদিগের নতুনত্বের নমুনা পাওয়া গেছে, যেখানে একবিংশ শতাব্দীর নারীদের প্রেমের দুঃসাহসিকতার বহু নিদর্শন রয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা সেরূপ রাধা, যিনি বিবাহিত হয়েও কৃষ্ণের জন্য সংসার ধর্ম বিসর্জন

দিয়ে কৃষ্ণের সান্নিধ্যে যেতে চেয়েছেন। রাধা তাঁর প্রেমিকের জন্যে রাতের অন্ধকারে দুঃসহ মনোভাবে এগিয়ে চলেছে। গোবিন্দ দাস অভিসার পর্যায়ের পদে বলেছেন-

"একে কুলকামিণী তাতে কুহু যামিনী।
ঘোর গহন অতি দূর।।"[১৪]

একালের নারীরা প্রেমিকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার আগে নানা ভাবে নানা আভরণে নিজেকে সজ্জিত করে, রাধার মধ্যেও সেইরূপ লক্ষণ দেখা গেছে।গোবিন্দ দাসের অভিসার পর্যায়ের পদে রয়েছে, নীল শাড়ি পরিহিত রাধা, নিজেকে আতরের সুগন্ধিতে ভরিয়ে নিয়েছেন,-

"মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তহি পাহিরায়হ নীল নিচোল।।"[১৫]

রাধার মতো আধুনিক নারী তাঁর ভালোবাসাকে পূর্ণতা দিতে যেভাবে কঠোর অনুশীলন করেছেন, তা পুরাতনের মাঝে নতুনের সন্ধান। পথের পিচ্ছিলতা যাতে অতিক্রম করতে পারে তার জন্য কলসীর জল ঢেলে পথভাগ পিচ্ছিল করে অনুশীলন করেছেন, ঘন অন্ধকার কোনোভাবেই রাধাকে যাতে কৃষ্ণহারা করে তুলতে না পারে, তার জন্য দু হাতে চোখ ঢেকে অনুশীলন করেছেন।গোবিন্দ দাস অভিসার পর্যায়ের পদে বলেছেন -

"গাগরি বারি ঢালি করি পীছল।
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।

................................

করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী।
তিমির পয়ানক আশে।।"[১৬]

রাধাকে কবিরা সীমাতে বেঁধে না রেখে নিজেদের নতুন চিন্তাতে রাধাকে সজ্জিত করেছেন।

শতাব্দীর সময়ক্ষণের ইতি ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু সেই সময়কালের নতুনত্বের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যতম নিদর্শন হয়ে রয়েছে।শাক্তপদাবলীর কয়েকটি অংশে উত্তরোত্তর কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া গেছে।বর্তমান সময়কালে নারীরা যেমন পুরুষদের অসংযত আচরণে সর্বদা প্রতিবাদী, তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর সময়কালেও নারীর মধ্যে অন্যায় দমনকারী মনোভাব দেখা গেছে। শাক্তপদাবলীর উমা পুরুষ সমাজে অবস্থান করেও

অত্যাচারী পুরুষকে দমন করেছেন, তাঁর পদতলে সংহার করেছেন অন্যায়কারীদের।রামচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর আগমনী পর্যায়ের পদে বলেছেন -

"উমা চতুর্ভুজ ছিল, দশভুজা কবে হইল,

------------------------------------

আর একি চমৎকার,পদে মহাসিংহ তার।

সঙ্গে সুর পরিবার, এল দেবকন্যা লয়ে।।"[১৭]

উমার চারটি হাত বিস্তৃত হয়েছে,দশহাতে রক্ষা করছেন জগত সংসারকে।তাঁর পদতলে সিংহ,পুত্র, কন্যাসহ সুর পরিবার যেন সম্পূর্ণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সময়কালে অবস্থান করেও নারীরা যখন প্রায় কিছুক্ষেত্রে নিজেদের অগ্রশীল করে তুলতে সহায়ক হয়েছে, তখন অন্দরমহলে বন্দি মাতৃহৃদয়ও লোকচক্ষুকে উপেক্ষা করতে শিখেছে।পতিগৃহ পরিত্যাগী কন্যা যখন মা-বাবার দুশ্চিন্তার কারণ, তখন 'শাক্তপদাবলী'র মেনকা সমাজ সংসারকে উপেক্ষা করে কন্যাকে নিজগৃহে রাখতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়,সাধারণত বাঙালি পরিবারে শাশুড়ি জামাতার সম্মুখে কথা বলেন না, সেখানে মেনকা জামাতার সঙ্গে ঝগড়া করবেন বলে ঘোষণা করেন শুধুমাত্র উমাকে নিজের কাছে রাখার জন্য।রামপ্রসাদ সেন আগমনী পর্যায়ের পদে বলেছেন -

"যদি মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়।

এবার মায়ে-ঝিয়ে করবো ঝগড়া,জামাই বলে মানব্ না।"[১৮]

সময়ের প্রবাহমানতায় মাতৃহৃদয় ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। নারীরাও কৌশলী হয়ে উঠছে, পুরুষ মনকে আয়ত্ত করার নানা পন্থাও অবলম্বন করেছে। উমাকে পিতৃগৃহে আনার জন্য শিবের মতামত গুরুত্বপূর্ণ, তাই শিবকে তুষ্ট করার জন্য গিরিরাজকে ভিন্ন উপায়ের সন্ধান দিয়েছেন মেনকা। কবিরাম বসু তাঁর আগমনী পর্যায়ের পদে বলেছেন, যে শিবের মনকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁকে সাদরে গঙ্গা জলে স্নান করিয়ে চন্দন এবং বিল্বপত্র শিবকে অর্পণ করতে-

"শিবকে পূজবে বিল্বদলে,সচন্দন আর গঙ্গাজলে।

ভুলবে ভোলার মন।।"[১৯]

শাক্ত কবিরা চিরাচরিত ধারাকে নিজ ভাবনায় পরিবর্তনে প্রয়াসী হয়েছেন।

মধ্য যুগেরকবিরা চৈতন্য জীবনও নতুনত্বে সজ্জিত করেছেন। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত',কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'র মধ্যে কিছু অভিনব ভাবনার সন্ধান পাওয়া গেছে।

রাধা-কৃষ্ণের অমর কাব্যের কাহিনী বহু কবি বিভিন্নভাবে পরিস্ফুট করেছেন। 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে রাধার মন হয়েছে কৃষ্ণ মাতোয়ারা,আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ অঙ্কন করলেন একই অঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের ভাবস্বরূপকে—চৈতন্যদেব একই সঙ্গে রাধা ও কৃষ্ণ ভাবে ভাবিত ছিলেন-

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।"[২০]

সংকীর্ণতা যখন সমাজকে গ্রাস করেছে, মানব সমাজ যখন জাতপাতের ভেদাভেদ করতে সদাব্যস্ত, তখনই সমাজে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে আবির্ভাব ঘটেছিল শ্রীচৈতন্যদেবের, যিনি স্থান করে নিলেন নিম্নগোত্রীয় সমাজচ্যুত মানুষের অন্তরে, চন্ডাল-অচন্ডালের কাছে যা ছিল অপ্রাপ্য, চৈতন্যদেব অধিকার দিলেন সেই নাম সংকীর্তনের।হীন জাতির ভেদাভেদ ভুলে সমাজকে ভাসিয়েছেন অপার প্রেমের মহিমায়-

"সেই দ্বারে আচন্ডালে কীর্তন সঞ্চারে।"[২১]

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়  ধর্ম বর্ণের সংস্কার দূর করে,অন্যের ধর্মকে আপন করেছে এমন সংখ্যা কম নয়, তাই হীনজাতির উচ্চ নীচের পারম্পর্যের ভ্রষ্টতা যেন চৈতন্যচরিতামৃত লক্ষ করা গেছে।

এই যুগে প্রেমের বিভিন্ন বৈচিত্র্যতা প্রায়ই দেখা যায়, বিবাহ অন্তর্ভুক্ত সীমানার বাইরেও নারী পুরুষ প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধিত।পুরাতনপন্থীর গন্ডি যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রায় অতিক্রম করেছেন, তার উল্লেখ 'চৈতন্যচরিতামৃত'গ্রন্থে রয়েছে -

"মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে।।"[২২]

রাধা আইহনের পত্নী হয়েও কৃষ্ণ ভাবে ভাবিত, কৃষ্ণই রাধার জীবন সর্বস্ব,গোপীগণও কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত, কৃষ্ণহারা জীবন তাঁদের কাম্য নয়।জীবনের ভারসর্বস্ব কৃষ্ণের কাছে সমর্পিত, কৃষ্ণ তাই উপপতি হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের অপার পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতায়পূর্ণ চৈতন্য জীবনীকে তিনি যতখানি ভক্তিভাবে উপস্থাপনা করেছেন তা সে যুগের জীবনীকাব্যে দুর্লভ।

কবি অতি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় বৈষ্ণব রসতত্ব, চৈতন্য আবির্ভাবের তাৎপর্য,দার্শনিকতা প্রভৃতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য পয়ার ত্রিপদী ছন্দে আলোচনা করেছেন।

মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রায় প্রতিটি সাহিত্যিক নিদর্শনের মধ্যে রাগ রাগিনীর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' ব্যতিক্রমী গ্রন্থ, এই গ্রন্থে কবি রাগ রাগিণী উল্লেখ করেননি।

'চৈতন্যচরিতামৃত'গ্রন্থে কবি পুরাতনের মাঝেও নতুন কয়েকটি দিককে চৈতন্য জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। 'চৈতন্যভাগবতে'রয়েছে নব নব দিকের উন্মোচন।

কবি মহাপ্রভুর বাল্যকালকে সাধারণ দস্যি বালক রূপে চিত্রিত করেছেন। তিনি শান্তশিষ্ট ছিলেন না, বরং কৃষ্ণের দৌরাত্ম্য মনোভাব তাঁর মধ্যে ছিল। কবি জানিয়েছেন যে তিনি কারো পুজোর শিবলিঙ্গ চুরি করে নিতেন,কারোর উত্তরীয় নিয়ে পালিয়ে যেতেন, কারোর বিষ্ণু পুজোর নৈবেদ্য তিনি ভক্ষণ করতেন, গ্রন্থ মধ্যে রয়েছে তাঁর প্রমাণ -

"কেহ বলে মোর শিবলিঙ্গ করে চুরি।
কেহ বলে মোর লঞা পলায় উত্তরী।।
কেহ বলে পুষ্প দূর্বা নৈবেদ্য চন্দন।
বিষ্ণুপুজিবার সজ্জ বিষ্ণুর আসন।।
আমি করি স্থান হেতা বৈসে সে আসনে।
সব খাই পরি তবে করে পলায়ন।।"[২৩]

বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্য মধ্যে নানা লৌকিক অলৌকিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন।মহাপ্রভুর বাল্য মহিমা বর্ণনাতে কবি বিভিন্ন লৌকিক অলৌকিকতার চিহ্ন রেখেছেন। বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত'গ্রন্থে বলেছেন যে, এক ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর বাড়িতে ভোজনকালে যতবার মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন ততবার সেই খাদ্য আগে ভোজন করেছেনচৈতন্যদেব,-

"প্রভু বলে ওহে বিপ্র তুমি তো উদার।
তুমি আমা ডাকি আন কি দোষ আমার।।
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি আসি তোমা স্থান।।"[২৪]

চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে কবি নতুনত্বের বহিঃপ্রকাশে অভিনবত্বের পরিচয় দিলেন।চৈতন্য জীবনী গ্রন্থে কবি লোকায়ত জীবনকে উল্লেখ করেছেন।বিবাহের বিভিন্ন রকমের উপকরণ কাব্য মধ্যে রয়েছে, যেমন স্ত্রী বরণের নানারকম উপচারের নিদর্শন রয়েছে— নান্দীমুখ, গঙ্গাপুজো, ষষ্ঠীপুজো, অধিবাস, পান, প্রভৃতির উল্লেখ

রয়েছে।এমনকি বিয়ের অনুষ্ঠান যে বাদ্যযন্ত্র,সানাইয়ে মুখরিত থাকতো তাঁরও নানারকম নিদর্শন কাব্যে রয়েছে।

জীবনী গ্রন্থ পরিবেশনের মাঝেও কবি যেভাবে পারিপার্শ্বিক বিষয়ের অভিনবত্বকে প্রকাশ করেছেন, তা অসাধারণ।

মহাকাব্যকে যে নতুনভাবে উপস্থাপন করা যায়, অনুবাদ সাহিত্য তার প্রমাণ।একই কাব্য ভিন্ন কবির মানসিক রূপান্তরে নবীনতার দিক সূচিত হয়েছে— 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র মধ্যে সেই বীজ অঙ্কুরিত। বাল্মীকি রচিত 'রামায়ণ' অনুবাদক কৃত্তিবাসের রচনায় নব প্রাণ ফিরে পেয়েছে বাঙালি। তাঁর 'শ্রীরাম পাঁচালী'নব ভাবনার উদ্ভাবক।যেমন,—

কৃত্তিবাস তাঁর রচিত গ্রন্থে রামের মাহাত্ম্য বর্ণনার সূচনায় রাজা গৌড়েশ্বর ও রাজ সভাসদদের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি শুধু বাল্মীকির রামকে গ্রহণ করেছেন, আর তাঁর মনের অভিনবত্বে সাজিয়েছেন কাহিনীকে।

রাম চরিত্রকে বাঙালি মনের উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন, রামকে উপস্থাপন করেছেন ঘরের ছেলে হিসেবে।বাল্মীকির 'রামায়ণে' যে রাম মদ মাংসে আসক্ত ছিল, গোসাপের মাংস ভক্ষণেও দ্বিধাহীন ছিল, সেই রাম 'শ্রীরাম পাঁচালী'তে হয়ে উঠেছেন নিরামিশাষী, গন্ডিবদ্ধ, জীবনে বিশ্বাসী।শুধু রামচন্দ্রের খাদ্য সামগ্রী নয়, পাঁচালীর মধ্যে ভোজনরসিক বাঙালির খাদ্যদ্রব্যের বিভিন্ন সম্ভারের উল্লেখ করেছেন।

কৃত্তিবাস রাক্ষসকুলকেও অঙ্কন করেছেন বাঙালি প্রথানুসারে। তাদের কথাবার্তা, ভাববিনিময়ের মধ্যে রয়েছে বাঙালিয়ানা।রামকাহিনীকে ত্রিপদী ছন্দে পাঁচালীর সুর, লয়, ছন্দ সহযোগে অনুবাদক উপস্থাপন করেছেন।

বাল্মীকি রচিত রামায়ণের বহু কাহিনী অনুবাদক বর্জন করেছেন। যেমন - কার্তিকের জন্ম, বশিষ্ঠ বিশ্বমিত্র বিরোধ, অম্বরীষ রাজার যজ্ঞ প্রভৃতি। আবার কয়েকটি অধ্যায়ের সংযোজনও তিনি করেছেন, যেমন-সৌদাস দীলিপ রঘুর কাহিনী, গণেশ জন্ম, গুহক মিতালী, বীরবাহুর যুদ্ধ, তরনীসেনের রাম ভক্তি, রামচন্দ্রের অকাল বোধন সহ প্রভৃতি কাহিনীর মধ্যে দিয়ে রামায়ণের নতুনত্ব বাঙালির মনোআকর্ষণের অন্যতম কারণ।

বাল্মীকি রচিত রামায়ণে প্রাধান্য পেয়েছে বীররস এবং রৌদ্র রস।কিন্তু অনুবাদকের কীর্তিতে তাঁর পাঁচালীতে করুণরস গাঢ় হয়ে উঠেছে।

কৃত্তিবাস বিষয়কে অতিরঞ্জিত করে পরিবেশনায় ছিলেন সিদ্ধ হস্ত।তাই বাল্মীকি দশরথের বিবাহ সংখ্যা তিনশো বাহান্নর মধ্যে আবদ্ধ রাখলেও কৃত্তিবাস কিন্তু সংখ্যার গণ্ডিকে আরও কয়েকধাপ এগিয়ে দিলেন।তিনি দেখালেন দশরথের বিবাহের সংখ্যা সাড়ে সাতশো।

রামায়ণের অনুবাদ বহু কবি করেছেন, বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে রামায়ণ, কিন্তু বাংলা ভাষায় কৃত্তিবাস রচিত 'শ্রীরাম পাঁচালী'সর্বকালের জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

আরেক অনুবাদক কাশীরাম দাসের অনূদিত গ্রন্থের জনপ্রিয়তা সামান্য নয়।ব্যাসদেব রচিত মহাভারত কাশীদাসী মহাভারতে নব চিন্তার উন্মেষ রূপে ধরা দেয়।

কাশীরাম দাস তাঁর ভারত পাঁচালী রচনা করেছেন পয়ার লাচাড়ী ছন্দে। তাঁর অনূদিত রচনায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে।

বিভিন্ন কাহিনীকে বর্জন করে নতুন নানা কাহিনি যুক্ত করেছেন, যেমন শ্রীবৎস চিন্তা উপাখ্যান, সুভদ্রাহরণ কাহিনী প্রভৃতি।

সমকালীন সময়ে সমাজ যে সতীন সমস্যায় জর্জরিত ছিল তার উল্লেখ অনুবাদক সভাপর্বে দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার কলহের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করেছে।

ব্যাসদেব সৃষ্ট মহাকাব্যের বিভিন্ন চরিত্র কাশীরামের ভারত পাঁচালীতে নব ভাবনার রূপান্তর ঘটেছে। চরিত্রের মধ্যে ক্ষত্রিয় তেজে দীপ্ত ভীম, কাশীদাসী মহাভারতে উদার সর্বস্ব ব্যক্তিত্ব, ব্যাসদেবের বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন পুত্র অভিমুন্যর জন্য সর্বদা প্রাণত্যাগেও প্রস্তুত,গৃহবধূর বেশে উপস্থিত হয়েছে দ্রৌপদী।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'গ্রন্থটিতে কবি ভাগবতের দশমও একাদশ স্কন্দের অনুবাদ করেন,এই পুরাণ অনুবাদ গ্রন্থে বাঙালির জীবন সংস্কৃতি লক্ষ করা যায়।এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম কৃষ্ণকে 'প্রাণনাথ'বলা হয়েছে।ভাগবতের কাহিনীকে তিনি পাঁচালী অর্থে রচনা করেছেন। এই কাব্য চিরন্তনী ধারাকে লঙ্ঘন করেছে, বারমাস্যা উল্লেখ এ কাব্যে নেই।

মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারা বহু কবির রচিত হলেও বিশেষ কিছু কবি কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষে রয়েছেন। অবশ্যই তার কারণ বলা যেতে পারে, কাব্য মননে কবিদের নব ভাবনার উন্মোচন,কাব্য মধ্যে নতুন দৃষ্টির সমন্বয়। মঙ্গলকাব্যের মূলধারাগুলি হল-চন্ডীমঙ্গল,মনসামঙ্গল, শিবায়ন, অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি।

কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কয়েকটি নব সৃষ্টির সন্ধান মিলেছে-

কবি যে সর্বদাই নতুন ধারনার সন্ধানী তার প্রমাণ তিনি নিজেই রেখেছেন, নামকরণের মধ্যে।তিনি কাব্যের নাম 'নূতন মঙ্গল'বলে অভিহিত করেন।

কাব্যটি উপন্যাসের স্টাইলে রচিত,বাস্তবতা, চরিত্র রূপায়ণে সার্থক তিনি। ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রটি আখেটিক খন্ডের অন্যতম বাস্তব চরিত্র।

নিম্নবর্ণের সমাজ জীবনকে তিনি উচ্চ সমাজ জীবনে প্রেরণ করেছেন। তাই কালকেতু ফুল্লরার বিবাহের সম্বন্ধ করেছে ঘটক। উচ্চবর্ণের রীতি কানুন অনুসৃত হয়েছে, যেমন ধর্মকেতু ও নির্দয়া বৃদ্ধ বয়সে কাশিবাসী হয়েছে।

বিজয়গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ'কাব্যের মধ্যে নতুন দিকের লক্ষণ রয়েছে। যেমন-

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে অবস্থান করেও চাঁদ সদাগরের নির্দেশ অমান্য করে মনসার ঘট স্থাপন করেছে সনকা। এতে নারী মনের সাহসিকতার প্রমাণ দিলেন কবি।

গ্রন্থের প্রারম্ভে দেবদেবীর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, অযথা সংস্কৃত শব্দভারে ভারবহুল নয়।পদ্মপুরাণ কাব্যে করুণ রস প্রাধান্য পেয়েছে।বেহুলার স্বামীর জীবন রক্ষার্থে স্বর্গদ্বারে পৌঁছানোর সময় অতিক্রম করেছে বিভিন্ন ঘাট, যেমন গোদার ঘাট, ধনামনার ঘাট প্রভৃতি। এই সমস্ত ঘাটের বর্ণনা কবি নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করেছে।

লখীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য বেহুলাকে দেবকুলে সর্বসমক্ষে নৃত্য পরিবেশন করতে হয়।

বেহুলা বুদ্ধিমতী নারী লখীন্দরের দেহ নিয়ে গঙ্গায় ভেসে যাবার সময় সনকাকে বিভিন্ন শুভকার্যের নির্দশন চিহ্ন বলে দিয়েছে। যেমন, সেদ্ধ ধান থেকে যখন অঙ্কুর প্রস্ফুটিত হবে তখন বেহুলা দেবপুরে পৌঁছাবে,সিদ্ধ হরিদ্রা থেকে পত্র অঙ্কুরিত হলে লখীন্দর প্রাণ ফিরে পাবে, যেদিন হাঁড়ির চাল আগুনের সংস্পর্শে না এসেই ফুটবে সেদিন বেহুলা চাঁদ সদাগরের হারানো ধন পুনর্প্রাপ্তি করে ফিরবে।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'কাব্যে সূক্ষ্মতার মধ্যে দিয়ে নতুন মনোভাবের পরিচয় রেখেছেন।কবি কাব্যে অন্নদার মাহাত্ম্য সূচনার প্রারম্ভে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্য সীমানার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন।কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মীয় পরিজনদের বর্ণনা তাঁর কাব্য মধ্যে রয়েছে।মনসামঙ্গল কাব্য যেমন এক নারী বেহুলা স্বামীর প্রাণ পুনর্জন্মের জন্য দেবকুলে নৃত্য পরিবেশন করে, আরেক নারী 'অন্নদামঙ্গল'কাব্যে সতী স্বামীর অপমানে দেহত্যাগ করেন। সুতরাং নারী মন ধীরে ধীরে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে।সতীর পিতৃগৃহে আগমন

বাঙালি কন্যার চিত্রকে অঙ্কন করেছেন।শিব চরিত্র মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবির মতো তাঁকে সাধারণ মানবে পরিণত করেছেন।

কবি দেবী সতীর মধ্যেও মানবীরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।ভারতচন্দ্র শব্দ নির্মাণ,ছন্দ অলঙ্কার নির্মাণে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

কবি রামেশ্বর 'শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা'কাব্যের মধ্যে শিবকে যেন প্রথাগত ধারার উর্ধ্বে দেখালেন। শিব চাষ করেছেন সাংসারিক অভাব অনটন দূর করার জন্য। চাষকার্যে মর্ত্যে পদার্পণ করে গৌরীকে বিস্মৃত হয়েছেন,শুধু তাই নয় কৈলাসধাম প্রায় স্মৃতিভ্রষ্ট এবং শিবের যে মর্ত্যলোকে সঙ্গিনীর অভাব নেই, সে কথাও কবি বলেছেন।কীট পতঙ্গের দংশন থেকে রক্ষা করার উপায়ও কবি কাব্যের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।শিব ছদ্মবেশী শিবানীকে অঙ্গুরি প্রদান করে বাগদান সম্পন্ন করার উল্লেখও কবি করেছেন।বাঙালি নারীর বিবাহ লোকচার প্রসঙ্গ গৌরীর শাঁখা পরার মধ্যে রয়েছে।

ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে কবি নারী স্বাধীনতার মুক্ত চিন্তা ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন।নারীকে কবি গৃহবন্দী করে রাখেন নি।তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরাঙ্গনা নারীরূপে প্রস্তুত করেছেন। লাউসেনের দুই পত্নী রণসজ্জায় সজ্জিত করেছেন নিজেদের। মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করলে সেই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে কলিঙ্গা। কানড়ার বীরত্বও কোনও অংশে কম নয়।যুদ্ধেক্ষেত্রে সমানভাবে পারদর্শী।আবার কালু ডোমের স্ত্রী সমগ্র ময়নাগড়ের দায়িত্ব পালন করেছে। বাংলা সাহিত্যের সূচনার সময় থেকেই বিভিন্ন কবিরা নব নব সৃষ্টির ভাবনাকে কাব্যের মধ্যে লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন, এবং তাঁরা যে নবরূপ অঙ্কনে সার্থক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।প্রাচীন পন্থার অনুসরণে যে তাঁদের মনও ভারাক্রান্ত হয়েছিল, তাই কাব্যের মধ্যে প্রাচীন ধারা নব ভাবনার মিলনে সৃষ্টি হয়েছে নতুনত্বের সংজ্ঞাবহ অর্থ।

**পাদটীকা :**

১. নির্মল দাশ, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দেজ পাবলিশিং,জুলাই১৯৯৭,পত্রাঙ্ক১১৫
২. ঐ,পত্রাঙ্ক১২১
৩. ঐ,পত্রাঙ্ক১১৭
৪. ঐ,পত্রাঙ্ক১৩৭
৫. ঐ,পত্রাঙ্ক১৮০
৬. ঐ,পত্রাঙ্ক১৮০

৭. বড়ু চন্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, প্রজ্ঞাবিকাশ, ১৪১৯, পত্রাঙ্ক ১৬৯

৮. ঐ

৯. ঐ

১০. ঐ,পত্রাঙ্ক ২৪১

১১. ঐ,পত্রাঙ্ক ১৫৮

১২. ঐ,পত্রাঙ্ক ২১২

১৩. ঐ,পত্রাঙ্ক ২১২

১৪. তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, বৈষ্ণব পদসমীক্ষা, প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০০৫, পত্রাঙ্ক ১৭৩

১৫. ঐ,পত্রাঙ্ক১৬১

১৬. ঐ,পত্রাঙ্ক১৬৭

১৭. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, শাক্তপদাবলী, বিদ্যা, ২০১৩,পত্রাঙ্ক ২৭৫

১৮. ঐ,পত্রাঙ্ক২৪৬

১৯. ঐ,পত্রাঙ্ক ২৫৩

২০. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যচরিতামৃত, প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১৪, পত্রাঙ্ক ৩৯

২১. ঐ,পত্রাঙ্ক ৩৪

২২. ঐ,পত্রাঙ্ক ৩১

২৩. বৃন্দাবন দাস, চৈতন্যভাগবত, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০১, পত্রাঙ্ক ৮৫

২৪. ঐ,পত্রাঙ্ক ৮২

# শৈলজানন্দের গল্পে খনি-অঞ্চল কেন্দ্রিক অন্ত্যজ শ্রেণির চিত্রায়ণে অভিনবত্ব

রাজু মণ্ডল
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: কথাকার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। খনি অঞ্চলের কথাকার তিনি। তাঁর কলমে উঠে এসেছে একের পর এক অন্ত্যজ শ্রেণির নানা চরিত্রের নিখুঁত বয়ান। তাঁর 'কয়লাকুঠী', 'রেজিং রিপোর্ট', 'বলিদান', 'মা', 'নারীর মন', 'জোহানের বিয়ে', 'রসকলি', 'বনবিহগী' এবং 'সাঁওতাল পল্লী' গল্পগুলি রাণীগঞ্জ আসানসোলের কয়লাঞ্চলের এবং সেখানকার দরিদ্র ও অন্ত্যজ মানুষগুলির চরিত্র চিত্র বয়ানে সুনিপূণতার পরিচয় পেয়েছি আমরা। তাঁর গল্পেই প্রথম পাই আঞ্চলিকতার আস্বাদ। আঞ্চলিক ভাষা ও সংলাপপূর্ণ গল্পগুলি বাংলা গল্পে নতুনত্বের দিশা দেখিয়েছে। বিংশ শতকের বিশের দশকে তিনি পাঠকের দরবারে হাজির করেন 'কয়লাকুঠি' গল্পের মতো এক ভিন্ন ভাবনা ও ভিন্ন স্বাদের আখ্যান। এরপর তাঁকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। পরবর্তীতে তাঁকে পেয়েছি সম্পাদক, ঔপন্যাসিক ও চিত্রপরিচালকরূপে। তবুও বাংলা সাহিত্যরস পিপাসু পাঠক তাঁকে চিরকাল মনে রাখবে তাঁর আঞ্চলিক রচনায় অভিনবত্বের কারণে।

সূচক শব্দ : শৈলজানন্দ, খনি, গল্প, অন্ত্যজশ্রেণি, আঞ্চলিকতা, লেখক, সমালোচক, শিল্পী, শ্রমিক, প্রান্তিক, নরনারী।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাসাহিত্যিক হলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। খনি থেকে মূল্যবান কয়লা উত্তোলনের মতো যাঁর কলম থেকে উঠে এসেছে অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনচিত্র। যেগুলি বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল সম্পদ। তিনি ছিলেন কল্লোল কালের অন্যতম সেরা কথাকার। তাঁর গল্প-উপন্যাস ঝড় তুলেছিল বিংশ শতকের কয়েকটি দশক জুড়ে। শৈলজানন্দের জন্ম ১৮ মার্চ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলার অন্ডাল গ্রামে। বাবা ধরণীধর মুখোপাধ্যায় ছিলেন খেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। জঙ্গলে জঙ্গলে সাপ ধরা ও ম্যাজিক দেখানো ছিল যাঁর পছন্দের কাজ। সেজন্য দারিদ্র্য তাঁদের পিছু ছাড়েনি। এমন পিতার সন্তান শৈলজানন্দ মাত্র তিন বছর বয়সে মাতৃহারা হন। বাবা আবার বিয়ে করেন। তখন শৈলজানন্দ দাদামশাই মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে বড় হতে থাকেন।

দাদামশাই ছিলেন অনেকগুলি কয়লাখনির মালিক। সেই কয়লাখনি অঞ্চল খুব কাছ থেকে দেখার ফলে, পরবর্তীতে তিনি হয়ে উঠলেন কয়লাঞ্চলের অমর কথাকার। মামার বাড়িতেই তিনি প্রথম লেখেন 'আমের মঞ্জরী' গল্প। তারপরে এক আত্মঘাতী মানুষকে নিয়ে লেখেন ''আত্মঘাতীর ডায়েরী' নামের একটি ছোটগল্প। প্রকাশ পেলো 'বাঁশরী' নামক একটি কাগজে। তারপরেই পড়লেন দাদামশাইয়ের নেক নজরে। সেখান থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর শুরু হয় তাঁর সাহিত্য সাধনার পথ চলা।

বাংলা সাহিত্যে শৈলজানন্দের হাত ধরেই শুরু হয় আঞ্চলিকতার উন্মেষপর্ব। পরবর্তীতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে আঞ্চলিকতা পরিপূর্ণতা পেলেও, সকলভাবেই কিন্তু শুরু করেছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর গল্প উপন্যাসে রূপ পেয়েছিল আঞ্চলিক কথ্যভাষার মধুর সংলাপ। তিনি দারুণভাবে সফলও হয়েছিলেন। তাঁর কলমেই আঞ্চলিকতার জোয়ার এসেছিল। তাঁর 'কয়লাকুঠি' সিরিজের গল্পেই উঠে এসেছে একের পর এক খনিকেন্দ্রিক চরিত্র ও তাদের জীবনচর্যার বিভিন্ন দিক। শুরু হয় তাঁর দৃষ্টিতে এক ভিন্নরুচির আবাহন। বলা হয়, শরৎচন্দ্রের পরে অন্ত্যজ শ্রেণির নরনারী সম্পর্কে এমন আলোচনা আর কেউ শুরু করেননি তখন। তাঁকে সেজন্য বস্তি সাহিত্যের লেখক ও বস্তি জীবন নির্ভর সাহিত্যের লেখক আখ্যা দিয়েছিলেন অনেক সমালোচক। রোমান্টিকতার মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা এঁকেছিলেন পরম মমতায়। রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলের কয়লাখনি থেকে কাঁচা হীরের মতো চরিত্র তুলে এনেছিলেন সাহিত্যের পাতায়। আদিবাসী জনজাতির কাহিনি ঠাঁই পেয়েছে তাঁর প্রায় প্রতিটি খনিকেন্দ্রিক গল্প উপন্যাসে। তিনি শ্রমিক ও মজদুর সম্প্রদায়ের বিচিত্র ব্যক্তিগত ঘরোয়া ও গোষ্ঠীগত ছবি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিরীখে তুলে ধরলেন সাহিত্যাকাশে।

অন্ত্যজ শ্রেণি নিয়ে তাঁর এমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন – ''আমার মাথার উপর তখন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। আর আমার অগ্রজ সাহিত্য রসিকরা। চিরন্তন সত্য বাস্তবের প্রতি আমার ছিল প্রচণ্ড অনুরাগ। পূর্ববর্তী যশস্বী সাহিত্যিকেরা তখন একটির পর একটি আদরণীয় গ্রন্থ রচনা করে চলেছেন। আমার চিরকালের ইচ্ছা, তাঁরা যা করেননি তাই করব। যাদের কথা তাঁরা বলেননি, আমি তাদের কথা বলব। অবহেলিত অবজ্ঞাত দীনদরিদ্র যাঁরা, সমাজের সর্বনিম্নস্তরে বাস করে, তাদের নিয়ে রচনা করব আমার সাহিত্য।''[১]

কয়লার স্তূপ দেখে যাঁর দিন শুরু হতো, তাঁর কলমে তো কয়লাগুলোর আঘ্রান ফুটে উঠবেই। আর তাই তো গল্প বয়ানের রসদ তিনি কীভাবে পেলেন, সে বিষয়ে বলেছেন-

> "কয়লাকুঠির দেশে আমার জন্ম। বাল্যকাল থেকে আমি দেখেছি – চারিদিকে কয়লার খনি। বড়ো বড়ো চিমনির মাথায় ধোঁয়া উঠছে, হেড গিয়ারের চাকা ঘুরছে। মাটির নীচে থেকে লিফট বেয়ে টব গাড়িতে কয়লা আসছে ওপরে। সে এক বিচিত্র জগৎ। কিন্তু সে জগৎ তখন আমাদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। কারণ সেখানে বিপদ ছিল। বিপদ ছিল অনেক রকমের। সে বিপদের মুখে বেড়া দিয়ে ভাবপ্রবণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে ঠেকিয়ে হয়তো রাখা যায়, কিন্তু তার মনকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত। মন ছুটে চলে সেই বিপদসঙ্কুল জগতে। বয়স যখন হল মন ছুটে গেল রহস্যঘন পাষাণপুরীতে। দেখলাম স্বপ্নালোকিত সেই খাদের নীচে কালো কালো জোয়ানেরা কালো কয়লার গায়ে গাঁইতির চোট মারছে। দেখলাম কালো অন্ধকারের মাঝে কালো মানুষ আর কালো কয়লা। সেই অন্তহীন কালোর মাঝে যে আলো আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম সেই আলোতেই জ্বলেছিল আমার প্রাণের প্রদীপ। সেই চোখের দেখা আমার মনকে টেনেছিল। যা কিছু দেখেছিলাম তা ছিল নিরতিশয় সত্য। সেই সত্যের গৌরবে মনে হয় যেন আবিষ্কার করেছিলাম সেই তুচ্ছকে সেই অনাদৃতকে। আমার সেই সত্যের উপলব্ধিকে আমার আবিষ্কারের বিস্ময়কে প্রকাশ করেছিল আমার মন। ভাষায় রচিত আমার সেই প্রকাশই আমার প্রথম সাহিত্য রচনার ভিত্তিভূমি।"[২]

মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে 'আমের মঞ্জরী' গল্প দিয়ে যাঁর সাহিত্যজীবন শুরু, সেই তিনিই পরবর্তীতে লেখেন 'রেজি রিপোর্ট' ও 'বলিদান' এর মতো সার্থক গল্প। গল্প দুটি সাঁওতাল কুলিকামিনদের নিয়ে লেখা। তাঁর সাঁওতালি শ্রমিকদের নিয়ে লেখা একের পর এক গল্প বাংলা সাহিত্যের ভিত মজবুত করেছে। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক। অন্যদিকে ছিলেন সম্পাদক, চিত্র পরিচালক এবং বেতার প্রযোজক ও ঘোষক। সব জায়গাতেই তিনি সমান সফল হয়েছিলেন ঠিকই, তবে তিনি সবথেকে বেশি সফলতা অর্জন করেন তাঁর চরিত্র নির্ভর ছোটগল্পে। সেখানে তিনি রিপোর্টের

আকারে পাঠকের সামনে তুলে ধরছেন সমস্ত চরিত্রগুলিকে। পাঠক তাঁর গল্প পাঠ করে মানুষগুলিকে সঠিকভাবে চিনতে পারছেন। তাঁদের সমস্যার দিকগুলিকে সহজেই অনুধাবন করতে পারছেন। এখানেই শৈলজানন্দের ছোটগল্পের সাফল্য। এখানেই তাঁর গল্পের চরিত্র বয়ানের অভিনবত্ব। তিনি কয়লাকুঠী এলাকার কাহিনি ও চরিত্র নির্ভর গল্প লিখে বারে বারে পাঠককে চমকে দিয়েছেন। তাঁর গল্পে উঠে আসছে কুলি কামিনদের অশিক্ষা ও সরলতার কথা। তাদের জৈব প্রবৃত্তির কথা। সেখানে কোনও সংস্কার নেই, ছলনাও নেই। তাইতো 'কল্লোল' এর ছোঁয়ায় ও 'কালিকলম' এর দায়িত্ব নিয়ে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন সমাজের প্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে। শৈলজানন্দ ও তারাশঙ্কর তাঁদের লেখনী দিয়ে অন্ত্যজ শ্রেণি চরিত্রগুলিকে সম্যকভাবে পরিচয় ঘটিয়ে দিতে পেরেছিলেন। সমালোচক ও অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন-

> "ভদ্রেতর সমাজ আমাদের স্বল্প পরিচিত জনপদ এবং বিচিত্র জীবনাচরণকে আশ্রয় করে গল্প লেখার প্রবণতা খুব বেশি দেখা যায় কল্লোল যুগে। এইভাবেই সাহিত্যের আনুভূমিক বিস্তৃতি বা *Horizontal extension* তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন। প্রধানত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে এ ব্যাপারে অগ্রণী কথাসাহিত্যিকের মর্যাদা দেওয়া হয়।"[৩]

শৈলজানন্দ খনি অঞ্চল কেন্দ্রিক বহু গল্প লিখলেও, আমরা তাঁর দুটি গল্পের সংক্ষেপিত আলোচনায় সামগ্রিক অভিনবত্বের বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব। যার প্রথমটির নাম 'কয়লাকুঠী', আর দ্বিতীয়টি হল 'রেজিং রিপোর্ট'। মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি তাঁর 'কয়লাকুঠী' গল্পটি রচনা করেন। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের (ইংরেজি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে) কার্তিক সংখ্যায় 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হয়। বাউড়ি সম্প্রদায়ের মেয়ে বিলাসীর সুতীব্র প্রেমতৃষ্ণা এবং তার করুণ পরিণতি নিয়ে গল্পটি রচিত। এই গল্পে নানকুর প্রতি বিলাসীর তীব্র আবেগঘন প্রেমের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তারা বিবাহিত হলেও, লাইনু নামক একটি মেয়ের প্রতি যে নানকু আকৃষ্ট, এই সন্দেহ পেয়ে বসে নানকুর স্ত্রী বিলাসীর মনে। বিলাসী নানকুর সঙ্গে তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু করে দেয়। তাকে নানা ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে নানকু। এই ভাবে মান-অভিমান, ভালবাসার সন্দেহের দোলায় তাদের দিন কাটতে থাকে। একদিন হঠাৎ সত্যি সত্যিই লাইনুকে নিয়ে নানকু দূরদেশে পালিয়ে যায়। আতান্তরে পড়ে বিলাসী তখন পূর্বপ্রণয়ী রমণার সঙ্গে ঘর করতে শুরু করে দেয়। তবুও তাকিয়ে থাকে নানকুর

ফেরার প্রতীক্ষায়। শেষে একদিন বিলাসী খবর পায় যে, নানকু কয়লা খাদানে প্রাণ ত্যাগ করেছে। নানকুকে শেষবারের মতো দেখার জন্য বিলাসী অন্য পথের আশ্রয় নেয়। সে রাত্রিবেলা কেজ চালককে পয়সার লোভ দেখিয়ে কেজে করে কয়লা খাদে নামে। তখন কেজটিও তার সঙ্গে অবিচার করে। সেটি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মাঝপথে আটকে যায়। বিলাসী তীব্র উৎকণ্ঠায় পৌঁছে গেছে ভেবে নামতে গিয়ে অনেক নিচে পড়ে যায়। তখন সে সবেগে আছড়ে পড়ে মৃত নানকুর শরীরের উপরে। গভীর দুঃখে ও আবেগে স্বামীর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবে ঠিক করে সে। তখন স্বামীকে কাঁধে নিয়ে তিন নম্বর খাদের দিকে এগোতে থাকে বিলাসী। হঠাৎ মস্ত বড় এক কয়লার চাঙড় মাথার উপর ভেঙে পড়ে। তখন দুজনেই খনিগর্ভে সমাধিস্থ হয়ে যায়। এইভাবে বিলাসী ও নানকুর জীবনের বেদনাঘন পরিণতিতে 'কয়লাকুঠি' গল্পটি শেষ হয়েছে।

শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠি' গল্পটি পড়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মন্তব্য করেন-

> "কে এই নবাগত? মাটির উপরকার শোভন শ্যামল আস্তরণ ছেড়ে একেবারে তার নিচে অন্ধকার গহ্বরে গিয়ে প্রবেশ করেছে? সেখানে কয়লার বদলে তুলে আনছে হীরামণি?"[৪]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সীমিত আয়তনের গল্পে অত্যাশ্চর্য এক শিল্পী। গল্পের ক্ষেত্রে অর্ন্তদৃষ্টির গভীরতায়, পরিবেশনের সারল্যে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনিই প্রথম সাহিত্যিক যিনি তাঁর রচনায় সমগ্র জনপদ, গাছপালা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাণী ও মানুষকে গভীর দৃষ্টিতে প্রাধান্য দিলেন। 'কয়লাকুঠী' গল্পের পাশাপাশি তাঁর 'রেজিং রিপোর্ট' গল্পের বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়। গল্পটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পে শৈলজানন্দ কয়লাখনি অঞ্চলের শ্রমিক শোষণের করুণ, মর্মস্পর্শী ও কদর্য দিকটি তুলে ধরেছেন। গল্পের কাহিনি অংশে দেখা যায় – কয়লাখনি অঞ্চলের ম্যানেজার জেমস সাহেব অত্যন্ত ধুরন্ধর ও লোভী মানুষ। অধিক মুনাফার লোভে শ্রমিকদের অবধারিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে দুবারও ভাবেন না। তাঁর এই হিংস্র স্বভাবের বলি হয় কয়লাখনি শ্রমিক টুইলা। সে খনির অতলে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। তার মৃত্যু দুঃখের হলেও জেমস সাহেবকে একটুও বিচলিত করতে পারেনি। তিনি ঘটনাটি হালকা ভাবে নেন। ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলেন – 'কুছ পরোয়া নেই।' কারণ হিসেবে ভয়ানক যুক্তির অবতারণা করেন। তিনি জানান যে, তাঁর হাতে এরকম ঘটনা অনেক ঘটেছে। তাঁর লক্ষ্য যে করেই হোক কয়লার রেজিং বাড়াতে হবে। একদিন খনির রেজিং বাবু জেমস সাহেবের কাছে টুইলার মৃত্যুর

ক্ষতিপূরণের প্রসঙ্গ তোলেন। তখন জেমস রেগে গিয়ে বলেন – “Damn your Tuila.” জেমসের ঔদ্ধতের চরম প্রকাশ ঘটে তখন। খনি শ্রমিকের মৃত্যু মালিকের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। এইরকম শোষণের চিত্রে মালিক ও শ্রমিকের মাঝে যে কতটা বিভাজন রেখা তৈরি হয়েছে, সেটিই পরিস্ফুটিত হয়েছে গল্পটিতে। কয়লাখনি অঞ্চলের মানুষের জীবনের বেদনার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে পরতে পরতে।

এই দুটি গল্পের বাইরে শৈলজানন্দ ‘বলিদান’, ‘মা’, ‘নারীর মন’ ‘বন্দী’-র মতো অনেকগুলি গল্পে, খনি অঞ্চলের অন্ত্যজ শ্রেণির চরিত্র চিত্রণ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শৈলজানন্দের ছোটগল্প পড়ে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন-

> “শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দারিদ্র্য জীবনের যথার্থতা, অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লিখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্য ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। .... তাঁর কলমে গ্রামের যে সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলবার কারি-পাউডারি ভঙ্গীটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয়নি।”[৫]

বই লিখে প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে যাঁকে একসময় ঘুরতে হয়েছে, পরবর্তীতে তাঁরই ছোটগল্প তাঁকে এনে দিয়েছে বিপুল সম্মান। তাঁর গল্পে আছে সুনিপুণ বাস্তবিক কারুকার্য। গরীব আদিবাসী সমাজের অকৃত্রিম চিত্র। এখানেই তিনি অনন্য। এটাই শৈলজানন্দের রচনার অভিনবত্ব। বিখ্যাত সাহিত্যসমালোচক সুকুমার সেন তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন-

> “শৈলজানন্দের গল্প ‘বাস্তব’ (রিয়ালিস্টিক) বলিতে যাহা বোঝায় শুধু তাহাই নয়, ‘বাস্তবিক’ও। তীব্র অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ অনুভব শৈলজানন্দের সাহিত্য-সাধনাকে পরিচিতি সরণি হইতে ভুলাইয়া উপেক্ষিত-অবজ্ঞাত মানুষের অপরিচিত জীবনের অনাবিষ্কৃত গহনের দিকে পরিচালিত করিয়াছিল।”[৬]

একটি বৃহত্তর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ভিন্ন স্বাদের গল্পের মালা গেঁথেছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর গল্পের নরনারী আর্থ-সামাজিক দিক থেকে একেবারেই প্রান্তিক চরিত্র। নিজের চোখে এই চরিত্রগুলিকে প্রত্যক্ষ না করলে তাদের চরিত্রায়ণ গল্পে সম্ভব হত না। সেই কাজটিই করতে পেরেছিলেন তিনি। এবং তিনিই প্রথম দক্ষতার সঙ্গেই তাদের নিয়ে এসেছিলেন বৃহত্তর সাহিত্যের দরবারে। এখানেই তাঁর

লেখনির অভিনবত্ব। আর সেটাই আমাদের মতো পাঠকের চোখে তাঁকে এবং তাঁর গল্পগুলিকে ভিন্নমাত্রায় দেখতে সাহায্য করেছে। আর তাইতো সুকুমার সেন বলতে পেরেছেন-

> ‘‘স্থান-কাল-ভাষা-পরিবেশের সৌষ্ঠব, যাহাকে ইংরেজীতে বলে ‘লোক্যাল কালার’, তাহা শৈলজানন্দের গল্পে পরিপূর্ণভাবে দেখা গেল। অথচ কাহিনীর অত্যন্ত জৈবিক মানুষগুলি স্থান-কাল পরিবেশের মধ্যে কোথাও খর্ব হইয়া যায় নাই। বিষয় সর্বদা জীবন্ত, অনেক সময় নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত। ইহাও বাঙ্গালা সাহিত্যে কিছু নূতন।’’[৭]

**তথ্যসূত্র :**

১. সাহিত্য জীবনের প্রথম স্বীকৃতি, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিচিন্তা ভারতী, পৃ. ১১৮
২. তদেব, পৃ. ১১৯
৩. সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, দে’জ পাবলিশিং, পৃ. ৪৩২
৪. কল্লোল যুগ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃ. ১৯
৫. সাহিত্যের পথে প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃ. ৫৫৩
৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, সুকুমার সেন, আনন্দ, পৃ. ৩৪৮
৭. তদেব।

# নদিয়া জেলার শর্করাশিল্প

চায়না দেবনাথ
স্টেট এডেড কলেজ টিচার (SACT-I)

সারাংশ : ভারতীয় সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই এই সভ্যতা গ্রামকেন্দ্রিক ও কৃষি অর্থনীতি নির্ভর। কৃষিকেন্দ্রিক হওয়ায় কৃষিজশিল্প এই অর্থনীতির এক বিশিষ্ট আঙ্গিক। পশ্চিমবঙ্গ তথা অবিভক্ত নদিয়া জেলায় প্রাক-ঔপনিবেশিক সময় থেকে কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষিজশিল্প নদিয়া জেলার অর্থনীতিতে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছিল। এরই সূত্র ধরে এই জেলায় গড়ে উঠেছিল শর্করাশিল্প। নদিয়া জেলার মাটি আখ উৎপাদনের উপযোগী না হলেও খেজুরের রস উৎপাদনে উৎকৃষ্ট ছিল। ফলত এই রস শর্করা শিল্পের প্রধান উপকরণ। ঔপনিবেশিক সরকারের নেক নজর এই শিল্পের ওপর ছিল, কেননা নদিয়া জেলার চিনির চাহিদা সমগ্র ভারত ছাড়া বিদেশেও একসময় দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এবং পরিবর্তিত চাহিদা ও প্রাকৃতিক দূর্বিপাক এর কারণে জেলার একসময়ের সমৃদ্ধ শিল্প ক্রমাগত পিছু হটতে থাকে। স্বাধীনতা ও দেশভাগের ফলে জেলায় আগত অসংখ্য উদ্বাস্তু মানুষের  কর্মসংস্থানের চাহিদা পূরণ করেছিল এই দেশজ শিল্পটি। তাসত্বেও সরকারের অসহযোগিতা, পরিকল্পনার অভাব এবং সাংগঠনিক দূর্বলতার কারণে বর্তমানে নদিয়া জেলার শর্করাশিল্প ইতিহাসের পাতাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।

শব্দ সূচক : দেশজশিল্প, শিউলি, শর্করা, ঔপনিবেশিক সরকার, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, , উদ্বাস্তু, কর্মসংস্থান, সরকার, সংগঠন, ভগ্নাবস্থা।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এমনকী ভারতের বাইরে অবিভক্ত বাংলা থেকে যে সব দ্রব্য রপ্তানি করা হত তার মধ্যে প্রথম ছিল বস্ত্র আর দ্বিতীয় ছিল চিনি বা শর্করা। রামায়ণ, মহাভারত, শুশ্রুত সংহিতা ও মনুসংহিতায় শর্করাখন্ড, খন্ডমোদক, ইক্ষুসার, গুড়োদ্ভবা ইত্যাদি চিনির সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়[১]। স্পেনসার লিখেছেন সুদূর অতীতকাল থেকেই আরব ও পারস্যের সাথে বাংলার বানিজ্য চলত। আর এই বানিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ছিল চিনি।[২] ষোড়শ শতকের গোড়ায় সিংহল, আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশে চিনি রপ্তানি নিয়ে দক্ষিণ ভারতের সাথে বাংলার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা পোর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা উল্লেখ করেছেন।[৩] অবিভক্ত বাংলার যে সমস্ত অঞ্চল থেকে এই চিনি ও গুড় ভারত ও ভারতের বাইরে রপ্তানি  হত তার মধ্যে নদিয়া জেলা

ছিল উল্লেখযোগ্য। ঔপনিবেশিক শাসনকালে এমনকী তার আগে থেকে নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, পলাশী, নবদ্বীপ, চাকদহ, সুতরাগড়, দর্শনা, নীলমণি-গঞ্জ, আলমডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, যশোহর, মেহেরপুর, কোর্ট চাঁদপুর, কেশবপুর প্রভৃতি স্থানে শর্করা শিল্প গড়ে উঠেছিল। উক্ত স্থানগুলির মধ্যে বর্তমান নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, সুতরাগড়, পলাশী, চাকদহ, আলমডাঙ্গা প্রভৃতি জায়গার শর্করা শিল্প ছিল বিশেষ উল্লেখ্য।

নদীমাতৃক নদিয়া জেলার অর্থনীতি কৃষিকেন্দ্রিক হওয়ার ফলে এই জেলার বিভিন্ন জায়গায় আখ উৎপাদিত হত।  নদিয়া জেলার মাটি খানিকটা লবনাক্ত হওয়ার কারনে এখানে পারর্শবর্তী জেলা বর্ধমান, হুগলীর তুলনায় কম পরিমাণে আখ উৎপাদিত হত বরং এখানে সমগ্র জেলা জুড়েই খেজুর গাছের দেখা মেলে। নদিয়া জেলায় চিনি প্রস্তুত হত মূলত খেজুরের রস থেকে। খেজুর অপেক্ষা আখজাত চিনিতে ব্যয় অধিক হয় বলে দেশীয় ব্যবসায়ী ও চাষীরা খেজুর রসের চিনি প্রস্তুত করতেন। ১৯০৮-০৯ সালে নদিয়া জেলা থেকে ১৪০০০০ মণ গুড় ও চিনি দেশের অন্যান্য জেলায় রপ্তানী হত।[৪] নদিয়াবাসীরা ভোজন বিলাসী হবার কারণে শর্করা শিল্পের এত বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়।

প্রসঙ্গত বলা যায় খেজুরের রস থেকে গুড় ও চিনি তৈরীর দেশীয় প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত কারি গরদের 'শির্ডলি' বলে অভিহিত করা হয়। ঔপনিবেশিক আমলের অনেক আগে থেকেই নদিয়ার কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, চৌগাছা, আলমডাঙ্গা, ঝিকরগাছা প্রভৃতি স্থানের চিনি তৈরীর কারখানা গুলিতে চিনি ও গুড় প্রস্তুতের কাজ চলত।[৫] স্থানীয় চাষী ও শিউলিদের কাছ থেকে কারখানার আধিকারিকগণ খেজুরের রস ও গুড় নিয়ে চিনি প্রস্তুত করতেন। এই কৃষকরা কৃষি কাজের পাশাপাশি খেজুরের রসের ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।[৬] ব্যাপকার্থে নদিয়ার চিনির বাজারীকরণ হয়েছিল এদের দ্বারাই। নদিয়ার চিনির কারখানা গুলিতে মূলত 'দোলো' ও 'পাকা' চিনি প্রস্তুত হত।

দেশীয় পদ্ধতিতে খেজুরের রস থেকে গুড় বা চিনি প্রস্তুতের সময় বেশ কয়েকটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত পর্যায়ে স্থানীয় চাষী বা শিউলিরা কোন খেজুর গাছ থেকে ভালো রস পাওয়া যাবে তা গাছ দেখে নির্ধারণ করে নেয়, একে বলা হয় 'গাছ ধরা'। এরপর খেজুর গাছ কাটার প্রথম পর্বের নাম 'গাছ মূড়ো দেওয়া' অর্থাৎ শিল্পীরা 'দা' দিয়ে গাছের উপরের দিকের নির্দিষ্ট অংশ চেঁছে পরিষ্কার করে, এটি দ্বিতীয়

পর্যায়। তৃতীয় পর্যায়ে ফুল চাঁছা বা চাঁচা। এই পর্বে গাছ মূড়ো দেবার পর ৭ দিন শুকিয়ে গেলে আবার একবার চেঁছে দেওয়া হয়। চতুর্থ পর্বে হয় গাছ কাটা। এই পর্বে যেখান থেকে রস আসবে সেই জায়গাটা ভালো ভাবে কেটে একটা বাঁশের কঞ্চির নলি লাগানো হয়। এই নলি বা নালিকা লাগানোর ওপরের দিক দিয়ে দুটি 'দা'-র সাহায্যে দুটি রেখা তৈরী করা হয় যাতে রস আসতে সুবিধা হয়। পঞ্চম পর্যায়ে রসের জন্য গাছে কলসি লাগানো ও তা থেকে রস নামানোর কাজ চলে। ষষ্ঠ পর্বে হয় রস জ্বাল দেবার কাজ। এই কাজ করার জন্য যে উনুন তৈরী হয় তাকে বলে 'বান'। এই বান চার চোকো, তিনচোকো এবং এক চোকো এই তিন প্রকারের হয়। এই ভাবে উনুনে রস জ্বাল দেবার সময় বানের উপর সেটা বসিয়ে রস জ্বাল দেওয়া হয় তাকে বলে 'খুলি'। এই খুলিতে রস জ্বাল দিয়েই দোলো চিনি ও পাকা চিনি প্রস্তুত করা হত।

দোলো চিনি প্রস্তুতের সময় সদ্য জ্বাল দিয়ে ঘন করা খেজুরের রস মাটির কলসিতে ঢালা হয়। তারপর কলসির মুখে রস ফোটানোর সময় রস থেকে যে গাঁজার মত বুদবুদ বা ফোটা তৈরী হয় তা তুলে রেখে এখন কলসী ভর্তি ঘন গরম রস বা গুড়ের কলসির মুখে চেলে দেওয়া হয়। তারপর কলসির গলার অংশটা ভেঙ্গে দিয়ে কলসিটা একটি পাত্রে উলটো করে ৭ দিন রাখা হত। ফলে গুড় জমার সময় গুড়ের পাতলা অংশ পড়ে গিয়ে অবশিষ্ট অংশ শক্ত গুড়ে পরিণত হত। এবার ঐ গুড় তালপাতার চাটাইয়ে ঢেলে কাঠের একটা মুগুর দিয়ে পোষাই করে সমস্ত গুড় একটা ঝুড়িতে রেখে তার ওপর শ্যাওলা চাপা দিয়ে বেশ কিছুদিন রাখতে হত।[৭] এই শ্যাওলা জলঙ্গি, মাথাভাঙ্গা, কপোতাক্ষ, ইচ্ছামতি, যমুনা প্রভৃতি নদী ও জলাশয় গুলি থেকে সংগ্রহ করা হত। শ্যাওলার কাজ ছিল জলকে কয়েকদিন পাতায় ধরে রেখে ফোটা ফোটা জল পাতা থেকে বের করে দেওয়া। এভাবে জলের সাথে গুড়ের পিচ্ছিল অংশ বের হয়ে গুড়ের লাল রং ফেটে গিয়ে সাদা রং-এ পরিণত হত। এভাবে যে চিনি প্রস্তুত হত তা-ই দোলো চিনি নামে পরিচিত। এই সরস, সুস্বাদু ও ক্ষুদ্র দানা যুক্ত হওয়ায় এর নাম দোলো চিনি।[৮]

দোলো চিনি বেশিদিন শুকনো অবস্থায় থাকে না এজন্য পাকা চিনি প্রস্তুত করতে হয়। পাকা চিনি তৈরী করার সময় দোলো চিনির সাথে দুধ মিশিয়ে বড়ো কড়াতে জ্বাল দিতে হয় এবং উপর থেকে গদ বা ময়লা পরিষ্কার করে ছিদ্র যুক্ত খোলায় রেখে শ্যাওলার সাহায্যে আগের পদ্ধতিতে পাকা চিনি তৈরী করতে হয়। এই চিনির মধ্যে যার রং খুব সাদা বা বড়ো দানাওয়ালা তাকে দোবরা চিনি, আর

অপেক্ষাকৃত লালচে চিনির নাম 'একবরা চিনি'। পাকা চিনিই ইউরোপে রপ্তানি হত, দোলো চিনি মূলত দেশীয় বাজারে-বিক্রি হত।[৯] এই দুই পদ্ধতিতে তৈরী দোলো, দোবরা, একবরা চিনি অভ্যন্তরীন চাহিদা মিটিয়ে ভারতের বেনারস, আসাম, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা এবং ভারতের বাইরে আরব, পারস্য, চীন ও ইউরোপ, আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমে বাংলাদেশে বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত এবং নবদ্বীপের নিকটস্থ ধোবা' নামক গ্রামে প্রথম ইউরোপীয় কর্তৃক চিনি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্লেক নামক একজন ইংরেজ এই কারখানার প্রতিষ্ঠাতা।[১০] কিন্তু লাভ কম হওয়ায় তিনি নিউ হাউস ও সেন্টসবারি নামক ইংরেজের সাথে যৌথ ভাবে 'ধোবা সুগার কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই কোম্পানী তৎকালীন অবিভক্ত নদিয়ার কোর্টচাঁদপুর ও ত্রিমোহনিতে কারখানা স্থানান্তরিত করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে নদিয়ার চৌগাছায় 'Gladstone Wylie & Co' প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১] ১৮৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী ও কোম্পানির কর্মচারীদের উদ্যোগে নদিয়ার শান্তিপুর ও সুতরাগড়ে বেশ কয়েকটা চিনির কারখানা গড়ে ওঠে। এই সময় কোলকাতা থেকে ১৮,১৩,২৬৩ মণ চিনি রপ্তানী হয়েছিল ব্রিটেনে, যার সিংহভাগই ছিল শান্তিপুর ও সুতরাগড় অঞ্চলের তৈরী চিনি।[১২] বিংশ শতাব্দীর প্রথমে অবিভক্ত নদিয়া জেলায় দুটি বৃহৎ চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমটি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কুষ্টিয়া চিনিকল' ও দ্বিতীয়টি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে দর্শনায় 'বেরু এন্ড কোম্পানি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দর্শনা চিনিকলে প্রায় ১০০০ শ্রমিক কর্মচারী নিযুক্ত ছিল এবং বাৎসরিক ১০,০০০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন হত।[১৩] দর্শনায় চিনিকল প্রতিষ্ঠার প্রায় সম সাময়িক কালে নদিয়ার পলাশীতেও চিনিকল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই কারখানা ভারতের স্বাধীনতার পরও তার উৎপাদন অব্যাহত রেখেছিল। পরে ১৯৮০ দশকে অভ্যন্তরীন চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদন কমে যায় এবং ধীরে ধীরে কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়।

শর্করা শিল্পে ইংরেজ কোম্পানীর শোষণের বহুমুখী চরিত্র দেখা যায়। প্রথমদিকে দোলো চিনির কারখানার মালিকরা বর্ধিত চাহিদা সামাল দিতে আরও বেশি করে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতে চাইলে তারা কোম্পানির কর্মচারী বা আশ্রিত নায়েব গোমস্তাদের উপর আর্থিকভাবে নির্ভর করতেন, পরবর্তী ধাপে কোম্পানী বা তার কর্মচারী কোনো এলাকায় কারখানা স্থাপন করলে স্থানীয় প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে দেশীয় ব্যবসায়ী ও কারিগরদের তুলনায় কমদামে খেজুরের রস ও গুড় কিনত

এবং চাষীদের দাদনও দিত। ফলে স্বল্প মূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং স্বল্প মজুরি প্রদান এই দুই দিক দিয়েই তারা লাভবান হত। অনেক সময় পারিবারিক ভিত্তিতে অনেক গৃহপতি চিনি প্রস্তুত করে রাখত। বাজারে বিক্রির সময় কোম্পানির কর্মচারীরা বাজারের থেকে ২০-২৫ শতাংশ কমদামে জোর করে কিনে নিত। বিভিন্ন সময়ে জেলার প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং তা থেকে বেঁচে থাকার তাগিদ-ই তাদেরকে একাজ করতে বাধ্য করত। এত ধরনের শোষণ ও অবহেলা স্বত্বেও অনেক দেশীয় ব্যবসায়ী এভাবেই উন্নত মানের চিনি উৎপাদন করে আসছিলেন। আর এই ভাবে দেশীয় পদ্ধতি ব্যবহার করে যারা প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন তাদের মধ্যে নদিয়ার মানিকচন্দ্র দাস, কার্তিক চন্দ্র দাস, নিধিরাম রক্ষিত, বিষ্ণুচরণ ইন্দ্র প্রমুখ উল্লেখ্য।[১৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশকগুলি ছিল শর্করা শিল্পের অবনবনের যুগ। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে শর্করা শিল্পে উত্থান ও পতন দুই-ই পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে ঘরে ঘরে 'দলুয়া' চিনির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। শান্তিপুরের কার্তিক চন্দ্র দাস ১৯২০-২১ সালে কোলকাতার বড় বাজারে ও বেলগাছিয়াতে দুটি দেশীয় চিনির আড়ত খোলেন। স্বদেশী অনুপ্রেরণার এই সমৃদ্ধি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। দেশে ও বিদেশে দেশীয় চিনির অভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল আবার সেই তুলনায় উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছিল না। ১৯২৪ সালে ভয়াবহ ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব জেলার শর্করা শিল্পের পতন আসন্ন করে তোলে। ১৮৯০ দশক থেকে মরিশাস, জাভা প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ গুলি থেকে যন্ত্রে তৈরী সস্তা পাকা চিনি ইউরোপ ও দেশীয় বাজারে যত আমদানি হচ্ছে ততই দেশীয় চিনির চাহিদার অবনমন হতে দেখা যাচ্ছিল।[১৫] এই সময় থেকে মরিশাস থেকে আমদানিকৃত চিনি দেশীয় চিনির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

ঔপনিবেশিক সরকার এই সময় জেলার এই ঐতিহ্যশালী দেশীয় শিল্পকে বাঁচাতে ১৯৩২ সালের শিল্প সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করে বহিরাগত চিনির উপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপ করে।[১৬] ফলে বিদেশী চিনির আমদানি হ্রাস পেলেও দীর্ঘ ২৫-৩০ বছরের অবহেলা অনাদরের চাপ এই শিল্পটি সহ্য করতে পারেনি। এই সময় দর্শনা, কুষ্টিয়া, শান্তিপুর, পলাশীর চিনি কল গুলি ঠিক থাকলেও জেলার ছোট ছোট কারখানা গুলি বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া এই সময় ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হলে পশ্চিম ভারত শিল্পে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। ফলে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের চিনি কারখানা থেকেই বাংলা তথা নদিয়ায় চিনি আসতে শুরু করে। যুগ পরিবর্তনের ফলে মানুষের রুচি ও চাহিদায় পরিবর্তন আসে। ফলে মানুষ পরিশোধিত চিনির প্রতি আকৃষ্ট

হয়। ১৯৩৯-৪০ দশকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি দেশীয় শিল্পের প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চিনি শ্রমিকদের মজুরী হ্রাস পায়। ফলে অনেক শ্রমিক উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহারের চিনিকল গুলিতে শ্রমিকের কাজে যোগ দেয়। এই কারণেও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে তোলা চিনি কারখানাগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হতে থাকে। অবশ্য শান্তিপুরে শর্করা শিল্পের পতনের শেষ লগ্নে নিধিরাম রক্ষিত এই ব্যবসা ধরে রেখেছিলেন। কোর্টচাঁদপুরের কারখানাও তার উৎপাদন বেশ কিছুদিন ধরে রেখেছিল। ঔপনিবেশিক সরকারের পতনের সাথে সাথে এই কারখানাটিও বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় জেলার পলাশীতে যে চিনি কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা টিকে ছিল। স্বাধীনতা ও দেশ ভাগের ফলে নদিয়া জেলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ কুষ্টিয়া ও দর্শনার চিনি কারখানা গুলি বর্তমান বাংলাদেশে চলে যায়। ফলে শর্করা শিল্পে নদিয়া ক্রমশ শ্রীহীন হয়ে পড়ে। অবশ্য উদ্বাস্তু আগমন স্বত্বেও শর্করা শিল্পের পুনরুজ্জীবন হয়নি। কেননা প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাতে জেলার ছোট শিল্প গুলির পুনরুজ্জীবন এর জন্য কোন অর্থ বরাদ্ধ না থাকায় এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে (১৯৫১-৫৬ খ্রীঃ) বৃহৎ শিল্পের উপর জোর দেওয়া হলেও নদিয়া জেলায় সেভাবে কৃষিভিত্তিক কোন বৃহৎ শিল্পের উদ্ভব না হওয়ায় এবং সমগ্র ঔপনিবেশিক আমলেই যেহেতু এই শিল্পের পতন প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল তাই তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারও সেভাবে শর্করা শিল্পের পুনরুজ্জীবনে উদ্যোগ নেয়নি। কেবলমাত্র পলাশীর চিনি কলটি ব্যক্তি মালিকাকানাধীন হয়ে স্থানীয় শিল্প হিসাবে টিকে ছিল। ১৯৮০ দশকে সেটাও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচী গ্রহণ ও তার ফলে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে শর্করা শিল্পের কেন্দ্রীকরন হয়েছিল। তাছাড়া নদিয়া জেলায় আগত উদ্বাস্তুরা কেউই জেলার শর্করা শিল্পের টানে নদিয়া জেলায় আসেনি।  যারা এসেছিল তারাও কৃষিকাজ বা বিকল্প শিল্পে নিজেদের রোজগারের পথ খুজে নিয়েছিল। তাই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে শর্করা শিল্পের উন্নয়ন আর তেমন দেখা পাওয়া যায় না।

স্বাধীনতা উত্তরপর্বে নদিয়া জেলার শর্করা শিল্পের উন্নয়নের জন্য তৎকালীন কেন্দ্রিয় ও রাজ্য সরকারের কোন পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না। স্বাধীনতার পর ভারত সরকারের গৃহীত শিল্পনীতি অনুযায়ী পশ্চিম ভারতে শর্করা শিল্প মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও নদিয়া জেলার ক্ষেত্রে তা অসংগঠিত পর্যায়েই থেকে যায়। নদিয়া

জেলার একমাত্র পলাশী ছাড়া আর কোন জায়াগাতেই চিনি তৈরির কারখানা দেখা যায় না। তাছাড়া পশ্চিম ভারত থেকে জেলায় চিনি আমদানি হওয়ায় নদিয়া জেলার শর্করা শিল্পের সাথে যুক্ত উৎপাদক এবং শিউলিরা কেবলমাত্র খেজুরের গুড় উৎপাদনেই মনোনিবেশ করে। ফলে নদিয়া জেলার অর্থনীতিতে গুড় উৎপাদন স্থানীয় লোকশিল্প চর্চার স্তরেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। ১৯৭০ এর দশকে 'অসংগঠিত শিল্প' শব্দটি প্রচলিত হলেও জেলার শর্করা শিল্প এর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এমনকি বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও শেড়োকোম কোন উদ্যোগ দেখা যায়না। সস্তা দরের চিনির আমদানি হওয়ায় ১৯৮০-র দশকে পলাশীর চিনি কলটি চাহিদার অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ১৯৯০ এর দশকে বিশ্বায়নের প্রভাব নদিয়া জেলার শর্করা শিল্পে দেখা যায় না। সার্বিক ভাবে বলা যায় ঔপনিবেশিক সরকারের মুনাফা লোভী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সমাজে কৌলিক বৃত্তিতে পরিবর্তন এলেও পরিবর্তিত চাহিদার পরিবর্তন ও সরকারী উদ্যোগহীনতা জেলার শর্করা শিল্পের পরিণত অবস্থা থেকে ক্রমাবনতির জন্য দায়ী ছিল। যদিও এই শিল্প কিছু সময়ের জন্য হলেও জেলার অর্থনীতিকে খানিকটা সুদৃঢ় ভিত্তি দিতে সক্ষম হয়েছিল।

**তথ্যসূত্র :**


১. সুভাষ মজুমদার, *বাণিজ্য-বাঙালি-একাল ও সেকাল,* শঙ্খ প্রকাশক, বৈশাখ, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ ১৮৩

২. তদেব।

৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস,* আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৫০

৪. J. H. E. Garretl, Bengal District Gazetteers : Nadia, Govt. of West Bengal, Calcutta, 2001, P 123

৫. S. H. Robinson, The Bengal Sugar Planter : Being A Treatise on the Cultivation of Sugar Cane and date tree in Bengal and the Manufacture of Sugar and Rum there from, Bishop's college Press, Calcutta, 1849, P 8

৬. বিপিন বিহারী চক্রবর্তী, *খাটুরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনি,* শ্রী অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ৮২

৭. তদেব, পৃ ৮৯-৯০

৮. সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১, পৃ ৯৮৯

৯. তদেব, পৃ ৯৮৯-৯৯০

১০. বিপিন বিহারী চক্রবর্তীস পূর্বোক্ত, পৃ ৮১

১১. তদেব, পৃ ৮২

১২. কল্যাণী নাগ, *শান্তিপুর প্রসঙ্গ* (প্রথম খণ্ড), সুতরাগড়, বেনেপাড়া, শান্তিপুর, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ৫২

১৩. W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Districts of Nadia and Jersore, Vol. –II, D. K. Publishing House, 1973, P 32

১৪. কল্যাণী নাগ, পূর্বোক্ত, পৃ ৫২

১৫. তদেব, পৃ ৫২

১৬. তদেব।

# একটি কবিতা : মানবাধিকার ও নারীর অধিকার কথায় মুখর

অসিত রঞ্জন সাঁতরা
সহযোগী অধ্যাপক, রঘুনাথপুর কলেজ, পুরুলিয়া

**সার সংক্ষেপ** :- নির্যাতন আর নির্মাণের কৌশলী প্রয়োগে পিতৃতন্ত্র নারীকে গড়ে নিয়েছে নিজেদের প্রয়োজনের ছাঁদে।কিন্তু আলোকপ্রাপ্ত,স্বাবলম্বী নারী মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়।পিতৃতন্ত্রের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তের সংগ্রামে তাকে হতে হয় ক্ষত-বিক্ষত।তবুও সে অধিকারের,স্বাধীনতার অমৃত-আস্বাদ ছাড়তে নারাজ। অথচ একদল নারী মেয়েলিপনাকে বিজ্ঞাপিত করে থাকে রসে-বশে। কবিতার মোহিনী আড়ালে কবিতা সিংহ এভাবেই চারিয়ে দিয়েছেন নারীর অধিকার মানবাধিকারের ভাবনা।

**বিষয়সূচক শব্দ (Key Word) :** মানবাধিকার,নারীর অধিকার,পিতৃতন্ত্র,নারীবাদ।

মানবাধিকার (Human Rights) ধারণাটি দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টার ফলে একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও গতিশীল পরিসর লাভ করেছে।এই প্রচেষ্টা বহু ব্যক্তি-মানুষ ও বহু সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের। খ্রিস্ট পূর্বাব্দ কালের নির্বিকারবাদী (Stoic)দার্শনিক থেকে শুরু করে Anti-Slavery Movement এর দুঃসাহসী সৈনিকগণের অক্লান্ত প্রয়াসের সাফল্য হল মানবাধিকারের স্বীকৃতি।যে স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর United Nations এর দ্বারা প্রকাশিত ও ঘোষিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র বা Universal Declaration Of Human Rights এর মাধ্যমে।এই অধিকার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে সমভাবেই প্রযোজ্য।তাই 'The History Of Human Rights' গ্রন্থে Micheline R Ishay বলেছেন "Human Rights are rights held by individuals simply because they are part of the human species.They are rights shared equally by everyone regardless of sex, race, nationality and economic background. Across the centuries conflicting political traditions have elaborated different components of human rights or differed over which elements had priority."[১] এই সংজ্ঞা থেকেই বোঝা যায় মানবাধিকারের পরিসরের মধ্যে নারীর অধিকারও অন্তর্গত।তা সত্ত্বেও নারীর অধিকার যেন কোথাও একটু অন্যরকম।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দুটি ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-দাস প্রথা ও নারীর দাসত্ব শৃঙ্খল। কৃষির উদ্ভাবন ও ব্যক্তিগত মালিকানার সৃষ্টি হল দাস প্রথার মূল। “মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষ যখন উৎপাদনমুখী হলো,উৎপাদনের প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো তখন থেকে এর সূত্রপাত।সভ্যতার অগ্রযাত্রার সাথে প্রাচীনকালের সমাজেই এর উদ্ভব।প্রধানত কৃষির উদ্ভাবনের পর নতুন প্রস্তর যুগে এর সূত্রপাত। ”[২] আর কৃষিকাজের পত্তন হয়েছিল মেয়েদের হাতেই।কৃষিকাজ সৃষ্টি করেছিল বাড়তি উৎপাদনের সুযোগ।বাড়তি উৎপাদন সৃষ্টি করল ব্যক্তিগত মালিকানার।মালিকানার হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজন পড়ল রক্ত-সম্পর্কের উত্তরসূরির।তাই সমাজ হল মাতৃতান্ত্রিক থেকে পিতৃতান্ত্রিক ও একগামি।এই একগামিতা প্রযোজ্য হল শুধুমাত্র নারীর ক্ষেত্রে।নারী হল দাসী।“মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ হচ্ছে স্ত্রী জাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়।পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্বও দখল করল,স্ত্রীলোক হল পদানত,শৃঙ্খলিত,পুরুষের লালসার দাসী,সন্তান সৃষ্টির যন্ত্রমাত্র।”[৩]

কালক্রমে দাসত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য পরিকল্পিত হল ‘সতীত্ব’,’মাতৃত্ব’,’দেবীত্ব’-প্রভৃতি মহার্ঘ খেতাব।শাস্ত্র যখন ব্যর্থ হয় তখন প্রয়োগ করতে হয় শস্ত্র।প্রসঙ্গটি সুকুমারী ভট্টাচার্য উপনিষদের একটি শ্লোক অনুবাদ করে দেখিয়েছেন- ‘মান্যবর যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন-, “স্ত্রী যদি স্বামীর সম্ভোগ কামনা চরিতার্থতা করতে অস্বীকার করে,তাহলে স্বামী প্রথমে কোমলভাবে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করবে,তারপরে উপহার দিয়ে তাকে কিনে নিতে চেষ্টা করবে (অবক্রীণীয়াৎ) এবং তারও পরে স্ত্রী রাজি না হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে বশ করবে।”[৪]

দমন-পীড়ন যেমন সত্য,প্রতিবাদও তেমনই সত্য। প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ হয়তো সব সময় আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় না কিন্তু তারও একটা পরোক্ষ প্রভাব থাকে। একক প্রতিবাদের প্রচেষ্টা যখন সংগঠিত রূপ নেয় তখন তার তীব্র অভিঘাত সব কিছু বন্ধনকে চুরমার করে দিতে চায়।ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে নারীর অধিকার (Women’s Rights) নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়।‘নারীবাদ’ শব্দটিও ব্যবহৃত হতে শুরু করে।অক্সফোর্ড অভিধান ১৮৯৪ সালে ‘নারীবাদ’ Feminism শব্দটিকে গ্রহণ করে। Encyclopaedia Britanica’য় উল্লিখিত নারীবাদের সংজ্ঞা হল Feminism,the belief in social,economic and political equality of sexes.বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রথম নারীবাদী কবি হলেন কবিতা সিংহ। তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর গ্রন্থিত কবিতার তুলনায় অগ্রন্থিত কবিতার সংখ্যা অনেক বেশি। তাঁর একটি অগ্রন্থিত কবিতার

মাধ্যমে মানবাধিকার ও নারীর অধিকার প্রকাশিত হয়েছে তীব্রভাবে।কবিতাটি হল 'আমিই সেই মেয়েটি'।

ব্যক্তির বিকাশের জন্য যে সকল সুযোগ ও সুবিধা তার সবটুকুই নারীরও প্রাপ্য।অথচ সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত পিতৃতন্ত্র তার আধিপত্য ও ভোগ কায়েম রাখার জন্য মেয়েকে 'মেয়েছেলে' রূপে নির্মাণ করেছে। বিনষ্ট করেছে তার স্বাভাবিক বিকাশ।অবলুপ্তি ঘটিয়েছে তার চিন্তা-চেতনা ও মেধার অবকাশ।গড়ে তুলেছে নিজেদের ভোগের ছাঁচে।সে এখন খাঁচার পাখি।হাতের পুতুল।কবিতার প্রথম ভাগে আছে সেই পুতুল নির্মাণের কাহিনী।

কবিতার প্রথম স্তবকে আছে সেই মেয়েটিকে কেমন করে স্বাগত জানানো হয় তার ছবি।আনন্দে কেউ শাঁখ বাজায় না।উচ্ছ্বাসে কারুর হৃদয় তোলপাড় হয় না। যে নারীর গর্ভ থেকে তার জন্ম তারও কেউ খোঁজ করে না। কেবল জ্যোতিষীর ছকে তাকে বন্দী করার সুপরামর্শ চলে। পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধি পিতা-ভাই-স্বামী-পুত্রের স্বার্থ-সুখের খোঁজ চলতে থাকে। সেই মত তৈরি হয় পরিকল্পনা।

আমিই সেই মেয়েটি
সেই মেয়ে যার জন্মের সময়ে কোনও শাঁখ বাজে নি
জন্ম থেকেই যে জ্যোতিষীর ছকে বন্দি
যার লগ্ন রাশি রাহু কেতুর দিশা খোঁজা হয়েছে
না-
তার নিজের জন্য না
তার পিতার জন্য
তার ভাই-এর জন্য
তার স্বামীর জন্য
তার পুত্রের জন্য
কিন্তু যাঁর গর্ভ থেকে আমার জন্ম সেই মায়ের কথা
বলেনি কেউ!
("আমি সেই মেয়েটি",অগ্রন্থিত কবিতাবলি')

এই অনাদর, অবমাননা কিন্তু একটি পুরুষ শিশুর ক্ষেত্রে ঘটে না।তার জন্মে শাঁখ বাজে।হয় কত আদরের আয়োজন।সুকুমারী ভট্টাচার্য তৈত্তিরীয় সংহিতা থেকে একটি শ্লোক অনুবাদ করে জানিয়েছেন- "একটি সোমযাগে কয়েকটি যজ্ঞপাত্র মাটিতে রাখা

হয়,কয়েকটি উপরে তুলে ধরা হয়, “সুতরাং সদ্যোজাত কন্যা সন্তান মাটিতে রাখা হয়,পুত্র সন্তান উপরে তুলে ধরতে হয়।”[৫]

কন্যা সন্তান মানেই বিয়ের জন্য বলি প্রদত্ত।বিয়ের বাজারে নয়ন-সুখকর নারীর কদর বেশি।তাই বাজারদর কীরকম হতে পারে বা কোন হাটে বিকোতে পারে সেই কারণে মেয়েটির ত্বকের রঙ,নাকের গড়ন,চুলের বহর নিয়ে চলে বিস্তর আলোচনা-গবেষণা।কিন্তু তার মস্তিষ্কের গ্রে মেটারের জন্য থাকে না কারুরই চিন্তা ভাবনা।কারণ গ্রে মেটারের বিকাশ ঘটলেই বিপদ। শাস্ত্রে “আমরা শুনতে পাই যে শিক্ষিতা নারী আসলে পুরুষই।”[৬]

আমিই সেই মেয়েটি-
যে জন্ম থেকেই বিবাহের জন্য বলি-প্রদত্ত
যার বাইরের চেহারা
চোখ নাক মুখ ত্বক চুল রং নিয়েই কেবল
দর কষাকষি!
কালো না ফর্সা
খাঁদা না টিকালো
লম্বা না বেঁটে
কুঁৎকুঁতে না টানাটানা?
যার মাথার বাইরের জন্যই সকলের ভাবনা
মাথার ভিতরটা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই- ( ঐ)

গ্রে ম্যাটারটা অপারেট করে দিয়ে সুকৌশলে শুরু হয়ে যায় ‘মেয়েছেলে’ নির্মাণ।যে হবে জ্যান্ত পুতুল,রক্ত-মাংসের ভোগ্য বস্তু।যাকে শেখানো হয় জোরে কথা বলতে নেই।জোরে কথা বললে যে প্রতিবাদের সম্ভাবনা থেকে যায়। ছুটতে নেই। ছুটলে যে ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়। শরীর শক্তিশালী হয়ে ওঠে।তাহলে যে সমূহ বিপদ।তার কান্না,তার ঘুম,তার ক্লান্তি কোনো কিছুই প্রকাশ করতে নেই।সহ্যশক্তি যে সতী নারীর মহৎ গুণ।এভাবেই অধিকারহীন বোকা মেয়েটিকে মহিমান্বিত করে দেবীত্বে উত্তীর্ণ করে দেওয়া হয়।তবেই না নির্মাণ সম্পূর্ণতা লাভ করে।যেমনটা সিমোন দ্য বোভেয়া তাঁর ‘The Second Sex গ্রন্থে বলেছেন “One is not born,but rather becomes a women.”[৭]

আমিই সেই মেয়েটি
যে ছোটবেলা থেকেই শুনেছে
জোরে জোরে কথা বলতে নেই-
ছুটতে নেই-
চেঁচাতে নেই-
হাসতে নেই-
এমনকী কাঁদলেও-
লুকিয়ে লুকিয়ে-
আমিই সেই মেয়েটি যাকে বলতে নেই-
খিদে পেয়েছে
ঘুম পেয়েছে
ইচ্ছে করছে না
ক্লান্তি লাগছে
আর পারছি না
আর পারছি না !
আমিই সেই মেয়েটি
খেলার জন্য যার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে পুতুল
পুতুলের আদল পাওয়ার জন্য-
পুতুলের সংসার বানাবার জন্য।

ব্যক্তিগত সম্পদ ও সম্পত্তির পরবর্তী প্রজন্মের হাতে হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজন পড়ল উত্তরাধিকারীর পরিচয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার।তাই প্রবর্তন ঘটল বিবাহের ও একগামিতার। সে একগামিতা অবশ্যই নারীর। বিবাহিতাকে চিহ্নিত করার জন্য উদ্ভাবিত হল নানা পন্থা। কপাল ফা্যটিয়ে স্থায়ী চিহ্ন এঁকে দেওয়া থেকে শুরু করে হাতে লোহার বালা-এরকম অনেক কিছু।সে বিয়ে আবার চরম স্বৈরাচারিতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হল পুরুষের বহুবিবাহের ফলে।অকাল বৈধব্যের পাশবিক যন্ত্রণা,বহু সন্তানের জন্ম দেওয়ার বেদনা আর নানা রকম ব্যভিচারেও মন ভরল না স্বার্থপর পিতৃতন্ত্রের।স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির লোভে তাকে স্বামীর চিতায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা হল সতীত্বের নামে।পৃথিবীর নানা দেশে,নানা কৌশলে,অত্যাচার আর

অবদমনের দ্বারা নারীকে বেঁধে রাখার যে পাকা বন্দোবস্ত হল সে কথাই ধ্বনিত হয়েছে কবির কলমে,যা আগে কখনো হয় নি।

আমিই সেই মেয়েটি-
যে জন্ম জন্মান্তর আগের-
প্রাগৈতিহাসিক জ্যোৎস্নারাত্রির স্বপ্ন দেখে
এখনও আতঙ্কে চমকে চমকে উঠি।
সেই অর্ধদানব অর্ধমানবের প্রস্তর কুড়ালে কাটা আমার সিঁথি দিয়ে
ঝরতে দেখেছি রক্তের ধারা
আমার হাতে লোহার শিকল দিয়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি !
এক গোষ্ঠী থেকে আর এক গোষ্ঠীর দিকে
লুণ্ঠিত সম্পদের মতো জন্ম জন্মান্তরে-আমি বীর্যশুল্কার চৈতন্য
বহন করে নিয়ে চলেছি!
আমার স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠে দেখেছি-
সেই রক্তের চেতনায় মেয়েরা যত্নে পরছে সিঁদুর
হাতে লোহার বালা......
আমিই সেই মেয়েটি
যে গত কোন্ শতাব্দীতে-
পাঁচ বছর বয়সে মালা দিল গঙ্গা যাত্রীর গলায়
কুলীন ব্রাহ্মণের তিনশো পঁয়ষট্টিতম স্ত্রীর অন্যতমা হয়ে
স্বামীর গরবে গরবিনী
একাদশীর দিন অবুঝ দশমী বালিকার তৃষ্ণায়
আটক ঘরের মাটি লেহন করতে করতে
প্রাণত্যাগ করেছি!
সন্তানের পর সন্তান জন্ম দিতে দিতে রক্ত শূন্যতায় মুখ থুবড়ে
পড়েছি সূতিকাগারে
জ্বলে পুড়ে মরেছি সতীদাহে।
আমার অসহায়ত্বের জন্য পুরুষের পৌরুষ
ওঁৎ পেতে থাকে।

নির্যাতন আর নির্মাণের ভাষ্য রচনার পরে কবি একালের আলোকপ্রাপ্ত নারীর সমস্যা চিত্রিত করেছেন। আলোকপ্রাপ্তা, দক্ষ, সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমতী নারীকে যে পুরুষের সহ্য নয়।তার চাই দেহে-মনে তুলতুলে নরম মেয়ের, 'মেয়েছেলে'র।তাই চাকরির জায়গায় দক্ষতা দেখাতে নেই,প্রেমিককে তার প্রেমপত্রের বানান ভুল ধরিয়ে দিতে নেই,কবিতা লিখতে নেই,আরো কত কিছু যে করতে নেই তা বলে বোধ করি শেষ করা যাবে না।

আমি বুঝতে পারিনি যে,
চাকরির জায়গায় নিজের কুশলতা
দেখাতে নেই
আমি বুঝতে পারিনি যে,
আমার প্রেমিককে তার প্রেমপত্রের বানান ভুলগুলো
ধরিয়ে দেওয়াটাই আমার ভুল হয়েছিল
আমি বুঝতে পারিনি যে,
আমি যদি কবি হতে চাই
আমার বন্ধুরা বলবেন-'ওটা কবিতা হয় নি
পদ্য হয়েছে
আমি বুঝতে পারিনি যে,
একবিংশ শতাব্দীর শেষ সীমানায় এসেও
এই পুরুষশাসিত পৃথিবী বুদ্ধিমতীদের জন্য
অপ্রস্তুত। (ঐ)

পুরুষশাসিত পৃথিবী বুদ্ধিমতীদের গ্রহণ করতে অপ্রস্তুত কারণ তাদের রক্তের মধ্যে বয়ে চলেছে যুগ-যুগান্ত লালিত আধিপত্যবাদ।তাই তারা মনুষ্যত্বের মহিমায় উজ্জ্বল নারীকে সহকর্মী ও সহমর্মী রূপে গ্রহণ করতে শেখেনি। মানিয়ে নিতে,অভ্যস্ত হতে তাদের আঁতে ঘা লাগে।

অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিকতার এই মানসিকতাকে মূলধন করে কিছু মেয়ে নির্বোধ সেজে,মেয়েলিপনাকে বিজ্ঞাপিত করে দিব্যি চালিয়ে নেয়।'মেয়েছেলে' বনে গিয়ে তারা কুড়িয়ে নেয় বেনারসি শাড়ি,হীরাপান্নার অলঙ্কার,বাসের সিট পর্যন্ত অনেক দ্রব্য-সামগ্রী।কিন্তু এই মেয়েটি যে কোনো কিছুতেই ন্যাকা সাজতে রাজি নয়।পুরুষতন্ত্রের মন ভোলানোর প্রসাধন তার অসহ্য। পাউডারে এলার্জি হয়,সুস্বাদু লিপস্টিক খেয়ে ফেলে,শাড়ি-গয়না ছুঁড়ে ফেলে বিদ্যার উজ্জ্বলতায় প্রতিষ্ঠিত হতে চায়।তার জন্য সে

জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়েও হেঁটে যেতে প্রস্তুত কিন্তু 'মেয়েছেলে' বনতে রাজি নয়।কবি তাই নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেন-

শূকরী পালের মতো মুখাবয়বহীন রমণীর অপ্রয়োজন?
প্রয়োজন আন্তিগোনের মত দৃপ্ত নারীর।("আন্তিগোনে," 'হরিণাবৈরী')

শিক্ষার অগ্নিস্পর্শে পরিশুদ্ধা নারী আজ ধরে ফেলেছে পিতৃতন্ত্রে যাবতীয় ফাঁক আর ফাঁকি।সমস্ত প্রকার বন্ধন আর প্রলোভন ছিন্ন করে সে আজ অমৃতের অভিসারী।সে অমৃত হল নারী-মুক্তি,নারী-স্বাধীনতা,নারীর স্বাতন্ত্র্য,তার সমান অধিকার।
সে স্বাদ যে একবার গ্রহণ করেছে তাকে আর কোনভাবেই পদানত করা যাবে না।সে যে আজ যুগান্তরের দহন শেষের অগ্নিশুদ্ধা।

আমি প্রণাম জানাই সেই প্রথম আগুনকে
যার নাম বর্ণ-পরিচয়
সেই অগ্নিশুদ্ধ্ পরম্পরাকে
সেই সব পুরুষ রমণীকে
যারা ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্ধকারের হাতল
জ্ঞানের শিখা জ্বালিয়ে
এক জন্মেই আমাকে জন্ম-জন্মান্তরের
দরজা খুলে দিয়েছেন।
আমি আজ চরিত্রের দিকে চলে যেতে যেতে খুলে ফেলেছি
পণ দিয়ে কেনা বিবাহের ঝুটো গয়না
সংস্কারের বেনারসি
আমাকে ভুলিয়ে রাখার পানের বাটা-
জর্দার কৌটো
আমাকে পায়াভারী করানোর জন্য পিতা স্বামী শ্বশুরের
পদস্থ দাবি-
আমি আজ প্রেমের জন্য ফেলে যাচ্ছি আরাম
স্বোপার্জিত শাকান্নের জন্য ফেলে যাচ্ছি ক্রীতদাসীর চর্বচোষ্য
জেগে থাকার জন্য ফেলে যাচ্ছি ভাতঘুম
যন্ত্রণার জন্য ফেলে যাচ্ছি সুখ

জ্ঞানের জন্য ফেলে যাচ্ছি অন্ধতা
আনন্দের জন্য ফেলে যাচ্ছি সাফল্য
অমৃতের জন্য ঐশ্বর্য
আমার হাতে জ্বলছে দিশারীদের শিক্ষার মহান আগুন
আমিই সেই মেয়েটি আপনারা নিজের দর্পণে দেখে
আমাকে চিনুন।
("আমি সেই মেয়েটি",অগ্রন্থিত কবিতাবলি')

ঘরে ঘরে দেখা দিক সেই মহামানবী।পৃথিবী তারই অপেক্ষায়। আর পিতৃতন্ত্র ধাতস্থ হোক তার সঙ্গে শুদ্ধ সহাবস্থানে।

**তথ্যপঞ্জি:**


১. Micheline R Ishay,The History Of Human Rights,Orient Longman,First Edition,2008,p-3(Introduction)

২. সিরাজ উদ্দিন সাথী, 'দাস প্রথা',অ্যাডর্ন পাবলিকেশন,২২সেগুন বাগিচা,ঢাকা-১০০০,বাংলাদেশ,দ্বিতীয় মুদ্রণ-২০১৭,পৃ.-২০

৩. ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, 'পরিবার,ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ,কলকাতা,একাদশ মুদ্রণ ২০১৪,পৃ.-৪১

৪. সুকুমারী ভট্টাচার্য,'প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ', ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৩১,২০০৬, পৃ.-৬

৫. তদেব পৃ.-৬

৬. তদেব পৃ.-৬

৭. Simone de Beauvoir,The Second Sex 1949.Trans and Ed H.M. Parshley. Harmondsworth,Penguin 1987,p-295

# পৃথিবীতে আদি সময়ের জনস্বাস্থ্য ও লোক চিকিৎসা পদ্ধতি

জিতেশ চন্দ্র রায়
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ
প্রসেনজিৎ নায়েক
SACT (GL), ইতিহাস বিভাগ, সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়, পাঁশকুড়া

**সারসংক্ষেপ (Abstract) :** মানব ইতিহাসের আদি, মধ্য ও আধুনিক, প্রতিটি ধাপে মানুষ যেমন সুখ চেয়েছে, তেমনই দুঃখও পেয়েছে কম নয়। মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার দেহ। আর এই দেহকে নিয়েই অশেষ কৌতুহল। এই কৌতুহল-ই মানুষকে মানুষ করেছে, সামাজিক করেছে। মানব শরীরের রহস্যময় আচার-আচরণ পরিস্কার হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের চোখে। নানান জটিল রোগের মোকাবিলা সম্ভব হয়েছে। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে পৃথিবীতে তখনও মানুষ ছিল, রোগ ছিল, জ্বালা-যন্ত্রনা ছিল, কিন্তু চিকিৎসা ছিল না। তখন ছিল জড়িবুটি – ঝাড়ফুক – হ্লিংক্লিং মন্ত্রোচারণ ও ভয়াবহ পাশবিক নিদান। কিন্তু তখন সেই সময়কালে সেটাই ছিল চিকিৎসা। তাই যে সবের কোন অস্বাভাবিকতাও ছিল না। ঔষুধপত্র বলতে নানা গাছ-গাছড়ার রস বা শিকড় ও ছালই তখন অগতির গতি। যুগ-যুগান্তরে, কালে-কালান্তর ঘটে যাওয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই গতি - প্রগতিকেই ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

**সূচক শব্দ (Keywords) :** প্রাক্-ঐতিহাসিক, জনস্বাস্থ্য, লোক-চিকিৎসা, জন্মান্তরবাদ, হিপোক্রেটিসের শপথ, চিত্রলিপি, আর্য-ঋষিগণ ।

মূল বিষয় (Introduction) : আদিম মানুষেরা ভাবত, অতি প্রাকৃতিক শক্তিই রোগের মূল কারণ। তাই শরীরে যে কোন হ্যাঁপা শুরু হলেই, আদিম মানুষ নদী, পাহাড় ও পর্বতে ছুটত, আত্মার কাছে প্রার্থনা করত, অপ-আত্মাকে শরীর ছাড়ার পরামর্শ দিত। আর এভাবেই গড়িয়ে যেত দিন ও রাত। মানুষ ধীরে ধীরে টের পেয়েছে, সাধারণ প্রাকৃতিক শক্তির গোলমালেই রোগের জন্ম ও বাড়বাড়ন্ত, সেখানে দেবী বা অতি প্রাকৃতিক শক্তির কোনই ভূমিকাই নেই। যুগান্তর এল মানুষের জীবনে ও যাপনে। এই যে মানুষের নিজের প্রতি অগাধ আস্থা এল, তাই-ই হল সভ্যতার মূল উপাদান। তবে একথাও ঠিক যে, যাযাবর, শিকারী এবং আহরণকারী সমাজে সভ্যতার জন্ম সম্ভব ছিলনা। কারণ স্থিতিশীলতা স্থায়ী সংগঠিত গোষ্ঠী সমাজ এবং খাদ্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা

ছাড়া সভ্যতার বিকাশ ঘটে না। ফলে কৃষিজীবী সমাজ থেকে নদীভিত্তিক সমাজ ছিল নিঃসন্দেহে উন্নত। এই উন্নত অবস্থায় পৌছতে অনেক সময় লেগেছিল। প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের প্রধান নদীভিত্তিক সভ্যতাগুলি, যেমন মেসোপটেমিয়া, মিশর, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা।

ফ্যারাওদের (রাজকীয় উপাধি) দেশ মিশর। এই মিশরেই চিকিৎসা প্রথম বিজ্ঞান হয়ে উঠে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মিশরের নানা জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি করে অসংখ্য প্রাচীন নির্দশন পেয়েছেন, যা আমাদের আজও বিস্ময়ে হতবাক করে। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মাটির নীচে আবিস্কার করেছেন অতি প্রাচীন মমি (সমাধি মন্দির)। এই সমাধি মন্দিরের গায়ে লেখা (মিশরীয় লেখাকে বলা হয় Hieroglyphic[১] বা চিত্রলিপি) পাঠ করে পন্ডিতেরা জেনেছেন এই গর্ভ মন্দিরটি অতি প্রাচীন যুগের এক ফ্যারাওয়ের মেমসাহেবের। তিনি যখন মমি হয়ে গর্ভ গৃহে ঢুকেছেন, তখন সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর। অর্থাৎ আজ থেকে পাক্কা সাড়ে চার হাজার  বছর আগের ঘটনা। মমিটি এত বছর পরেও এখনও অটুট; এতটুকু পচনের দাগ পর্যন্ত নেই কোথাও। মমির শরীরটির উপাদান পরীক্ষা করে ও গর্ভ মন্দিরের নানা স্থানে জিনিষপত্র ঘেঁটে বিজ্ঞানীরা চমকে উঠেছেন। নানা রোগের উপযুক্ত ঔষুধই যে সেখানে উপস্থিত।

প্রসঙ্গক্রমে গ্রীক ইতিহাসকার ও মানব সন্ধানী  হেরোডোটাস, তার লেখা 'আমার দেখা মিশর' বইয়ে বলেছেন যে, "…..ওদের মতো স্বাস্থ্য সচেতন জাতি আমি আর দুটি দেখেননি। ওঁদের ঘরদোর, পথ-ঘাট, নালা-নর্মদা সবই ঝকঝকে, তকতকে। ওঁরা যত্রতত্র থুতু ফেলে না, প্রকৃতির ডাকে বসে পড়ে না, আর্বজনাও ফেলে না। ওরা ব্রোঞ্জের পেয়ালায় পানীয় খায়, থালা, বাসন দুবেলা ঘষামাজা করে। চমৎকার লিনেনের পোশাক-আশাক পরে ঘোরো । দিনে দুবার স্নান করে, নিয়মিত কাপড় কাচে, গায়ে যে সুগন্ধি ব্যবহার করে, তাও মনকে মাতিয়ে তোলে। সত্যি ওঁদের জবাব নেই।"[২]

সাধে কি টানা আড়াই হাজার বছরের ওপর মিশরের এই প্রাচীন সভ্যতা জেগে ছিল। কথাতেই বলে, 'স্বাস্থ্যে যদি মন না দাও, প্রগতিও হবে উধাও।' চিকিৎসায় মিশরীয়রা যে চমৎকার এগিয়েছিল, তার মূল কারণ হল এরা 'জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হলেও, দেহের পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিল না।' তাই এরা শরীরকে সাধ্যমত যত্নআতি করত, মৃত্যুর পরেও মৃতের দেহাংশ নানা জারক বসে মিশিয়ে সংরক্ষিত করা হত বা গোটা শরীরকেই মমি করে ফেলা হত। এই শরীর নিয়ে চিন্তাভাবনাই এদের চিকিৎসায়

এগিয়ে এনেছে। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যেও মিশরীয়রা অনেক এগিয়ে। ফলে বাণিজ্য সূত্রে পেয়েগেছে নানা দুর্লভ গাছ-গাছড়া, যা চিকিৎসার কাজে খুবই জরুরি। চিকিৎসার স্রোত মিশর থেকে গ্রীসের মাটিতে ঢুকে পড়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরেই। যদি 'রোগ থেকে সত্যি সত্যি দশ হাত দূরে থাকতে চাও, তবে শরীরচর্চায় মন দাও'-এই কথাটাও আড়াই-তিন হাজার বছর আগে গ্রীক বদ্যিরা আমাদের পই পই করে বলে গেছেন। অর্থাৎ 'ভক্তি নয়, শরীরের শক্তিই' যে পারে রোগের সম্ভাবনাকে দূর করতে, সে মহাশক্তি প্রাচীন মানব সভ্যতারই নিদান। 'Prevention is better than cure' এই আপ্ত বাক্যটির আঁতুড়ঘর ওই অতি প্রাচীন মানুষেরাই গড়ে গেছেন। শরীরচর্চার ব্যাপার স্যাপার অতি প্রাচীন গ্রীসে তাই দারুণ জমে উঠেছিল। নানা ধরণের খেলাও তখন চলেছে ওই জিমন্যাশিয়ামগুলির আখড়ায়।

'পালোয়ান ব্যায়াম করুক
আর জ্ঞানবান আলো গড়ুন' ।

এই ছিল গ্রীস সভ্যতার সরল সমীকরণ। এমন কি 'ম্যারাথন' দৌড়টিও প্রাচীন গ্রীসের উপহার। মানব ইতিহাসে প্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ এর বসন্তে, এই সময়টি আজও সোনার কালিতে লেখা রয়েছে।

গ্রীসের সভ্যতার মহাপুরুষ 'হিপোক্রেটিস'।[৩] তিনি ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রকৃত পিতা। তিনি বলেছেন যে, 'পরিস্কার পরিচ্ছন্ন তাই হল সেরা সপান । অপরিস্কার থাকলেই ঘা হয়। শরীরে কোন ক্ষত তৈরি হলে, সবার আগে দরকার ক্ষতের মুখটিকে পরিস্কার রাখা। শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতিও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা চাই। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার যে কোন বিকল্প নেই তা, তিনি ঘা চিকিৎসার ক্ষেত্রে জানিয়ে দিয়েছেন – এক: ক্ষতস্থানটি পরিস্কার জলে নিয়মিত পরিস্কার করা চাই। দুই: এরপর ক্ষতের মুখে ভেষজ উদ্ভিদ রসের প্রলেপ চাই। তিন: তারপর পরিস্কার কাপড়ে তা শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। না হলে বাতাসের ধূলোবালি ক্ষতে গিয়ে আরো তাকে বিপজ্জনক করে তুলবে। জীবনের শেষ বেলায় তিনি লিখেছেন 'হিপোক্রেটিক ওর্থ' বা 'হিপোক্রেটিসের শপথ'। সেই শপথের কিছু কথা, "আমি সর্বান্তঃকরণে আমার চিকিৎসা আর্তের সেবায় নিয়োজিত করবো, কখনও কাউকে আঘাত করবো না অথবা কোন কুপথে নিজেকে সঁপেও দেবনা।"[৪] আজও এই অতি আধুনিক যুগেও তার পুরানো আলো, চিকিৎসকদের অন্ধকারে নতুন পথ দেখায়, নতুন পাথেয় এনে দেয়।

এর পরেই এসেছে ভারতের প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার পরিচিতি। সিন্ধু নদীর অববাহিকা জুড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে গড়ে উঠেনি এক অত্যাশ্চর্য সভ্যতা। প্রাচীন ভারতীয় এই সভ্যতার স্বাস্থ্য সচেতনতা সে কি পরিমাণ সচেতন ছিলেন, তা তাদের নগরজীবন ধারার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। কী ঝকঝকে রাস্তা, রাস্তার ধারে নালা, আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থা-----সব মিলে বলা যায় 'একমেবা দ্বিতীয়ম্'। এক কথায় এই সভ্যতার প্রকৃত শক্তিই হল স্বাস্থ্যের প্রতি অচলা ভক্তি।

ভারতের সিন্ধুসভ্যতার পাশাপাশি সমান্তরাল স্রোতের মতো বয়ে গেছে আরও এক সভ্যতা নাম হরপ্পা সভ্যতা। এর পর এল বৈদিক সভ্যতা। বৈদিক সভ্যতা গ্রামীন সভ্যতা। বৈদিক সভ্যতার আয়ু মোটামুটি ভাবে বারোশো বছর (খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক)। এই বিশাল সময় সারণিতে কত যে বিস্ময়কর চিকিৎসা-প্রতিভা এসেছে তা গুনে শেষ করা যাবে না। ভরদ্বাজ, আত্রেয়, অগ্নিবেশ, ধন্বন্তরি, সুশ্রুত, জীবক ও চরক । এদের নাম আজও চিকিৎসা বিজ্ঞানের আকাশে অম্লান ধ্রুব তারা । এদের মধ্যে বেশি নাম ডাক চরক ও সুশ্রুতকে নিয়েই। এরা গবেষণার কথা নিজেদের সংহিতায় লিখে গেছেন। 'সুশ্রুত-সংহিতা' ও 'চরক-সংহিতা' এই দুই মহাগ্রন্থ ভারতীয় আয়ুর্বেদের দুই হরিহর আত্মা। একটিতে মূলত শল্য চিকিৎসক প্রসঙ্গ, অন্যটিতে সাধারণ আয়ুর্বেদ চিন্তা। সুশ্রুত মুখ্যত শল্য চিকিৎসক। সেই বৈদিক যুগে তিনি এসেছিলেন যখন শান্তি-স্বস্তয়ন ও যুদ্ধ-বিগ্রহ পাশাপাশি বয়ে চলেছে দুই সমান্তারাল ধারায়। আর্যযোদ্ধারা প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রে তির বিদ্ধ শরীরে হাঁপাতে হাঁপাতে যখন ফেরেণ, তখন তাদের শুশ্রুষার ভার শল্যবৈদ্যের হাতে। এছাড়া নানা দুরারোগ্য রোগের অস্ত্র চিকিৎসায় কিভাবে নিরাময় হয়, তার আত্মবিশ্বাসী আলোচনা রয়েছে সুশ্রুত-সংহিতায়।

এছাড়া চড়ক-সংহিতা তো বিশ্ব ইতিহাসে এক তুলনাহীন মহাগ্রন্থ। ভ্রূণের সৃষ্টির ইতিহাস, মানব শরীরের গঠন, শরীরে তিন ধাতুর (বায়ু, পিত্ত ও কফ) পারস্পরিক সাম্য অবস্থা ও অসামান্যবস্থায় শরীর ও স্বাস্থ্য, নানা রোগের উৎস, স্ফূরণ ও প্রসারণ, রোগের গতির পূর্বাভাস। রোগ নির্ণয়ের পথঘাট, নানা রোগ নিরাময়ের মাধ্যমে শরীরে নবযৌবন সঞ্চারের যন্ত্র-কৌশল ইত্যাদি সব কিছুরই উল্লেখ আছে চরক সংহিতায়।

প্রকৃতপক্ষে আর্য-ঋষিগণই ছিলেন আর্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির প্রকৃত বাহক। তাদের পান্ডিত্য দ্বারা সমগ্র জাতি উপকৃত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার তার, 'Indian Thought the Ages' গ্রন্থে বলেছেন যে, "মধ্যযুগীয় ইউরোপে

গীর্জা ছিল যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষস্থান, তেমনি প্রাচীন ভারতে ঋষিদের আশ্রম ছিল জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান।"[৫] ঋষিরা চিরকালই আমাদের সমাজের নেতা। একজন ইংরেজ মনীষীর কথায়, "The Indian concept of Rishi is closely linked to leadership. The Rishi is neither a monk nor a priest but a complete being who is detached and yet involved in his work."[৬]

এই ভাবেই অতি পুরানো দিনে ভারতের মাটিতে স্বাস্থ্যের পতাকা উড়েছে তরতরিয়ে। তখন মানুষ জানতো রোগ থেকে রেহাই পাবার একটাই সুপথ, তা হল শরীরকে সুস্বাস্থ্যে ভরিয়ে তোলা। শরীরচর্চা ও পরিমিত আহারই স্বাস্থ্যলাভের সহজ পথ। সাধারণ মানুষের ভেতরে স্বাস্থ্য চেতনা না হলে যে রোগ বিরোগের হাত থেকে রেহাই মিলবে না, তা টের পাবার পরেই জনস্বাস্থ্য আইন ১৮৪৮ সালে ব্রিটেনে। চিকিৎসা ইতিহাসে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত এই প্রথম পদক্ষেপ। এই আইনে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়, দেশের যে কোন শহরে এক দশমাংশ করদাতা ও জনস্বাস্থ্য বোর্ড গঠনের দাবি জানায়, তবে সরকারকে সেই ইচ্ছাটি পূরণ করতেই হবে। এভাবে তলে তলে একটি রিপ্লবই ঘটে গেল জনস্বাস্থ্য চেতনার জগতে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষ ধীরে ধীরে ইতিহাসের পথে পথে পা দেয়। সভ্যতা এগিয়েছে সামনে। পা হয়ে উঠেছে রনপা, ইতিহাসের চাকা এভাবেই সামনে এগিয়েছে। ওই চাকায় ফুটে উঠেছে মানবীয় কত দৃশ্য । কত করুণ-সুখপ্রদ-চমকদার প্রেক্ষিত। কত অনির্বান সূর্যের সাধনা। প্রাগৈতিহাসিকের পথ ধরেই সেই আলোর খোঁজে ধীরে ধীরে প্রাচীন-মধ্যযুগের সময় সারণি হয়ে আমরা আধুনিক কালবেলায় চলে এসেছি বিন্দুতে সিন্ধুকে ধরতে চেয়েছি।

তথ্যসূত্র :

১. Hieroglyphics: Logographic Writing System.

২. ড. বিধান চন্দ্র সামন্ত : প্রবন্ধ - স্বাস্থ্য ভাবনায় বিজ্ঞান ও ইতিহাস; সুবর্ণ স্মারক-মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়, ভূপতিনগর, পূর্ব মেদিনীপুর; ২০১৬; পৃষ্ঠাঃ ২৩০।

৩. Hippocrateo : Hippocrateo ancient Greek physician, who is traditionally regarded as the father of medicine.

৪. ড. বিধান চন্দ্র সামন্ত : প্রবন্ধ-স্বাস্থ্য ভাবনায় বিজ্ঞান ও ইতিহাস; সুবর্ণ স্মারক-মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়, ভূপতিনগর, পূর্ব মেদিনীপুর; ২০১৬; পৃষ্ঠাঃ ২৩২।

৫. Jadunath Sarkar: India Thought the Ages; M. C. Sarkar & Sons; Calcutta; 1993; Page =10.

৬. ড. বিজয় আঢ্য : ভারতের ঋষি ; তুহিনা প্রকাশনী; কলকাতা-৭৩; ২০০৪, পৃষ্ঠাঃ ৭।

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :**

১. ড. বিজয় আঢ্য : ভারতের ঋষি; তুহিনা প্রকাশনী; কলকাতা; ২০০৪।

২. রনবীর চক্রবর্তী : ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব (প্রথম খন্ড); প্রাচীনতম পর্ব থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ; ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান; কলকাতা; ২০১১।

৩. অতুল চন্দ্র রায় : ভারতের ইতিহাস; প্রাচীনযুগ হতে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত; মৌলিক লাইব্রেরী; কলিকাতা-৭৩; ১৯৮৫।

৪. সুনীল চট্টোপাধ্যায় : প্রাচীন যুগের গ্রীসের ইতিহাস; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ; কলকাতা-৭৩; ১৯৯৭।

৫. A. L. Basham: Studies in Indian History and Culture; Sambodhi Publication Private Ltd.,; 22 Strand Road; Calcutta-1; 1964.

৬. S. C. Roy Chowdhary : Social Cultural and Economic History of India (Modern Time); Surjeet Publication; Delhi; 2000.

৭. D. D. Kosambi: The Culture and Civilization of Ancient Indian in Historical outline; Vikas Publishing House Pvt. Ltd.; New Delhi; 2010.

৮. D. N. Jha : Ancient India - An Introductory outline; People's Publishing House; New Delhi; 1983.

৯. Ramesh Chandra Dutt : Later Hindu Civilization; AD 500 to AD 1200; Abhijeet Publication; New Delhi; 2018.

১০. V. D. Mahajan : Ancient India; S.chand & Company Ltd; New Delhi- 55; 2001.

# অতিবাস্তবতা ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প (নির্বাচিত)

শিখা হালদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল

**সংক্ষিপ্তসার :** বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবিও ভিন্ন। ভাষাশিল্পে বাস্তবতার দাবি অন্যান্য শিল্পমাধ্যমগুলি থেকে জোরালো। জীবনের বাস্তব সমস্যার সঙ্গে কথাসাহিত্যের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। তাই বাস্তবতা সাহিত্যে থাকবেই। কিন্তু সেই বাস্তবতা যখনই অকপটে— অনাবৃতভাবে পাঠকের কাছে ধরা দেয়, তখন শিল্পের ক্ষেত্রে কোথাও যেন একটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পগুলি পাঠ করলে অতিবাস্তবতার এই বিশেষ রূপটি চোখে পড়ে। এই বিষয়ের গল্পের মধ্যে তাঁর প্রথম শ্রেণির গল্পগুলি যেমন 'দুঃশাসন'(১৯৪৪), 'হাড়'(১৯৪৪), 'টোপ', 'বীতংস' (১৯৪১) প্রভৃতি গল্পগুলিতে সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট বীভৎস। হয়তো সমকালীন পরিস্থিতিগত দিক থেকে তা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু সাহিত্য সর্বোপরি শিল্প। শিল্পের ন্যূনতম শর্তকে পালন করতে হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প পড়ে আমরা শিউরে উঠি। নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। আমরা হতবাক হয়ে যায়— এমনও হয় জেনে। কিন্তু সত্য তো শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকও হয়ে উঠতে পারে। এই প্রবণতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে কোথাও কোথাও দেখা যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের সীমাবদ্ধতা আসলে তাঁর শ্রেণিচরিত্রের সীমাবদ্ধতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমচাঁদ মুন্সী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যা পারেন, নিজেদের শ্রেণিচরিত্রের জোরে এবং টানে যেভাবে সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে তা হয়ে ওঠে সহানুভূতিশীল অতিথির মতো বর্ণনা। পাঠক পূর্ণবৃত্তের গল্প ভালোবাসে ঠিকই, কিন্তু লেখকের উচিত পাঠককেও কল্পনার খানিকটা অবকাশ দেওয়া। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে এই প্রবণতা চোখে পড়ে।

**মূলশব্দ:** সাহিত্যে বাস্তবতা, শৈল্পিক বাস্তবতা, অতিবাস্তবতা, যথাযথভঙ্গি ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গল্পে পাঠকের ভূমিকা, সাহিত্যক্ষেত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প।

**অতিবাস্তবতা ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প (নির্বাচিত)**

জীবনকে বাদ দিয়ে যেমন কোনো মানবীয় অভিজ্ঞতা হওয়া সম্ভব নয়, তেমনই বাস্তব উপাদানকে বাদ দিয়ে মানবিক কল্পনা সম্ভব নয়। ভিন্ন ভিন্ন শিল্পমাধ্যমের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবিও ভিন্ন ভিন্ন। ভাষাশিল্পের বাস্তবতার দাবি অন্যান্য শিল্প মাধ্যমগুলি থেকে অনেক বেশি জোরালো। আধুনিক চিত্রকলায় অনেক সময় দেখা যায় বাস্তবতার আনুগত্যই নেই। জীবনের বাস্তব সমস্যাবলি, গদ্যভাষা আর কথাসাহিত্য পরপর অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। আসলে অভিজ্ঞতাকে পুনঃবর্ণনা করার করার ইচ্ছা থেকে কথাসাহিত্যের সূচনা ধরে নেওয়া যায়। তাই বাস্তবতা সাহিত্যে থাকবে এটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সেই বাস্তবতা যখনই অনাবৃতভাবে পাঠকের কাছে ধরা দেয়, তখন শিল্পের ক্ষেত্রে কোথাও যেন একটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় বলে মনে হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প পাঠ করে অতিবাস্তবতার রূপটি চোখে পড়ে।

সাহিত্যের কনিষ্ঠতম সন্তান ছোটোগল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৭-৭০) দুর্বলতা ছিল বলা বাহুল্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সারাজীবন ধরে বহু ছোটোগল্প রচনা করেছেন। এখনও পর্যন্ত তা বারোটি খণ্ডে প্রকাশিত। এর বাইরেও আছে আরও অনেক ছোটোগল্প। কিন্তু তার মধ্যে বেশ কয়েকটি গল্প ‘দুঃশাসন’, ‘হাড়’, টোপ, বীতংস— এই গল্পগুলিকে আমরা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি প্রতিস্থাপিত বিষয়টিকে আলোচনার জন্য।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন— “সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আদর্শ যে লেখকেরা এবং সমালোচকেরা পুরোপুরি মান্য করতে গেছেন তাঁরা সকলেই সাহিত্য বিচারে ভ্রান্তির সম্মুখীন হয়েছেন।”[১] পরবর্তী লেখক সমালোচকেরা অনেকটা দূর করতে চেষ্টা করেছেন এই ধারণার সীমাবদ্ধতা। তবে ব্যক্তিমানুষকে যে তাঁর সামাজিক প্রেক্ষাপটে, শ্রেণি-সংঘর্ষের নিরন্তর প্রবাহের মধ্যে এবং দ্বন্দ্বময় বিকাশশীলতায় সমগ্রভাবে দেখা দরকার—এই বক্তব্যের মধ্যে বাস্তবতা-ধারণার একটি যথার্থ দিকে ধরা পড়ে। সাহিত্যতত্ত্ববিদ্‌রা এই সত্যটি তুলে ধরে সাহিত্যে বাস্তবতার বিষয়টিকে একটি সম্পূর্ণতা দান করেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পেও যথাযথ বাস্তবকে তুলে ধরার প্রয়াস আছে।

বিংশ শতকের মধ্যভাগে কাছাকাছি সময় থেকে দেখা যায়— বাস্তবতার ধারণাটি বহুমুখী এবং বহুমাত্রিক। বাস্তবের অনুকরণ বা অনুসরণ মাত্রই সাহিত্যের বাস্তবতা নয়। একদিকে যেমন ফ্যান্টাসিও সাহিত্যে বাস্তবতার সহায়ক হতে পারে, অন্যদিকে

বাস্তবতার অনুপুঙ্খতার মধ্য দিয়েও ব্যঞ্জিত হতে পারে এক রহস্যের দ্যোতনা। যেমন হয়েছে মেলভিলের 'মবিডিক'-এ। তিমি সম্পর্কিত সহস্র খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করার পর, তিমি-শিকার সংক্রান্ত সব তথ্য বিবৃত করার পরও সেই অতিকায় এবং অধরা শ্বেত তিমি এক অনন্ত জিজ্ঞাসার মতোই পাঠককে আপ্লুত করে এক রহস্যমতার অনুভবে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতেও বাস্তবতা যথাযথভাবে ব্যক্ত হয়েছে। পাঠক গল্পের শেষে এসে চমকিত হয় ঠিকই, কিন্তু নিজের ভাবার কোনো অবকাশ গল্পকার রাখেন না। অর্থাৎ যথাযথবাদ পাঠের দিক থেকে বাধা সৃষ্টি করে। হয়তো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে সময় গল্পগুলি লিখেছেন সেই সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট ততটাই বীভৎস ছিল। কিন্তু সাহিত্য সর্বোপরি শিল্প। শিল্পের ন্যূনতম শর্তকে পালন করতে হয়। তাঁর গল্প পড়ে আমরা শিউরে উঠি, নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। আমরা হতবাক হয়ে যায়— এমনও হয় জেনে। কিন্তু সত্য তো শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে। এই প্রবণতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও দেখা যায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'দুঃশাসন' গল্পে মহাভারতের দুঃশাসনের মিথটিকে ব্যবহার করেছেন তৎকালীন পশ্চিমবাংলার খাদ্য ও বস্ত্র সংকটের প্রেক্ষিতে। আমাদের জাতীয় জীবনে এ ছিল এক সংকটের কাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপীয় সাহিত্যে যে পরিবর্তনের সূচনা করে তার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে মানুষের সভ্যতা, কল্যাণবুদ্ধি ও সৌন্দর্যচেতনার অবলোপ।  যুদ্ধের সময় শত্রুর আক্রমনে প্রাণ হারানো এক জিনিস । আর বাংলার লক্ষ লক্ষ গ্রাম নিরাশার অন্ধকারে নিস্তব্ধে ডুবে যাওয়া অন্য জিনিস। তেল নেই, কাপড় নেই, ভাত নেই। মানুষের সৃষ্ট মহামন্বন্তরে গ্রামে-গঞ্জে-শহরে পথে হাজার হাজার মানুষ মরেছে। 'দুঃশাসন' গল্পে দুর্গতি চরমসীমায় উঠেছে। মার্কসীয় সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি সমাজের স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতার আলেখ্য উপস্থাপিত করেছেন এই গল্পে। লেখক দেখাতে চেয়েছেন পৌরাণিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলমান যুগের অন্যায়-অবিচার। মহাকাব্যিক যুগে দুর্যোধন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেছিলেন। এই পৈশাচিকতা সমাজে আজও চলে আসছে। কাপড়ের আড়তদার 'দেবীদাস' দুঃশাসনের প্রতিভূ। যুদ্ধের বাজারে আড়তে কাপড় রেখে দিয়েছে মুনাফালাভের আশায়। তাই লক্ষণ মুচির স্ত্রীদের যুগে যুগে বিবস্ত্র হয়ে থাকতে হয়। গল্পকার এই বাস্তব সত্যটিকে তুলে ধরেছেন অকপটে— "...ঘাটের দিক থেকে একটি ষোড়শী মেয়ে জল নিয়ে আসছিল, মানুষের গলা শুনেই বিদ্যুৎগতিতে কোথায় মিলিয়ে গেল আবার। আর একইসঙ্গে চমকে উঠল দেবীদাস আর গৌরদাসের দৃষ্টি, ছলছল করে উঠল রক্ত।

মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনোখানে একফালি কাপড় নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।”[২]

এই সময়ের দুঃশাসন হয়ে দেবীদাস যেন সমস্ত বাঙালি নারীর বস্ত্রহরণ করেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই দুঃসময়ের নির্মম রূপটিকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন—পেরেছেনও। পরিস্থিতির ভিত্তিতে তিনি দেখিয়েছেন যে মেয়েটিকে—তাকে পানীয় জলটুকু সংগ্রহ করতে হয় রাতের অন্ধকারে। কারণ তার বস্ত্রটুকুও নেই, সে উলঙ্গ। যদি বাস্তব ক্ষেত্রে তা ঘটেও থাকে, তবে এই নির্মমতাকে রূপ দিতে লেখকের কোনো নারীর বা যুবতীর উলঙ্গ হয়ে জল সংগ্রহ করতে যাওয়া শিল্পের দিক থেকে একটু অস্বস্তিকর। কারণ লেখক একবারও ভেবে দেখলেন না মেয়েটি নিজের কাছেই নগ্ন হবে বস্ত্রের অভাবে। লজ্জাতে জল সংগ্রহ অনেক দূরের কথা— নিজের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেও এই দুর্ভিক্ষের ছবি আছে— কিন্তু এতটা প্রকট করে তোলেননি সেখানে লেখক।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে বাস্তবতার সীমাকে অতিক্রম করে দেখা গেছে ‘টোপ’ গল্পেও। যথাযথবাদের অতিকথনের অসাধারণ নমুনা এই গল্পটি। শিল্প কিছুটা আড়াল খোঁজে। অক্ষর দিয়ে নির্মিত যে শিল্প তা রসাস্বাদনে রসিককে অবশ্যই বুঝতে হবে, তবে এর সঙ্গে যুক্ত হবে রসবোধ। লেখক হিসেবে তাই পাঠকের যোগ্যতার ওপর আস্থা রাখতে হয়। যেন গল্পটিকে পূর্ণতা দেওয়ার অর্ধেক দায় পাঠকের। লেখক সব বলে দিলে পাঠকের আর করার কিছুই থাকে না। স্বভাবতই লেখক এই জাতীয় গল্পের ক্ষেত্রে অনীহ হবেনই। এক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জবানীতে বিবৃত হয়েছে গল্পটি। মধ্যবিত্তের মেরুদণ্ডহীনতার জীবনের বিপরীতে রাজকীয় আয়াসের টোপ গলাধঃকরণ নিঃসন্দেহে আনন্দের। অন্যদিকে কীপারের মাতৃহারা শিশুদের কাছে রাজাবাহাদুরের ছুঁড়ে দেওয়া দানও এক ধরণের টোপ। লেখকের ভাষায়— “কীপারের একটা বেওয়ারিশ ছেলে যদি জঙ্গলে হারিয়ে গিয়ে থাকে, তা অস্বাভাবিক নয়, তাতে কারো ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রকাণ্ড রয়্যাল বেঙ্গলটা মেরেছিলেন রাজাবাহাদুর— লোককে ডেকে দেখানোর মতো।”[৩]

গল্পকার সামন্ততান্ত্রিক নিষ্ঠুরতার বীভৎসতা দেখাতে একটি কুলির বাচ্ছাকে বাঘ শিকারের টোপ হিসেবে ব্যবহারের কথা বলতে পারেন, এইরকম হয়েছেও হয়তো প্রায়শই। কিন্তু লেখক কোনো মানুষকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করার নিষ্ঠুর বিবরণ

থেকে দ্বিতীয় মাত্রা যোগ করতে পারেননি বলে মনে হয়েছে। সমালোচক আলোক রায়ের মতে— "মহৎ আর্ট কাকে বলে তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্যই লেখনী ধারণ করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে বক্তব্য-প্রধান গল্পের সীমাবদ্ধতাও অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে।"[৪] 'টোপ' তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত গল্প। কীপারের একটা বেওয়ারিশ ছেলেকে রাজাবাহাদুরের বাঘশিকারের টোপ হিসেবে ব্যবহার—বক্তব্যের দিক থেকে বা শ্লেষোক্তি হিসেবে অব্যর্থ, কিন্তু সমালোচক বলেছেন— "সত্য অনেক সময়ই কল্পনার চেয়েও অদ্ভুত। তাই মানবশিশুর তৈরি টোপ এমনকি বাস্তবে সত্য হলেও সারস্বত বিশ্বাসকে বিচলিত করতে চায়।"[৫] চেখভ বলতেন উত্তরমেরু অভিযান বা সমুদ্রে ভাসমান বিরাট তুষারস্তূপ থেকে মানুষের পতন কখনও ঘটে, তা নিয়ে গল্প লেখা যায়, তেমনি দৈনন্দিন জীবনের কাহিনি নিয়েও ছোটোগল্প তৈরি হয়। আসলে সবকিছুই ছোটোগল্পের বিষয় হতে পারে। ঘটনার অসামান্যতা, দেশকালের অপরিচয়জনিত বিস্ময়কর পটভূমি গল্পে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে, মনে দাগ কাটে বেশি। বক্তব্য-প্রধান গল্পে এর প্রয়োজন আছে। সমারসেট ম্যম বা ও. হেনরি 'সারপ্রাইজ এণ্ডিং' বা 'কিক' পছন্দ করতেন। বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এঁদের সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনো মিল নেই। তবে তিনিও মনে হয় 'চাবুক হাঁকড়ানো' সমাপ্তির পক্ষপাতী। হয়তো সামাজিক দায়িত্বপালনের সঙ্গে এর একটা যোগ আছে। এই একই কথা 'হাড়' গল্প সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে সময় গল্প লিখছেন সেই সময়টি ছিল বাস্তবতার চিত্রণের যুগ। সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে প্রগতিশীল সাহিত্যের প্রচার এবং অত্যন্ত সুলভ মূল্যে অনুবাদগ্রন্থ সরবরাহ বাঙালি সাহিত্যিকদের প্ররোচিত করেছিল। অনেকটা সোভিয়েত মডেলে গল্প-উপন্যাস লেখার প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। 'হাড়' গল্পের সমস্ত ঘটনাগুলি যেন বৈপরীত্যের বিন্যাসে সাজানো। যার ফলে মন্বন্তরের চিহ্ন প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে। রায়বাহাদুর এইচ. এল. চ্যাটার্জীর রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর ওপর কোলাপসিবল গেট দেওয়া বিশাল অট্টালিকার বর্ণনা লেখক দিয়েছেন। যেখানে চারিদিকে গ্ল্যাডিফ্লোরা ফুলের সুবাস ও দুটি বীরদর্শন কুকুর— বাড়ির আভিজাত্যকে বহন করেছে। অন্যদিকে মনোহরপুকুর পার্কে বুভুক্ষু-দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের কলোনি। বলা বাহুল্য এই দুই শ্রেণি যথাক্রমে 'have' এবং 'have nots'-এর প্রতিভূ। এই নির্মম বাস্তবতার পরিস্থিতিতে রায়বাহাদুর দিন অতিবাহিত করছেন বিদেশে হাড়

সংগ্রহের রোমাঞ্চকর কাহিনিতে। তার বিপরীতে লেখক দেখিয়েছেন— “সামনে ডাস্টবিন। পাশের অবগুণ্ঠিত ল্যাম্পপোস্ট থেকে একটা ছোট আলোকচক্র পড়ছে তার ওপর। তিন চারজন অমানুষিক মানুষ তার ভিতর হাত ডুবিয়ে খুঁজছে খাদ্য। একটু দূরেই এক কঙ্কালসার ছায়ামূর্তি— নতুন প্রতিযোগীদের কাছে ভিড়বার ভরসা পাচ্ছে না। কাঠির মতো হাত-পা আর বেলুনের মতো পেটওয়ালা একটা ছোটোছেলে দু’হাতে কী চুষছে প্রাণপণে। হাড়? হাঁ, হাড়ই তো।”[৬]— তাই বলা যায় , নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যের এই সময়টা কোনো অর্থে অস্বীকার করতে পারেননি সাহিত্যিক। গোর্কির বাস্তবতাকে, বাস্তব নির্মাণে কথনকে এই সময়ের বাংলা সাহিত্যিকেরা গ্রহণ করেছেন কিন্তু তাঁরা আখ্যানের নৈপুন্যকে নিতে পারছেন না। ফলে যথাযথের বাস্তবতা এবং তার সঙ্গে প্রতিবাদ ও ভবিষ্যের ঈশারা এই গল্পগুলির স্টিরিওটাইপ মডেলকে চিহ্নিত করে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যের ক্ষেত্রেও এই প্রবণতাটি প্রবল।

কিছু কিছু গল্পে যেখানে লেখক অভিজ্ঞতা নয়, অভিজ্ঞতার মন্মথজাত উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন। তা হয়ে উঠেছে গল্প হিসেবে অসাধারণ। ‘বীতংস’ গল্পেও আসামের চা-বাগানে কুলি যোগাতে হবে— আড়কাঠি সুন্দরলালের সেই জন্য মহাপুরুষের ভূমিকা গ্রহণ! জীবনের এক নির্মম সত্যরূপ। কিন্তু মানুষের ক্রূরতা আর লোভ বর্ণনায় দৃশ্যপটের অভিনবত্ব ও ঘটনার চমৎকারিত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ছোটো শিল্পরূপ সম্বন্ধে বিতর্ক আজকের নয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটোগল্প সম্পর্কে বলেছেন— “গল্প মনস্তত্ত্বমূলক হোক আর কাব্যমূলকই হোক— একটা ছোটো কাহিনীকে অন্তত তার মধ্যে থাকতেই হবে— এতদিন পর্যন্ত এই নিয়মটিই চলে আসছিল। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ঘটনার প্রতি আধুনিক লেখকের মনে বিরূপতার সৃষ্টি হয়েছে...। কোনো একটি ক্ষণ মুহূর্তে কোনো একটি চকিত ঘটনায় উদ্ভাসনই তো যথেষ্ট— তাতেই তো একটি জীবনগত বা চরিত্রগত সত্য বিদ্যুতের মতো দীপিত হয়ে থাকে।”[৭] সাধারণ পাঠক অবশ্যই ভালোবাসেন একটি নিটোল গল্প, যা শুধু সুগঠিত নয়, সুগ্রথিতও বটে— তার মধ্যে থাকে আদি-মধ্য-অন্ত তিনটি ভাগ, একটি নাট্যচমক। এদিক থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমারসেট ম্যমের দ্বারা প্রভাবিত বলা যায়। ম্যমও ছোটোগল্পের শিল্পরূপ নিয়ে অনেকটা এরকমই ভেবেছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের সীমাবদ্ধতা আসলে তাঁর শ্রেণিচরিত্রের সীমাবদ্ধতা। বুদ্ধিজীবী এই মানুষটি তাঁর আত্মিক প্রেরণায় প্রলেতারিয়েতে’র বা

সর্বহারাদের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর শ্রেণির অবস্থান কখনই তাঁদের সাথে একাত্ম হতে দেয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যা পারেন, প্রেমচাঁদ মুন্সী যা পারেন, এমনকি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত নিজেদের শ্রেণিচরিত্রের জোরে এবং টানে যেভাবে সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে তা হয়ে ওঠে সহানুভূতিশীল অতিথির মতো বর্ণনা। তিনি সমাজ বিশ্লেষণ করেন , সময়ের আততীকে মোটা দাগে তুলেও ধরেন, কিন্তু তা তাঁকে কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারার শরিক করে তোলেনা। তাঁর সহানুভূতির মধ্যে আন্তরিকতা গভীর আবেগের। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তার ব্যবস্থার প্রতি প্রতিবাদী। কারণ লেখকের কাজই হল— স্থিতাবস্থার বর্ণনা নয়, তাকে ভাঙাও। 'পুঁইমাচা' গল্পের মধ্যে যে দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যের পেছনে যে চক্রান্ত এবং চক্রান্তের ভেতরে যে প্ররোচনা— তার পরিণামেই হল পুটির মৃত্যু।  তারই লাগানো পুঁইগাছ বর্ষার জলে, শিশিরের স্পর্শে পল্লবিত হতে পারে অথচ পুটি এক বর্ষা থেকে আরেক বর্ষা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারেনা। তার দরিদ্র শ্বশুড়বাড়ির অবহেলা এমনকি তার বাবার নিরাবেগে পুটির মৃত্যুসংবাদ থেকে মাছধরার কাছে নিজেকে নিমজ্জিত রাখার মধ্যে জেগে থাকে একটা নিষ্ঠুর সময়।  পাঠক বুঝে নিতে পারে পুটিকে হত্যা করা হয়েছে। এই একই প্ররোচনার গল্প তো 'দুঃশাসন'। লেখক পাঠকের কল্পনার প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারেন না বলে পাঠককে কল্পনার অবকাশ না দিয়ে নিজেই সব বলে দেন। কিছু পাঠকের কাছে তা পূর্ণবৃত্তের গল্প হলেও শিল্পসচেতন পাঠকের কাছে তা নয়। তাই বলা যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প নিশ্চয় বাংলা সাহিত্যের সম্পদ, কিন্তু শিল্পক্ষেত্রের দিকে অতিবাস্তবতার ও যথাযথের মোড়কে সমালোচিত।

**তথ্যসূত্র :**

১. চক্রবর্তী সুমিতা, 'সাহিত্যে বাস্তবতা', পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা, নবেন্দু সেন (সম্পা.), রত্নাবলী প্রকাশনা, কলকাতা , ২০০৯, পৃ. ১৭৮।

২. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ গল্প, অধ্যাপক জগদীশ আচার্য (সম্পা.) প্রকাশভবন প্রকাশনা, কলকাতা, ১৩৬১, পৃ. ৫৮।

৩. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'টোপ', একালের গল্প, প্রাক্-স্নাতক বাংলা পাঠসমিতি সম্পাদিত, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ২০০৪, পৃ. ৮৫।

৪. রায় আলোক, 'ছোটোগল্পে স্বদেশ স্বজন', অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮৭।

৫. তদেব, পৃ. ১৮৭-১৮৮।

৬. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ গল্প, অধ্যাপক জগদীশ আচার্য (সম্পা.) প্রকাশভবন প্রকাশনা, কলকাতা, ১৩৬১, পৃ. ৩৭।

৭. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'সাহিত্যে ছোটোগল্প', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ৩৮৭।

**সহায়ক গ্রন্থ :**

১. দত্ত বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটোগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (২য় খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫।

# দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাস্তুভিটা’ নাটকে সাম্প্রদায়িক ঐক্য

টুম্পা রায় ব্যাপারী
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

বাংলাকে ভাগ করে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি চলছিল ভীতরে ভীতরে। হৃদয়টা যে ভাগ হতে চলেছে সেটা আঁচ করতে পারেননি আমজনতা। নিশ্চুপভাবে ছুরি চালিয়ে যারা রক্তক্ষরণে অভ্যস্ত তারা মূলত পাশের মানুষটকেও বুঝতে দেননা কি করতে চলেছেন। ‘লর্ড মাউন্টব্যাটেন ‘ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস’ দানের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্থানের দুটি কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পরিকল্পনা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে প্রকাশ করলে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ব্যতীত আর প্রায় সকলেই দেশবিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন। গান্ধিজি এই পরিকল্পনার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন “So long as I am alive, I will never agree to the partition of India. Nor will I, if I can help it, allow Congress to accept it’ শেষ পর্যন্ত গান্ধিজি তাঁর মত পরিবর্তন করে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন”[১] মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুসারে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের হিন্দুপ্রধান ও মুসলমান অঞ্চলগুলির আইনসভার সদস্যরা পৃথকভাবে বসে ভোটের মাধ্যমে স্থির করবেন তারা ভারতভাগে রাজী হবেন কিনা? ভারতভাগে অনেকেই রাজী ছিলেন না কিন্তু পরবর্তীকালে নয়া দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় যে ভোটাভুটি হয় তার ফলাফল হল খুব ভায়নাক। প্রস্তাবের পক্ষে ১৫৭টি, বিপক্ষে ২৯টি ভোট পড়ে এবং ৩২ জন সদস্য নিরপেক্ষ থাকে। ১৯৪৭ এর ১৮ জুলাই ‘ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স বিল’ রাজার সম্মতি লাভ করলে এই আইনে ১৫ আগষ্ট থেকে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্থানের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হবে। এই বছরের ১৯ জুলাই ভাইসরয় হাউস থেকে ভারত ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়। ‘পাকিস্থানের জন্ম হয় দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত সময়ে। মুসলীম লীগ তার প্রচার কার্যক্রম চালাত সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে, যেমন জুম্মার নামাজ, মিলাদ মাহফিল, ওয়াজ, ঈদের জামাত প্রভৃতি। এভাবেই সামাজিক জীবনকে রাজনীতির সাথে যুক্ত করে লীগ ঐতিহ্যগত ধর্মীয় আনুগত্যকে একটি রাজনৈতিক

আন্দোলনে রূপান্তরিত করে, যা কখনো সাম্প্রদায়িক আন্দোলন এবং কখনো বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্যোতক প্রতীকের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।একটা লক্ষ্যনীয় ব্যাপার এই যে মুসলিম কৃষকেরা তাদের হিন্দু ভাইদের মতো সেইসময় দেশত্যাগ করেনি।’[২]১৯৪৭ এর দেশভাগের ভাবনা থেকে ১৯৪৮ সালে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাস্তুভিটা’ নাটকটিপ্রকাশ করেন। বাস্তুভিটা নাটক নিয়ে নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়বলেছেন- ‘১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট রাত্রি বারোটার সময় ছুটে গেলাম মানিকতলা চৌমাথায়। দেশ ভাগ করে স্বাধীনতা এল। সেদিন সাধারণ মানুষের মনে কি আনন্দের জোয়ার। মানিকতলায় লালবাগান অঞ্চলে যে সব মুসলমান দাঙ্গার সময় রাজাবাজারে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা ছুটে এলে মানিকতলায়। হিন্দু, মুসলমান পরস্পরকে করল আলিঙ্গন। এই দৃশ্য একটা বিদ্যুৎ চমকের মতো চমকিত করল। ভাবলাম এটাই সত্য। রাজনৈতিক কারণে একটা দেশকে দু’ভাগ করা যেতে পারে, কিন্তু একটা জাতিকে দু’ভাগ করা যায় না। এই ঐতিহ্যকে তুলে ধরার জন্যই এল আমার ‘বাস্তুভিটা’ নাটক।’[৩]আবার অন্যত্র বাস্তুভিটা নাটক রচনার কারণ সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন - “আমার ‘তরঙ্গ’ নাটক পড়ে অত্যন্ত প্রীত হয়ে স্বর্গীয় কবি ও সমালোচক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ‘বঙ্গদর্শন’- এর জন্য একটি নাটিকা লিখতে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, তাতেই উৎসাহিত হয়ে আমি ‘বাস্তুভিটা’ রচনায় হাত দিই।”[৪]

বঙ্গভঙ্গের পর পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুদের বাস্তু সমস্যাকে নিয়ে তিনি নাটকটি রচনা করেন।পাকিস্তান সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের ফলে সেখানকার হিন্দুরা বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। স্বার্থান্বেষী মুসলমানদের অত্যাচারে হিন্দুদের সেখানে টিকে থাকা খুব দুষ্কর হয়ে পড়ে। উচ্চ-মধ্যবিত্ত হিন্দুরা সবকিছু জলের দরে বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় এসে নিজেদের বাঁচার পথ খুঁজছেন। দরিদ্র বা দারিদ্র্যসীমার নীচের মানুষরা না পেরেছে জমিজমা বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় আসতে, না পেরেছে ক্ষমতালোভী মানুষদের সঙ্গে ঠিকভাবে থাকতে। আর এই দু’য়ের টানাপড়েন উঠে এসেছে ‘বাস্তুভিটা’ নাটকে।

এই নাটকের মুখ্য চরিত্র মহেন্দ্র মাষ্টার। তিনি বিচক্ষণ মানুষ, পরিস্থিতি বুঝে মোকাবিলা করেন। শচীনের বাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার কথা শুনে মহেন্দ্র বলেছেন- ‘চৌদ্দ পুরুষের বাস্তুভিটা বেচে দেবে?’[৫] চৌদ্দ পুরুষের বাস্তুভিটা তার কাছে সোনার চেয়ে বেশি মূল্যবান। তাই বাস্তুভিটা বিক্রি করা তার কাছে অনেক বড়ো পাপের। শত অত্যচারেও তিনি নিরব থেকেছেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলে তার বন্ধু। আমীন

মুন্সীর ছেলে অসুস্থ হলে বর্ষা রাতে সকলের নিষেধ উপেক্ষা করে তিনি ছুটে গিয়েছেন। কিন্তু যখন মুসলিম অত্যাচারের কথা গ্রামের মোড়ল সোনামোল্লাকে জানাতে গিয়েছেন তখন তিনি তার কোন প্রতিকার পান নি। একদিকে স্ত্রী-কন্যার নিরাপত্তা অন্যদিকে ভিটে-মাটির প্রতি মমত্বে তিনি ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন। পাঠশালার টানও তিনি ছাড়তে পারেন না।

মাষ্টারের স্ত্রী মানদা দুঃখ প্রকাশ করলেও মহেন্দ্র মাষ্টার সব সময় আশার বাণী শুনিয়ে গেছেন। তার বক্তব্য- কিছু করার নেই। মান ইজ্জত রাখার জন্য একটু কষ্ট করতে হয়। চিরদিন সময় এক রকম থাকে না।

মহেন্দ্র।। কি করবে-মান ইজ্জত রাখবার জন্যে দিন কয়েক একটু কষ্ট করতে হবে।

মানদা ।। দিন কয়েক কেন- এখানে থাকলে হয়ত এভাবেই থাকতে হবে।

মহেন্দ্র।। না গো না। চিরদিনই কি এরকম থাকবে।[৬]

আমীন মুন্সী ছিলেন টাইপ চরিত্র। নন্দন গ্রামের মোক্তারের মাষ্টার। মুসলমানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সে কারণে তাকে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। মহেন্দ্র মাষ্টারের প্রতি সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা মহেন্দ্র মাষ্টারকে ধরে রাখতে সাহায্য করেছে।

নাটকের প্রথম দিকে সোনামোল্লা হিন্দু বিরোধিতা না করলেও মুসলমানদের ঠেকাতে কোনও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেননি। মহেন্দ্র মাষ্টার তার সাত পুরুষের ভিটা-মাটি ছেড়ে যেতে রাজি নয়। কিন্তু চারপাশের পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে তিনিও বাস্তুভিটা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। নন্দন গ্রামের মোড়ল প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সোনামোল্লার ছেলেদের অত্যাচার, হিংস্র ইয়াসিন মিঞা ও তার দলবল লঞ্চ লুঠ করলে মহেন্দ্র মাষ্টার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তিনি নিজের মনকে বোঝাতে থাকেন আর ভিটেতে বাস করা যাবে না। এদিকে মাষ্টারের বাড়ি ছাড়ার কথা শুনে সোনামোল্লার শুভ বুদ্ধির সূচনা হয়। সে তার দলবল নিয়ে মাষ্টারের যাওয়ার পথে বাধা দেয়। তারা বুঝতে পেরেছে হিন্দু মুসলিম বলে কিছু হয় না তারা সকলে এক। মহেন্দ্র মাষ্টার চলে গেলে তারা যেন অনেকটা অবিভাবকহীন হয়ে পড়বে। সুখে দুঃখে নানা পরামর্শে মহেন্দ্র মাষ্টারের সাহায্য পেয়েছে, পরামর্শ নিয়েছে। তাই আজকের এই হিংসার দিনে তারা মাষ্টার মহাশয়কে বাড়ি যেতে দিতে চায় না।

ইয়াসিন ধনী ও কুচক্রী। হিন্দুদের হাতে জামাইকে খুনের প্রতিহিংসায় হিন্দু নিধন যজ্ঞে সে মেতে ওঠে। কলকাতায় জামাইয়ের মৃত্যুতে তার মাথার ঠিক নেই। সমস্ত হিন্দুকেই সে দোষী বলে ভাবতে শুরু করেছে। হিন্দু শ্রেণিকে সে কচুকাটা করলে শান্তি পায়। নিজের গুণ্ডা বাহিনীকে নিয়ে সে সমস্ত অনৈতিক কাজে যোগ দেয়। তারই নেতৃত্বে লঞ্চ লুঠ ও ধানের নৌকা লুঠ হয়েছে। নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইয়াসিনকে অনেক বেশি সহানুভূতিশীল মন দিয়ে গড়েছেন।বিরোধী পক্ষ বলে তিনি কোন অবিচার করেন নি। নাট্যকার ইয়াসিনের মেয়ের বিধবা হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। তাই পিতা হিসাবে ইয়াসিনের যন্ত্রণা ও রাগ দুটোকেই তুলে ধরেছেন।

মহেন্দ্র মাষ্টারের স্ত্রী মানদা, মুসলমানদের অত্যাচারে পরিবারকে রক্ষা করার চিন্তায় ব্যাকুল। স্বামী এবং কন্যা সন্তানকে নিয়ে তিনি একটু শান্তিতে থাকতে চান। চারিদিকে যখন হত্যা চলছে, বাইরের পরিবেশও তখন খুব খারাপ বজ্রপাত সহ বৃষ্টি চলছে। সেই সময় আমীন মুন্সীর ছেলে পেটের যন্ত্রনায় চিৎকার করতে থাকে। মহেন্দ্র মাষ্টার স্কুলে পড়ানোর সাথে সাথে একটু ডাক্তারিও করে থাকেন। যখন আমীন মুন্সী মহেন্দ্র মাষ্টারকে ডাকতে আসে তখন মানদা যেতে দিতে চায় না। মানদা ভয় পায় যদি তার স্বামী আর ফেরত না আসে, কেননা তারা হিন্দু বলে বাইরের পরিবেশ তাদের কাছে অনুকূল নয়। আবার তার মেয়ে পুকুরে বাসন ধুতে গেলে সোনামোল্লার ছেলেরা নানা রকমভাবে উত্যক্ত করতে থাকে। তিনি এই খবর জানার পর মেয়েকে আর পুকুরে যেতে দিতে চান না। অসহনীয় এই পরিবেশে সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। সেই কারনেস্বামীকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি বারে বারে অনুরোধ করেছেন। মেয়ে কমলার জন্য তার উৎকণ্ঠার শেষ নাই। বাস্তুত্যাগের আগের মুহূর্তে তাকে বেদনায় বিহ্বল হতে দেখা গেছে। মানদা চরিত্রের মধ্যে কর্তৃত্বের ভূমিকা বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়।

ড. অজিত কুমার ঘোষ, ‘বাস্তুভিটা’নাটক সম্পর্কে বলেছেন-‘কফিলদ্দি ও আমীন মুন্সী মিলনের পথ দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার সময় তাদের প্রভাব যে নগন্য তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই স্বীকার করিবেন। বাস্তুভিটা ত্যাগ করা মর্মচ্ছেদের মতই ক্লেশকর। কিন্তু যে সব লক্ষ লক্ষ লোক বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন তাহারা শুধু হুজুগ কিংবা মিথ্যা আতঙ্কে মাতিয়া আসিতেছেন না, নিরুদ্বেগ শান্তি লইয়া সমাজ গঠনের আশা নিঃশেষ হইয়াছে বলিয়াই তাহারা চলিয়া

আসিতেছেন'[৭]। এ প্রসঙ্গে কলকাতা গণনাট্য সংঘের সভাপতি ও অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের উক্তি-'হাজার বছর ধরিয়া হিন্দু-মুসলমান শান্তভাবে প্রতিবেশীরুপে ভারতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে সহজ সামাজিক বন্ধন যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল আমরা যেন তাহা ভুলিতে চলিতেছি। অথচ সে কথা না ভোলার পথেই রহিয়াছে সহজ সমাধানের পথ। 'বাস্তভিটা' একটি ক্ষুদ্র নাটিকা সেই কথাই স্মরণ করাইতে চায়। আলোক বর্তিকা ক্ষুদ্র, কিন্তু অনেকখানি অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ।'[৮]

সমস্যাই শেষ কথা নয়। সমস্যার মধ্যেই থাকে সমাধানের পথ। নাটকের শেষে দেখি প্রত্যেকেই যেন সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছেন,মহেন্দ্র মাষ্টারকে তারা নিজেদের মধ্যে ধরে রেখেছেন। নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকের সমাপ্তি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি বসবাসকরা সমস্ত জাতি অভিন্ন আত্মা। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে নিজের ভাই বলে পরিচয় দেয়, হিন্দু মুসলমান হিসাবে নয়।

বাস্তভিটা নাটকে নাট্যকার সাত জনের মুখে কলকাতার নাগরিক সংলাপ বসিয়েছেন। বাকি চরিত্রেরা পূর্ববঙ্গের হলেও, যারা শিক্ষিত তাদের মুখে মার্জিত সংলাপ বসিয়েছেন। যেমন- মহেন্দ্র মাষ্টার, তার স্ত্রী মানদা ইত্যাদি। আবার পূর্ববঙ্গের জেলে-চাষি-মাঝি এদের মুখে পূর্ববঙ্গের কথ্য সংলাপ ব্যবহার করেছেন। অর্থ্যাৎ তিনি চরিত্র উপযোগী সংলাপ ব্যবহার করেছেন। যা নাটকের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাস্তভিটা নাটকে বাস্তভিটা শুধু মাত্র কোন ব্যক্তি মানুষের ভিটে-মাটিকে ইঙ্গিত করেনি, করেছে সমগ্র দেশকে। এখানে মহেন্দ্র মাষ্টার বাংলাদেশকে নিজের বাস্তভিটা মনে করেছেন। সংসারকে তিনি ভালোবাসেন, সংসারের উন্নতির জন্য তিনি তৎপর। তবে তার জন্য তিনি দেশ ছাড়তে পারবেন না। দেশের আস্থির পরিস্থিতি মানদাকে চিন্তিত করে তুললেও মহেন্দ্র মাষ্টার নিরব থেকে যান। তাঁর অন্তরের যন্ত্রণা পরিবারের নিরাপত্তার থেকেও অনেক বেশি দেশের জন্য। প্রতিবেশীরা মুসলিম হলেও তাদেরকে নিয়ে তিনি একত্রে থাকতে চেয়েছেন। ধর্মগত কারণে মানুষের মধ্যে কখনও ভেদাভেদ থাকতে পারে না এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী তিনি। তাই নাটকে জাতিগত ঐক্যেরকথা মহেন্দ্র মাষ্টারের সংলাপে একাধিক বার প্রকাশ পেয়েছে।

**তথ্যসূত্র :**

১. অসিতাভ দাশ, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত তারিখ অভিধান ১৭৫৬-১৯৪৭, পত্রলেখা, ২০১৪, কলকাতা, পৃষ্ঠা – ৩৪৪

২. তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৪৮

৩. দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; বাস্তুভিটা, কলকাতা, পুস্তকালয়, ১৯৫৪, ভূমিকা অংশ।

৪. তদেব, পৃষ্ঠা – ২

৫. দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; বাস্তুভিটা, কলকাতা, পুস্তকালয়, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা-১০।

৬. ঐ, পৃষ্ঠা-৩।

৭. ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, দে'জ, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৮৭

৮. পূর্বোক্ত, সূত্র-২, ভূমিকা অংশ

# দেশভাগ পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে ক্যাম্পে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের করুণ প্রতিচ্ছবির এক ইতিহাসমূলক পর্যালোচনা : প্রসঙ্গ—মনোরঞ্জন ব্যাপারীর 'ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন'

সঞ্জু সরকার

গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

**সারসংক্ষেপ :** ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা আপাতদৃষ্টিতে ভারত ও পাকিস্থান নামক দুটি অযাচিত ও অপ্রার্থিত (সিংহভাগ লোকের কাছে) স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। তবে দেশভাগের অব্যবহিত পরেই 'উদ্বাস্তু সমস্যা' যেন এক সাধারন প্রবনতা হিসেবে দেখা গিয়েছিল। নতুন রাষ্ট্র গঠন ছিল উদ্বাস্তু সৃজনের প্রক্রিয়া। তবে ইতিহাসে আবর্তে উদ্বাস্তুদের নানা বিষয়ে গবেষোণাধর্মী আলোচনা হলেও তৎসময়ে ক্যাম্পগুলিতে বসবাসকারী নিরক্ষর, নিম্নশ্রেণীর উদ্বাস্তুদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল সে বিষয়ে তেমন আলোচনাই হয়নি। উল্লেখ্য, 'উদ্বাস্তু' সম্পর্কে আলোচনায় খুব স্বল্প পরিসরে আলোচনার আবর্তে এদের কথা এসে পড়ে। কিন্তু সেই ইতিহাস এদের করুন অবস্থার ভয়ংকর রূপটিকে সামগ্রিকভাবে ব্যক্ত করে না। আর আমি এক্ষেত্রে মনোরঞ্জন ব্যাপারী ও তাঁর কালজয়ী রচনা 'ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন'- এর আলোকে ইতিহাসের উক্ত বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করেছি। এটি একটি 'মাইক্রো হিস্ট্রি'- মূলক রচনা। কারন এক্ষেত্রে একজনের আত্মজীবনীর নিরিখে ইতিহাসের আবর্তে সামগ্রিকভাবে নিম্নশ্রেনীর উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প জীবনের ভয়াল রূপ, তাদের প্রতি বর্নবাদের কঠোরতা ও তাদেরকে নিয়ে তৎসময়কালে নানা রাজনৈতিক দলের কুচক্রী খেলা ইত্যাদী বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করেছি। কাজেও উক্ত ঘরানায় এই ইতিহাস রচনাও যে সামগ্রিক ইতিহাসচর্চাকে প্রানবন্ত করে তুলবে — তা বলা যায়।

**সূচক শব্দ :** উদ্বাস্তু, উচ্চশ্রেণী, নিম্নশ্রেণী, বর্নবাদ, ক্যাম্প, ডোল, কুচক্রী নীতি, দন্ডকারন্য, মরিচঝাপি।

আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অনান্য কারনে লোকজনকে তার জন্মভূমি থেকে পরক ভূমিতে, গ্রাম থেকে শহরে, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে এবং এক রাষ্ট্র থেকে আরেক রাষ্ট্রে অভিপ্রয়ান দীর্ঘ সময়কাল ধরেই সমগ্র বিশ্বে এক সাধারন প্রবনতা হিসেবে পরিলক্ষিত। সমাজের অভ্যন্তরে সংঘর্ষ এবং রাষ্ট্রীয়

নীতিসমূহের মত নানা কারনে জোরপূর্বক অভিপ্রয়ান হতে পারে। একইসঙ্গে একটি অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মানুষের অভিপ্রয়ান হলে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা তথা যারা পূর্ব থেকেই সেখানে বাস করে, তাদের মনে তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং অনেকসময় স্থানীয় ও অভিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ অভিবাসীদের পুনরায় অভিপ্রয়ানের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কিন্তু যখন জোরপূর্বক স্থানান্তরিত অভিবাসীদের অন্য কোন বিকল্প পথ না থাকে, তখন তারা জীবন ধারনের ন্যূন্যতম সংস্থান ছাড়াই উক্ত স্থানে অতি কষ্টকাতর অবস্থার মধ্য দিয়ে বাস করে। আর ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি এরূপ অবস্থার জন্ম দিয়েছিল। জয়া চাটার্জী দেখিয়েছেন যে, নতুন রাষ্ট্র গঠন হল উদ্বাস্তু সৃজনের প্রক্রিয়া।[১] তবে এদেশে আগত উদ্বাস্তুদের সকলের অবস্থা সমান ছিল না, সেক্ষেত্রে নানা পৃথকত্বের চিত্র ছিল। আর নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পজীবন বা তাদের প্রতি সরকারের নানা নৃশংস নীতি, জাত প্রথার কঠোরতা ইত্যাদী বিষয়গুলি ফুঁটে উঠেছে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর 'ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন' গ্রন্থে। আপাতদৃষ্টিতে এটি ব্যক্তিস্বতন্ত্রমূলক রচনা হলেও সেক্ষেত্রে এক মিশ্র প্রতর্ক স্পর্ষ্ট হয়েছে।

**মনোরঞ্জন ব্যাপারী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা**

মনোরঞ্জন ব্যাপারী পূর্ব পাকিস্থানের বরিশাল জেলার পিরিছপুর গ্রামের নিকটে তুরুক-খালি নামক স্থানে এক নমঃশূদ্র দলিত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। যদিও তাদেরকে (নমঃশূদ্রদের) 'চন্ডাল' বা 'চাঁড়াল' বলে অবিহিত করা হত। ব্যাপারী লিখেছেন, আমি জন্মের সময় মধু পায়নি। আমি এক দলিত বাবার হতভাগ্য ছেলে হিসেবে আমার জীবন কাটিয়েছিলাম, যে জীবন কেবলই হতাশাগ্রস্ত, করুন ও যন্ত্রনাময়।[২] যাইহোক, তিনি ১৯৫৩ সালে (আনুমানিক) তথা মাত্র তিন বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে বরিশাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন। অতঃপর প্রায় সাত বছর বাঁকুড়ার শিরোমনিপুর উদ্বাস্তু শিবিরে ছিলেন। হঠাৎ একদিন সরকারি নির্দেশানুসারে শিবিরটি বন্ধ হয় এবং তারা দক্ষিন ২৪ পরগণার ঘোলা দোলতলা উদ্বাস্তু শিবিরে স্থানান্তরিত হন। ১৯৬৪ সালে তাঁর বয়স যখন ১৪ বছর তখন তিনি পরিবারের জন্য রোজগারের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়েন এবং নিউ জলপাইগুড়িতে গিয়ে চায়ের দোকানে কাজ করেন। অতঃপর তিনি আসাম, লক্ষৌ, এলাহবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানেও কাজের জন্য গিয়েছিলেন।[৩] তবে ১৯৬৯ সালে পরিবারসহ তিনি যাদবপুরে স্থানান্তরিত হন। আবার ১৯৭১ সালে তারা দন্ডকারন্যে যান। ১৯৭৩ সালে ব্যাপারী কলকাতায় ফিরে আসেন, যদিও তার পরিবার আরও কিছু সময়কাল দন্ডকারন্যে ছিলেন।

যাইহোক, ওই বছরেই তিনি যাদবপুর রেলওয়ে স্টেশনের নিকট রিকশা চালক হিসেবে কাজ শুরু করেন। যদিও ১৯৭৫ সাল নাগাদ যাদবপুর এলাকাতে রাহাজানিতে যুক্ত হওয়ার কারনে তিনি গ্রেপ্তার হন। আর ১৯৭৫-৭৭ সাল এই দুই বছর জেলে থাকাকালীন সময়কালে তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা যেন তাকে প্রভাবিত করেছিল এবং তিনি জেলের ভিতরেই পড়াশোনা শুরু করেন। আর পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে, "জেল থেকে ছাড়া পেয়েও পড়া সামলাতে পারিনি। এভাবে পড়তে পড়তেই একদিন চানক্য সেনের 'পিতা-পুত্র' বইতে একটা শব্দ পাই 'জিজীবিষা'। শব্দটার মানে খুঁজতে খুঁজতেই একদিন রিকশায় ওঠা এক মহিলা সওয়ারীকে জিজ্ঞাসা করি শব্দটার মানে। উনি অবাক হয়। আমার কাছ থেকে জানতে চান আমার বিষয়ে। সবটা শুনে বললেন, ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। উনি নাকি আমার মতো অল্পশিক্ষিত মানুষজনের লেখা ছাপেন। আমি ঠিকানা রেখে দিই। বলি, লেখা হলে জানাব। একমাস ধরে বহু চেষ্টায় একটা লেখা তৈরি হয়। তারপর জানতে পারি ওই মহিলার নাম মহাশ্বেতা দেবী। মূলতঃ তারপর থেকেই আমি একের পর এক লিখতে থাকি। অতঃপর আমার এই পরিচিতি।"[৪]

**'ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন'- এ রচনার নানা আঙ্গিক**

দলিত আত্মজীবনীগুলি ব্যক্তিগত তথ্যের চেয়ে অধিক বেশি এক সামাজিক প্রতর্ক। আর মনোরঞ্জন ব্যাপারীর রচনায় যেন ব্যক্তিস্বতন্ত্রমূলক নানা অভিজ্ঞতার সঙ্গে বহুধাবিস্তৃত ও বহুবিভক্ত সামাজিক ক্ষেত্রের নির্মম রূপ স্পর্ষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ এই রচনায় দেশভাগের পর নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের অবস্থা, রাজনৈতিক দলের নানা কুচক্র, স্তরীকৃত সামাজিক ধাঁচে মানুষের সামাজিক অবস্থান, বর্নবাদের কঠোরতা ইত্যাদী বিষয়গুলি বিশেষভাবে স্পর্ষ্ট হয়েছে। বলা প্রয়োজন, জাতিগত ভিত্তিতে ব্যাপারী ছিলেন চন্ডাল (উচ্চবর্গীয়দের ভাষায় অস্পৃশ্য); নাগরিকত্বের দিক থেকে তিনি ছিলেন উদ্বাস্তু; পেশাগত দিক থেকে তিনি শিশু শ্রমিক (চায়ের দোকানে কাজ বা উচ্চবর্গীয়দের বাড়িতে ভৃত্যের কাজ করেছেন) হিসেবে কাজ করেছেন, প্রাপ্তবয়সে রিকশাচালক হিসেবে কাজ করেছেন অর্থাৎ তাঁর পেশাগত প্রকৃতি ছিল অসংগঠিত ও মিশ্র; শিক্ষাগত দিক থেকে তিনি সাবালক হওয়ার আগে পর্যন্ত ছিলেন নিরক্ষর। এমনকি রাহাজানিতে যুক্ত হওয়ায় তিনি কারাবন্দী হয়েছিলেন, সেদিক থেকে অপরাধীর তকমাও তার উপর ছিল। অর্থাৎ তার জীবন অতিবাহিতকরনের ক্ষেত্র থেকে সঞ্চিত নান অভিজ্ঞতাই তার রচনায় স্পর্ষ্ট হয়েছে। ব্যাপারী লিখেছেন, "জীবনে যত কিছু পাঠ, যা কিছু আহরন এবং

সঞ্চয় সব পেয়েছি জীবনের কাছ থেকে। জীবনই আমার পুঁথি পুস্তক, আমার শিক্ষক-গুরু-মার্গ-দর্শক। তাই যা দুই লাইন লিখেছি সব জীবন, জীবন থেকে শেখা, জীবন থেকে জানা, জীবন থেকে পাওয়া, জীবন থেকে নেওয়া।”[৫]

**উদ্বাস্তুদের আগমন ও তাদের অবস্থার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট**

দেশভাগের পর পরই পূর্ববঙ্গ থেকে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুরা একইসঙ্গে, একইসময়ে এদেশে উদ্বাস্তু বা শরনার্থী হয়ে আসেন নি। তারা নানা সময়ে এসেছিলেন। ড. রূপকুমার বর্মন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন, সরকার কর্তৃক গঠিত উদ্বাস্তু কলোনী ও ক্যাম্প এবং সেইসব কলোনি ও ক্যাম্পে কত সংখ্যক উদ্বাস্তু পরিবার ও লোকজন ছিলেন তাঁর সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরন বিশদে উল্লেখ করেছেন।[৬] জয়া চ্যাটার্জী দেখিয়েছেন, দেশভাগের অব্যবহিত পরে যেসব হিন্দু উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন স্বচ্ছল ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর লোক। আর ক্রমে ক্রমে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু যারা কৃষক, ভাগচাষী বা কৃষিশ্রমিক ছিল, তারাও দেশত্যাগ করে।[৭] ব্যাপারীর রচনায়ও স্পর্ষ্ট হয়েছে যে, যারা শিক্ষিত, সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত, অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল তারা প্রথমে চলে আসে। যারা সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট ছিল তারাও পালিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছিল....নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা পরে এসেছিল।[৮]

তবে সেক্ষেত্রে স্বচ্ছল ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোক বা উচ্চ শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের নতুন রাষ্ট্রে এসে ততটা সংকটের মধ্যে পড়তে হয়নি, যতটা পড়তে হয়েছিল নিম্নশ্রেণীর লোকেদের। কারন উচ্চশ্রেণী বা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের কর্মসূত্রে কিংবা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের সূত্রে উদ্বাস্তু হয়ে আসার পর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।[৯] তবে ড. রূপকুমার বর্মন এসবের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের প্রতি সরকারি নীতির দ্বিচারিতার বিষয়টিও স্পর্ষ্ট করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ড. বিধান চন্দ্র রায় কলোনী ও ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু কলোনীগুলিতে অধিকাংশ উদ্বাস্তু ছিল উচ্চ শ্রেণী বা শিক্ষত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সেখানে তপশিলি উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত।[১০] আর এই সমস্ত বিষয়গুলি মনোরঞ্জন ব্যাপারীর উক্ত রচনায় স্পর্ষ্ট। তিনি লিখেছেন, পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের মধ্যে দুই ধরনের বিভাজন ছিল। সেক্ষেত্রে নিঃস্ব, দরিদ্র, নিরক্ষর নিম্ন জাতিদের বলা হত ছোটলোক, যাদের সাথে ক্যাম্পে থাকতে উচ্চশ্রেণীরা অনিচ্ছুক ছিল।[১১] সর্বোপরি, ব্যাপারী লিখেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী মানুষদের কাছে ‘উদ্বাস্তু’- এর সমার্থক শব্দ যেন ‘বাঙ্গাল’

ছিল। আর তাদের প্রতি অবজ্ঞা, হিংসা, দ্বিচারিতা যেন একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১২]

**ক্যাম্পে থাকা উদ্বাস্তুদের অবস্থা ও রাজনৈতিক দলের নানা কুচক্রী নীতি**

সরকার কর্তৃক সৃষ্ট কলোনী বা জবরদখল কলোনীগুলিতে উচ্চ শ্রেনী বা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর উদ্বাস্তুরা থাকত, সেখানে স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত তপশিলি সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুদের স্থান ছিল না বললেই চলে। এই নিম্নশ্রেনীর লোকেদের মূলত ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল। যাইহোক, রূপকুমার বর্মন দেখিয়েছেন, ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের অবস্থা ছিল চরম সংকটময়। যদিও আপাতদৃষ্টিতে সরকার উদ্বাস্তুদের জীবনধারনের জন্য 'ডোল' সরবরাহ করত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবন গৃহপালিত পশুর তুলনায় ভালো ছিল না।[১৩] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন, প্রত্যেকটি ত্রাণ শিবিরের উপর একটি বিশাদের আচ্ছাদান ছিল। ক্যাম্পের ডোলজীবি এই মানুষগুলি অল্প দিনের মধ্যেই ভুলে গেল যে তারা একসময় মানুষ ছিল।[১৪] হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, বিড়াল-কুকুরের চেয়েও খারাপ অবস্থায় তাদের রাখা হয়েছিল।[১৫]

উদ্বাস্তু সকল ক্যাম্পবাসীদের জীবন কমবেশি একই ছিল। এক্ষেত্রে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর গ্রন্থে উল্লেখিত তাঁর উদ্বাস্তু জীবনে ক্যাম্পে থাকার অভিজ্ঞতা উল্লেখ করলে চিত্রটি সম্পূর্নই স্পষ্ট হবে— শিয়ালদহ স্টেশন থেকে আমাদের বাঁকুড়া জেলার শিরোমনিপুর ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে আমাদের আগে থেকেই কয়েক হাজার উদ্বাস্তু পরিবার ছিল। এক বিশাল বড় মাঠ যেখানে সারিতে গায়ে গায়ে কালচে বাদামী রঙের তাবু ফেলা ছিল। পাঁচ-ছয় বা সাতটা করে পরিবার ৮/৬ ফুট স্থানে তাবুর নীচে গাদাগাদি করে থাকতে হত.....আর ওই কয়েক হাজার পরিবারের জন্য সরকার মাত্র দুটো জলের কলের বন্দোবস্তো করেছিল, সেখানে এক-দু ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে দু-বালতি জল পাওয়া যেত। সরকারি লঙ্গরখানা থেকে কিছু চাল, ডাল ও ডোল দেওয়া হত...যখন একটু ভালো কিছু রান্না হত, তা যেন স্বর্গের খাবার মনে হত। কারন, এমনি সময়ে নোংরা-ভাঙা চাল-ডাল রান্না হত, তা যেন একেবারে বিস্বাদ লাগত। এমনকি শৌচকর্মের জন্য নির্দিষ্ট কোন ঘেরা স্থান বরাদ্দ ছিল না। কাজেই তাবুর পিছনের দিকে বা কিছু দূরে শৌচকর্ম সারতে হত। পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল একেবারে জরাজীর্ণ। আমাদের ক্যাম্পবাসীদের জীবন ছিল দুঃসহ, যন্ত্রনাময়।[১৬]

আর উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাজনৈতিক দলের নানা জঘন্য খেলাও তাঁর রচনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে সরকার সময়ানুক্রমে ক্যাম্পে ত্রাণ দেওয়া বন্ধ করেছিল

এবং ভেবেছিল ক্যাম্পে উদ্বাস্তুরা বিমর্ষ হয়ে পড়বে ও নিজেদের দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু যখন তা হল না তখন সরকার মনস্থির করে তাদেরকে আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। তবে সেইসময় কমিউনিস্ট দল নড়বড়ে ভিতে ছিল। তারা এই সুযোগে উদ্বাস্তুদের নিয়ে দলকে শক্তিশালি করার জন্য তাদেরকে বোঝাতে থাকে যে তারা যেন আন্দামানে না যায়। সেক্ষেত্রে ক্যাম্পে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের অনেকে কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রস্তাবকে প্রতাখ্যান করে এবং এই পরিকল্পনা কিছু পরে বন্ধ হয়।[১৭]

কয়েক বছর পর মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতারা দ্বিতীয় পরিকল্পনা ঘোষনা করেন — দন্ডকারন্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা। সেক্ষেত্রে ওড়িষ্যার কোরাপুট ও কালহান্দি জেলা এবং মধ্যপ্রদেশের বস্তার এলাকার বিস্তৃর্ন ভূমি সমেত ৭৭৬৭০ বর্গ কিলোমিটার অনুর্বর, পাথুরে ও জঙ্গলাকীর্ন এলাকা এই প্রকল্পের তথা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য বেঁছে নেওয়া হয়েছিল। ব্যাপারী লিখেছেন, সরকারে উদ্দেশ্য ছিল যদি উদ্বাস্তুদের এইসব স্থানে আনা যায়, তাহলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে – উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যার সমাধান হবে এবং বিস্তৃর্ন এই বন্ধ্যা জমি কৃষিজমিতে পরিনত করা যাবে।[১৮] এছাড়া তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, "অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি আর ফরোয়ার্ড ব্লকের একটা সংগঠন ছিল উদ্বাস্তুদের নিয়ে — ইউ.সি.আর.সি। তাদের নেতারাও সকলকে উস্কানি দেয় দন্ডকারন্যে না যাওয়ার জন্য। কিছু মানুষ তবুও দন্ডকারন্যে চলে গেছিল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যেতে রাজী হল না। এরমধ্যে সরকার জানিয়ে দিল, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দন্ডকারন্যে না গেলে সমস্ত সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। এবং তাই হল। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রিফিউজি ক্যাম্পের সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়েছিল একই দিনে। ফলে ছিটেফোঁটা সাহায্য যেটুকু মিলত, সেটাও বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে সে এক ভয়ানক অবস্থা। কাজ নেই, টাকা নেই, ভাত নেই...ফলে বেশিরভাগ দিনই খাওয়া জুটত না।"[১৯] তবে যারা দন্ডকারন্যে গিয়েছিল, তারাও অনেকে পরবর্তীতে ফিরে আসে। ১৯৬৬ সালে ২১৭০ পরিবার দন্ডকারন্য ছেড়ে চলে আসে, ১৯৭৩- এ এই সংখ্যা ৮০০০- এ পৌঁছায়।[২০] আর ১৯৭৭ সালে বাম দল যখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসে তখন এই আগমন আরও বেড়েছিল, কারন তারা উদ্বাস্তুদের আশ্বাস দিয়েছিল যে তারা উদ্বস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু এটি মিথ ছাড়া আর কিছু নয়।[২১]

আর উদ্বাস্তুদের জীবনে এক নৃশংস ভয়াল ঘটনা ছিল 'মরিচঝাপি ঘটনা'। রূপকুমার বর্মন দেখিয়েছেন, ১৯৭৮ সালে এপ্রিলের শেষে ৪০০০০ উদ্বাস্তু

মরিচঝাপিতে পুনর্বাসিত হয়েছিল। এমনকি তারা নিজ প্রচেষ্টায় সেখানে ঘর-বাড়ি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাজার, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, জলের কল বসানোর পাশাপাশি বিড়ি, বেকারি বয়ন কারখানা ইত্যাদীও স্থাপন করে। তবে বাম সরকার নানা আচিলায় তাদেরকে সেখান থেকে উৎখাত করতে চেয়েছিল এবং সময়ানুক্রমে তাদের উপর নৃশংস অত্যাচারও চালিয়েছিল। আর অবশেষে **১৯৭৯** সালের **১৩** ই মে সরকার পোষিত পুলিশ ও ক্যাডাররা উদ্বাস্তুদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়, তাদের উপর লাঠি চার্জ ও গুলি করে। পরের চার দিনের মধ্যে উদ্বাস্তুরা মরিচঝাপি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়।[২২] ব্যাপারী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আমি এটা কোনোভাবেই বুঝতে পারছিলাম না যে বহু সংখ্যক লোক একই ভূমি থেকে এদেশে এসেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে এক শ্রেনীকে শহরের ভিতরে এবং প্রান্তে নানা কলোনীগুলিতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আরেক শ্রেনী, যারা সুন্দরবনের জঙ্গলে 'মরিচঝাপি' নামক বিচ্ছিন্ন দ্বীপে ছিল, সরকার তাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল। আমার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছিল, কেন শাসক শ্রেনী এরকম দ্বৈত আচরণ করছেন। পরে বুঝলাম এর পিছনে যা ছিল, তা হল প্রাচীন শতকের বর্নব্যবস্থার প্রভাব।[২৩]

**ব্যাপারীরউক্ত রচনায় জাত প্রথার কঠোরতার আভাস**

সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ভারতের নিম্নবর্গীয় মানুষেরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই নানা ধরনের বর্নগত অসহিষ্ণুতার অত্যাচার ও লাঞ্ছনার মুখোমুখি হয়েছেন। সাম্প্রতিককালেও তার ধারা বহমান। তবে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর রচনায় তৎসময়ের তথা দেশভাগের পরবর্তীতে উদ্বাস্তুদের প্রতি সরকারের, স্থানীয় ব্যাক্তি যারা পশ্চিমবঙ্গে আগে থেকেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছে বা উচ্চ শ্রেনীর মনোভাবের কথা স্পর্ষ্ট হয়েছে। 'ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন' গ্রন্থ বিষয়ে এক পত্রিকায় ব্যাপারী উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে বলেছেন যে, "দেশভাগের ফলে দুই ধরনের রিফিউজি তৈরি হয়েছিল। উচ্চবর্ন ও নিম্নবর্ন। অনেকে বর্নবাদটা মানে না। কিন্তু আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বর্নবাদটা ছিল ভিতরে ভিতরে। আর নিজে নিম্নবর্নের মানুষ না হলে এটা উপলব্ধি করাটাও খানিকটা কঠিন।"[২৪]

আবার সরকার কর্তৃক সৃষ্ট কলোনী বা জবরদখল কলোনীতে ভদ্রলোক তথা উচ্চবর্নরাই থাকত, সেখানে নিম্নবর্গীয়দের কোন ঠাই ছিল না বললেই চলে। এমনকি দেশভাগের পূর্ব থেকে বসবাসকারী পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী মানুষদের কাছে 'উদ্বাস্তু'-র

সমার্থক শব্দ যেন 'বাঙ্গাল' হয়েছিল। আর তাদের প্রতি দৃষ্টিকটু বিষয়টি একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ওপার বাংলা থেকে আসা উচ্চবিত্ত তথা অবস্থাসম্পন্ন উদ্বাস্তুরাও ওপার বাংলা থকে আসা ক্যাম্পে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের প্রতি ঘৃনাভাব দেখাত। ব্যাপারী বলেছেন, ঝগড়ার সময়ে উচ্চবিত্ত বা অবস্থাসম্পন্ন উদ্বাস্তুরা "তোদের মত ক্যাম্পে থাকি নাকি?" — এসব বলত হামেশাই।[২৫] এমনকি তিনি বলেন, "ঘুটিয়া শরিফের যে বাড়িতে গরু চরানোর কাজ পেলাম, সেই বাড়ির মহিলা যেই শুনলেন আমি নমঃশূদ্র, ব্যাস আমার সঙ্গে কুকুর-বেড়ালের মত ব্যবহার শুরু করে দিলেন। নমঃশূদ্র শুধু না, যাকে বলে চন্ডাল। আমি অবশ্য তখন জানতাম না যে আমি চন্ডাল। পরে জেনেছি। বর্নবাদের সঙ্গে পরিচিতি সেই প্রথম।[২৬] এরকম বহু ঘটনার উল্লেখ ব্যাপারীর রচনায় রয়েছে, যা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে উদ্বাস্তুদের প্রতি জাত প্রথার কঠোরতার নিদারুন চিত্র তুলে ধরেছে।

**উপসংহার**

ইতিহাসের আবর্তে এই আলোচনা থেকে পরিস্ফূট হয় যে, মনোরঞ্জন ব্যাপারীর 'ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন' গ্রন্থে নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প জীবন, বর্নভেদের কঠোরতা, উদ্বাস্তুদের প্রতি সরকারি আচরণে দ্বিচারীতা, তাদের নিয়ে রাজনৈতিক দলের নানা কুচক্রী খেলা ইত্যাদী বিষয়গুলি বিশদে স্পর্ষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর পূর্ব স্মৃতি তথা পূর্ব অভিজ্ঞিতা এবং যেসব গ্রন্থাদি তিনি পাঠ করেছিলেন তা থেকে নানা ধ্যান-ধারনা সবকিছুই সন্নিবেশিত হয়েছে। বলা প্রয়োজন, এই রচনাটিকে আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিস্বতন্ত্রের উপস্থাপনা বলে মনে হলেও, তা যেন স্তরীকৃত সমাজের সামগ্রিক অবস্থাকে তুলে ধরেছে। তবে উদ্বাস্তু সম্পর্কে সবশেষে একথা বলতেই হয় যে — ১৯৪৭-র দেশভাগ শুধুমাত্র উদ্বাস্তু সমস্যা সৃষ্টি করেছিল এমন নয়। দেশভাগ অনেক অন্যায় প্রথার অবসানে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। উচ্চবর্ন ও নিম্নবর্ন নির্বিশেষে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিনবঙ্গের সীমানা ঘেষা জেলাগুলিতে উদ্বাস্তু শিবির তথা পুনর্বাসন কলোনীগুলিতে পূর্ববঙ্গীয়দের কাছে বেঁচে থাকার সংগ্রাম অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। 'অস্পৃশ্যতা' বা 'পৃথক ভোজনের ব্যবস্থা' তাঁদের কাছে ছিল অতি বিলাসিতার নামান্তর।

**তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী :**


১. Chatterjee, Joya 'The Spoils of Partition —Bengal and India (1947-1967), Cambridge University Press, London, 2007, p – 119.

২. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন 'ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন', দে পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৪, পৃ – ৫.

৩. তদেব, পৃ – ১০৩

৪. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন 'বাবুলালের "নো স্যারেন্ডারের ইতিবৃত্ত" (বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত গদ্য)', পুজো সংখ্যা, কলকাতা, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ – ১২৯-১২৯.

৫. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন 'ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন' (প্রাককথনের অংশ)

৬. Barman, Rupkumar 'Partition of India and Its Impact on The Scheduled Caste of Bengal', Abhijeet Publication, New Delhi, 2012, p – 132-166.

৭. Chatterjee, Joya , p – 126-127.

৮. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন 'ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন', পৃ – ১৫.

৯. Chatterjee, Joya, p – 126-128.

১০. Barman, Rupkumar, p – 154-157.

১১. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন 'ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন', পৃ- ২১.

১২. চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার 'প্রান্তিক মানব —পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের কথা', প্রতিক্ষন পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ – ১৯-২০.

১৩. Barman, Rupkumar, p – 158-159.

১৪. চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার, পৃ – ৮০.

১৫. বন্দোপাধ্যায়, হিরন্ময় 'উদ্বাস্তু', শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ – ৩১.

১৬. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন 'ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন', পৃ – ১৫-১৮.

১৭. তদেব, পৃ – ২২.

১৮. তদেব, পৃ – ২৩.

১৯. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন (বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত গদ্য), পৃ – ১১৯-১২-.

২০. Ghosh, Alok Kumar 'From Caste To Class – The Dalit Experience of Partition in Bengal,' in Biswajit Chatterjee and Debi

Chatterjee (ed) 'DalitLives and Dalit Vission in Eastern India', Centre for Rural Resources, Kolkata, 2007, p - 13

২১. মন্ডল, জগদীশ চন্দ্র 'মরিচঝাপি — নৈশব্দের অন্তরালে', সুজন পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০২, পৃ – ৪৯.

২২. Barman, Rupkumar, p – 192-210.

২৩. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন 'ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন', পৃ – ৩৫.

২৪. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন (বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত গদ্য), পৃ – ১২০.

২৫. তদেব, পৃ – ১২২.

২৬. তদেব, পৃ – ১২২-১২৩.

# জন্মদিনে'র 'ঐকতান' : সামগ্রিকতার সন্ধানে

প্রণব নস্কর
SACT-II, বাংলা বিভাগ,
ফকিরচাঁদ কলেজ, ডায়মন্ড হারবার

**যে রেখা পড়িছে আঁকা শিল্পীর তুলির টানে টানে**

সার্ধশতবর্ষ অতিক্রান্ত করে আজ কবির বয়স একশ আটান্ন বছর। এই অভিপ্রায়ে আমাদের প্রিয় কবিকে তাঁরই জন্মদিনের প্রাক্কালে আরো একবার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে নিতে পারি তাঁরই লেখা কবিতার পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে। সেই শৈশবে আট-নয় বছর বয়সে যে কবি কলম ধরেছিলেন, জীবন সায়হ্নে পৌঁছে তাঁর কলম স্থগিত হয়ে যায় মাত্র আশি বছরের সময় সীমায়। জমিদারি পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের উৎসাহ ও প্রবল আগ্রহে যাঁর লেখা শুধু হয়েছিল, সেই কবি রবীন্দ্রনাথ নিজের নাম মুদ্রিত গ্রন্থাকারে প্রথম বই চোখে দেখেছিলেন ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে। বইটির নাম 'কবিকাহিনী'। আবার জীবনসন্ধ্যায় পৌঁছে তাঁর চোখে দেখা গ্রন্থাকারে শেষ বইটি ছিল 'জন্মদিনে' (১ বৈশাখ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)। তবে জীবনের একেবারে শেষ কয়েকদিনের লেখা নিয়ে শেষ কবিতার বই 'শেষ লেখা'— কবির মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পরে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৪১) প্রকাশিত হয়। তাই গ্রন্থটি কবি নিজ চোখে দেখে যেতে পারেননি। অবাক লাগে, রবীন্দ্রনাথের বিপুল রচনা সম্ভারের মধ্যে তাঁর জীবনের প্রথম এবং শেষ মুদ্রিত গ্রন্থ কিন্তু কবিতার বই— যা তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৪৮ সালের পয়লা বৈশাখ, ইংরেজি ১৪ এপ্রিল ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে নববর্ষের দিনে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থটি প্রাকশিত হয়। সে সময় শান্তিনিকেতনে রেওয়াজ ছিল পয়লা বৈশাখের দিন সকালে নববর্ষ উৎসব পালন এবং সন্ধ্যায় উত্তরায়ণে নির্মিত একটি মণ্ডপের নীচে 'রবীন্দ্র-জন্মোৎসব'-এর আয়োজন হত। এই অনুষ্ঠানের দিনেই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে তিনি দেশকে ও মানুষকে শেষ উপহারটি দিয়ে গিয়েছিলেন। এর কবিতাগুলি ছিল কবির জীবনযজ্ঞের আহুতির শিখা ও অনেক দুঃখের তপস্যার ফল। গ্রন্থটিরর পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছিল কবির শেষ বর্ষের ইতিহাস : ১৩৪৭-এ নববর্ষের দিন জন্মোৎসব হবার ক'দিন পরে কবি চলেছেন পাহাড়ে। কালিম্পঙে রবীন্দ্রনাথের আসতে দেরি আছে

বলে কবি মংপুতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে কবির জন্মদিনের উৎসব হল। পরের দিন খবর পেলেন কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে কালীমোহন ঘোষের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদের জন্যও কবি-মন তৈরি ছিল না। তখন কবি কালিম্পঙে, সেখান থেকে কলকাতায় গিয়ে আবার শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। এভাবে কবির দিনগুলো মন্থরগতিতে চল্‌ছিল। শরীর ভেঙে পড়ছে-হাঁটতে কষ্টও হয়, ঠেলা গাড়িতে চলাফেরা করেন, চোখের দৃষ্টি কমে এসেছে, কানেও তখন কম শুনছেন। তা সত্ত্বেও ছোটোবড়ো কাজের জন্য লোক আসেন, লেখালিখির তাগিদও আসে নানা জায়গা থেকে। শান্তিনিকেতনে তাঁর মন টেঁকে না, চলাফেরার সতর্কতা নিয়ে কলকাতায় আসেন এবং সেখানে থেকে শেষ সফর পুনরায় কালিম্পঙে প্রতিমা দেবীর কাছে গেলেন। এখানে কবি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গিয়ে জ্ঞান হারান। কলকাতায় আনা হল কবিকে অজ্ঞান অবস্থায়। প্রায় একমাস শয্যাশায়ী থাকলেন। শুয়ে শুয়ে কবিতা বলে যান, পাশের লোক লিখে নেন। 'রোগশয্যায়' কাব্যে এগুলি সংকলিত হয়েছে। রোগশয্যায় তখন দিন কাটে কবির— কখনও কেদারায়, কখনও বিছানায়, রাত্রি কাটে কখনও অনিদ্রায়, কখনও-বা বিচিত্র ভাবনায়। এরই মধ্যে চলেছে সাহিত্যসৃষ্টি— কোনোটি গম্ভীর, কোনোটি আবার লঘু। কবির কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতাও এই সময়ে লেখা হয়ে যায়। এই উৎকৃষ্ট ফসলের কয়েকটি রচনা ধরা আছে 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থে।

'জন্মদিনে' গ্রন্থটির মধ্যে সবকটি কবিতা সংখ্যাযুক্ত হলেও বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশকালে এর বেশিরভাগই ছিল শিরোনামযুক্ত। নামসহ সেই তালিকার প্রকাশ ও শিরোনামগুলোর পরিচয় নেওয়া যাক—

| কবিতা সংখ্যা | কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি | সাময়িকপত্রে প্রকাশ | শিরোনাম |
|---|---|---|---|
| ১ | সেদিন আমার জন্মদিন | মন্দিরা, বৈশাখ ১৩৪৮ | সেদিন আমার জন্ম |
| ২ | বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে | বৈশাখী, বার্ষিকী ১৩৪৮ | অপরিসমাপ্ত |
| ৫ | জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিনু যবে | প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ | জন্মদিনে ১ |
| ৬ | কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে | প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ | জন্মদিনে ২ |
| ৭ | অপরাহ্নে এসেছিল | প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ | জন্মদিনে ৩ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৮ | আজি জন্মবাসরে বক্ষ ভেদ করি | প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ | জন্মমৃত্যু |
| ৯ | মোর চেতনায় | প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ | জলচর |
| ১০ | বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকু জানি | প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৭ | ঐকতান |
| ১১ | কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত | প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৭ | প্রথম প্রৈতি |
| ১২ | করিয়াছি বাণীর সাধনা | প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৮ | পথের শেষে |
| ১৪ | পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে | পরিচয়, কার্তিক ১৩৪৭ | কালিম্পঙের চিঠি |
| ১৫ | মনে পড়ে, শৈলতটে | প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৮ | গিরি-নিবাস |
| ১৬ | দামামা ওই বাজে | প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৭ | নবজাতকের উত্তর-কাণ্ড |
| ১৭ | সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে | প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৭ | আরোগ্য |
| ১৮ | নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে | প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৭ Liberty, September 1933 | চিরস্মরণীয় |
| ১৯ | বয়স আমার বুঝি | প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৭ | ছেলেবেলা |
| ২০ | মনে ভাবিতেছি | প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৭ | আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে |
| ২১ | রক্তমাখা দন্তপঙ্‌ক্তি হিংস্র সংগ্রামের | প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৭ | অভিশাপ |
| ২৫ | জটিল সংসার | প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৭ | অন্তঃশীল |

সংযোজন

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | নারীর দুঃখের দশা অপমানে জড়ানো | প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৭ | অবিচার |
| ২ | সংগ্রামমদিরাপানে আপনা-বিস্মৃত | প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৭ | প্রচ্ছন্ন পশু |

উল্লেখ করা যেতে পারে, আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের শেষ দুটো কবিতা এবং তৃতীয় একটি কবিতা 'ফসল গিয়েছে পেকে' 'জন্মদিনে' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ছিল না, পরে ১৩৮৪ আষাঢ় সংস্করণে এগুলি সংযোজিত হয়েছে। কবিতার নাম প্রসঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে কবির মৃত্যু-উত্তর 'সঞ্চয়িতা' সংস্করণে 'জন্মদিনে'র যে তিনটি কবিতা গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে একটির নামের পরিবর্তন ঘটেছে। 'পথের শেষে' এবং 'ঐকতান' শিরোনাম অপরিবর্তিত থাকলেও 'কালিম্পঙের চিঠি' নাম পরিবর্তন হয়ে অন্য নাম হয়েছে 'বরণ'।

**অসীম পথের পান্থ, এবার এসেছি ধরা মাঝে**

'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা থেকেই দেখা যাবে কবির পরিণত মনের বিবিধ চিন্তার রূপায়ণ; কখনও তা দার্শনিক প্রজ্ঞায় অনুসৃত, আবার কখনও-বা রহস্যময়তায় মোড়া। আমাদের আলোচ্য '১০' সংখ্যক 'ঐকতান' নামক কবিতাটি কবি লেখেন শান্তিনিকেতনের 'উদয়ন'-এ থাকার সময় ২১ জানুয়ারি, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রাতঃকালে। কবিতাটি প্রবাসীতে প্রকাশ হওয়ার পর বিদগ্ধ পণ্ডিত সমাজ ও পাঠকদের মধ্যে আলোচনার শেষ ছিল না। আর কবিতাটি রচনা সম্পর্কে লোকশ্রুতিরও অভাব হল না। তাই এরকম শোনা যায় 'রবিগুপ্ত' ছদ্মনামে কোনো একজন বামপন্থী সমালোচক নাকি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেন যে কবি সাধারণ মানুষের দুঃখ বেদনার রূপায়ণে আন্তরিক নন এবং দরিদ্রের চোখের জলকে তিনি মুক্তার সঙ্গে উপমিত করেছেন। নীল কাঁচের মধ্য দিয়েই তাই তিনি সাধারণ মানুষের জীবনধারা দেখেছেন বলেই জনগণ তাঁর সাহিত্যে বাস্তবাতীত বর্ণাঢ্যতায় আবিল। রবীন্দ্রনাথ এমনই অভিযোগ একটি গ্রন্থের মধ্যে শোনেন এবং মৃত্যুর সাত মাস আগে তার জবাবদিহি করতেই কবিতাটি লিখেছিলেন।[১] এমন তথ্য নিছকই জনশ্রুতি, এর কোনো লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রসাহিত্যে 'জন্মদিনে'র ১০ সংখ্যক কবিতাটির একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। 'ঐকতান' নাম নিয়ে কবিতাটি প্রাবসীতে প্রকাশ পায় ১৩৪৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যায়। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির অপূর্ণতার স্পষ্ট স্বীকৃতি। এটি প্রকৃতি, জগৎ ও

মানবজীবন নিয়েই সম্পূর্ণ সৃষ্টি সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের অপূর্ণতাকে তিনি পরিব্রাজকের বর্ণনা পূর্ণ করে নেন, কিন্তু কবি অভিজাত সমাজভুক্ত হওয়ায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর মিলিত হওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি ছিলেন সমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তির উচ্চাসনে নির্বাসিত। তাই ভবিষ্যতের কবির জন্য তিনি অপেক্ষা করেছেন— যিনি এই অবহেলিত মানুষের একজন হবেন এবং তাদের যথা পরিচয়কে কাব্যে ফুটিয়ে তুলবেন। শেষ জীবনে এই অসম্পূর্ণতার কথা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। এই অসম্পূর্ণতার বেদনাই হল 'ঐকতান' কবিতার মূল সুর। এর পূর্ববর্তী 'আরোগ্য' গ্রন্থে আমরা কবির মানব-প্রশস্তি লক্ষ করেছি। কৃষক, শ্রমিক দরিদ্র এককথায় সাধারণ মানব— যারা মানববেতিহাসের এক দরদী শিল্পী, তাদের জয়গান শোনা গেছে। এই 'ঐকতান' কবিতাতেও জনসাধারণের কথা বলার জন্যই কবি চিত্ত ব্যাকুল। তিনি যে অসম্পূর্ণতার বেদনা অনুভব করেছেন— তা প্রকাশ করার জন্যই এ কবিতার রচনা।

কালের পটভূমিতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আজ যা দুর্ধর্ষ ও শক্তিমান, কালের গতিবেগে সেই দুর্ধর্ষ শক্তির আশু অবসান অবশ্যম্ভাবী। আবার প্রবল পরাক্রান্ত জাতির অতি দম্ভ ও প্রতাপ চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু যারা সবসময় মাটির কাছাকাছি আছে এবং যাদের কাজের ওপর নির্ভর করে পৃথিবী চলমান— সেইসব মানুষেরাই চিরস্থায়ী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাজনৈতিক নিষ্ঠুরতার প্রবল চাপে পিষ্ট যে জনসাধারণ— যারা এই পৃথিবীর কল্যাণেই নিজেদের শ্রমশক্তি নিয়োজিত করেছিল; অথচ তারাই আজ রাষ্ট্রীয় নিষ্ঠুর যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত। কবি বারবার সেই সব সাধারণ কল্যাণকর বৃত্তিধারী মানুষদের প্রতি পরোক্ষে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। এমন ভাবনাই ফুটে উঠেছে 'আরোগ্য' কাব্যের ১০ সংখ্যক কবিতায় "অলস সময়-ধারা বেয়ে/মন চলে শূন্য-পানে চেয়ে।" কবি ভারতবর্ষের অতীতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে কবিতাটির শুরু করলেও মহাকালের অমোঘ নিয়মে শক্তি ও দম্ভের পতনকে অনিবার্য করে তুলল। কিন্তু যারা সাধারণ মানুষ, পৃথিবীর কল্যাণ রচনায় সাধারণ বৃত্তিধারী— তাদের অবলুপ্তি নেই। তাই কবি সেই সমস্ত মানুষের মহামন্ত্রধ্বনি গুঞ্জরিত করে বলে উঠলেন "শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে/ওরা কাজ করে।"

অন্য দিকে 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক 'ঐকতান' কবিতা : "বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকু জানি"—উদ্ধৃত কবিতা দুটি রচনার পরিপ্রেক্ষিতে কবি রবীন্দ্রনাথকে নানা রকম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি শ্রেণি সংঘর্ষের ফলশ্রুতি হিসেবে ইতিহাসের চিরাচরিত ফসলকে গ্রহণ করেছেন এমনটা নয়। তবে সাধারণ

মানুষের প্রতি অগাধ ও অসীম মমতার অধিকারী কবির ঐতিহাসিক চেতনার রূপ কিছুটা ভিন্নতর। কবি সাধারণ মানুষকে প্রাণ ভরে ভালবেসেছেন, সেই ভালোবাসার মধ্যে কোনো রকম ফাঁকি ছিল না। তাঁর শেষ জীবনের কাব্য বিশেষ করে 'ঐকতান' কবিতায় সেই মানবপ্রীতি কাছের মানুষ-কে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-সমালোচক শিশিরকুমার ঘোষের অভিমত স্মরণযোগ্য : "'রোগশয্যায়' ও 'আরোগ্য'র পরিণতি 'জন্মদিনে'। 'প্রান্তিকে'র পর আরেকটি শিখর। মৃত্যু ও মহাদূরত্ব; অব্যক্তের বিরাট ছাদ ঘিরে আছে বইটিকে।"[২]

কবি রবীন্দ্রনাথ মার্কসীয় দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বা না হয়েও সাধারণ মানুষের প্রতি দরদী ও গভীরভাবে সহানুভূতিশীল ছিলেন এই পরিচয় তাঁর কবি জীবনের শুরু থেকেই পাওয়া যায়। তবে প্রথম জীবনে তিনি মর্ত্যলোকে মানবের মাঝেই বেঁচে থাকার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন তিনিই আবার শেষ জীবনে সাধারণ মানুষের দুঃখ-সুখের অনুভবে একাত্ম হয়েছেন। এর প্রমান রয়েছে 'ঐকতান' কবিতায়। জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে কবির জীবন পিপাসা সম্পূর্ণ নয়। তাইতো কবিতার প্রথম স্তবকে কবি জানিয়ে দেন এমন সত্যবাণী :

'বিপুল এ পৃথিবীর কততুকু জানি।'

কবি তাঁর জীবনের এবং জীবন-কর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানিয়ে দিয়ে বিপুল পৃথিবীর সর্বব্যাপকতার সঙ্গে পূর্ণ পরিচয়ের অজ্ঞতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আর অনাদৃত সাধারণ মানুষের একাংশের সঙ্গে মেলামেশা করতে না পারার জন্য কেবলই ব্যথিত হয়েছেন। আমাদের দেশ ভারতবর্ষে কত নগর-রাজধানী, মানুষের কত কীর্তি, কত নদ-নদী-গিরি-সিন্ধু-মরু, কত সব অজানা জীবজন্তু, কত অজানা তরু-পুষ্প-বীজ— এ সবের কিয়দংশ-ই মাত্র কবির জানা, বাকি বেশির ভাগই তাঁর গোচরের বাইরে। এ পৃথিবী যে একটা বৃহৎ খেলাঘর, কবি যেন তারই একজন কারিগর— সম্পূর্ণ খেলা আর তাঁর দেখা হয় না। তাই ভ্রমণ পিপাসু কবি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আস্বাদনের জন্য অক্ষয় উৎসাহে নানা গ্রন্থ, ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী কুড়িয়ে এনেছেন। এভাবে তিনি নিজের জ্ঞান পূরণের কথা বলেছেন। তবে এখানেও কবি থামেননি, এই অবহেলিত জীবনের যারা যথার্থ শরিক, যারা অনাদৃত— তাদের মধ্য থেকেই নতুন কবিকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন অসম্পূর্ণ কর্মকে সম্পূর্ণ করার উদ্দেশে।

দ্বিতীয় স্তবকে কবির উপলব্ধি, ‘জীবনে জীবন যোগ’ না করা হলে প্রত্যক্ষ অনুভব রসের অভাবে কৃত্রিম পণ্যে গানের পসরা ব্যর্থ হতে বাধ্য। যিনি যে জীবনের অধিকারী, তিনি যেন তাঁর নিজের জীবন-পরিচয়ই ব্যক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু ‘পৃথিবীর কবি’, তাই প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে যে পৃথিবী— তাঁকে তো সেই পৃথিবীর কথাই বলতে হবে। যেখানে যত ধ্বনি বাজবে— তাঁর কাব্যবীণায় যেন তখনই সাড়া জাগাবে। কিন্তু আজ কবি স্বীকার করছেন, তাঁর সুরসাধনায় অনেক আহ্বান-ই পৌঁছায়নি; সেখানে অনেকটা ফাঁক রয়ে গেছে। এই অভিভব  কবি ব্যক্ত করেছেন কবিতায় :

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক—
রয়ে গেছে ফাঁক।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও কবির কল্পনা ও অনুমান ধরিত্রীর এক মহাতান প্রকৃতি রাজ্যে উত্থাপিত হয়ে বহু বিচিত্র সুর-লহরীকে শুনে নিয়েছেন। এভাবে কবি প্রকৃতির অন্তর্লোকে প্রবেশের পথ খুঁজে পেয়েছেন এবং কবির অন্তরে অনুরণিত হয়ে উঠেছে “দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়/অশ্রুত যে গান গায়” ধ্বনি ঝংকার। আবার দক্ষিণমেরুতে মানুষের অগণ্য স্থান, সেখানে ঊর্ধ্বাকাশে যে তারারা অপূর্ব আলোক দ্বীপ্তি দান করেছে এবং কবির অতন্দ্র আঁখি পল্লবকে তা স্পর্শ করেছে। কবির মনের গহনে বিচিত্র কল্লোল বার্তা পাঠিয়েছে সুদূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝরকে সঙ্গে নিয়ে। এইভাবে পৃথিবীর তথা প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির ঐকতান স্রোতে নিজের সুরের পূর্ণতা সন্দর্শন করে আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠেছেন। আবার এই জগতে যত কবি আছেন, তাঁরা প্রকৃতির ঐকতান স্রোতে গানের প্রবাহ ঢেলে দিয়ছেন। এঁদের সকলের সঙ্গে আমাদের কবির যোগ রয়েছে নিবিড়তর। এই যোগসাধনের ফলে সকলের সঙ্গ পান এবং আনন্দ উপভোগ লাভ করেন। সেই আনন্দ যজ্ঞে তিনিও গীতভারতীর প্রসাদ লাভ করে নিখিলের সংগীতের স্বাদ গ্রহণ করে ধন্য অনুভব করেছেন।

পরবর্তী পর্যায়ে কবির উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে, মানুষের জীবন-পরিচয় বিচিত্র— এর মধ্যেই তাদের যথার্থ পরিচয় লাভ। তবে তাদের সেই দুর্গম অন্তরের হদিস না পেলে তো তাকে জানা সম্ভব নয়। কারণ অন্তর দিয়েই পাওয়া যায় অন্তরের

পরিচয়। কবি চেষ্টা করেছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তিনি সফল হতে পারেননি। তাই ব্যর্থ হয়ে কবি জানান :

পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।

মানুষের অন্তর-তলের যে 'দুর্গম' নিত্য-মানুষ সে দেশকালের মধ্যে, উচ্চনীচ বর্ণের মধ্যে, ধনীদরিদ্রের মধ্যে আবদ্ধ নয়— সে সর্বত্রব্যাপী। সকল দেশের সকল মানুষদের অন্তরে সে, সেই মানুষের সান্নিধ্য পেতে হলে সর্বসাধারণের অন্তরের পরিচয় লাভ করতে হবে। কিন্তু কবির জীবনযাত্রার বাধা সেই সকল শ্রেণির মানুষদের সঙ্গে মিশতে বাধা সৃষ্টি করে। অথচ এই সমস্ত সাধারণ মেহনতি মানুষদের মধ্যেই তো রয়েছে চাষি, তাঁতি, জেলে— যাদের বহুদূর প্রসারিত কর্মকাণ্ডের ওপর ভর করে চলেছে সমস্ত সংসার। দেশের ও সমাজের বেশির ভাগ অংশ তাদের ওপর নির্ভরশীল। তারাই তো প্রকৃতপক্ষে সমাজের ধারক ও বাহক। সমাজের উচ্চ মঞ্চে আসীন হয়ে, ধনী ও উচ্চ সমাজের সম্মানের ক্ষুদ্রগণ্ডিতে বদ্ধ থেকে এই জনজীবনের হৃদয়ের সংবাদ সংগ্রহে তাঁকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু কবি স্পষ্ট বুঝেছেন তাদের অন্তরের ভেতরে যে অসীম আঁধার লুকিয়ে রয়েছে তা আপন অন্তরে অনুভব করে উঠতে পারেননি। আসল প্রকৃত সাহিত্যস্রষ্টা রূপে কবি জানেন 'জীবনে জীবন যোগ' না করতে পারলে জনজীবনের সাহিত্যিক বা গণসাহিত্যিক হওয়া যায় না। তাই তাঁর কাব্যে সুরের অপূর্ণতা এসেছে। কবিকে স্বীকার করতে হল যে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার দ্বারা বিচিত্র সৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট এত সব সাহিত্যসম্ভার থাকা সত্ত্বেও তাঁর কবি-প্রতিভার সর্বত্রগামী হয়ে উঠতে পারেনি। ফলস্বরূপ তিনি 'পৃথিবীর কবি' এই অভিধা দাবি করলেও তা যুক্তিযুক্ত নয়। কবি কণ্ঠে তার প্রমাণ মেলে :

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

বলা যায়, কবির এই বিনয় এবং অতিশায়িত দৈন্য প্রকাশে মর্যাদা বেড়েছে কবিতাটির। ঠিক একই ভাবে কবি 'নবজাতক' গ্রন্থের 'এপারে-ওপারে' কবিতায় সত্যভাষণ স্বরূপ জানিয়েছেন :

আপনার উচ্চতট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।

আলোচ্য ‘ঐকতান’ কবিতার অন্তিম স্তবকে কবি তথা কথিত সমালোচকদের নিন্দার কথা মেনে নিয়ে আহ্বান জানালেন নতুন যুগের জনদরদী সাহিত্যিকদের। কৃষাণের জীবনের যিনি সত্যিকারের শরিক হবেন, যিনি কর্মে ও কথায় অনাদৃত মানুষের সত্য আত্মীয়তা অর্জন করবেন, যিনি মাটির কাছকাছি থেকে মৃত্তিকা-আশ্রিত মানুষদের মর্মের কথা মানুষকে শ্রবণ করাবেন— রবীন্দ্রনাথ সেই কবির বাণী শোনার জন্য অধীর আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয়েছেন। তিনি যে সাহিত্য সৃষ্টি করতে অসফল হয়েছেন তা অনাগত সেই গণজীবনের কবিকে শুনিয়ে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন এবং সেখানে গণসাহিত্য সৃষ্টি হবে এটাই তাঁর পরমকাম্য। তবে ভঙ্গিসর্বস্ব শৌখিন নকল মজদুরীকে তিনি গণসাহিত্য আখ্যা দেননি। তাঁর মতে জীবন সত্যের আলোচনাই কাব্য; শ্রমিক-কৃষকের প্রকৃত অভিজ্ঞতা না নিয়ে তাদের অনুভূতি উপলব্ধিজাত। জীবনসত্যের পরিচয় না জেনে অন্তঃসারশূন্য রচনা কোনো মতেই গণসাহিত্য নয়— এই সাবধান বাণীটুকু কবি তাঁর বাচ্যার্থের আড়ালে উচ্চারণ করে গেলেন এভাবে :

সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজ্‌দুরি।

সাহিত্যিক হয়ে যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি করে প্রশংসা অর্জন করা এক; আর শুধু ভঙ্গি দিয়ে মানুষের দৃষ্টি এড়ানো আর এক ব্যাপার। রচনাভঙ্গির চাক্‌চিক্যে চোখ ঝলসে দিয়ে মূল্যহীন যে সাহিত্য সৃষ্টি করা তা যথার্থ সাহিত্য নয়; তার দ্বারা খ্যাতি অর্জন করা হলে চুরি করা হয়। তাই সৎ-সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে এই আচরণ একেবারেই কাম্য নয়। এজন্য রবীন্দ্রনাথ ভাবীকালের ‘অখ্যাত জনের নির্বাক মনের’ কবির জন্য প্রতীক্ষা করেছেন। এভাবেই কবি আগামী দিনের গণসাহিত্যিককে অগ্রিম অভিনন্দন জানয়েছেন। আবার বিশ্বসাহিত্যের ঐকতান সংগীত সভার একজন বিশিষ্ট সুরকার রূপে সপ্ততন্ত্রী বাজিয়ে নিজের অসম্পূর্ণতা এবং অসমাপ্তির বেদনা নিয়েই বুঝেছেন যে ওই ঐকতান সংগীত সভায় একতারা যাদের বাদ্যযন্ত্র, সেই মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষগুলোর কাছে তাঁর বাণীর সুর পৌঁছায়নি। তিনি আশাবাদী, ভবিষ্যতদ্রষ্টা, তাদের সাদর আহ্বান জানালেন সেই অনাগত গণসাহিত্যিককে; যিনি জনগণের মর্মের বেদনার কথা বলবেন তাঁর সাহিত্যে। তবে তাদের গান ঐকতান সংগীত সভায় এতদিন অবহেলিত হয়েছে, তাই তাঁর মতে সাহিত্যিকের ঐকতান আজও অসম্পূর্ণ রয়েছে। তাকে পূর্ণতা দান করবেন যে শিল্পী-কবি তাঁর উদ্দেশে কবি সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়েছেন কবিতার অন্তিমে এসে—

ওগো গুণী,
কাছ থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারই খ্যাতি—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।

এভাবেই অনাগত প্রকৃত গণসাত্যিকের আগমনেই বিশ্বসাহিত্যের ঐকতান সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে বলে কবির অভিভব এবং আমাদেরও। তবে কোনো গভীর মতবাদে প্রবৃত্ত না হয়ে সমালোচক ক্ষুদিরাম দাসের সঙ্গে সহমত হয়ে আমরাও বলতে পারি : "কবিতাটি কবির এক আশ্চর্য সৃষ্টি এবং এটিকেই বাঙলার ভাবী কাব্যরসিকদের হাতে তুলে দেওয়া কবির শেষ উপহার বলে মনে করা যায়।"[৩]

**দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে**

রবীন্দ্রকাব্যের শেষ অধ্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে মূলত দুটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটি হচ্ছে এই পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে সাধারণভাবে একটা মন্ত্রের ধ্বনি অনুভব করা যায়। অপরটি হল মন্ত্রের গুণবিশিষ্ট এই কবিতাগুলির কাব্য সৃষ্টি এক নতুন আদর্শ হিসেবে বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। মনে কবি যে দীর্ঘকাল ধরে কাব্যগুহার বিভিন্ন স্তর খুঁড়তে খুঁড়তে শেষ স্তরে পৌঁছে প্রার্থিব রত্নসম্ভার খুঁজে পেয়েছেন। কবির শেষ জীবনের কবিতার নিরাভরণ সৌন্দর্য ও অনুভূতি তীব্রতা থেকে উদ্ভূত স্বল্পভাষিতা আমাদের মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কবিতার তুলনায় এই সময়ের কবিতায় যেসব ভাবরূপ চিত্র পাওয়া যায়, সেগুলির বর্ণাঢ্য না হয়েও অনুভূতির গভীরতার জন্য অনেক বেশি দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে এবং এই দীপ্তি দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়ার থেকে হৃদয়গ্রাহ্য-ই বেশি। স্বল্পতম অলংকার নিয়ে যেসব ভাবরূপ চিত্র রচিত হয়েছে, সেগুলি প্রগাঢ় অনুভূতি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্যে অসতর্ক পাঠকের মনকেও গভীরভাবে নাড়া দেয়। গদ্যকবিতা লেখার যুগেও সাধারণ সমাজ-সংসারের ভাবপ্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ দৈনন্দিন জীবনের ভাষাকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর কাব্যে রূপ দিয়েছিলেন। সেই কাব্যময় ভাষা তাঁর কাব্যের শেষ পর্যায়ে আরো সংহত, পরিপক্ক ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। অনুভূতির তীব্রতায় ও অভিজ্ঞতার অকৃত্রিমতার জন্য সাধারণ ভাষাও অসাধারণ মহিমায় কাব্য মধ্যে স্থান পেয়েছে। 'পুনশ্চ' পর্বে দীর্ঘ গদ্য কবিতা লেখার পর কবি আবার ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করলেন। আসলে

পদ্যছন্দের মধ্যে দিয়েই যে ভাবের ও বিষয়ের যথাযোগ্য সফল-সুন্দর প্রকাশ সম্ভব— কবি সেই উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন। 'জন্মদিনে'র 'ঐকতান' কবিতা পাঠ করলে দক্ষা যায়, ছন্দমনস্ক কবি ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনায় যেন অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। আর পয়ার বা মহাপয়ার ছন্দের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়ে কবিতাটিকে ছন্দোবদ্ধ কবিতারূপে সুখপাঠ্য করে তুলেছেন।

রবীন্দ্র-মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ১০ সংখ্যক 'ঐকতান' শিরনামে কবিতাটি অসম পঙক্তি বিন্যাসে ছোটো-বড়ো চারটি স্তবকে (১২+২২+২০+২৮) 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান পেয়েছিল। কবিতাটি শুরু হয়েছে সমগ্র জীবনের অপ্রাপ্তির হতাশা নিয়ে 'বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'। এর পরে পরে কবি তাঁর জীবনের অপূর্ণতার কাহিনি খণ্ডে খণ্ডে বিন্যাস করে গেছেন প্রতিটি স্তবক জুড়ে। আর এখানে সমাধানের উপায় স্বরূপ তিনি আগামী দিনের ভবিষ্যত-কবিকে তাঁর অপূর্ণতার ভার অর্পণ করেছেন এবং সম্পূর্ণতা দান করতে আহ্বান জানিয়েছেন। কবিতার সূচনার মধ্য দিয়েই কবি পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছেন— যা একটি কবিতার শৈলী নির্ণয়ের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কবি সেই নিয়ম মেনেই কবিতার সূচনাতে পরিণতির আভাস জানিয়ে দিয়েছেন। অকপটে তাই পরিণতিতে তিনি বলে গেছেন :

তোমার খ্যাতিকে তারা পায় যেন আপনারই খ্যাতি—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।

'ঐকতান কবিতার বিন্যাস আপাতভাবে অসম। কবিতাটি চারটি স্তবকে বিন্যস্ত এবং প্রতিটি স্তবকের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা যথাক্রমে ১২, ২২, ২০ ও ২৮। সমগ্র কবিতার সজ্জাগত দিকটি নিম্নে দেখানো যেতে পারে এভাবে—

| স্তবক | পঙ্‌ক্তির সংখ্যা | মিলের হিসেব | মিলের চরিত্র | ছেদ | কমা | ঊর্দ্ধকমা | সেমিকোলন | ড্যাস | হাইফেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম | ১২ | ৩-4 | মরু-তরু | ৫ | ৩ | ০ | ১ | ২ | ৩ |
| | | ৯-১০ | বাণি-আনি | | | | | | |
| | | ১১-১২ | মনে-ধনে | | | | | | |
| ২য় | ২২ | ১-২ | ধবনি-তখনি | ৬ | ৬ | ০ | ১ | ১ | ২ |
| | | ৩-4 | ডাক-ফাঁক | | | | | | |
| | | ৯-১০ | বার-তার | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ১১-১২ | তারা-সারা | | | | | | |
| | | ১৩-১৪ | চোখে-আলোকে | | | | | | |
| | | ১৫-১৬ | নির্ঝরে-স্বর | | | | | | |
| | | ১৭-১৮ | স্রোতে-হতে | | | | | | |
| | | ১৯-২০ | যোগ-ভোগ | | | | | | |
| ৩য় | ২০ | ৭-৮ | হাল-জাল | ৯ | ৮ | ২ | ০ | ১ | ১ |
| | | ৯-১০ | কর্মভার-সংসার | | | | | | |
| | | ১৫-১৬ | করা-পসরা | | | | | | |
| ৪র্থ | ২৮ | ৫-৬ | ভোজে-খোঁজে | ৯ | ১০ | ০ | ০ | ৩ | ১ |
| | | ৭-৮ | হোক-চোখ | | | | | | |
| | | ৯-১০ | চুরি-মজ্‌দুরি | | | | | | |
| | | ১১-১২ | জনের-মনের | | | | | | |
| | | ২৩-২৪ | গুণী-শুনি | | | | | | |
| | | ২৫-২৬ | জ্ঞাতি-খ্যাতি | | | | | | |

আলোচ্য কবিতায় শৈলীগত বিভিন্ন ধারা প্রায় চারটি স্তবকের প্রত্যেকটিতে পরিস্ফূট হয়েছে। এখানে মিলযুক্ত পঙ্‌ক্তিটির ব্যবহার প্রচুর পরিমাণেই লক্ষ করা গেছে। এছাড়া ছেদ-যতি চিহ্নের ব্যবহারেও এ কবিতা যথোপযুক্ত শৈলীর বৈশিষ্ট্যকে স্পর্শ করে গেছে। কবি তাঁর আপন বাচন ভঙ্গিমায় সাধু-চলিত ও মানুষের মনোগ্রাহী ভাষার মাধ্যমে নিজস্ব প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন এই শেষ পর্যায়ের কবিতাতে। কবি ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগেও নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। পূর্ববর্তী গদ্যছন্দ থেকে আজ সরে এসে পুনরায় পয়ার বা মহাপয়ার ছন্দের প্রয়োগে আলোচ্য কবিতাকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করেছেন। নিচে সেই ছন্দের পরিচয় নেওয়া যাক—

বি পুল । এ পৃ থি বীর ।। ক ত টু কু । জা নি । (৪+৪)।।(৪+২)
দে শে দে শে । ক ত-না ন। গর রাজ ধা নী । (৪+৪)।।(৪+২)
মা নু ষের । ক ত কী র্তি ।। ক ত ন দী । গি রি সি ন্ধু। ম রু। (৪+৪)।। (৪+৪+২)
ক ত–না অ জা না জী ব,।। ক ত না অ প রি চি ত ।। ত রু। (৪+৪)।। (৪+৪+২)
র য়ে গেল। অ গো চ রে ।। বি শাল বিশ্বে র । আ য়ো জন। (৪+৪)।। (৪+৪+২)
মন মোর । জু ড়ে থা কে ।। অ তি ক্ষু দ্র । তা রি এ ত। কোণ। (৪+৪)।। (৪+৪+২)

বাংলা ছন্দের ত্রিধারার অন্তর্গত মিশ্রবৃত্ত রীতিতে কবি পয়ার ও মহাপয়ার (৮।। ৬) এবং (৮।। ১০) ছন্দোবন্ধে কবিতাটিকে বিভাজন করেছেন। অলংকারের ক্ষেত্রে যমক, উপমা, অপহ্নুতি ইত্যাদি অর্থালংকারের আধিক্য দু-এক জায়গায় চোখে পড়ে। এছাড়া জটিল, যৌগিক, সরল, নঞর্থক ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ কবিতাটির মধ্যে দেখা গেছে। আবার শৈলীগত বিচারে নির্বাচন ও বিচ্যুতির দিকটিকে কবি এভাবে দেখিয়েছেন–

ব্যবহৃত ক্রম : তার (৪) কোনো (৫) পরিমাপ (৬) নাই (৭) বাহিরের (১) দেশে (২) কালে (৩)

আদর্শ ক্রম : বাহিরের (১) দেশে (২) কালে (৩) তার (৪) কোনো (৫) পরিমাপ (৬) নাই (৭)

বিচ্যুতিক্রম : ৪ ৫ ৬ ৭ ১ ২ ৩

এছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'পুনরক্তি'র ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। যেমন— 'দেশে', 'কত-না', 'ভালো নয়', 'আমি' শব্দ কবিতায় একাধিক ব্যবহারের ফলে 'পুনরুক্তি'র সৃষ্টি করেছে। আর রাবীন্দ্রিক শব্দবন্ধ  বা বাগ্‌বন্ধের যেসব পরিচয় পাওয়া গেছে সেগুলি হল যথাক্রমে : 'বিপুল এ পৃথিবী', 'চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী', 'জ্ঞানের দীনতা', , 'ভিক্ষালব্ধ ধন', 'পৃথিবীর কবি', 'স্বরসাধনা', 'বহুতর ডাক', ধরিত্রীর মহা-একতান', 'মহাজনশূন্যতা', 'সুদূরের মহাপ্লাবী প্রান্তনির্ঝর', 'প্রকৃতির ঐকতান স্রোত', 'গীতভারতী', 'নিখিলের সঙ্গীতের স্বাদ', 'সুরের অপূর্ণতা', 'কৃষাণের জীবনের শরিক', 'সাহিত্যের আনন্দের ভোজ', 'সাহিত্যের ক্ষতি করা চুরি', 'শৌখিন মজদুরী', 'সাহিত্যের ঐকতান সংগীতসভা' ইত্যাদি।

আলোচ্য কবিতাটিতে কবি তাঁর কাব্যজীবনের এবং কবিস্বরূপের প্রায় যথাযথ পরিচয় অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন। কবি অবহেলিত সাধারণ মানুষের জীবনে শরিক না হতে পারার আক্ষেপ প্রকাশ করে কর্মী মানুষের জীবন থেকে উদ্ভূত নিষ্ঠারত কবির প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেছেন। কিন্তু এই স্বীকারোক্তি ছাপিয়ে দৈন্য যাপনের মধ্যে কবির অকপট অনুরাগের সুরই প্রবল হয়েছে এবং কবিতাটিকে কাব্যসৌন্দর্য্যে সমুত্তীর্ণ করে দিয়েছে। 'বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'— এই কথাটির মধ্য দিয়ে কবির রোমান্টিক স্বভাবের লক্ষণ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলিতে চলেছে এই স্বভাবেরই বিশ্লেষণ। 'এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক'— এই স্বীকৃতি যেমন বিশ্বের সর্বকবি সাধারণের সত্য কথা, তেমনি এটা কবিপক্ষে অতিশয়িত দৈন্যও বটে। এরপর কবি যেখানে যেখানে মানুষের পরিচয় দিয়েছেন, সেখানে সেখানে

সাধারণ যুক্তিমত্তাকে পরিস্ফুটিত করে বাণী বন্দরের গৌরব ও অর্থের অলংকারগুলির রমণীয়তা দিয়েই আমাদের আকর্ষণ করেছেন। সবশেষে শেষ স্তবকে 'প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার', 'মুক যারা দুঃখে সুখে' ইত্যাদি বর্ণনায় কবি যেমন চিরপ্রসিদ্ধ মমত্বের সুর উচ্ছলিত হয়েছে, তেমনি অখ্যাতজনের কবিকে আহ্বান জানানোর মধ্যেও দেখা গেছে। এভাবে ক্রমান্বয়ে যা আভাসে হচ্ছিল তাই এই অংশে ঘনীভূত হয়ে রস ও ভাবের পরম রমণীয় কাব্যানন্দ স্ফূরিত করে সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

**অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম**

রবীন্দ্রনাথের 'ঐকতান' কবিতা নিয়ে সে সময়ের বহু পত্র-পত্রিকা— 'পরিচয়', 'প্রবাসী', 'কবিতা' ইত্যাদিতে বিচ্ছিন্নভাবে বেশকিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে কবিকে উপলক্ষ করে কেউ কেউ বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ যে সত্যকার গণকবি ছিলেন— এই কবিতাটি তার স্পষ্ট প্রমাণ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ বিনয়ী কবি— শ্রমিকদের নিয়ে ভঙ্গিসর্বস্ব কিছু ধোঁকাবাজি গণকাব্যের নামে যখন সাহিত্যে অবাধ অনাচার সৃষ্টি করছিল, তখনই কবি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ একেবারে কমিউনিস্ট কবি ছিলেন না; এ প্রসঙ্গে সমালোচক শিশিরকুমার ঘোষ যথার্থই বলেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ জনগণের জন্য ভেবেছেন অনেক, কার্যক্ষেত্রে তার নমুনা বিরাজ করছে, কিন্তু স্বীকৃতি স্পষ্ট হওয়াই ভালো, রবীন্দ্রনাথ জনগণের কবি নন। কোন কালেই রবীন্দ্র-অনুভূতি ও আদর্শ পুরোপুরি রাজনীতি-কবলিত হয়নি।[৪]

আসলে রবীন্দ্রনাথকে কোনো পর্যায়ভুক্ত কবি হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়াই ভালো। কারণ, তিনি ছিলেন রোমান্টিক কবি, মানুষের হৃদয়ের কবি। তাই তাঁর কবিতা পাঠ করার জন্য পাঠকের কোনো বয়সের প্রয়োজন হয় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সব সময়েই পালাবর্তন ঘটেছে। কব্যের এই পালাবদলের প্রসঙ্গে 'নবজাতক' (১৯৪০) কাব্যগ্রন্থের সূচনায় যা ব্যক্ত করেছেন, এক্ষেত্রে প্রযোজ্য :

> আমার কাব্যের ঋতু পরিবরতন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু-জোগান নতুন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চারদিকের হাওয়ায়। যারা ভোগ করে এই মধু তারা এই বিশিষ্টতা টের পায়

স্বাদে। কোনো কোনো বনের মধু বিগলিত তার মাধুর্যে, তার রঙ হয় রাঙা; কোনো পাহাড়ি মধু দেখি ঘন, আর তাতে রঙের অবদান নেই, সে শুভ্র; আবার কোনো অরণ্য সঞ্চয়ে একটু তিক্ত স্বাদেরও আভাস থাকে।

....এরা বসন্তের ফুল নয়; এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভীতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তা হলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা।[৫]

কবির এ মতামত বিশেষভাবে তাঁর কবিতার সর্বশেষ পর্যায় সম্বন্ধেই। এই সময়ের কবিতায় বাহ্য অলংকার যথাসম্ভব পরিহার করে অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে ছেয়েছেন। এই কবিতাগুলি রচনার মধ্য দিয়ে কবির পরিণত বয়সের প্রেরণা অনবদ্যভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে চারিত্র্য, দৃঢ়তা ও পরিপক্কতা দান করেছেন।

কবির 'ঐকতান' কবিতাটি সে সময়ে এতোই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, এই কবিতার ইংরেজি অনুবাদ জরুরি হয়ে পড়েছিল। তাই কবিতাটির ইংরেজি তর্জমা প্রসঙ্গে প্রবাসী মডার্ণ রিভিয়্যু-এর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ (৩০ মাঘ ১৩৪৭) কবিকে লিখেছিলেন :

ফাল্গুনের প্রবাসীর জন্যে ছাপা আপনার 'ঐকতান' কবিতাটির একটি ইংরেজি অনুবাদ হলে বাঙালী ছাড়া অন্যেরাও আনন্দিত ও উপকৃত হবেন। অনুবাদটি আপনার দ্বারা হলেই ভাল হয়। কিন্তু আপনি এখন সেরূপ পরিশ্রম করতে পারবেন কিনা জানি না। অবশ্য এম্প্রেস নন্দিতারও (নাতনী নন্দিতা কৃপালনী) অনুমতি চাই। যদি পারেন, তাহলে অন্য কাউকে বলতে হয় না। নইলে, আপনার মত হলে, আপনাদের অধ্যাপক শ্রীমান্ ক্ষিতীশকে (ক্ষিতীশ রায়) বলে দেখতে পারি।

আবার, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ (৮ ফাল্গুন, ১৩৪৭) তারিখের একটি পত্রে 'পুনশ্চ' অংশে সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পুনরায় লিখলেন : "অনিল বাবু (অনিল চন্দ) আমাক লিখিয়াছেন যে, অমিয়বাবু আপনার 'ঐকতান' কবিতাটির অনুবাদ করিতেছেন। তাহা শীঘ্র পাইবার আশা করিতেছি।"[৭] এরপরেই মার্চ, ১৯৪১ সংখ্যায় মডার্ণ রিভিয়্যু-তে অমিয় চক্রবর্তী এবং ক্ষিতীশ রায় কর্তৃক যুগ্মভাবে 'ঐকতান' কবিতার ইংরেজি তর্জমা

প্রকাশ করেন। সেখানে অনুবাদটি ছিল এরকম : 'The Great Symphony' [How Little I know of the most World]। এই ইংরেজি তর্জমাটি Visva Bharati Quarterly May-Oct 1941 এর Feb-April 1942 সংখ্যা দু'টিতে পুনর্মুদ্রিত হয়। পরে A Tagore Reader-গ্রন্থে সংকলিত হয়।

এ প্রসঙ্গে বলা ভালো, 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর সে সময় যেমন বিভিন্ন সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনি নানা প্রতিক্রিয়ার কথাও শোনা গিয়েছিল নানা জায়গা থেকে। ৮ জুন ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে (২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮) আনন্দবাজার পত্রিকা পুস্তক-পরিচয় বিভাগে গ্রন্থটির পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়। সেখানে পর্যালোচক লেখেন এমন কথা :

> কবি রাবীন্দ্রনাথের সম্প্রতি লিখিত ঊনত্রিশটি কবিতা একত্র সংকলিত হইয়া 'জন্মদিনে' প্রকাশিত হইয়াছে। বহু জন্মদিনে গাঁথা জীবনে কবি নিজেকে যে বিচিত্র রূপের সমাবেশ দেখিয়েছেন, এই কবতাগুলিতে সেই অনুভবের কাব্যমূর্ত্তি ভাবে ছন্দে চিত্রিত হইয়াছে। পরমায়ুর প্রান্তে দাঁড়াইয়া কবির চক্ষে নূতন এক জ্যোতির্লোকের রূপ ধরা পড়িয়াছে। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন অখণ্ড জীবনের স্বরূপ— 'যাহে জন্ম এক মৃত্যু এক হয়ে আছে'। 'জন্মদিনে'র কবিতাগুলি তাই শুধু কবিতা নহে, উপনিষদের সুক্তগুলির মত পরম তত্ত্বের ঐশ্বর্য্যে ভরপুর। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহা অভিনব। নিছক কাব্যসৃষ্টির দক দিয়া দেখিলেও বুঝা যায় যে, এই সুপরিণত বয়সেও কবির লেখনীমুখে ভাষা ও ছন্দের কী প্রাণবন্ত রূপ উৎসারিত হইয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি তাঁহার পাত্র রিক্ত হয় নাই তবে রসাস্বাদও পূর্ব্ব পরিচয় হারায় নাই। 'আজ যুগের এই দুঃসময়ে হিংস্র সংগ্রামের রক্তমাখা দন্তপংক্তি শত শত গ্রাম ও নগরের অস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে, দলে দলে মানব আপন সত্তা ব্যর্থ করিতেছে।' এই দুর্যোগের ক্ষণে কবি আশা ভরা বিশ্বাসের ছবি লইয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। 'এ পাপযুগের অস্ত হইবে, মানব তপস্বী বেশে নব সৃষ্টি ধ্যানের আসনে স্থান লইবে।'
>
> 'আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান ঘোষিছে কামান।'[৮]

### পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই

আলোচনার একেবারে অন্তিম পর্বে এসে আমরা 'জন্মদিনে'র ১০ সংখ্যক কবিতা 'ঐকতান'-এর একটি গুরুতর পাঠভেদের কথা উল্লেখ করতে পারি। কবিতাটি যদি মনোযোগ সহকারে পাঠ করা যায়, তাহলে সেখানে দেখা যাবে কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের দ্বাদশ পঙ্‌ক্তি বর্তমান রচনাবলীতে বা 'সঞ্চয়িতা'য় যেরকম ছিল তা হল : 'মহাজনশূন্যতায় দীর্ঘ রাত্রি করিতেছে সারা'। এই পঙ্‌ক্তিটি পাণ্ডুলিপিতে সম্পূর্ণ একই রকম ছিল। কিন্তু সাময়িক পত্রে, গ্রন্থে, বিশ্বভারতীর রচনাবলীতে এটি পরিবর্তিত হয়ে এরকম হয়েছে : 'মহাজনশূন্যতায় রাত্রি তার করিতেছে সারা'। সেইরকমই, 'সঞ্চয়িতা' বা বর্তমান রচনাবলীতে তৃতীয় স্তবকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি 'তার পূর্ণ পরিমাপ নাই বাইরের দেশে কালে', অন্তিম থেকে পঞ্চম পঙ্‌ক্তি 'কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি'। বিশ্বভারতী রচনাবলী এ দুটি রূপ পেয়েছে এভাবে : 'তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে' এবং 'কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি'।[৯]

### উল্লেখপঞ্জি


১. শুদ্ধসত্ত্ব বসু, 'রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়' (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৮০, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, পৃ.২৯৭-৯৮

২. শিশিরকুমার ঘোষ, 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যে', প্রকাশ : ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ. ১৪৮

৩. ক্ষুদিরাম দাস, 'চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী' প্রকাশ : ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, পৃ. ৩১৬

৪. শিশিরকুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮৭

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নবজাতক' : রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৬, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, সূচনাংশ, পৃ. ৯৪

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র : ১২', পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্করণ : ৩৫, পৃ. ৪১১-১২

৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪১৩

৮. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ : ২' (আনন্দবাজার পত্রিকা ২২ মার্চ ১৯৩২-৩১ ডিসেম্বর ১৯৪১), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২২৯

৯. রবীন্দ্র-রচনাবলী (ষোড়শ খণ্ড) : 'গ্রন্থপরিচয়', প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৪০৮, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, পৃ. ৪৬৫

**সহায়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ**

১. অনুত্তম ভট্টাচার্য, 'রবীন্দ্ররচনাভিধান' (পঞ্চম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ২০০৩, দীপ প্রকাশন, কলকাতা।

২. খনা মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়', প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৭৮, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।

৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবন কথা', সংশোধিত ও পরিবর্ধিত অষ্টম সংস্করণ : একাদশ মুদ্রণ ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৪. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, 'নির্বাচিত রবীন্দ্র কবিতা পাঠ', তৃতীয় সংস্করণ মে ২০০৩/বৈশাখ ১৪১০, রত্নাবলী, কলকাতা।

# পশ্চিমবঙ্গের লালগড় আন্দোলনে আদিবাসী নারী (২০০৮-২০১১)

মধুমিতা সেতুয়া
পিএইচ. ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম(বর্তমান) জেলার লালগড় অঞ্চল বহু প্রাচীন কাল থেকেই আদিবাসী অধ্যুষিত। ইংরেজ আমলের পূর্বে এই অঞ্চলে আদিবাসী ও অনাদিবাসী ভুক্ত মানুষেরা মিলে মিশে বসবাস করত। এদের মধ্যে প্রথম বিছিন্নতার সৃষ্টি করেছিল ইংরেজরা। যার ফলস্বরূপ এদের মানসিকতায়ে পরিবর্তন এসেছিল, এরা মনে করেছিল তথাকথিত 'সভ্য' মানুষদের থেকে এরা আলাদা তারা বিছিন্ন ও অপাঙ্গতেও,এবং বাস্তবেও ঘটেছিল সেটাই। তাই স্বাধীনতার এত বছর পর ও তাদের গণ্য করা হয় পিছিয়ে পড়া শ্রেণী হিসাবে। এই পিছিয়ে পড়া সমাজে নারীদের অবস্থান আরও কিছুটা প্রান্তিক। ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহলের লালগড় অঞ্চলেও এই বঞ্চনার ইতিহাস ভীষণভাবে প্রকট। তাই এই অঞ্চলে আন্দোলনও হয়েছে বারংবার। ঔপনিবেশিক যুগ থেকে যতবার আন্দোলন ততবার আদিবাসী মহিলারা দলে দলে পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে। এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে লালগড় আন্দোলন সম্পর্কে। লালগড় আন্দোলনের সূত্রপাত হওয়ার একটি অন্যতম কারণ ছিল আদিবাসী মহিলাদের ওপর পুলিসি অত্যাচার। যার ফলে সমগ্র আদিবাসী সমাজ এই আন্দোলনে যোগদান করেছিল কিন্তু এর কিছুদিনের মধ্যে এই আন্দোলনের মোড় ঘুরে যায় অতিবাম তথা মাওবাদী আন্দোলনের দিকে। এই প্রবন্ধটিতে সাম্প্রতিক কালে ঘটা এই লালগড় আন্দোলনের সূচনাকাল থেকে শেষ পর্যন্ত আদিবাসী নারীদের ভুমিকা কতটা ছিল সেই প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে।

সূচকশব্দ : লালগড়, জঙ্গলমহল, আদিবাসী, আন্দোলন, নারী।

**ভুমিকা :**

পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলার জঙ্গলমহলের আদিবাসীদের বঞ্চনার ইতিহাস যেমন সুপ্রাচীন তেমনি প্রাচীন আন্দোলন ও বিদ্রোহের ইতিহাসও। এই অঞ্চল সাক্ষী স্বাধীনতার পূর্বের ১৭৮৪ সালের তিলকা মাঝির বিদ্রোহের, ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের, ১৮৩২ সালের কোল বিদ্রোহের, ১৮৯৯ সালের মুণ্ডা বিদ্রোহের আবার স্বাধীনতার পরের নকশাল আন্দোলন, ঝাড়খণ্ড আন্দোলন ইত্যাদির। এই সবের মতই

২০০৮ সালে এই অঞ্চলে ঘটেছিল লালগড় আন্দোলন যা আবার একবার প্রমাণ করে আদিবাসীদের বঞ্চনা, অত্যাচার ও শোষণের যে ইতিহাস তা বর্তমানেও একই ভাবে প্রাসঙ্গিক এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লালিত পালিত হয়ে চলেছে।

ঝাড়গ্রাম জেলার (বর্তমান, আন্দোলনের সময় পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল) জঙ্গলমহল অঞ্চল বহু প্রাচীন কাল থেকেই আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। ২০১১ এর সেনসাস অনুযায়ী এই জেলার মোট জনসংখ্যা ১,১৩৬,৫৪৮ জন, যার মধ্যে গ্রামীণ জনসংখ্যাই বেশি প্রায় ৯৬.৫২% এবং শহুরে জনসংখ্যা মাত্র ৩.৪৮%। আদিবাসী জনসংখ্যার প্রায় ২৯.৩৭%।[১] এখানে বসবাসকারী মানুষদের বেশিরভাগেরই জীবিকা এখনো ক্ষুদ্রচাষি নয় ভূমিহীন কৃষক যারা অন্যের জমিতে কাজ করে কোন ক্রমে দিন গুজরান করে। দারিদ্র্যের সঙ্গে নিত্য সংগ্রাম তাদের জীবনের রোজকার চিত্র। তবুও তারা তাদের নিজস্ব সমাজ, গোষ্ঠী এর অভ্যন্তরে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেও সম্মানের সাথে জীবন যাপন করে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারত সরকার আদিবাসীদের কল্যাণে বিভিন্ন নীতি নেন এর মধ্যে পাঁচটি মুল নীতির কথা বলা হয়েছিলো –

১। আদিবাসীদের নিজস্ব বিশিষ্টতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পনা নির্ধারণ করা।

২। আদিবাসীদের দায়িত্ব নেওয়া ও প্রশিক্ষিত করা।

৩। জমি ও জঙ্গলের অধিকারকে সংরক্ষিত করা।

৪। সরকারী কর্মীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৫। আদিবাসীদের প্রকৃতি ও গুণ বিচার করে জনকল্যাণমূলক কাজের মুল্যায়ন করা।[২]

এর পাশাপাশি তপশিলি জাতি ও উপজাতি অন্তর্ভুক্তদের আলাদা সংরক্ষণ ছিল যা আজও বর্তমান। এর পরবর্তীকালেও বিভিন্ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে আদিবাসী কল্যাণে। কিন্তু তার প্রভাব যে আদিবাসী সমাজে খুব কমই পড়েছে তা আরও একবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এই লালগড় আন্দোলন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংও স্বীকার করে নেন আদিবাসীরা ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত এই বিষয়টিকে তিনি পদ্ধতিগত ব্যর্থতা (Systematic failure) বলে মেনে নেন।[৩]

আদিবাসীরা তাই বারংবার আন্দোলন—বিদ্রোহ করেছেন ন্যায্য অধিকারের দাবিতে। লালগড় আন্দোলনও এর ব্যাতিক্রম নয়। আদিবাসী আন্দোলনে নারীদের যোগদান ও নতুন কিছু নয়। আদিবাসী সমাজে যেহেতু লিঙ্গগত বৈষম্য খুব বেশি নয় তাই প্রাচীন কাল থেকেই আদিবাসী নারীরা বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ

করেছেন এবং পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন। এই লালগড় আন্দলনেও আদিবাসী নারীরা ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকায়। এই আন্দোলনে এদের ভূমিকা ঠিক কতটা ছিল তা বিচার করা প্রয়োজন।

ঝাড়গ্রামের লালগড় অঞ্চলটির অবস্থান ঝাড়গ্রাম শহর থেকে ৩৮ কিমি এবং মেদিনীপুর শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে। এটি বিনপুর -১ ব্লকের অন্তর্গত, মুলত আদিবাসী, কুরমি মাহাত অধ্যুষিত অঞ্চল। প্রাকৃতিক পরিবেশ জঙ্গলাকীর্ণ ও রুক্ষ। যার ফলে এই অঞ্চলের দুর্বল অর্থনীতি, চরম দারিদ্র্য এবং বন্ধুর প্রাকৃতিক পরিবেশের ফলে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের ( ১৯৭০ এর দশক) বেশ কয়েক দশক পর্যন্ত এই অঞ্চলে নকশাল ও মাওবাদী কিছু কার্যকলাপ অভ্যন্তরে চলত। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড অঞ্চল থেকে অতিবামপন্থিনেতারা এই অঞ্চলে ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাতে থাকত। এই পরিস্থিতিতেই সূচনা হয়েছিলো এই আন্দোলনের। এই আন্দোলনের সূচনার পশচাতে একটি ঘটনা ছিল উল্লেখযোগ্য। ২রা নভেম্বর, ২০০৮, শালবনীতে জিন্দাল গোষ্ঠীর ইস্পাত কারখানা উদ্বোধন সেরে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এর ফিরে আসার সময় মাওবাদীদের পাতা মাইন বিস্ফোরণে একটি পুলিশের গাড়ি আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং দুজন পুলিশের মৃত্যু হয়।[৪]এই ঘটনার পরবর্তীকালে সন্নিহিত অঞ্চলে অপরাধীদের ধরার জন্য পুলিশ ব্যপক ধরপাকড় শুরু করে। আদিবাসীদের গ্রামে ঢুকে অত্যাচার ও আটক করা শুরু করে। ফলে আদিবাসী প্রত্যন্ত গ্রাম গুলি পুরুষ শূন্য হয়ে পরতে থাকে যার ফলে গ্রামের মহিলারা পুলিশি অত্যাচারের শিকার হতে থাকেন।

আদিবাসী সমাজের মানুষেরা সমাজের প্রান্তিক শ্রেণী হলেও তারা সবথেকে বেশি ঘৃণা করে তাদের মহিলাদের অসম্মানকে তাই এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এমন কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে যার মাধ্যমে মহিলাদের ওপর নির্যাতনের দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম থেকেই এই এলাকায় মাওবাদী ধরার নামে গ্রামে প্রবেশ করে পুলিশ মহিলাদের কম বেশি অপমান করত কিন্তু শালবনীর ঘটনার পর পুলিশের ঔদ্ধত্য চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। ২০০৮ এর ৫ই নভেম্বর পুলিশ এর অত্যাচারের একটি হিংস্র দিক উন্মচিত হয়ে পড়ে।[৫] এই দিন ছোট পেলিয়া গ্রামে পুলিশের বন্দুকের ধাক্কায় ছিতামনি মুরমুর একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়াও বিভিন্ন ঘটনা কিছুদিন ধরেই ঘটছিল যেমন কাঁটাপাহাড়িতে একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলার ওপর অত্যাচার করা হয়। বেলপাহাড়ি তে আদিবাসী মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হয়। পুরুষদের সন্ধানে মহিলাদের বিবস্ত্র করা তল্লাসি করা হতে থাকে বলেও জানা যায়। তল্লাশির নামে স্কুল ছাত্রীদেরও হেনস্থা করা

হয়। এরপর ছিতামনির ঘটনার পর পুলিশ যখন অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে চায় তখন সমগ্র আদিবাসী সমাজ গর্জে ওঠে। এবং একজোট হয়ে তারা বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করে। মহিলাদের অপমানকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলনের রাস্তা প্রস্তুত হয়েছিলো যার ফলে দলে দলে নারীরাও এই আন্দোলনে যোগদান করেছিলো।

লালগড় আন্দোলন শুরু হয় একটি সংগঠন গঠনের মাধ্যমে, এই সংগঠনের নাম ছিল People's Committee Against Police Atrocities বা পুলিসি অত্যাচার বিরোধী জনসাধারনের কমিটি। এই কমিটির তরফ থেকে বেশ কিছু দাবী জানানো হয় যার মধ্যে প্রধান দাবী ছিল পুলিশকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে এবং নিরপরাধ আদিবাসীদের নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে। এর কয়েকদিন পর তারা আরও বেশ কিছু দাবী পেশ করে ( ২৫ শে জানুয়ারি,২০০৯) যেগুলি তারা কমিটির পক্ষ থেকেও সাংবাদিকদের জানায় পাশাপাশি লিখিত ইস্তেহারের মাধ্যমেও ছড়িয়ে দেয়। এর কয়েকটি ছিল এরকম-

১। আদিবাসীদের শারি ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মকে স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদের সংস্কৃতিকে উৎসাহ দিতে হবে। এর পাশাপাশিতাদের উৎসব অনুষ্ঠানে সরকারি ছুটি দিতে হবে।

২। কুরমালি, অলচিকি, মুণ্ডারি, প্রভৃতি ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে এই ভাষাগুলি বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। মদ্যপান রোধে মদের দোকান উচ্ছেদ করতে হবে।

৪। জঙ্গলমহলে স্বায়তশাসন মূলক সংগঠন তৈরি করে উন্নয়নের কাজে তাদের সামিল করতে হবে।

৫। জমিহীনদের বিনামুল্যে চাষের জমি ও তাদের জঙ্গলের অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে।

৬। একশো দিনের কাজ সুনিশ্চিত করতে হবে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে।

৭। নতুন স্কুল কলেজ স্থাপন করতে হবে।

৮। পুলিসি অত্যাচার বন্ধ করতে হবে এবং স্কুল, পঞ্চায়েত ভবনথেকে ক্যাম্প সরাতে হবে।[৬]

লালগড়ে আদিবাসী মহিলাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য All India committee against violence on Women এর সদস্যারা জঙ্গলমহলে যান। এখানকার মহিলাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্টে জানান যে এদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত

শোচনীয়, এর পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলিও অবহেলিত। এর থেকেই বোঝা যায় যে লালগড় আন্দোলনের পশ্চাতে অর্থনৈতিক বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[৭]

মহিলাদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ২০০৮ সালের ৬ ই নভেম্বর এক বিশাল মিছিল লালগড় পুলিশ ষ্টেশন অবরোধ করে ও বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে স্লোগান দিতে থাকে।[৮] এরপর ক্রমশ এই আন্দোলন পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল অঞ্চলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ে। বাইরের পুলিশ ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। ১০ ই এপ্রিল ২০০৯ বাঁকুড়াতে পুলিসি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারনের কমিটির কয়েক জনকে গ্রেফতার করা হলে বাঁকুড়াতে এর প্রতিবাদে বিশাল মিছিল হয়।[৯] বাঁকুড়া পুলিশ ভয়ে ১৪৪ ধারা জারি করে এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে। আদিবাসী নারী পুরুষের নিরস্ত্র মিছিল ও এই প্রতিরোধকে ভেঙ্গে অগ্রসর হয়। এই ঘটনার পর পুলিশ প্রশাসন ভীত হয়ে পড়েছিল। এছাড়াও বিভিন্ন গ্রামে পুলিশ প্রবেশ করতে চাইলে গ্রামের মহিলারাই লাঠি, তরোয়াল, কুঠার নিয়ে পুলিশকে বাধা দিতে থাকে। ক্রমশ রাজ্য পুলিশ এই আন্দোলনের সম্মুখে পিছিয়ে পরতে থাকে। পুলিশকে গ্রামে ঢুকতে বাধা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন এলাকার রাস্তা কেটে ফেলা হয়। বড় বড় গাছ কেটে রাস্তায় ফেলা হয় এবং গ্রামগুলিতে পুলিশ ঢুকতে এলে গ্রামের মহিলারা শাঁখ বাজিয়ে আওয়াজ করে পুরুষদের সাবধান করত। এই পর্যায়ে আদিবাসী মহিলাদের যোগদান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

কিন্তু এর পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমশ এই আন্দোলন অতিবাম আন্দোলন তথা মাওবাদী আন্দোলনের দিকে সরে যায় এবং আন্দোলনের জায়গায় সহিংস আন্দোলন শুরু হয়।

প্রশাসন বুঝতে পারে অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আসা মাওবাদীরা এই আন্দোলনকে প্রভাবিত করছে। প্রশাসনের ওপর ক্ষোভের কারনে জনগণও তাদের সাহায্য করছে। ফলে সরকার এরপর কঠোর ভূমিকা নেয় এবং শুরু হয় Operation Lalgarh. ২০০৯ এর জুন মাসে কেন্দ্রের সহায়তায় এই অঞ্চলে মিলিটারি, CRPF, ও কোবরা বাহিনী নামানো হয় এবং তারা ঘোষণা করে এক ভয়াবহ যুদ্ধ। এদের সাথে ছিল রাজ্য পুলিশ বাহিনী।[১০]লালগড়ের কাছে সারেঙ্গা অঞ্চলের বাজারে তল্লাশির সময় PCAPA নারী শাখার সদস্যরা মিছিল শুরু করে। এই সময় তাদের ওপর আক্রমন করা হয়, নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করা হয় এবং তাদের গ্রেফতার

করে তাদের ওপর মামলা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর পরেও নানা সময় পুলিশ বাহিনীর কাছে তারা নানা সময় অত্যাচারিত হয়েছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিবাদ করে গেছেন। ২রা সেপ্টেম্বর ২০০৯, মাওবাদী তকমা দিয়ে দুজন আদিবাসীকে হত্যা করা হয়। এর প্রতিবাদে কাঁটাপাহাড়িতে দশ হাজারের বেশি আদিবাসী নারী পুরুষ বিক্ষোভে সমবেত হয়। ১৪ জন নারী ও ৩ জন পুরুষকে গ্রেফতার করা হয় ও নারী পুরুষ নির্বিশেষে নির্মম ভাবে লাঠিচার্জ করা হয়। পরের মাস গুলিতে এরকম অবস্থা হয় কোন গ্রামে পুলিশ ঢুকলেই গ্রামের মহিলারা এগিয়ে এসে বাধা দিতে থাকেন।[১১] ফলে অনেক মহিলা গ্রেফতার হতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে মাওবাদী নতা কিষানজির নেতৃত্বে মাওবাদীরা শাঁকরাইল থানার O.C অতিন্দ্রনাথ দত্তকে অপহরন করে ও ২ জন পুলিশকে হত্যা করে। তাদের দাবী ছিল ৩০ জন আদিবাসী মহিলা যাদের মাওবাদী সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছিলো তাদের মুক্তিদান। এরপর ২৩ জনকে সরকার জামিন দেয়।[১২]

পুলিসি অত্যাচারের প্রতিবাদে ঝাড়গ্রাম শহরেও চলতে থাকে আন্দলন। ৯ ই নভেম্বর ২০০৯, আদিবাসীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে কয়েকশো আদিবাসী মহিলা লাঠি, কুঠার, তীর প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে ঝাড়গ্রাম মহকুমা শাসকের দফতরের বাইরে বিক্ষোভ দেখান। তারা তৎকালীন মহকুমা শাসক উল্লানাথনের কাছে তাদের দাবী জানান। এর কয়েকদিন পর আবার মহিলারা ঝাড়গ্রাম থানার সামনে বন্দিদের মুক্তির দাবিতে ধর্নায় বসেন। ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মিছিলও করা হয়। এই ধরনের মিছিল ও মিটিং বিভিন্ন গ্রামে গ্রামেও হতে থাকে।[১৩] স্কুল গুলিতে ক্যাম্প করার প্রতিবাদেও বিভিন্ন এলাকায় মিছিল হয়। ১৮ ই মার্চ ২০১০ এ মানিকপারা ক্যাম্পের কাছে জনগণর কমিটির সদস্যরা বিক্ষোভ মিছিল করেও ক্যাম্প সরানোর দাবী জানাতে থাকে।[১৪] পুলিশ ও কমিটির সংঘর্ষে বেশ কিছু আদিবাসী নারী গুরুতর আহত হন। এর আগে ৮ ই মার্চ ২০০৯ এ পুলিসি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির নারী শাখা আত্মপ্রকাশ করেছিলো। জুলাই মাস থেকে তারা সক্রিয় ভাবে আন্দোলনে সামিল হয় এবং থানা ঘেরাও প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়। পুলিসি সন্ত্রাসের বিরোধিতার পাশাপাশি তারা মদ্যপান, পারিবারিক হিংসা, সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদে সামিল হন। লালগড় আন্দোলনে বহু নারীই শহিদ হয়েছেন। সরকারি রিপোর্টে নাম পাওয়া গেছে ১০ জন মহিলার। সংখ্যাটা নিঃসন্দেহে আরও অনেক বেশি।[১৫]

ক্রমশ এই আন্দোলনে জনগণের কমিটি ও মাওবাদীদের সীমারেখা মুছে যেতে থাকে এবং আন্দোলনের নৃশংস দিকগুলি আত্মপ্রকাশ করে। আন্দোলনের কিছু নেতারা এবং মাওবাদী নেতারা অস্ত্র সস্ত্র সহযোগে গ্রামের মানুষের ওপর জোর করতে থাকে। সাধারন মানুষ যারা এতদিন পুলিশ প্রশাসনের অত্যাচারের শিকার ছিল তারা এবার সামরিক বাহিনী ও মাওবাদী উভয় শক্তির জাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকে। এর পাশাপাশি তুমুল আতঙ্ক দেখা যায় তখন যখন সি পি আই এম নেতা( গ্রামীণ) দের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মাওবাদীরা বিচার করে তাদের হত্যা করে রাস্তায় ফেলে দিতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে গ্রাম থেকে মানুষ জন পালিয়ে যেতে শুরু করে, সামরিক বাহিনীও মাওবাদী সন্দেহে গ্রামের মানুষদের ধর পাকড় করা শুরু করে। আন্দোলন একটি চরম পর্যায়ে উন্নিত হয় ও জন সমর্থন হারাতে থাকে।

২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি অবিশ্বাস্য পালাবদল ঘটে। ৩৪ বছরের সি পি আই এম সরকার কে সরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হন। এই সময় লালগড় আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। উন্নয়ন মূলক কাজ ও পুনর্বাসনের আশ্বাস পেয়ে বহু মাওবাদী নেতা নেত্রী আত্মসমর্পণ করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসে। তাদের প্রধান বিরোধ তৎকালীন সরকার সরে যাওয়ায় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। শেষপর্যন্ত মাওবাদী নেতা কিষাণজী এনকাউন্টারে মারা যাওয়ার পর আন্দোলন ক্রমশ শেষ হয়ে যায়।[১৬]

নারীদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া লালগড় আন্দোলন ক্রমশ মাওবাদী আন্দোলনে পরিনত হয়েছিলো ঠিকই তবে এই আন্দোলনের শুরুর দিকে নারীদের যোগদান ছিল অত্যন্ত বেশি যা নারী আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন দিশা সংযুক্ত করেছে। নারীদের ওপর অত্যাচার হলে কিরূপ ভয়াবহ আকার ধারন করতে পারে তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে রাষ্ট্রকে দেখিয়ে দিয়েছে। তবে মাওবাদী প্রভাব এই আন্দোলনের চরিত্রে পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই প্রসঙ্গে স্বপন বসুর একটি বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে-“এই সরল নিরিহ গরীব মানুষদের প্রতিরোধ আন্দোলন সক্রিয় হওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই উগ্রপন্থী মাওবাদীদের উস্কানি ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। বিক্ষুব্ধ আদিবাসীদের পাশে মাওবাদীরা বন্ধু সেজে এসে প্রশাসন ও পুলিশের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে পারে। কারন মানুষের দারিদ্র্য ও শোষণ-বঞ্চনাকে মূলধন করেই তাদের সন্ত্রাসী রাজনীতির প্রসার ঘটানো তাদের লক্ষ্য। জঙ্গলের এই নিরিহ মানুষদের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে তারা সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি

করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সামনে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।"[১৭] তবে এই লালগড় আন্দোলন প্রসঙ্গে একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে এই আন্দোলনে আদিবাসী নারীর যোগদান অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষদেরও ছাপিয়ে গিয়েছিল।

তথ্যসূত্র:


১. Census Report ২০১১ ।West Bengal.

২. S.S Shashi*, Nehru and the Tribals*, Concept publishing Company, New Delhi, 1990. Page no- 23.

৩. The statesman, 1st December , 2009. "*Tribal Deserve a Better Deal*".

৪. Times of India, 3rd November, 2008. *"Bengal CM survives Maoist attack".*

৫. Amit Bhattacharyya , "*Singur to Lalgarh via Nandigram : Rising Flames of People's Anger against Displacement, Destitution and State Terror"* . Published by K N Pandit on behalf of Visthapan Virodhi Jan Vikas Andolon. 2009. Page no- 12.

৬. Amit Bhattacharyya , "*Singur to Lalgarh via Nandigram : Rising Flames of People's Anger against Displacement, Destitution and State Terror".* Published by K N Pandit on behalf of Visthapan Virodhi Jan Vikas Andolon. 2009. Pageno – 14-16 and 22-24.

৭. The statesman, *Hard times in Bleak Houses. 'How the women in Lalgarh eke out a living,'* 21. 05. 2009.

৮. Sanhati, "*Background of the movement*" By Partho Sarathi Roy, November 13, 2008.

৯. Tehelka.com, "*Lalgarh's red arrows*" by Shriya Mohon, April 25, 2009, Issue 16, Volume 6.

১০. Financial Express, "*Operation Lalgarh begins, central forces move in.*" by Subrata Nagchoudhury , june 20 ,2009.

১১. আনন্দবাজার পত্রিকা, "বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মহিলাদের" 26.10.2009.

১২. The Telegraph, 21 th October, 2009.

১৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, "টাঙ্গি ও লাঠি নিয়ে ঝাড়গ্রামে বিক্ষোভ দেখালেন মহিলারা" 10.11.2009.

১৪. The Statesman, *"Twelve women hurt in PCPA-joint forces clash*" 18.03.2010.

১৫. "লড়াইঃ ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, অভাবনীয় প্রতিরোধ', প্রকাশক কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, April, 2010, Kolkata, page no- 37-40.

১৬. The Hindu, "*Kishenji killed in encounter"* 26 November, 2011.

১৭. স্বপন বসু, "যৌথ অভিযান সমাধান নয়, জঙ্গলমহলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সদর্থক পদক্ষেপ নিতে হবে" সমাজবাদী ভাবনা, ষোড়শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

# দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে ব্রিটিশ বিরোধী জনমতের উত্থানে সামাজিক ও ধর্মনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

বিদ্যুৎ মিশ্র
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, সিকম স্কিল ইউনিভার্সিটি

**সারসংক্ষেপ :**
উনবিংশ শতকে বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া নবজাগরণের প্রবাহ দেখা দিলে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলিতেও এই নবজাগরণের ভাবধারা প্রবেশ করে। এইনবজাগরণের হাত ধরেহুগলীবর্ধমান বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরজেলাগুলিতে এক ঐক্যবদ্ধ সমাজ চেতনার জন্ম হয়েছিল।যার মধ্য দিয়ে উঠে আসে জাতীয়তাবাদের ভাবনা। মানুষ প্রথাগত ধ্যান – ধারনার বাইরে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে এবং স্বদেশ চিন্তা ও জাতিয়তাবাদী মানসিকতা গড়ে তোলে। ব্রিটিশ সরকারের একের পর এক প্রতিক্রিয়াশীল নীতির কারনে ভারতীয়রা প্রতিবাদ জানাতে থাকে এবং প্রতিবাদের মঞ্চ হিসাবে তারা ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলি হয়ে উঠেছিল এক জনমত প্রকাশের শক্তিশালী মাধ্যম। অর্থাৎ জনমত গঠনের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে সামাজিক ও ধর্মনৈতিক পরিমণ্ডলে জন্ম নেয় রাজনৈতিক সংগঠন। এই সংগঠন সম্প্রদায় ভিত্তিক সভা – সমিতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যা পরবর্তী সময়ে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানে রুপ পায়। সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিবাদ হিসাবে এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় ক্ষেত্রে শক্তিশালী জনমতকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

**বিষয়সূচক শব্দ :** নবজাগরণ, স্বদেশ চিন্তা, জাতীয়তাবাদ, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, সভা – সমিতি, জনমত।

**প্রতিপাদ্য বিষয় :**

পরাধীন ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার কারনে জন্ম নেওয়া নবজাগরণ মানুষের চেতনার বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। বাঙালী সমাজ জীবিকার প্রয়োজনে প্রথমাবস্থায় ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করলেও একটা সময় এই বাঙালী সম্প্রদায় স্ব – জাতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। ফলে তারা উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্রিটিশ বিরোধী মতামত প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। এই

ভাবনার সূচনা হয়েছিল ১৮১৫ সালের দিকে রামমোহন রায়ের হাত ধরে। যতই দিন গেছে এই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ভাবনা তাদের মধ্যে শক্তিশালী হয়েছে। ফলে তারা একের পর এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলাতে এইরূপ সামাজিক এবং ধর্মনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিকাশ লাভ করেছিল। ঐতিহাসিকগন কলিকাতা কেন্দ্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী হলেও আঞ্চলিক বা দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলিতে জন্ম নেওয়া স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করতে সেরুপ আগ্রহী নয়। সেক্ষেত্রে আমার আলোচনা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পাশে স্থানীয় এই সকল প্রতিষ্ঠান যে যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করেছিল তা উঠে আসবে।

**গবেষনার ক্ষেত্র :**

আমার গবেষনার ক্ষেত্র দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গ ।অর্থাৎ হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা বোঝায়। পুরুলিয়া জেলাকে এই অংশে না রাখার কারন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে এই অংশ জেলা হিসাবে পৃথক ভাবে পরিচিতি পায় নি। দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে উঠে আসা সমাজ – সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক চিন্তা ধারার বৈচিত্র রয়েছে। ফলে ব্রিটিশ ভূমি ব্যবস্থা থেকে উঠে আসা ভূমি নির্ভর, পেশা নির্ভর মধ্যবিত্ত এই দেশে আধা ধনতান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামো গড়ে তোলে। এর মধ্য থেকেই জন্ম নেয় সমাজ – সংস্কৃতি। সেক্ষেত্রে এই সমাজ থেকে উঠে আসে ঔপনিবেশিক শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী ভাবনা। এই জাতীয়তাবাদী ভাবনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই সকল সামাজিক ও ধর্মনৈতিক প্রতিষ্ঠান কতটা প্রাসঙ্গিক ছিল তা তুলে ধরা।

**গবেষনার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি :**

উনবিংশ শতকে জনমত গঠনের অন্যতম মাধ্যম হলো সামাজিক পরিমণ্ডলে জন্ম নেওয়া রাজনৈতিক সংগঠন। এই সংগঠন জাতিভিত্তিক সভা – সমিতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানদীপ্তির বিকাশ ঘটলে সাহিত্য এবং দার্শনিক আলোচনামূলক সংগঠনগুলি হয়ে উঠেছিল সংস্কারমুখী উদ্দীপনার কেন্দ্রস্থল। একই সাথে এগুলি ছিল শিক্ষিত মানুষজনের মিলিত উপস্থিতিতে চিন্তা – চেতনা ও ভাবনা এবং আলাপ – আলোচনার মঞ্চ।[১] অর্থাৎ উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা বা নবজাগরণের প্রভাবে বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষজনের নিকট সভা – সমিতিগুলি পারস্পারিক ভাবনার লেনদেন ও সুচিন্তিত মত প্রকাশের স্থান হয়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতকে জন্ম নেওয়া নানান রাজনৈতিক ও সামাজিক

সংগঠন মানুষকে যেমন ঐক্যবদ্ধ করেছিল, একই সাথে তাদের মধ্যে এনে দিয়েছিল জাতীয়তাবাদের মানসিকতা ও স্বাধিকার চেতনা।[২] যা ছড়িয়ে পড়েছিল মফঃস্বল শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা একদিকে উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়কে যেমন নিজ নিজ স্বার্থ পূরনের জন্য জোঠবদ্ধ করেছিল, তেমনি এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও যোগ দিয়েছিল। যার দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই সকল প্রতিষ্ঠানের দ্বারা রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হতে পেরেছিল। সেক্ষেত্রে এই সকল রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলি কিভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি আমার আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছি কিছু প্রাথমিক ও গৌন উপাদানের ভিত্তিতে। এছাড়াও আই বি রেকর্ড, ১৮৯১ সালের জনগণনার উপর ভিত্তি করেআলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছি।

**বিশ্লেষণ :**

সামাজিক সংগঠন হিসাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশ গ্রহণে প্রথম উঠে এসেছিল ১৮২৩ সালের ২৩ শে মার্চ কলিকাতায় রামকমল সেন ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুর এর সম্পাদনায় “গৌড়িয় সমাজ”। এই রুপ একের পর এক ১৮২৮ সাল নাগাদ ডিরোজী-র নেতৃত্বে“অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন”, ১৮৩৬ সালে “বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা”, ১৮৩৬ সালে কলিকাতায় জন্ম লাভ করে “ভূম্যাধীকারী সভা” বা “জমিদার অ্যাসোসিয়েশন”। এই সভার ১৮৩৮ সালে নাম রাখা হয় “ল্যান্ড হোল্ডার সোসাইটি”। কয়েক বৎসর পরে ১৮৫১ সাল নাগাদ কলিকাতায় জমিদার শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এক ছত্রতলে এসে “ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি” আত্মপ্রকাশ করে। ফলে এটি হয়ে ওঠে ভারতীয়দের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন। এই সংগঠনের মধ্যে “জমিদার সভা ও “ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি” মিলিত হয়ে যায়। যাইহোক এই সকল কলিকাতা কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির পাশে মফঃস্বল দক্ষিন পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলিতে রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান জন্ম নিতে থাকে।

মফঃস্বল দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলিতে প্রথম দিকের সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি জমিদার বা বুর্জোয়া নির্ভর প্রতিষ্ঠান হওয়ায় মধ্যবিত্ত বা সাধারন মানুষের অংশগ্রহণ সেভাবে উঠে আসে নি। মফঃস্বল হুগলীজেলাতে এই সামাজিক ও ধর্ম কেন্দ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক আন্দোলনের সুত্রপাত হয়েছিল রাজা রামমোহন রায় -এর হাত ধরে। ১৮১৫ সালে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত “আত্মীয় সভা” জন্ম লাভ করলে শহর ও মফঃস্বল অঞ্চলগুলিতে উদীয়মান মধ্যবিত্তের একটি সভায় পরিণত

হয়।[৩] কলিকাতার পাশাপাশি এই "আত্মীয় সভা"র প্রচার হুগলী জেলাতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তেলিনীপাড়ার আনন্দপ্রসাদ ব্যানার্জি, নোয়াপাড়ার নীলরতন হালদার প্রমুখ জমিদার এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন।[৪] এই জেলার সাথে রাজা রামমোহন রায়ের যোগাযোগ থাকলেও তিনি এই জেলার আত্মীয় সভার কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন নি। দেখা যায় সমাজ সংস্কারের এবং ধর্মীয় সংস্কীর্নতা দূর করার লক্ষ্য নিয়ে হুগলী জেলায় বেশ কয়েকজন জমিদার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এদিকে "ব্রাক্ষ্ম সমাজ" কলিকাতায় ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে বাংলাদেশে নিরাকার ধর্মের উপাসনা শুরু হয়ে যায়। "ব্রাক্ষ্ম সমাজ" ক্রমশ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। হুগলী জেলার কিছু স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ব্রাক্ষ্ম সমাজের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। কোননগরের শিবচন্দ্র দেব, বাঁশবেড়িয়ার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, উত্তরপাড়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক রামতনু লাহিড়ি অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৫] ১৮৭০ সালের মধ্যে হুগলী জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্রাক্ষ্ম সমাজের শাখা গড়ে উঠেছিল । এগুলি গড়ে উঠেছিল কোননগর, বৈদ্যবাটী, চিনশুরা, হুগলী, বাসুয়া, বালুতি এবং চন্দননগরে ।[৬] "ব্রাক্ষ সমাজ" এর শাখা সংগঠনগুলি শিক্ষা বিস্তারে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিল । ১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন "তত্ববোধিনী পাঠশালা"। অর্থাৎ ব্রাক্ষ্ম সমাজ ধীরে ধীরে মফঃস্বল জেলাতে শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়ে ওঠে।

"ব্রাক্ষ্ম সমাজ" পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ৫০টির মতো শাখা গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে ১৮৬৭ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যক্ষ নির্দেশে বর্ধমান জেলার অম্বিকা – কালনা এলাকায় একটি শাখা স্থাপিত হয়েছিল। কালানার মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং রাধিকামোহন পাল প্রথম ব্রাক্ষ্ম ধর্মের দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই কালনাতে ব্রাক্ষ্ম সমাজের শাখা প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে। উল্লেখ করা যায় কালনাতে ব্রাক্ষ্ম সমাজের বিস্তারে বর্ধমানের জমিদার মহতাব চাঁদের আন্তরিক আনুকুল্য ছিল। শাখা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও এই অঞ্চলে ব্রাক্ষ্ম সমাজের জনপ্রিয়তা তেমন একটা লক্ষ্য করা যায় না।

মফঃস্বল বাঁকুড়া জেলায় "ব্রাক্ষ্ম সমাজ" এর আন্দোলনের বিস্তারের প্রচেষ্টা রক্ষণশীল ব্রক্ষন্যবাদের নিকট এক অসম্ভব বিষয় ছিল। ১৮৮১ সালে বাঁকুড়ার স্কুল ডাঙ্গা পল্লীতে ব্রাক্ষ্ম সমাজের উপাসনা গৃহ নির্মীত হয়।[৭] সাধারন ব্রাক্ষ্ম সমাজের সপ্তম বার্ষিক প্রতিবেদনে বাঁকুড়া জেলায় প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৮৮১ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৮৪ সাল নাগাদ বাঁকুড়ায় তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শিবনাথ শাস্ত্রী নিজে বাঁকুড়ায় যান। তখন ক্ষেত্রনাথ সেন ছিলেন বাঁকুড়া ব্রাক্ষ্ম সমাজের সম্পাদক। কিন্তু ১৮৯১ সালের জনগণনা

অনুযায়ী জানা যায় এই সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা তেমন একটা বৃদ্ধি পায় নি।[৮] এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় বাঁকুড়া জেলায় ব্রাক্ষ্ম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল ১৬ জন। এর মধ্যে বাঁকুড়াতে ১২ জন, খাতড়াতে ৩ জন, ইন্দাস থানায় ১ জন।[৯] তবে তাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। রক্ষণশীল বাঁকুড়া জেলাতে ব্রাক্ষ্ম সমাজের অগ্রগতি তেমন ভাবে অগ্রসর হতে পারে নি। ব্রাক্ষ্ম সমাজ বাঁকুড়া শহরে সীমাবদ্ধ ছিল কয়েকটি পরিবারের মধ্যে। জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক কেদারনাথ কুলভী ছিলেন ব্রাক্ষ সমাজের আচার্য। জানা যায় কেদারনাথ কুলভীর প্রভাবে বাঁকুড়ার ছাত্র ও শিক্ষক, মোক্তার হাকিমগন তাঁর অনুগামী হয়ে ওঠেন।[১০] এই কেদারনাথ কুলভীর প্রিয় ছাত্র ছিলেন রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়। কেননা সাংবাদিক রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়কে ব্রাক্ষ্ম সমাজের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সমাজচ্যুত হতে হয়েছিল।[১১] বাঁকুড়া জেলাতে ব্রাক্ষ্ম সমাজ স্থানীয় জনকল্যাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের উদ্যোগে অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। এছাড়াও স্টুডেন্টস ক্লাব, রামমোহনের মৃত্যু বার্ষিকী উৎযাপন, ভাদ্রোৎসব, মাঘোৎসব প্রভৃতি পালিত হয়। সাধারন মানুষের মধ্যে ব্রাক্ষ্ম সমাজ সম্পর্কে তেমন একটা আগ্রহ না থাকলেও কেশব সেনের “সুলভ সমাচার” বাঁকুড়াতে ভালোই বিক্রি হতো। ১৯০১ সাল নাগাদ বাঁকুড়া জেলাতে “ব্রাক্ষ্ম সমাজে” এর সদস্য সংখ্যা ১৬ জন থাকালেও[১২] পরের দিকে এই সমাজের সদস্য সংখ্যা কমে আসতে থাকে । উল্লেখ্য ১৯২৫ সালে সাধারন ব্রাক্ষ্ম সমাজেরবার্ষিক প্রতিবেদনে বাঁকুড়া জেলাতে ব্রাক্ষ্ম সমাজের কোন অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া যায় না।[১৩]

উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটতে থাকলে উচ্চবিত্ত শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে স্বাধিকার চিন্তার প্রসার ঘটে।[১৪] ফলে পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল এই সমাজের অভ্যন্তরে। বিশেষ করে সদগোপ, সৎচাষী, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, যোগী, রাজবংশী প্রভৃতি জাতি পরিচয় স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে। ১৮৭২ সালের জনগণনার রিপোর্টে জাতের সামাজিক মর্যাদা উঠে এলে মর্যাদা অর্জনের ভাবনা তীব্র ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।[১৫]

ধর্ম ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে আত্মপ্রকাশ করলে হিন্দু সমাজের মধ্যে জাতি ভিত্তিক সম্প্রদায়ের জন্ম ঘটে। ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক নীতির কারনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে হুগলী জেলাতে ১৮৬৩ সালে জন্ম লাভ করে “হিতকরী সভা”।[১৬] কিন্তু এর পূর্বেই হুগলী জেলাতে যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন “উত্তরপাড়া সমাজ”। এই সমাজ বিভিন্ন

বিষয়ে আধুনিক ধ্যান – ধারনা বিকাশে উদ্যোগী হয়েছিল। পরে জয়কৃষ্ণ মুখার্জি ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন “উত্তরপাড়া এ্যাসোসিয়েশন”।[১৭] “হিতকরী সভা” উত্তরপাড়ায় আত্মপ্রকাশ করলে যুব সমাজ এগিয়ে আসে। এই সভার দায়িত্ব গ্রহণ করেন হরিহর চ্যাটার্জি।[১৮] এই সভার স্থায়ী সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্থানীয় জমিদার বিজয়কৃষ্ণ মুখার্জি এবং তিনি এই সভাকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। এই সভার উদ্যোগে দরিদ্রদের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিবাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাহায্য করা হয়েছিল। নারী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান হিসাবে “হিতকরী সভা” ভূমিকা গ্রহণ করে। এছাড়াও কৃষি সংক্রান্ত জ্ঞান বিস্তারের জন্য ঐ বৎসর উত্তরপাড়ায় কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এই “হিতকরী সভা” ছিল কলিকাতা কেন্দ্রিক ও মফঃস্বল বুদ্ধিজীবীদের মিলন কেন্দ্র।

বাঁকুড়া জেলাতে ১৯২৫ – ২৬ সালে “হিন্দু সভা” প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এই সভার রামেশ্বর চট্রোপাধ্যায় এবং সত্যকিঙ্কর সাহানা সভাপতি এবং সহ – সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯২৭ সালের মধ্যে বাঁকুড়া জেলাতে এর প্রায় ১০ টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই “হিন্দু সভা”র আদর্শ প্রচারের জন্য সহ – সম্পাদক অনঙ্গ নিয়োগী “যুবদীপ” নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।[১৯] এই সমিতির লক্ষ্য ছিল ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে উদ্যোগী গ্রহণ করা। এই সভা নিম্নবর্নের বা নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলেছিল। ধর্মীয় ভাবনা নিয়ে এই সভা পরিচালিত হওয়ায় সাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশ লাভ করেছিল। কেননা এই সভার মধ্যে হিন্দুত্ববাদী ভাব – ধারা ছিল প্রবল। হিন্দু সভার আগে বাঁকুড়া জেলাতে “হরিসভা”র বিকাশ ঘটেছিল। একই ভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই জেলাতে আত্মপ্রকাশ করেছিল আঞ্জুমান ইসলামিয়ার ন্যায় প্রতিষ্ঠান। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রদায়গত স্বতন্ত্রতা যেমন ছিল, তেমনি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জন্ম লাভ করেছিল। যাইহোক, এই সকল সভাগুলির পাশে বিজ্ঞ সমাজ সারস্বত সমাজ গড়ে তুলেছিল। তারা জ্ঞান চর্চামূলক সভার বাইরেও নেতৃত্ববর্গ বৈষয়িক বিষয় নিয়ে জন্ম দিয়েছিল উন্নয়নমূলক সভা – সমিতি তথা দরিদ্র ভান্ডার, কৃষি ও হিতসাধনী সমিতি প্রভৃতি গড়ে তুলেছিল।

উনবিংশ এবং বিংশ শতকের দিকে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলিতে এই রুপ বিভিন্ন সম্প্রদায় ভিত্তিক সভা – সমিতির আত্মপ্রকাশ করেছিল। যেগুলির লক্ষ্য ছিল জন চেতনা বিকাশের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সমস্যাগুলিকে সরকারের নিকট তুলে ধরা। দেখা গেছে হুগলী ও মেদিনীপুর জেলাতে মাহিষ্য সমাজ, বর্ধমান জেলাতে উগ্র ক্ষত্রিয়

সমাজ এবং বাঁকুড়া জেলাতে সুবর্ন বনিক, কায়স্ত সমাজ বিকাশ লাভ করেছিল। উল্লেখ্য করা যায় মেদিনীপুর জেলার পূর্ব ভাগে মাহিষ্য সম্প্রদায় সংখ্যাধিক্য ছিল।[২০] তারা আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষমতাশালী ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের কারনে তাদের সেই মর্যাদা লোপ পায় এবং আর্থিক প্রতিপত্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও জাতের প্রশ্নে তারা উপেক্ষিত ছিল। এদিকে মেদিনীপুর জেলাতে ব্রাহ্ম সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হলে উনবিংশ শতক ধরে সামাজিক প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল।[২১] জেলাতে জাতীয় কংগ্রেসের বিস্তার ঘটলে এই সম্প্রদায় আন্দোলনে শক্তিশালী ভূমিকা গ্রহণ করে। এই রুপ পরিস্থিতিতে সর্বভারতীয় আন্দোলনের অংশ হিসাবে মাহিষ্য সম্প্রদায় জাতিগত মর্যাদা বৃদ্ধি করেতে চেয়েছিল। ফলে বিংশ শতকের প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দান করতে চাইলে সম্পন্ন মাহিষ্যগন রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভে চেষ্টা করে। আর এর মধ্য দিয়েই জন্ম লাভ করে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন। যা মেদিনীপুর জেলার পাশাপাশি আরামবাগ, বাঁকুড়া জেলাতেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অংশ হিসাবে ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী প্রতিবাধ আন্দোলন বিকাশ লাভ করেছিল।[২২]

তাই বলা যায়, এই সকল সম্প্রদায় ভিত্তিক সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন নিজেদের সংগঠিত করেছিল, তেমনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে তারা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। এছাড়াও এই সকল সম্প্রদায় ধর্মীয় ভাবধারাকে সামনে রেখে নিজেদের মধ্যে জাতিগত ঐক্য গড়ে তুলেছিল। দেখা গেছে এই সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও সম্প্রদায় ভিত্তিক ঐক্য বোধ জন্ম নিয়েছিল। অর্থাৎ সার্বিক ভাবে এই সকল সম্প্রদায় ভিত্তিক ভাব ধারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

তথ্যসূত্র :

১. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র,* চতুর্থ খণ্ড, প্যাপিরাস, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ – ১৮ – ১৯

২. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮),* দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭, পৃ – ২১৭

৩. Subhash Chandra Sen, *The Landed Middle Class And Their Political in Hooghly*, Progressive Publishers, Kolkata, P – 96

৪. Idbi
৫. Idbi, P - 99
৬. W.W.Hunter, *Statistical Accounts of Bengal*, Voll – III, (Reprint), New Delhi, 1976, P – 293
৭. Sivnath Sastri, *History of the Brahmo Samaj*, Vol – 2, Published By R.Chatterjee, Calcutta, 1912,P - 517
৮. শ্রী রথীনমোহন চৌধুরী, *বাঁকুড়াজনের ইতিহাস-সংস্কৃতি*, বেস্ট বুকস, কলিকাতা, পৃ – ৩৯১
৯. তদেব
১০. কৃষ্ণকুমার মিত্র, আত্মচরিত, ১৩৪৩, কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদনা), দ্বিতীয় মুদ্রন, কলিকাতা, ১৩৮১, পৃ - ১৪০
১১. শ্রী রথীনমোহন চৌধুরী, *বাঁকুড়াজনের ইতিহাস-সংস্কৃতি*, বেস্ট বুকস, কলিকাতা, পৃ – ৩৯১
১২. Census of India, 1891, Vol – V, Table XVI, P – 24, Census of India, 1901, Vol – VI – A, Part – II, Table – V, P – 20
১৩. The Forty – Eighth Annual Report of the Sadharan Brahmo Samaj, 1925, P – x
১৪. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *স্বরাজের পথে,* প্যাপিরাস, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ – ৫৯
১৫. তদেব, পৃ –৬০
১৬. Subhash Chandra Sen, *The Landed Middle Class And Their Political in Hooghly*, Progressive Publishers, Kolkata, P – 106
১৭. Idbi
১৮. Nilmoni Mukherjee, op. cit., *Bengal past and present*, july, 1970
১৯. I.B. Records, File No. Q/25, SL, No. 115/25, Government of Bengal, (1) Copy of a Latter from S.K. Sahana to the Secretary, Hindu Relief Society, 1st November, 1926
২০. *চতুরঙ্গ*, বর্ষ ৩৮, কার্তিক – পৌষ, ১৩৮৩, প্রবন্ধ, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, দক্ষিন পশ্চিম বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, পৃ – ১৮৭
২১. তদেব
২২. তদেব, পৃ - ১৮৮

# একজন চেনা কবিকে নতুনভাবে খুঁজতে গিয়ে

দীপঙ্কর সরদার
গবেষক, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

**সারসংক্ষেপ :** শিল্পীকে চেনা যায় শিল্পের আস্বাদনে, পর্যালোচনায়। কিন্তু কালের বিচার ও সেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন 'বামপন্থী কবি' বাংলার সমাজ সংস্কৃতির পালাবদলের মাঝেও যে উজ্জ্বল হয়ে থাকেন, তা সত্যই এক কালজয়ী ঘটনার দৃষ্টান্ত। শতবর্ষ পেরিয়েও আমাদের কবি আমাদের শিক্ষালয়ে কতখানি জায়গা জুড়ে অবস্তান করছেন, তারই অনুসন্ধান করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। কবিকে নতুনভাবে খুঁজতে গিয়ে এখানে আমাদের বিধিবদ্ধ পড়াশুনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সিলেবাসকে মূল ভিত্তি ধরা হয়েছে।

**শব্দসংকেত :** বামপন্থী কবি, শতবর্ষ, কবি সুভাষ, গদ্যকার সুভাষ, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেবাস, প্রাসঙ্গিকতা, কালজয়ী প্রতিভা।

এক.

বসন্তকালীন রবিবারের এক পড়ন্ত বিকাল। কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে হঠাৎ শুনি একটি কলেজ পনউয়া মেয়ে আরেকটি কলেজ পড়ুয়া ছেলেকে বলে ওঠে, সুভাষের মেনে হওয়া স্বাভাবিক 'কবি সুভাষ' বলা উচিত ছিল!) কবিতার নোটস্ এনেছিস্! জানতে পারলাম তাদের আসন্ন কলেজ-পরীক্ষায় কবি সুভাষের কবিতা পাঠ্য-বিষয় হিসেবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সেদিন মনে হল, শতবর্ষ পেরিয়ে স্মরণে আমাদের 'সিলেবাসে' সুভাষকে কিভাবে ধরা হয়েছে, তা একটু দেখা দরকার।

একজন প্রকৃত কবি, প্রতিভাবান সাহিত্যিক নিঃসন্দেহে সাধারণ পাঠক সমাজে নিজগুণে লাভ করেন। তা সত্ত্বেও বলতে হয়, পাঠ্য তালিকায় স্থান পাওয়া একটু অন্য ধরনের বিষয়। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য শোনা যায়, পাঠ্যতালিকা নির্মাণে স্বজন পোষণের রাজনীতি বড় বিষয়। কিন্তু প্রৃত বিচারে সেটাই সবকথা নয়। সময়ের দাবি, বক্তব্যের দাবি, শিল্পের দাবি সেখানে অবশ্যই গুরুত্ব পায়। তাই মনে হয়, পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্তি এক কবি-সাহিত্যিকের কাছে খুবই মর্যাদার, আনন্দের বিষয়। প্রসঙ্গত, কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। একটি পাঠ্যসূচি আসলে গড়ে ওঠে বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাবিদ্, বিষয় বিশেষজ্ঞ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রেমী মানুষের নিরন্তর শ্রমে ও নিরসল পরিকল্পনায়। ফলতঃ একজন কবির একটি কবিতা কিংবা

একজন নাট্যকারের একটি নাটক নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তা একবার মূল্যায়িত হওয়ার সুযোগ পায় ও গুনীজনের শংসাপত্র লাভ করে থাকে। তাছাড়া, একজন কবি-সাহিত্যিক যখনই একটি সিলেবাসের অংশ হয়ে ওঠেন, তখন তাঁর বিশেষ পরিচিত লাভ ঘটতে বাধ্য। তেনই মনে রাখতে হবে, একটি সিলেবাস একটি কালের সমাজের দাবি মেনে যেহেতু তৈরী হয়, সেহেতু কোনো সিলেবাসে থাকা গল্প-কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ যে কালোজয়ী, সমাজোপযোগী সৃষ্টি, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। এমনই কিছু যুক্তির নিরিখে আমাদের শিক্ষালয়ে কবি-সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অবস্থান পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে।

দুই.

প্রথমেই আসা যাক, বিদ্যালয় স্তরের সিলেবাস ধরে সুভাষের গ্রহণযোগ্যতার পর্যালোচনায়। প্রাথমিক শিক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণিতে সহজপাঠের পাশাপাসি আলাদা করে বাংলা পাঠসংকলন সেভাবে পড়ানো হয় না। 'আমার বই' শিরোনামে একটি পাঠ্যগ্রন্থে ননাবিধ বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছড়া, গল্প স্থান পেয়েছে। সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্য-তালিকায় মেলে সুভাষের 'বারোমাসে' ছড়াটি। ছড়াটি এখানে তুলে ধরলাম-

'আষাঢ়ে মেঘের মেলা, শ্রাবণে বন্ধ খেলা
কম করে দুটো মাস চলে বরষার পালা।
ভাদ্রে টেকে না মন, আশ্বিনে পার্বণ
শরতের সাদাফুলে ঢেকে যায় কাশবন।
কার্তিকে মন তোলা, অঘ্রাণে ভরে গোলা
হেমন্তে হিম লেগে গোবিন্দ গালফোলা।
ফাগুনে ভরে ফাগে, চৈত্রে পরব লাগে
বসন্তে ফুল নিয়ে মধুরস রাত জাগে।।'

ছড়াটির শিক্ষণ পরামর্শে লেখা হয়েছে – শিক্ষার্থীরা কবিকাটি পড়বে – বিভিন্ন মাসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাদের ধারনা গড়ে উঠবে। সত্যই অন্ত্যমিলযুক্ত দ্রুতলয়ের ছন্দে রচিত এই ছড়াটি শিশুমনে আনন্দ আর বাংলা ঋতুবৈচিত্র্যের জ্ঞান দুই-ই দান করে। তৃতীয়, চতুর্থ কিংবা পরবর্তী পর্যায়ে পঞ্চম শ্রেণিতে সেই অর্থে সুভাষের দেখা মেলেনি। তবে ষষ্ঠ শ্রেণির 'সাহিত্যমেলা'য় দেখা যায় এক চমক। সেখানে সংকলিত হয়ে সুভাষের 'নারদের ডায়েরি' থেকে গৃহীত 'মরশুমের দিনে' গদ্যরচনাটি। যে গদ্যরচনাটির বিষয়বস্তুও বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য। ছড়া আর ব্রতগানে সমৃদ্ধ এই রচনায় উঠে এসেছে বাংলার বর্ষাকাল। তবে এই রচনাটির ইতিহাস বেশ মজাদার। 'মরশুমের দিনে' প্রথম

প্রকাশিত হয় ১৩৬৮-র মাঘ-চৈত্র ‘নতুন সাহিত্য’ (নবপর্যায়)-এর পাতায়। জানা যায়, একটি বিদেশি প্রকাশনার প্রতিনিধি নাইজেল কেমরন একদা কলকাতায় এসে সত্যজিৎ রায়ের পরামর্শে কবি সুভাষের সঙ্গে আলাপ করেন। নাইজেল সাহেব-ই সুভাষকে বাংলার বর্ষাকাল নিয়ে ‘মরশুমের দিনে’ লিখতে অনুরোধ জানান। তবে কমিউনিস্ট কর্মীর রচনা প্রকাশে যাতে না আপত্তি আসে, তার জন্য নিবন্ধটি সুবোধ মুখোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত হয়।[১] অষ্টম শ্রেণির ‘সাহিত্যমেলা’র একেবারে শেষে থাকা ‘লোকটা জানেই না’ কবিতাটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। ১৯৬২-তে প্রকাশিত ‘যত দূরেই যাই’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এই কবিতাটিতে উঠে এসেছে জীবনযাপনের সম্পূর্ণতা, সার্থকতার মতো দার্শনিক সত্য। যেকোন কিশোর-কিশোরীর কাছে কবিতাটি নিঃসন্দেহে শিক্ষনীয় পাঠ্য।

প্রাথমিক, উচ্চ-প্রাথমিকের মতো মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ও সুভাষের গুরুত্ব কিছু কম নয়। বাংলা দ্বিতীয় ভাষায় নবম শ্রেণির ‘সাহিত্যসম্ভার’-এ সংকলিত হয়েছে সুভাষের যে কবিতা, তার শিরোনাম ‘জননী জন্মভূমি’। এই কবিতাটিও উক্ত কবিতা সংকলনের শেষ কবিতা। গদ্য ছন্দে রচিত এই নাতিদীর্ঘ কবিতাটিতে স্বদেশচেতনা এক অন্যমাত্রা লাভ করেছে। যে কবিতায় দেশমাতার উদ্দেশ্যে লেখা হয়, ‘আমি যা কিছু স্পর্শ করি / সেখানেই, / হে জননী, / তুমি।’ ঠিক তেমনই দশম শ্রেণির প্রথম ভাষার ‘সাহিত্যসঞ্চয়ণের পাঠ্যসূচিতে থাকা ‘একাকারে’ কবিতাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ভাবধারাকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। যদিও নির্বাচিত পাঠসরণীতে তা বর্তমানে নেই, কেবল পূর্ণাঙ্গ সংকলনে স্থান পেয়েছে। জাতীয়, আন্তজার্তিক, স্তরে আজ যখন সাম্প্রদায়িক হানাঙানিতে আমরা আতঙ্কিত, তখন ‘একাকারে’ কবিতাটি হয়ে ওঠে একেবারেই প্রাসঙ্গিক। ‘একাকারে’ কবিতাটিতে সুভাষ লেখেন, ‘শোনো / কোরানের সুবাহর সঙ্গে / উপনিষদের মন্ত্র, / সকালের প্রভাত ফেরির সঙ্গে / ভোরের আজান / একাকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।’ সর্বোপরি উল্লেখ্য, বাংলা প্রথম ভাষার দ্বাদশ শ্রেণির সিলেবাসে ‘সাহিত্যচর্চা’য় সংকলিত ‘আমার বাংলা গদ্য রচনাটির কথা। আলোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কে বাঙালি জাতি ও বঙ্গ সংস্কৃতির খ্যাতনামা গবেষক-প্রাবন্ধিক ড. নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন,... সুভাষ পদাতিক হয়ে বাংলার পথে ঘাটে মাঠে বেরিয়েছিলেন দেশের অগণিত মানুষের পরিচয় নেবার জন্য, তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রন্থনের জন্য, নিজের যথার্থ পরিচয় পাবার জন্য।... ‘আমার বাংলা’ এই পরিচয় সাধনার ইতিহাস এবং সাধন অভিজ্ঞতার আনন্দময় কাব্য।’ ১৯৫১-

তে প্রকাশিথ কাশ্মীরের ছেলে জলিমোহন কলের স্মৃতিরে উৎসর্গ করা 'আমার বাংলা' গ্রন্থের মোট প্রবন্ধ সংখ্যা এগারোটি। যার মধ্যে 'গারো পাহাড়ের নীচে', 'ছাতির বদলে হাতি', 'কলের কলকাতা', 'মেঘের গায়ে জেলখানা' ও 'হাত বাড়াও' – পাঁচটি প্রবন্ধ পড়ানো হয় উচ্চমাধ্যমিক স্তরে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'রংমশাল' পত্রিকায় প্রকাশিত এই সকল প্রবন্ধ পুরানো বাংলাদেশের জীবনের জলচ্ছবি। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, সমাজরীতি, বাংলার মানুষের সুখ-দুঃখ, ইংরেজ অত্যাচার, পরাধীন ভারতের সংগ্রাম, জমিদার তন্ত্রের নানা বিভীষিকা – সবই আছে 'আমার বাংলা'র প্রবন্ধ-পঞ্চকে। এককথায় এই প্রবন্ধ সংকলন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দেশকাল-জ্ঞানকে সুদৃঢ় করে তোলে।

একেবারে প্রাথমিক থেকে প্রাক্-কলেজ স্তর পর্যন্ত চড়াকার, কবি, প্রাবন্ধিক, সমাজতাত্ত্বিক গবেষক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তাই যথেষ্ট রয়েছে বলতে পারি। বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষার সিলেবাস মিলিয়ে দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম, দশম, দ্বাদশ প্রায় প্রতিটি শ্রেণিতেই সুভাষের সৃষ্টি পাঠ্যরচনার মর্যাদা লাভ করেছে। আর সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ, বাংলার মানুষজনকে জানতে সাহায্য করার পাশাপাশি সুভাষের কবিতা প্রবন্ধ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, স্বদেশানুরাগের মতো মূল্যবান সব অনুভূতি-র উন্মেষেও সমানভাবে কার্যকরী ভূমিকা নেয়।

তিন.

যে শিক্ষার্থীদের কথায় বর্তমান প্রবন্ধের সূচনা, এবার তাদের কথায় আসার পালা! অর্থাৎ প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তর পেরিয়ে যখন ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এল, তখন সুভাষকে তারা কেমন ভাবে পেল- তা লক্ষ করা দরকার। বলাবাহুল্য, বর্তমান ওয়েবসাইট-এর দুনিয়ায় বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস সহজলভ্য হয়েছে। তারই সূত্রে বাংলা ভাষা সাহিত্য চর্চায় বৃহত্তর ক্ষেত্রে সুভাষের অবস্থান নির্ণয় করা যেতে পারে। ইতিহাস-সাক্ষী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে এখন পর্যন্ত চালু (তৃতীয় বর্ষের স্নাতক বাংলা) সিলেবাসে পাঠ্য সুভাষের বহুপঠিত 'বধূ' কবিতাটি। কিন্তু স্নাতকোত্তর স্তরে কাব্য-কবিতা বিশেষ পত্র পঠন-পাঠনে সুভাষের 'সে দিনের গান', 'রোমান্টিক', 'নবযুগের গান', 'মিছিলের মুখ', 'একটি কবিতার জন্য', 'সুন্দর', 'ফুল ফুটুক', 'যেতে যেতে', 'যত দূরেই সাই', 'কেন এলোনা', 'মেজাজ', 'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ', 'একটু পা চালিয়ে', 'ধর্মের কল'-এর মতো একাধিক স্মরণীয় কবিতা নির্বাচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য রাজ্যের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক-স্নাতকোত্তর স্তরের সিলেবাসে ঘুরে-ফিরে এই কবিতাগুলিই চোখে পড়ে। দৃষ্টান্ত হিসেবে

উল্লেক্য, গৌরবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় 'একটি কবিতার জন্য', সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মিছিলের মুখ', রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'যত দূরেই যাই'-এর সঙ্গে পড়ানো হয় 'পদাতিক' কবিতাটি। আর বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মিছিলের মুখ'-এর সঙ্গে একটু নতুনত্ব চোখে পড়ে, সেখানে সালেমনের মা' কিংবা 'এক মাঘে শীত যায় না'- এর মতো কবিতা পাঠ্য! সেদিক থেকে বেলুড় বিদ্যামন্দিরের মতো স্বশাসিত কলেজ রেখেছে সুভাষের ঘোষনা', 'যেতে যেতে'-এর মতো কবিতা, তবে নির্দেশ দিয়েছে আবৃত্তির জন্য। সত্যই সুভাষের কবিতার আবৃত্তি অভিজ্ঞতা একেবারেই অন্যান্যদের। তবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে মিল চোখে পড়ার মতো। দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়েই সুভাষের কবিতা পাঠ্য, তবে কবিতা নির্বাচনের ভার শিক্ষকের উপরই ন্যস্ত হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় 'বুড়ি', 'ছুঁয়ে' কবিতাটি। কবি সুভাষের পাশে গদ্যকার সুভাষ নিঃসন্দেহে কম আলোচিত। তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস। রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুভাষে কবিতা পড়ানো হলেও, সুভাষের গদ্যগ্রন্থ্ পাঠ্য হাতে-গোনা প্রতিষ্ঠানে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কথা। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরের প্রথম সেমেস্টারে বাংলা পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে পাঠ্য তালিকায় রাখা হয়েছে সুভাষের আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি।' এই গদ্যরচনা একদিকে সুভাষের অনুবাদ দক্ষতার পরিচয় যেমন তুলে ধরে, তেমনই বাংলা ডায়েরি সাহিত্যের সমৃদ্ধি দান করে। কবি সুভাষ যে কত সুপাঠ্য গদ্য রচনা করতে পারতেন, তার অসাধারণ নমুনা হয়ে ওঠে এই 'আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি'। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি এখানে উঠে আসে ভিন্রাজ্যের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় আসাম-শিলচর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। যেখানে 'যত দূরেই যাই'-কবিতার পাশাপাশি পাঠ্য সুভাষের এক অনবদ্য গদ্যগ্রন্থ-'বাঙালির ইতিহাস।' বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পাঠে অন্যতম সহায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে গ্রন্থটি।

তবে কল্যাণী, কবি নজরুল, সিধু-কানু-বিরসা, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে অবশ্য কবি কিংবা গদ্যকার সুভাষ যে যেমন কোন গুরুত্ব পায়নি। গুরুত্ব দেওয়া হয়নি রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর সিলেবাসেও। সবমিলিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে সুভাষের অবস্থান প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মেলবন্ধনে।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে কবি সুভাষকে যেভাবে ধরা হয়েছে, তাতে কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু-র কথাই সত্য হয়ে ওঠে। 'কালের পুতুল' গ্রন্থে একস্থানে লেখা হয়, 'কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে এখন আমরা খেন আমরা ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁচেছি যখন বাঙালি কবির হাতে ও কবিতা আর শুধুই বীনা হয়ে বাজছে না, অস্ত্র হয়েও ঝলসাচ্ছে।'[৩] 'সে দিনের কবিতা', 'মিছিলের মুখ', 'রোমান্টিক', 'নবযুগের গান'-এর মতো একাধিক কবিতা তার স্বাক্ষর বহন করে। পাশাপাশি অবশ্য 'বধূ', 'সুন্দর' এর মতো কবিতাগুলির কথা আলাদা করে বলা দরকার। নারীত্বের মর্যাদা রক্ষার, স্বামীপ্রেম বঞ্চনার অনবদ্য কবিতা 'বধূ', যেখানে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের 'বধূ' কবিতার একটি ভিন্ন-পাঠের সম্ভবনা ও তৈরি হয়। অন্যদিকে 'ফুল ফুটুকু' কাব্যের 'সুন্দর' প্রেমের, ভালোবাসার কবিতা। সৌন্দর্য উপলব্ধি যে অলৌকিক এই সত্য কবিতাটিকে দার্শনিকতা লাভ করেছে। তেমনই 'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ' কবিতায় ষাটের দশকে কমিউনিস্ট মতাদর্শের স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এখানে সত্য হয়ে ওঠে এক বিশিষ্ট সমালোচকের মূল্যায়ন, 'আসল কথা, সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে জাতের কবি তাঁরা মানুষের চেয়ে কবিতাকে বেশি দাম দিতে নারাজ। কবিতা তাঁদের জীবনোপলব্ধি ঘটানোর উপায় নয়, কবিতা তাঁদের হাতে জীবন প্রতিষ্ঠার অস্ত্র। কবিতা দামি, কিন্তু জীবন তার চেয়েও দামি, এই জাতের কবিদের কাছে।'[৪]

সুভাষের কবিতার আরেক বড় গুণ যে তাঁর অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গি, তাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে স্নাতক-স্নাতকোত্তরের সিলেবাসে। 'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপে যেমন উঠে এসেছে কথোপকথনের নাটকীয় ভঙ্গিমা, 'কাল মধুমাসে'র কিছু কবিতায় রয়েছে ছন্দের বৈচিত্র্য। স্তবক বিন্যাসে, মুখের ভাষার ব্যবহারে ও সুভাষের কবিতা হয়ে ওঠে আকর্ষণীয়। 'আধুনিক বংলা কবিতার রূপরেখা' গ্রন্থের স্রষ্টা তাই যথার্থই লিখেছেন, 'কবিতার আঙ্গিক রচনার সুভাষের কৃতিত্ব স্মরণীয়। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের বৈচিত্র্য তাঁর রচনায় চমৎকার খুলেছে।[৫] লক্ষণীয় বিষয় এই যে সিলেবাসের অন্তর্গত প্রায় সবকটি কবিতাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনে পাওয়া যায়। মূলতঃ 'পদাতিক', 'চিরকূট' 'অগ্নিকোন', 'ফুল ফুটুক', 'যতদূরেই যাই', 'ধর্মের কল'-এর কাব্যগ্রন্থ কবিতাগু নির্বাচিত হয়েছে। 'একবার বিদায় দে, মা', 'ছড়ানো ঘুঁটি', 'এই ভাই' 'জল সইতে', 'চইচই-চইচই'-এর মতো কাব্যগ্রন্থ থেকে সেভাবে কবিতা নির্বাচন করা হয়নি। সামাগ্রিকভাবে বলা যায় আধুনিক বাংলা কবিতার ধারনা নির্মানে, বাংলা কবিতায় সমাজ চেতনার প্রফিলন অনুধাবনে বাংলা ছন্দবৈচিত্র্য সন্ধানে প্রাত্যকের ভাষায় কবিতা রচনা ফলশ্রুতি উপলব্ধিতে কিংবা

বাংলাদেশ ও বাঙালি সংস্কৃতির জ্ঞান অর্জনে সিলেবাসের সুভাষ সিলেবাসের সুভাষ নিঃসন্দেহে একালের স্নাতক-স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রী বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে।

চার.

পড়াশুনার জগতে আমরা প্রায়ই বলে থাকি কিংবা শুনে থাকি, বর্তমান সময় প্রতিযোগিতার সময়। গতানুগতিক ডিগ্রি অর্জনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমরা প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অংশগ্রহণ করে থাকি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নির্ভর সেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সিলেবাসেও সুভাষের উপস্থিতি বেশ উজ্জ্বল। আমাদের রাজ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠসংকলনই সিলেবাস। সেদিক থেকে সুভাষের বেশ কিছু কবিতা, গদ্য-রচনা স্কুল সার্ভিসের জন্য আমাদের পড়তে হয়। তাছাড়া সাহিত্যের ইতিহাস অংশে আলাদা করে কাব্যকবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও পড়তে হয় (যদিও বর্তমান আলোচনায় সাহিত্যের ইতিহাসের সুভাষ নয়, মূলত সুভাষের মৌলিক সৃষ্টির কতখানি সিলেবাসে এসেছে, তা দেকানো হয়েছে)। অন্যদিকে রাজ্য সরকার পরিচালিত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টার কিংবা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগের পরীক্ষা সিলেবাসে সুভাষের ‘পদাতিক’ কাব্যের প্রথম পাঁচটি কবিতা পাঠ্য। কবিতাগুলি হল- ‘সকলের গান’, ‘সেদিনের কবিতা’, ‘কানামাছির গান’, ‘রোমান্টিক’, ‘প্রস্তাব : ১৯৪০’। যার মধ্যে প্রথম দুটি কবিতা প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু জানান, ‘এক-কিবতা দুটি আমার নিজের খুব পছন্দ নয়, কিন্তু এ-দুটি পড়ে মনে হয় যে ‘জনগণের কবি’ হবার প্রায় সমস্ত উপাদান এই তরুণ কবির আছে।’[৬] সমাজ সচেতন কবি সুভাষ বাদ পড়েননি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আয়োজিত জাতীয় পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা পরিচালিত নেট এবং পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন পরিচালিত সেট পরীক্ষার সিলেবাস থেকেও। যেখানে ‘পদাতিক’ থেকে ‘প্রস্তাব : ১৯৪০’, ‘অগ্নিকোণ’ থেকে ‘মিছিলের মুখ’, ‘ফল ফুটুক’ থেকে ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক’, ‘যতদূরেই যাই’ থেকে ‘যেতে যেতে’ ও ‘পাথরের ফুল’ আর ‘কানমধুমাস’ থেকে নাম কবিতাটি অর্থাৎ মোট ছয়টি কবিতা রাখা হয়েছে।

শুরু থেকে শেষ অর্থাৎ প্রাথমিক শিখন থেকে বৃত্তিমুখী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পর্যন্ত সুভাষকে ছাত্র-ছাত্রীদের আবশ্যিকভাবেই পড়তে হয়। সুভাষ তাই কেবল কবিতা প্রেমী সাধারণ পাঠক মনে হয়, একইসঙ্গে উদ্দেশ্যমুখী, পণ্ডিত পাঠক সমাজে ও সমানভাবে সমাদৃত হয়ে চলেছেন। চল্লিশের দশককে সুভাষের সমসাময়িক কালে সেরকম কবি – সিদ্ধেশ্বর সেন, অরুন ভট্টাচার্য, মনীন্দ্র রায়, অরুণকুমার সরকার

লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জনপ্রিয়তায়, গ্রহণযোগ্যতায় একমাত্র নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সুভাষের প্রতিস্পর্ধী বলা চলে। তার কারণ ব্যাখ্যা করে বিশিষ্ট সমালোচক লেখেন, ‘চল্লিশের মোটামুটি সবরকম প্রবণতা, সময়বোধ, বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রাকরণিক মুন্সিয়ানা যে দুজন কবির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কার্যকর হতে দেখেছি আমরা, তাঁা হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।’[৭] আমাদের শিক্ষালয়ে তাই সুভাষ হয়ে ওঠেন এক উজ্জ্বল শিখা। তবে একথা স্বীকার্য যে, কবি সুভাষ যতখানি সেকানে গুরুত্বের দাবিদার হয়েছে, ততখানি গদ্যকার সুভাষ বসু। তাই বলে আমরা সুভাষের গ্রহণ-বর্জনের পুনর্বিন্যাসের দাবি তুলে এমন মন্তব্য করতে চাই না, ‘সুতরাং নাট্য পাঠ্যক্রমের একঘেয়েমি দূর করতে  পাঠ্যক্রমে সামঞ্জস্য, আধুনিকতা ও গতি আনতে, নাটকের প্রতি শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত্য করতে, থিয়েটার সম্পর্কে তাদের বিশদ জানাতে নাট্যপাঠ্যক্রমকে ঢেলে সাজানো দরকার।’[৮] সুভাষের কবিতার ঢেলে সাজানো নয়, আমরা কেবল এইটুকু দাবি তুলতে চাই মানুষটি ‘আমার বাংলা’, ‘যখন যেখানে’, ‘ডাকবাংলার ডায়েরি’, ‘নারদের ডায়েরি’, ‘ক্ষমা নেই’, ‘আবার ডাকবাংলোর ডাকে’-র মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গদ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁর গদ্য রচনার উপরও আমাদের দৃষ্টিদান আবশ্যক। আমাদের শিক্ষালয়ে, আমাদের সিলেবাসে যে সত্য শেষ পর্যন্ত জোরালো হয়ে ওঠে, তা হল সাহিত্য শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায় ‘মরা ডালে ফুল ফোটানোর যে রাস্তা’ দেখিয়ে গিয়েছেন, শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েও তা ফুরিয়ে যায়নি, ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যায়নি। বিশেষতঃ আজ যখন দিকে দিকে রাজনৈতিক সচেতনতার বাতাবরণ, রাজনৈতিক বিশ্বাস-মতাদর্শাগত বিচার সবকিছুতে গুরুত্ব লাভ করে। ঠিক সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একজন ‘বামপন্থী’ তকমা পাওয়া কবি সুভাষ যেভাবে এই ‘অ-বামপন্থী’ যুগে আমাদের শিক্ষা জগতে ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছেন, তা সত্যই আমাদের মুগ্ধ করে। আসল কথা, শিল্পের দাবি সহজে ফুরিয়ে যায় না। কবি সুভাষের এই প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত শাশ্বত রূপ লাভ করে – ‘নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালোকথা। একটি কবিতা লেকা হয় তার জন্য।’

**তথ্যসূত্র :**

১. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ‘গদ্য সংগ্রহ’ সুবীর রায়চৌধুরী ও অমিয় দেব সম্পা. প্রণব বিশ্বাস কৃত গ্রন্থ পরিচয় অংশ, দে’জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৭, পৃ. ৫৭৯।

২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ‘গদ্য সংগ্রহ’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

৩. বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, তৃতীয় সং, মে ১৯৯৭, পৃ. ৮২।

৪. অশ্রুকুার সিকদার, 'আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়' অরুণা প্রকাশনী', মাঘ, ১৪১৯, পৃ. ২৫০।

৫. ড. অশোককুমার মিত্র, 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা' (১৯০১-২০০৮), দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সং জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২৭২।

৬. বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

৭. সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, 'চল্লিশের কবিতা : একটি পুনর্মূল্যায়িত প্রেক্ষিত', কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদীয় ২০১৫, পৃ. ৪৫।

৮. অপূর্ব দে, 'নাট্যসাহিত্য নাট্যব্যক্তিত্ব', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২, পৃ. ১১৪

# The physical and scientific interpretation of 'AZU' and the awareness of the Muslim people in India: A case study of West Bengal

Md. Rabiul Mallick
Research Scholar, Department of History, CMJ University, Jorabat, Meghalaya, India.
Deben Ch. Kalita
Former Associate Professor, Department of History, Morigaon College, Morigaon, Assam, India

**Abstract**
'Azu' is a religious act by which one can help control one's mind, emotions, and attitudes, and is thought to be able to provide a positive effect on the psychophysiology of the individual. Not only that, the mental revolution can help build a healthy society by making the Muslim community of West Bengal developed and prosperous. The main objective of the study is to eradicate the superstitious and conservative mentality of the Muslim community in West Bengal and to build a self-reliant, developed, and progressive society through awareness of the religious, social, physical, and scientific interpretation of their religious provision for recent social and political conditions. This can be said through quantitative research on the subject and by talking to 117 men and women from all walks of life in the Muslim community of West Bengal, although most of the Muslim communities living in the state are aware of the religious rituals and observed, most of the Muslim people are not aware of the scientific explanation. As a result, this article discusses the scientific and physical benefits of the religious practices of the Muslim community in 'Azu' and how much the Muslim people of the state are aware of this.
**Keyword**- Muslim community, awareness, scientific interpretation, conservative, religious fundamentalism.

**Introduction**

India is the second-largest Muslim country in the world and about 27% of the population in West Bengal is Muslim[1]. As India is a secular state, the Muslim community here observes all their religious rites with religious fervor. The Muslim community in this state is aware that 'Azu' is a religious provision and every Muslim who performs prayers performs Azu five times a day[2]. Also, ablution is done before going to any religious place or reading scriptures[3]. So the extensive knowledge of the Muslim community in West Bengal about ablution can be helpful for the character, mental, and physical development of

the present and future generations of the entire Muslim community[4]. But this Azu is just a religious order to the majority of the Muslim people, but the Muslim people are not aware of the physical, scientific, social, and psychological benefits of this religious order. Not only is that in the age of education and science in the evolutionary society, but most of the Muslim community is also bound by the shackles of superstitious conservatism. And the main obstacle to the development of scientific consciousness is religious fundamentalism.

Because of the recent social and political situation, it is essential to be aware of the full interpretation of religious rituals to maintain their existence. Even in the age of science and technology in the evolving society, the majority of the Muslim community is bound by religious orthodoxy, conservatism, and superstition, which is a major obstacle to the progress, well-being, and development of the Muslim community in West Bengal. Azu is a very important provision of the Muslim community and through the observance of this provision; more than one physical and mental disorder is removed. Through the development of this social and religious awareness can help the Muslim community in West Bengal to lead a healthy and normal life.

Although the Muslim community has lived in West Bengal since the sixteenth century[5], it still lags in many areas, including development and education. And one of the reasons for this backwardness is the orthodoxy of religious and conservative mentality. It is very difficult to eradicate such mentality of the Muslim community in West Bengal because the main obstacle to the development of the community and the development of scientific consciousness is religious fundamentalism. Also, the intellectuals and scholars of the community are indifferent to the question of development and awareness of the community. Although religious education is taught in some public and private madrassas, the observance of religious provisions does not provide a social and scientific explanation. Various Muslim committees, government minority departments, or madrasa education departments are indifferent in this regard.

Through the search for public awareness of the religious, physical, and scientific aspects of 'Azu' among the religious practices of the Muslim community, it can be said that the Muslim community in West Bengal can solve this problem even if it is difficult. The government should provide religious education in public and private madrasas through the department of minority development and the madrasa education department, as well as the complete interpretation

of religious provisions. The scientific and physical benefits of religious provisions should be made public through awareness camps to eradicate conservatism and superstition in various Muslim-dominated areas of the state. And these Muslim intellectuals and religious scholars should come forward and take responsibility for the development of the community. The emergence of a consciousness of a complete religious and scientific interpretation of religious provisions may result in the liberation of the community from the influence of religious fundamentalism.

Among the rituals observed in Islam, 'Azu' is performed by the Muslim community in all countries of the world with religious ideology. On the other hand, research on this subject is very important for researchers. Azu has been studied by several researchers from all over the world. Dian Cita Sari says in his research journal 'Wudhu as a succession of mental revolution for the future generation' through Azu, educators can inculcate multifaceted values in both physical and mental health as a legacy of future Muslim character, education, and mental revolution. Sarifa Mostafa M Sabra his 'Ablution (wudu) health benefits through comparison nagal cavity bacterial content with the gold standard at high altitude area' has proven in the journal that performing ablutions ensures protection against bacterial infectious diseases and their bacterial causes. Mohd Annar Awang Idris, Muhammad Nubli Abdul Wahab, Nora Yusma Mohamed Yusoff the main goal of their research journal, ‘The significant effect of wudu and zikr in the controlling of emotional pressure using biofeedback emwave technique’, is to determine the effects of wudu and zikr therapy using biofeedback emwave applications and technology. Wudu and zikr are spiritual practices that can help a person control their mind, emotions, and attitudes. Adnan Sukkarwalla, Salima Mehboob Ali, Prance Lundberg, and Farzeen Tanwir said in their study called ‘Efficacy of miswak on oral pathogens’, the effectiveness of miswak in suppressing oral pathogens including fungi as well as cariogenic, periodontal and endodontic bacteria by performing miswak before completing Azu is included. In addition to the above studies, several studies are focusing on Azu. But the region has not gained much importance in terms of religious and social awareness by freeing the Muslim community from the shackles of religious superstition and conservatism. Therefore, this research paper has been reviewed separately to raise awareness of the Muslim community in West Bengal.

**Methodology**

This is an exploratory study on the scientific, physical, mental, and social awareness of the observance of the religious observances of the Muslim community living in West Bengal and the actual position of the community members, with the main aim of studying every condition of one of the religious provisions of the Muslim community. The information has been given more importance in this study, where the collection of information on the scientific basis of Azu through grassroots analysis and on the other hand the awareness of the Muslim community on this issue and the effective role of the community's intellectuals and religious scholars have been discussed.

**Analysis**

Imperfection, inconsistencies, and inaccuracies in the data have been identified through the careful analysis of each piece of information in this research and through meeting and conversations with all classes of Muslim member from different district of the state, mistakes have been identified and corrected through multiple literary and research journal on the subject. In this process, data is first analyzed and followed by data analyzed by social science software. It is then included in the report through tables, graphs, and charts.

**Social and scientific interpretation of 'Azu'**

'Azu' is a very obligatory duty for all people of Islam. The second important pillar of the five pillars of Islam is Namaz or Salat[6]. And it is not possible to perform these prayers until the ablution is completed. So it is not possible to perform prayers or any kind of religious work without ablution.

According to Islamic law, the rule for performing Azu is as follows, wash the face with clean and holy water, up to the elbows of both hands, up to the ankles of the two feet and massage one-fourth of the head with wet hands, that means washing each limb well three times during Azu[7]. The Prophet Hazrat Muhammad (peace be upon him) said about this purity and cleanliness, "Cleanliness is half of religion"[8].

Azu Step

Scientists and physicians around the world have researched Azu, and discuss the multiple physical benefits of Azu. We know that vegetables and fruits should be eaten to maintain good health and maintain the brightness of the face[9]. But physicians have come up with a different way of retaining the brightness of the face. Ladybichar, an important member of the American Council for Beauty, has

discovered amazing and wonderful information. According to him, there is no need for a separate medicated lotion for members of the Muslim community. Because according to the religion of Islam, if a person completes Azu according to the religious rules, they get rid of many diseases[10].

The people of Islam have to wash their hands thoroughly while doing the Azu. The various types of chemicals and germs in the hand are cleansed by washing hands. As a result, the skin gets rid of various diseases like itching, eczema, etc[11]. After washing hands and legs they have to wash the nose and mouth with water. Then they massage the neck and head with wet hands and also clean the ears with water[12]. Muslim people are cleansed of their diseases by being bound by religious rules, whether they knowingly or unknowingly get rid of various diseases of their bodies. While cleaning the mouth with water during Azu, the teeth and germs become clean. The result is relief from fungal infections, swelling of the mouth, dental problems. Humans need oxygen for survival and this oxygen is consumed by the nose[13]. With the nose, we breathe daily and as a result, the air enters the nose with dust and germs but they are trapped in the hairs of the nose[14]. By doing Azu, the dirt cleanses and keeps the body safe[15].

Islamic law, there is a tradition of Miswak besides Azu. The Miswak tradition has many religious and physical benefits with this method the teeth get rid of multiple diseases. “By this method, the memory is increased, the headache goes away, and the rugs in the head are calm. It removes mucus, sharpens eyesight, and increases the digestive power of the stomach, increases fertility and conscience. Old age comes late and the back muscles tighten”[16]. Hazrat Muhammad, the founder of Islamic used to do Miswak when he woke up[17]. According to experts, 40% of the body’s disease is from the stomach and dental germs[18]. Typically, germs are caused by unclean teeth. Then they enter the stomach and cause various diseases. According to doctors, if a person does Miswak properly, it is possible to fix his dental problems, gums problems, and stomach problems[19]. According to doctors, hot foods and stomach acids often cause blisters in the gum. Various types of germs spread from this disease. To solve this problem, one needs to do Miswak with fresh Miswak and store the saliva in the mouth for a while[20]. This is how many patients get well.

Frustration has recently been one of the major problems in the west. As a result, the number of psychiatric patients is increasing day by day. A diploma holder physiotherapist in West Germany has discussed in a seminar titled; ‘ways to treat mental illness’. A

psychiatrist discusses one of the wonderful facts in his article. He says, he advised some mental patients to wash hands, mouth, shoulders five times daily and noticed a strange change in them a few days later[21]. He then gave this advice to patients with mental illness. He mentioned in the conclusion of this article that the number of people suffering from depression is less in the Muslim community. Because they complete Azu i.e. washing hands, feet, and face five times before completing Namaz. Not only this, a cardiologist strongly demanded that the blood pressure test must be lowered after washing the hands, feet, and face of the patient[22,23].

Therefore, based on the above discussion and research on this matter, it can be said that according to the rules of Shariah in Islam, the body can be healthy and free of germs. And by adopting this method, keeping the body free from disease, the firmness of the mind, the freshness of the body, the brightness of the face is maintained and the peace of mind is achieved. 02 crores 46 lakhs 53 thousand Muslim people living in West Bengal are aware of this religious tradition and complete Azu with utmost religious sentiments. About approx 15% of the Muslim community in Midnapore district i.e. 36 lakhs 97 thousand 950 people did not know how to complete Azu, again approx 85% of the 02 crores 09 lakhs 55 thousand 50 people who know to complete Azu. Again, out of 02 crores 09 lakhs 55 thousand 50 Muslims who know how to perform ablutions, about approx 25% i.e. 52 lakhs 38 thousand 762 peoples are aware of the scientific explanation of ablutions and physical benefits of Azu. On the other hand, 75% i.e. 01 crores 57 lakhs 16 thousand 288 Muslim people are not aware of the scientific explanation of Azu. That is, most of the Muslim people in the state perform ablutions as a religious provision.

**Figure: 1. The status of the people who know how to complete Azu**

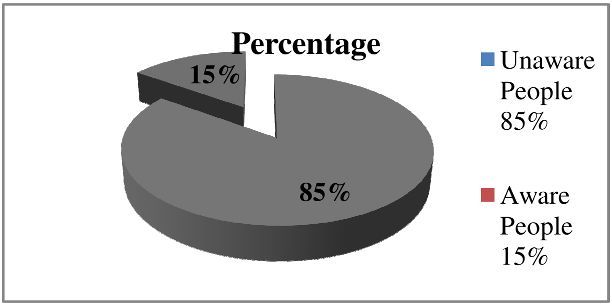


**Figure: 2. Status of Muslim people's about the scientific and physical benefits of 'Azu'**

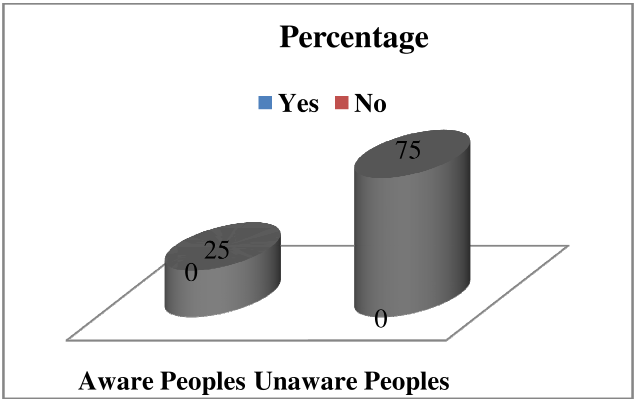


**Conclusion**

The main purpose of this research is to raise the religious and social awareness of the Muslim community by eradicating social and religious prejudices and conservative mentality to formulate the real truth of the social and religious practices of the Muslim community in the scientific and technological social system. The conservative mentality of the community, social education, the influence of fundamentalists, the reluctance of intellectuals and religious scholars to take social responsibility, and above all the indifference of various social welfare departments and the government is largely due to the search for awareness of the Muslim people of West Bengal about the scientific, physical and social benefits of Islam. Multiple texts, research papers, and conversations with people from all sections of society of the Muslim community have contributed to this research.

- "Education brings consciousness, consciousness brings revolution", this famous saying is very applicable to the present Muslim society. Because revolution is necessary for the question of conservatism and religious awareness of the Muslim society. And this revolution will take place only when the consciousness of the members of the Muslim community develops. Education is required for the development of consciousness. As a result, superstition, religious orthodoxy, and conservative mentality can be noticed among the majority members of the Muslim community in this district for this reason, despite the scientific and social significance of religious rules, most Muslims are not aware of them.
- The Muslim community of this district has been observing their religious rites with their religious ideology since about the sixteen

century. Not only that, after nearly 1400 years of Islam, the recent era of science and technology and even the impact of globalization has not changed this religious ideology. As a result, although the Muslim community in the district is aware of the religious rules they follow; most people are unaware of the social, physical, and scientific significance of following them.

- ❖ The Qur'an is a holy book for the followers of Islam. And above all, it is a complete provision for the life of the Muslim community. The guidelines for living in this book are enough to build a beautiful, healthy, normal, and prosperous society. But most of the Muslim people in the district carry the Qur'an only as a Holy Scripture. And did not accept it as one of the guides of society and life.
- ❖ Maintaining religious existence and social respect is a big challenge in terms of recent social and political conditions. In this situation, social and religious awareness is desirable. But a group of religious fundamentalists in the society becomes an obstacle to the progress of Muslim society for their self-interest. As a result, most of the Muslim community is bound by the shackles of superstition and conservatism.
- ❖ Intellectuals and religious scholars of Muslim society, those who specialize in social and religious literary education and embellished various positions of society, but the members of the community introduced a selfish mentality in the question of conservatism and awareness of the social, scientific, and physical benefits of religious provision. Not only that, 'it is better to protect personal interests than to protect overall interests', most of the people who are immersed in this mantra think it is always right to distance themselves from the social duty and responsibility of informing the members of the community about the usefulness of the advice of 'Qur'an' and 'Hadith' in preventing the disability of the Muslim community and making the Muslim community self-reliant.
- ❖ Islamic scriptures are taught in government and private madrasas in the Midnapore district. Although religious education and religious provisions are taught in all these madrasas, they are not informed about the social, physical, and scientific interpretations of these religious teachings and provisions. As a result, for all these students, the Qur'an is only a sacred scripture.

## References

1. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. Ministry of Home Affairs, Government of India. https://www.census2011.co.in/census/state/west+bengal.html

2. Mandy, Barrow. Information on Islam. World religions. http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/religion/Islam.htm
3. Glasse, Cyril (2001). The New Encyclopedia of Islam. Altmira Press. Page: 477.
4. Idris, Mohd Anuar Awang; Wahab, Muhammad Nubli Abdul; Yusoff , Nora Yusma Mohamed (2017). 'The Significant Effect of Wudu' and Zikr in the Controlling of Emotional Pressure Using Biofeedback Emwave Technique'. International Journal of Psychological and Behavioral Sciences. Vol:11, No:4.
5. Official website of Paschim Medinipur, Government of West Bengal. https://web.archive.org/web/20160903121113/http://www.paschimmedinipur.gov.in/node/27
6. Schimmel, Annemarie; Mahdi, S. Muhsin; Rahman, Fazlur; 'Islam-Prayer'. Religion. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/Islam
7. The Amazing and Surprising Physical Benefits of Wudu. December 7, 2016. https://quranschool.com/the-amazing-and-surprising-physical-benefits-of-wudu/
8. Ali Zai, Hafiz Abu Tahir Zubair (Arabic to English Translator). 1st January 2007. Sahih Muslim. Volume: 7
9. Jo Lewin. Eat your way to fabulous skin. Good food. BBC. https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/eat-your-way-fabulous-skin
10. Islam Rafikul (October 2013). Poribesh O Sastho Biggane Muhammad (PBUH). Page No: 112. https://www.quraneralo.com/role-of-muhammad-pbuh-in-health-and-social-science/
11. Razavi, Muhammad Ilyas Attar Qadiri. 'Wudu and Science'. Dawat-e-Islami. https://www.slideshare.net/Heavenlygates/wudu-and-science-86886565
12. My Religion Islam. Performing Wudu' Well. http://www.myreligionislam.com/detail.asp?Aid=6071
13. Ortiz Prado, Esteban; Dunn, Jeff F; Vasconez, Jorge; Castillo, Diana, and Viscor, Gines (February 15, 2019). 'Partial pressure of oxygen in the human body: a general review'. American Journal of Blood Research. Volume: 9. Issue: 1. Page: 1-14. PMCID: PMC6420699. PMID: 30899601. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6420699/
14. Tu, Jiyuan; Inthavong, Kiao; Ahmadi, Goodarz (January 2013). The Human Respiratory System. DOI: 10.1007/978-94-007-4488-2_2.

https://www.researchgate.net/publication/278719512_The_Human_Respiratory_System
15. Qazi, Moin (October 4, 2019). 'Mystic Mantra: Wudu in Islam cleanses mind, body & soul'. https://www.deccanchronicle.com/opinion/op-ed/041019/mystic-mantra-wudu-in-islamcleanses-mind-body-soul.html
16. Tahtavi, Hashiyatut. Al Maraqil Falah, Page No: 68
17. Abu Dawud, 1st volume, Page No: 54. Hadith: 57.
18. Barker, Joanne. 'Oral Health: The Mouth-Body Connection'. https://www.webmd.com/oralhealth/features/oral-health-the-mouth-body-connection#1
19. Sukkarwalla, Adnan; Ali, Salima Mehboob; Lundberg, Pranee and Tanwir, Farzeen (May-Jun 2013). Efficacy of Miswak on Oral Pathogens. Dental Research Journal. Volume:10. Issue:3. Page: 314–320. doi: 10.4103/1735-3327.115138. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3760353/
20. Krishnan, Vidya; Lakshmi, T; Rajendran, R and Madhusudhanan, N (January-June 2015). 'Azadirachta indica: A herbal panacea in dentistry – An update'. Volume: 9. Issue: 17. Page No: 41-44. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4441161/
21. Harnois , Gaston; Gabriel, Phyllis (2000). 'Mental health and work: Impact, issues, and good practices'. Nations for mental health. World Health Organization. ISBN: 9241590378.
22. Azu, Azu, and Science - Benefits of Azu. http://www.madina786.com/tag/উযূ/
23. Islam, Rafikul (October 2013). 'Poribesh O Sastho Biggane Muhammad (PBUH)'. Page No: 113. https://www.quraneralo.com/role-of-muhammad-pbuh-in-health-and-social-science/

# CONSTRUCTION OF GENDER IDENTITY AND GENDER TROUBLE IN NAGARKIRTAN AND SAMANTARAL

Amiya Mondal
M.Ed, Ramakrishna Mission
Sikshanamandira, Belur Math,
Howrah, West Bengal

**Abstruct**: The construction of gender identity and its troubles are very exclusively shown in two recent Tollywood movies- Nagarkirtan and Samantaral, and both these movies raise a lot of questions regarding the base of gender construction and the society's stereotypical demands of performing gender role. The intervane of Judith Butler, in the ongoing discussion of sex and gender, is a revolution in the bulk of gender studies. The fictitious nature of gender dismisses the so-called sex and gender discourse because of high tensed gender sensitisation in the present time academic atmosphere. With the arrival of transbody into the gender discourse, the idea of stable body, the idea of sex-gender-desire and reproductive role undergo a huge change from the earlier concepts. Samantaral and Nagarkirtan are very important two movies that show the gender construction of the patriarchal society, and its trouble in the society. The construction of gender is not only dependent on sex and sexuality, but on race, class, caste and many other variables.These two films show how society's demand creates misfortunes in the lives of Puti(Parimal) and Sujan when both of them try to live in their own ways.
**key words:** Sex, Gender, Desire, Stability, Transbody, Fictionality of Gender.

The construction of gender by the patriarchal society develops through the binary of stability and unstability, and upon the material value of body and biological reproductive role. The problems that are created in our society regarding sex and gender, are because of the lack of gender sensitisation. Patriarchal society will face blow if everyone is gender sensitised from the time of birth, though it makes the idea of stable society unstable.

We all are very happy with our stable job, stable income, stable relationship in the society, and we expect to add this stability with some thing that is material in nature. The antique nature of any goods is wanted by all. Every human being tries to possess antique things because they think that it gives a sense of stability both in the eyes of society and the self. Similarly, society expects stability of gender role.

Gender is stabilized at the material level of the body. Pari (Riddhi Sen), a woman trapped in a male body, of Kaushik Ganguly's Nagarkirtan, tries to live in her own way, though her father does not want her to play the role of woman and tries to treat Pari as Parimal, a male one. The idea of stability in the society is challenged as Pari loves her tutuion teacher Subhasda (Indrasish Roy). Parimal later runs away from his house and joins a group of eunuchs as Puti.Puti falls in love with Madhu (Ritwik Chakraborty) and Puti completely submits herself to Madhu. The love story of a man with another man ( as society marks Parimal on the basis of what hanging between his two legs) begins to run. Puti visits Manabi Bondyopadhaya, the first intersex person in India who has completed Doctor of Philosophy Degree and now working as a principal in a college. Puti tries to change herself completely into a complete woman through sex reassigned surgery, in order to marry Madhu. But puti is finally discovered as a person with a penis. Puti's disguise as eunuch is also revealed to all. And finally Puti commits suicide. But the irony is that Madhu joins the same group as eunuch.

On the other hand, in Partha Chakraborty's Samantaral, Sujan ( Parambrata Chatterjee) is a transgender by birth. But his father (Soumitra Chatterjee) tries to show him as male one. Finally, Sujan also commits suicide and donates his eyes to his brother. Though, He is not accepted in the family as he is by birth, his eyes perfectly suit in his brother's body.

So, patriarchy that considers sex as biological and body as stable, is radically challenged both by Puti's submission like a woman to Madhu, and Sujan's body parts in his brother's body. Gender is stabilised at the material level of the body and it is thought by the patriarchal society that as body is stable, all the body parts are so. The foundationalist value of body, thus, is used as a base on which various superstructures in the name of class, caste, religion etc. are to be set up easily. According to Society's norms, if body is stable all the parts are the same. But, in Samantaral, Sujan's eyes are transferred to his brother. A transgender's body parts are set up in a male body. So, where is the stability of the body parts when the body is regarded as stable? Now it can be said that body is constantly changing, as well as the body parts. Thus, the stability of the body, made by patriarchy, is subverted by Sujan's body parts.

According to patriarchy, we are born with biological sex- as male or female. Feminism also says that sex is biological and gender is social, and thus socially constructed. But this is challenged radically in 1990s, particularly by Judith Butler, who says that biological sex

and socially constructed gender do not make any sense. Butler talks about 'desire' and 'sexuality'. According to patriarchal society, sexuality comes first and then gender and at last desire because we ask for a male or female partner for reproduction. But, Judith Butler says that it is the desire which comes first, then comes gender and at last sex because biological sex is necessary only if we want reproduction i.e. heterosexuality. As a child is born, patriarchy identifies it not by it face or colour but by what is between its two legs. So the genitalia is considered as material, and after the confirmation of gender, patriarchy hopes that the child will participate in reproduction in near future, and sex is constructed in retro-actively, and to fulfil the aim of hetero-sexuality, gender is constructed on 'biological sex'. In this way, Parimal is expected to perform his social role as male. His inner voice is completely suppressed and finally he runs away from his family after facing betrayal from Subhasda. But in case of Sujan, his father snatches his biological identity. He is forced to perform the role of a man. He tries to touch female body to identify his another self. Here, patriarchy completely neglects its own dictum regarding male or female on the biological level. But the stark irony is that, the society that was not ready to accept his real presence, is now accepting his body parts shamelessly, after his death.

Actually, there is nothing as biological sex. Patriarchy regards penis as male sexual organ and vagina as female. But this notion is proved wrong with the arrival of the trans-body into gender studies. A unique couple of Ecuador came up in 2013 with a unique pregnancy. The father was carrying the child in his womb, after having sexual intercourse with his wife who had a penis. The trans-woman considered herself a complete woman though he had the penis. The trans-man also had undergone therapies though still retained the womb. Now no body can violate their right of self determination. So, both the penis and vagina are still sexual organs but do not have sex. Thus, penis is neither male nor female, and sex is not biological but a social construction to help a certain construction of gender which is based supposedly on a stable body. Now, as body is not stable, therefore, sexual desire is not. So, if biological sex doesn't exist, gender as a material does not exist, and gender becomes a fiction.

In case of Parimal, he completely neglects society's demand, though has a penis, and tries to undergo a change as Puti to prove that body is not stable, which has already been proved by Manabi Bondyopadhaya. Puti makes every one fool by making false breasts and long hair, and everyone in Madhu's family is ready to accept her as a woman until her disguise has not been revealed to everyone.

Similarly, Everyone accepts Sujan as a male one seeing his social role, though he is actually a transgender that is clearly known by his father. As his real identity is exposed to Arko, his self created and real identity faces troubles, and he commits suicide. His father was ashamed to express his identity but atlast has to accept his donated eyes for his another son. So, body as stable becomes futile and it becomes unstable, similarly the body parts also.

**Conclusion:** So, all the troubles created in the lives of Puti and Sujan are really hypocritical treatment of the transphobic society. The lack of gender sensitisation leads them towards their ultimate tragedy. Again, gender is not only constructed along the lines of sex and sexuality. There are many other factors that are to be taken into account. Colonizers treat colonized body as feminised. Dominant culture, religion, population also treat the weaker as feminised and object, while the subject claims masculinity. So, Samantaral and Nagarkirtan are two important movies that give blow to the existing social binaries of male - female, man - woman, and stability and unstability of the body.

**References:**

1. Butler, j.(1990). Gender Truuble:Feminism and subversion of Identity. 11 New Fetter Lane, Londaon: Routeledge.
2. Carter, R.& Macrae, J. (2017) The Routeledge History of Literature in English. London and Mew York: Routeledge.
3. Sanders, A.(2005). The Short Oxford History of English Literature. New Delhi: Oxford University Press.
4. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01965 /full
5. https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-native-american-
6. literature/women-writers-and-gender-issues/1CF90672E857BCAF233269393BD6BC
7. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gender_inequality
8. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nagarkirtan
9. https://www.google.com/amp/m.timesofindia.com/entertainment /bengali/movie reviews/nagarkirtan/amp_ movie_review/68096801. cms
10. https://inbreakthrough.org/nagarkirtan-film-review/
11. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Samantaral

12. https://m.timesofindia.com/entertainment/bengali/movie-reviews/samantaral/movie-review/61913527.cms
13. https://m.imdb.com/title/tt7746986/plotsummary
14. https://m.timesofindia.com/world/rest-of-world/Ecuadorian-couple-to-become-first-transgender-parents-in-S-America/articleshow/50329191.cms
15. https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/article/lifestyle/life-style/ecuador-trans-couple-becomes-the-first-to-give-birth-to-a-baby-3054368/lite/

# A Study of Madhesis in Nepal

Sarbari Dey Sarkar
Haringhata Mahavidyalaya
Department of History

**Abstract:**
This paper attempts to capture the rise of Madhesi nationalism both in historical context and contemporary politics. Madhesh is synonym of Tarai, referring to a narrow strip running along the southern border of Nepal with India. The term , Madhesi people is often given to people residing in Terai region of Nepal and comprises various caste groups such as Brahmins and Dalits as well as other ethnic groups. Over the years, Madhesis have suffered from a sense of discrimination and consequent deprivation. They also feel exploited and discriminated against by the Nepali state due to the following factors. While the mainstream Madhesi parties have adopted a soft stand on the issue , the armed groups are demanding outright 'independence'.
**Key words:** Madhesh, Madhesi People, Madhesi Groups, Political Parties, Madhesi Movement etc.

**Introduction :**

The end of World War II marked the advent of ethnic disputes in the world. The explicit wars for territory converted into implicit wars for identity and recognition. This thesis embarks on a study of the underlying factors that resulted in ethnic disputes in Nepal with a focus on the *Madhesis* (people from the plains of Nepal). In this context, it is important to carve out here the framework or structure of Nepal to explain the present day ethnic conflict between the *Madheshi* (terai people) and the *Pahadi* (hill dwellers). The emergence of ethnic demands in the Terai was initially witnessed during 1950's. The King's coup in 1960 sabotaged this demand and it was further impaired in 1990 with the restoration of multi party democracy. However with the institution of an interim government in 2006 ethnic demands came to the forefront.[1]

Modern Nepal is the superstructure built upon a small central Himalayan principality *Gorkha* that dramatically expanded during the eighteenth century, along the northern frontiers of the Indian states of Bengal, Bihar and Awadh up to the snow clad slopes of the Himalayas. According to the Mahabharata, Puranas , Buddhist and Jain scriptures Nepal had an independent , political and territorial identity. The first *Gorkha* King was crowned as late as 1559 A.D.[2] The Nepali Kingdom limited within the boundaries of hills began to expand under Prithvi Narayan Shah since 1769 and the annexation of

Terai was a part of this venture. Terai was treated more like a colony during the rule Prithvi Narayan.[3]

**Research Questions:**

Through this research there is the upholding of the history and the struggles of this particular group, whose mention have never really come on to the pages of Nepal's history. Presently a lot of political discussions mention them but who are these people actually? What history do they comprise of? Why are they considered Indians and are not given the recognition of a Nepali would be the areas of discussion.

**Research Methodology:**

The research is mainly based on empirical data. Due to scanty primary sources, extensive field survey through interviewing the local people had been undertaken in the Terai region of Nepal. I have mainly interviewed the local Madheshi people and some of the important local leaders in the two localities of Birgunj and Kathmandu in Nepal and had also worked in some of the important libraries like Thakur Ram Bahumukhi College , Library , Birgunj , Nepal, Tribhuvan University Library, Kathmandu and Martin Chauthari Library, Kathmandu for getting primary document. Apart from that, various contemporary newspapers, articles, journals, and online sources available especially documentaries, reports and also some of the Hindi literary sources had been extensively used in the thesis. A lot of secondary and primary books have been gathered from the National Library, Kolkata, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi, Central Library, Rabindra Bharati University.

**Formation of Ethnic Identity in the Terai**

The bulk of authentic and documentary history of Nepal from the ancient times largely pertains to Tarai also known as Madhesh. The term *terai* and *Madhesh* are often used interchangeably. However Terai refers to the flat plain region south of Siwalik , Madhesh derived from Sanskrit Madhyadesh basically means a country stretching between Himalayas in the north and Vindhyas in the south. The inhabitants of this region are called Madhesis who were opposed to the *Pahadiya* or the hill tribes.[4]

Madhesh or Terai has a rich socio- cultural history. The Madheshi culture is one of the oldest culture's in the world. According to the Ramayana, the ruler of Mithila, king Janak a Madheshi had established the Kingdom of Mithila with its capital in present day Janakpur long before the Shah rulers had even entered Nepal. Mostly the Madheshis are related by marriage to Indians across the border. Generally people speaking Maithili, Bhojpuri and Hindi used to resemble Indians in appearance are considered as Madhesis. Their

traditional man used to wear *dhoti* and *kurta* and women dress are *sarees* and blouse.[5]

Due to its cultural and linguistic diversity, there are festivals on various occasions among the Madheshis all throughout the year .The important ones include *Makar Sankranti* which marks the change of season and is celebrated in January where people offer rituals in the fire and eat *gur, til*, and *ghee* along with *kichadi; holi,* where colors are thrown on each other and the festivals is rejoiced. Sweets, meat and *bhang* are taken along with the beating of drums and singing; *Jurshital,* marking the beginning of New Year in spring season. Celebrations include elders sprinkling water on youngsters, pouring water into the roots of mango trees and also throwing mud on one another; *chaurchan*, a corrupted form of the *chauth chandra* where people worship the moon god and offer him various sweets. Durga puja, the most important festival in the entire country. The idols of the goddess are made in the villages and towns and carried on for ten days. The last day of the celebration also marks the victory of Ram over the demon king *Ravana*; *Dipawali* is the festival of light. It is also called Lakshmi Puja or *Sukha Ratri* where the goddess Lakshmi is worshipped houses and surroundings are cleaned and lights are used for decorations; *Jitiah* is celebrated by the Madhesi women to pray for the linearity of the children. It includes day long fasting; *chhaith* is another important festival. It includes the prayers to Lord Surya and the setting sun is worshipped. Various food items are offered to ponds and rivers in the morning and evening; *Sama-chakewa* is mainly the festival of the Mithila region of Nepal. Colorful toys and figures are made by the ladies with day; jute and *Siki* that marks the victory of good over evil; *Eid* and *Muharram* are the festivals of the Muslim community, who are also joined by the Hindus during *Tajia.*[6]

Madhesh is geographically and culturally a transitional region between the hills and the plains. The plains features predominate but the hill features make their impact. It consists of flat plains and is the agricultural backbone of the country. It has fertile lands, hot climate and rainfall that is suitable for growing crops throughout the year.[7] The Tarai is important to Nepal, because it generates more than half of the nation’s gross national product, and the government obtains 76 percent of its revenue from agriculture and industrial productivity in the region.[8]

Nepal is the only official Hindu country in the world with more than ninety percent of its population following the Hindu religion. [9]The process of *Hinduization* however started during the nineteenth and the twentieth century’s. According to Gerard Toffin, it can be called a

process of *Nepalization,* since the state backed Hinduism became the pillar of the Himalayan Kingdom.[10] It was the Shah rulers of Nepal enforced with vigor the traditional features of the Hindu polity as part of ruling value system. Thus since the days of the Shah rulers, the process of *Hinduization* was set into motion. The Rana period also engaged kingship and Hindu religion to further strengthen Nepali state and its identity.[11]

Nepal's population comprises more than thirty five castes groups, twenty five ethnic nationalities, ten dalit communities and other religious minorities. Maithili, Bhojpuri, Awadhi, Tharu and similar languages are spoken across the region. People residing in Nepal Tarai are Madhesis, whose culture is distinct from the hill culture.[12] The Terai area of Nepal, has its own share of multiple, ethnic , linguistic , religious and cultural groups of people. Among them, the Tharus are numerically the largest and historically the oldest indigenous people of the area.

The Gorkha ruler's policy on encouraging new settlements in Terai ever since its unification ( in 1768) and later on followed by the Ranas during their rule till 1950, had greatly influenced the demography of Nepal. The beginning of settlement of people of Indian origin is thus inseparably linked with the history of settlements in Terai.[13] The Nepali Kingdom limited within the boundaries of hills began to expand under Prithvi Narayan Shah. The annexation of Terai was a part of this venture. Terai was treated more like a colony during the rule Prithvi Narayan. Moreover, it had to be keep in mind from the argument of Kalpana Jha that after 1870's the world system underwent changes due European colonial expansion.[14] A sizeable increase in the population of Indian origin occurred when the British government returned the territories of far – western Terai to Nepal (which was taken away by them during the Anglo- Nepali war of 1814-16) as a good will gesture to the Ranas, who had provided military assistance to the British to suppress the Indian Mutiny in 1857-58. Muslims in the Terai constitute 3.28 percent of their total 3.53 percent representation in the whole of Nepal. Among the Terai caste /ethnic groups , they formed the third largest group, coming only after the Tharus (6.46 %) and Yadavs (4.1%). Thus the Muslim population in Nepal is predominately of Madheshi origin as around 97 percent of the total Muslims reside in the plains of Terai. Like their Hindu counterparts Terai Muslims too had strong ties across the border and receive cultural sustenance from the larger Muslim population of Uttar Pradesh and Bihar. According to the Legal Code of 1963, the Muslims

of Nepal are free to practice their customs and have been treated as an integral part of Nepalese society.[15]

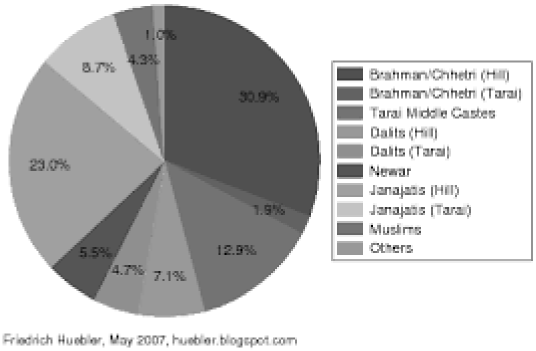


**Figure : 1 Population in the Terai**

Being a new democracy Nepal has traces of hegemonic prevalence in the form of dominance of the hill Hindu Brahmin, Chetri over bureaucracy, politics, education and civil services.[16] Numerically each group in Nepal is a minority for instance the Chhetris are 15.80 percent of the two national populations and while Bahuns are 28.84 of the total population.[17] The cultural diversity of the Madheshis can be seen in the three district religious groups Hindu, Muslim and Jains , who used to live there. Caste Hindus are the dominant social group in the Madhesh. The social structure of Madheshi caste is very similar to that of Hindus from the hills.[18] As mentioned earlier the most numerous among the Tarai Hindu caste groups is Yadav (895,423) or 4.1%. Of the total population of Nepal and 7.9% of the Tarai population, they are numerically highest in number in five districts of the Tarai. Dhanusha, Mahottari, Siraha, Saptari, Sarlahi (971,056) or 4.3% of total population and 8.6% of the Tarai population they are numerically highest in number in five districts of the Tarai : Rautahat, Bara, Parsa, Kapilvastu and Banke. Madhesis however formed an important segment of the population in Nepal. According to the population census of 2001, based on mother tongue for village development committees, the Madheshi population figured 67811115. If one was to go by this figure, the Madheshis formed 29.2% of the total population of Nepal in 2009. However Madheshi political leaders, scholars and activists have long questioned these figures. They claim that the Madheshis form 40-50% of the total population in Nepal today.[19]

**Table 1**
**Break up Madhesi Population as per 2001 census.**

| **Sl. No.** | **Caste / Ethnicity** | **Population** | **Percent** |
|---|---|---|---|
| | Madhesi Caste group | 3464249 | 15.24 |
| 1 | Yadav | 895429 | 3.94 |
| 2. | Teli | 304536 | 1.34 |
| 3. | Koiri | 251274 | 1.11 |
| 4. | Kurmi | 212842 | 0.94 |
| 5. | Dhanuk | 188150 | 0.83 |
| 6. | Sonar | 145088 | 0.64 |
| 7. | Kewat | 136953 | 0.60 |
| 8. | Brahman | 134496 | 0.59 |
| 9. | Baniya | 126971 | 0.56 |
| 10. | Mallah | 115986 | 0.51 |
| 11. | Kalwar | 115606 | 0.51 |
| 12. | Hajam | 98169 | 0.43 |
| 13 | Kanu | 95826 | 0.42 |
| 14. | Sudhi | 89846 | 0.40 |
| 15. | Lohar | 82637 | 0.36 |
| 16. | Nuniya | 66873 | 0.29 |
| 17. | Numbar | 54413 | 0.24 |
| 18. | Haluwai | 50583 | 0.22 |
| 19. | Rajput | 48454 | 0.21 |
| 20. | Kayastha | 46071 | 0.20 |
| 21. | Badhae | 45975 | 0.20 |
| 22. | Barac | 35434 | 0.16 |
| 23. | Kahar | 34531 | 0.15 |
| 24. | Lodha | 24738 | 0.11 |
| 25. | Rajbhar | 24236 | 0.11 |
| 26. | Bhediyar | 17729 | 0.08 |
| 27. | Mali | 11390 | 0.05 |
| 28. | Kamar | 8761 | 0.04 |
| 29. | Dhunia | 1231 | 0.01 |
| **Madheshi Dalit Caste Groups** | | | |
| 1. | Chammer | 269661 | 1.19 |
| 2. | Musahar | 172434 | 0.76 |
| 3. | Dusadh | 158525 | 0.70 |
| 4. | Tatma | 76512 | 0.34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Khatwe | 74972 | 0.32 |
| 6. | Dhobi | 73413 | 0.32 |
| 7. | Bantar | 35839 | 0.16 |
| 8. | Binda | 18720 | 0.08 |
| 9. | Chidimar | 12296 | 0.05 |
| 10 | Dom | 8931 | 0.04 |
| 11. | Halkhor | 3621 | 0.02 |
| | **Madheshi Ethnic Group** | | |
| 1. | Tharu | 1533879 | 6.75 |
| 2. | Muslim | 971056 | 4.27 |
| 3. | Rajbansi | 95812 | 0.42 |
| 4. | Marwari | 43971 | 0.19 |
| 5. | Santhal / Satar | 42698 | 0.19 |
| 6. | Dhagar | 41764 | 0.18 |
| 7. | Gangaj | 31318 | 0.14 |
| 8. | Dhimal | 19357 | 0.09 |
| 9. | Tajpuriya | 13250 | 0.06 |
| 10. | Bengali | 9860 | 0.04 |
| 11. | Punjabi | 3054 | 0.01 |
| 12. | Kisan | 2876 | 0.01 |
| 13. | Kache | 1429 | 0.01 |
| 14. | Munda | 660 | 0.00 |
| Unidentified dalit | 173401 | 0.76 | |
| Unidentified caste /Ethnic | 231641 | 1.02 | |
| | | 22736934 | 100 |

**The problem of ethnic identity :**

The problem of ethnic identity thus became an important issue in Nepal. The language issue is generally depicted as crucial in abetting ethnic sentiments and leading to conditions of regional and separatists movement. While discussing Madheshi ethnic identity , the qualifier terms used for Madhesis are often the minority and the dominated while the *Pahadis* are referred to as the majority and the dominant.[20] Most of the Madheshis have Maithili, Bhojpuri, Awadhi or Bajjika as their mother tongue. The Maithili language is the second

largest language in Nepal after Nepali. About 2.8 million people or 12.30 percent of Nepal's population have Maithili as their mother tongue. Bhojpuri is the third largest language in Nepal, spoken by 1.7 million people or 7.58 percent of Nepal's total population. More than half a million people or 2.47 percent of Nepal's population have Awadhi as their mother tongue, making it the eighth largest language, spoken by almost a quarter of a million people or 1.05 percent of Nepal's population. Hindi is the sixteenth largest language in Nepal and is the mother tongue of more than 100,000 people or 0.47 percent of the population. Maithili is the mother tongue of 90 percent of people in Dhanusa district, 85 percent in Siraha, 83 percent in Mahottari, 75 percent in Saptari, 54 percent in Sarlahi and 32 percent in Sunsari district. Bhojpuri is the mother tongue of 84 percent of the people in Parsa district, 76 percent of the people in Bara district and 51 percent of the people in Rupandehi. Awadhi is the mother tongue of 71 percent of the people in Kapilavastu district and 44 percent of the people in Banke district. Bajjika, the mother tongue of 43 percent of the people in Rautahat district. Hindi and Urdu are the connecting languages between various Madhesi communities.[21]

The National Census of 2011 played a very important role in providing figures of the socio economic characteristics of the population and also the population size of various ethnic, caste, language and religious groups. The Central Bureau of Statistics 2001 recorded a list of 1250 ethnic and 207 religious groups in Nepal. The list contrasted sharply with the 2011 census that reported less than 350 ethnic groups excluding 3 unidentified categories and 8 religious groups. However, experts hired by CBS processed these various code categories of ethnicity and enlisted those under 125 codes. The codes that could not be identified properly were categorized as *adivasi*, *dalit,* Tarai-Madhesi, unidentified and foreigners. Despite the tremendous importance of ethnic studies in Nepal, no detailed anthropological and sociological survey has been carried out till date to identity the different ethnic groups and their cultures. Because of this gap in data, the number of ethnic groups differ from one source to another. In the 1991 census, the CBS identified only 60 ethnic groups where as 100 ethnic groups were identified in the 2001 census having 59 cultural groups within the *adivasi* category alone. This was done by The *Adivasi Pratisthan* under the leadership of Om Gurung. The Dalit Ayog (2003) listed 23 separate cultural groups within the dalits. A technical committee formed by the Rashtriya Dalit Ayog further added of more groups make it a total of 29 cultural groups within the Dalits. The Government identified 92 cultural groups as

Madhesis but this is vague as many of them are listed under the Madhesi, Dalit and Adivasi categories. The "other backward caste" also has 24 Madheshi groups along with high caste Hindu-Madheshis and Dalits in Terai.[22]

Most Madheshis are losing their identity since they are treated as less Nepali or non-Nepali by the *Pahadis.* A chief reason is their socio-cultural, linguistic and physical affinity with the communities living immediately on the other side of the border in India, which historically was a part of Madheshi culture. Nepali-or hill language speaking people from Darjeeling or Sikkim, who have been living there for generations have been readily accepted in Nepal as Nepalese and they enjoy all the socio political benefits. A Madheshi who does not speak Nepali or any other hill language and who does not follow hill tradition and practices is not easily accepted as Nepali by the *Pahadis.* There has been a systematic process of discrimination deprivation and marginalization of the Madheshi during the last two and half centuries of the authoritarian rule perpetuated by the Shah kings, their Rana usurpers and the ruling hill elites of Nepal.[23]

Nepal's political parties originated in 1940's in opposition to the century old oligarchic Rana regime ( 1846-1951). This marks a difference between the history of parties of Nepal and that of the West , where parties evolved within the parliament as a consequence of the extension of popular suffrage or that of other Third World countries , where parties first appeared as part of the nationalist movement against colonial rule. Parties like Praja Parisad and Prachanda Gorkha preceded the Nepali Congress but the latter founded in exile in India in 1947 took the lead role in 1950-51 armed insurrection.[24] At the end of the Rana oligarchy[25] the political model that was adopted in Nepal after the 'revolution' of 1950-51 was that of parliamentary democracy under the aegis of a constitutional monarch.[26]

The overthrow of Rana regime marked the onset of Madheshi assertion for autonomy. Various Madheshi organizations that emerged were involved in mobilization of Madheshi people against discrimination of the Nepalese state. The Tarai Congress was formed in 1951 to fight to for the rights of the Madheshis.[27] In 1958 a Madheshi movement was started in the name of 'Madhesh Mukti Andolan' to fight for justice. During the 1960s, the organization emphasized on the development of Madhes and Madhesi people and demanded for Madheshi national police, Madheshi army, executive, legislature, independent judiciary and public service commission.[28] From 1960 until 1990 Nepal was ruled by a system known as party

less *panchayat* democracy. Under such a system, ethnic and caste affiliations were discouraged in the name of patriotism and nation building. In the 1990's the *panchayat* system was overthrown with the installation of multi party democracy in Nepal.[29]

Actually the *Janajati* movement, which was launched in the late 1980's, paved the way for the emergence of multi party democracy. Its main national organization the Nepal *Janajati Mahasang* has been founded in 1990. This movement may be seen as a response to the country's strained unification in the nineteenth century and to the complex set of discrimination and inequalities resulting from this situation. The local translation of *janajati* as nationality came from the Chinese concept of minority nationalities.[30]

In 1983, Gajendra Narayan Singh established an organization called the Nepal Sadbhavana Parishad, who's main aim was to combat discrimination against the Madheshi. Tarai Intellectual Society formed by intellectuals from Madhesh like professors, doctors, engineers, advocates and journalists during mid 1990's. The main aim of the organization is to brought the Madheshi problem in national level through mass meetings, seminars, talk programs and conferences.[31] Since the 1990's the *Mahasang* is at the forefront of all ethno political activities. Its adherents intended to promote their respective culture in all social spheres of life. In 1996 the *Mahasang* produced a list of sixty one nationalities or *janajatis* , covering all ethnic minorities of the country including the *Newars*.[32]

It must be remembered that the Nepal is identical in origin to the name of the *Newar* people. The terms "Nepal" "Newar", "Newal" and "Nepar" are phonetically different forms of the some word and instances of the various forms appear in texts in different times in history. Nepal is the learned Sanskrit form and Newar is the colloquial Prakrit form.[33]

Madheshi People's Right Forum was established in 1998 under the leadership of Upendra Yadav at Biratnagar eastern part of Nepal. Its main objectives are proper representation of Madhesi people in each and every sphere of *Madhesh* of state powers and abolition of every kind of discrimination and exploitation of *Madhesi* people by *pahadi* ruling elite, struggle for liberty, equality, democracy, fraternity, nationalism secularism, social justice and human rights. The CPN (Maoist) formed the Madhesi National Liberation Front (MNLF) in April 2001 that has provided a political space for the discontent and anguish of the Madhesi people. Madhesi Janatantrik Morcha was formed under the leadership of Jai Krishna Goit in 2003. The main objectives of the Madhesi Janatantrik Morcha are to remove

each and every kind of discrimination with Madhesi people and to establish autonomous region with right to self determination. They believe Madhesi people will get their right and recognition through armed movement. Madhesh Exyabadhata Parishad was formed in 2004 with the aim to give a common platform to the all Madhesi leaders of different political parties to raise Madheshi issues. Madheshi Tigers formed in 2004. The objective of the Madheshi Tigers has been stated as to start armed movement for Madheshi people and abolish the exploitation of Madheshi people from the CPN-Maoist.[34] However the defining moment of the Madhesh movement came in 2007 which declared Madhesh as an autonomous state.[35]

Based on the above theme, the major arguments of the paper have been placed.

**Conclusion:**

This paper seeks to explore the intricacies surrounding the issues of identity, rights and representations for the the Madhesis in Nepal. Most Madhesis are losing their identity since they are treated as less Nepali or non – Nepali by the Pahadis. A chief reason is their socio-cultural, linguistic and physical affinity with the communities living immediately on the other side of the border in India, which historically was a part of Madhesh. They migrated to the Tarai region to form semi-permanent settlements. The people who had Hindi, Maithili and Awadhi for their chief langueges and showed resemblances with Indians in their facial features are being identified as outsiders' or 'Indians' here. They were deprived of various opportunities and privileges . They have a long history of their own and are the residents of this region . These people were exploited by their social superiors. They were people of such simple and unsophisticated disposition , that they failed to see that the ruling class was treating them as Indians or people migrating from India .Consequently they were subjected to cruelties of various kinds , especially during the region of the Ranas . But when they eventually came to realize the reality , they gradually grow more and more vocal in protest.

**Sources:**

1. Kalpana Jha, " Contested Idea of Nation Madhesi Upsurge in Nepal," *TISS Research and Development ,* Paper No. 4 February 2015, pp. 1-11.
2. Ratneswar Mishra, Sectional President's Address" Ethnicity and National Unification: The Madhesis of Nepal," *Proceedings of the Indian History Congress,* Vol. 67, 2006-2007, pp. 802-833.

3. Kalpana Jha, " Contested Idea of Nation Madhesi Upsurge in Nepal," *op. cit.* pp. 1-11.
4. Ratneswar Mishra, Sectional President's Address" Ethnicity and National Unification: The Madhesis of Nepal,"*op. cit.* pp. 802-808.

5. J.K. Goait, "History of Terai in Nepal," *Madhesi United We Stand* ,4th April 2007.
6. Hari Bansh Jha, " The Tarai Community and National Integration in Nepal," *Centre for Economic and Technical Studies,* Modern Printing Press, Kathmandu 1993, p.11
7. J.K. Goait, *History of Tarai in Nepal,* https://madhesi.wordpress.com , accessed on 3.4.2019
8. Interview, Manoj Runier, Madhesi People, Birgunj,Nepal, 6th April, 2016.
9. https://education.stateuniversity.com/pages/1054/Nepal-HISTORY-BACKGROUND.html accessed on 10th April 2019, 14.48 p.m.
10. Gerald Toffin, " The Janajati / Adivasi Movement in Nepal: Myths and Realities of Indigeneity," *Sociological Bulletin ,* Vol. 58, No. 1( January – April 2009) pp. 25-42.
11. Ratneswar Mishra, Sectional President's Address" Ethnicity and National Unification: The Madhesis of Nepal,"*op. cit.* pp. 802-808.
12. Interview, Manoj Runier, Madhesi People, Birgunj,Nepal ,6th April, 2016.
13. Monica Dastidar, "Muslims of Nepal's Terai," *Economic and Political Weekly* Vol. 35, No. 10 (March 4-10, 2000) pp. 766-767.
14. Kalpana Jha, "Contested Idea of Nation Madhesi Upsurge in Nepal," *op. cit.* pp. 1-11.
15. Monica Dastidar, "Muslims of Nepal's Terai," *op. cit.* p. 766.
16. Kalpana Jha, "Contested Idea of Nation Madhesi Upsurge in Nepal," *op. cit.* pp. 1-11.
17. Ratneswar Mishra, Sectional President's Address" Ethnicity and National Unification: The Madhesis of Nepal,"*op. cit.* pp. 802-808.

18. *Government of Madhesh,* Kathmandu, Nepal, 13th July, 2013
19. J.K. Goait, *History of Tarai In Nepal*
20. Ratneswar Mishra, Sectional President's Address" Ethnicity and National Unification: The Madhesis of Nepal,"*op. cit.* pp. 802-808.
21. Kalyan Bhakta Mathema, *Madhesi Uprising The Resurgence of Ethnicity,* Kathmandu : Mandala Book Point, 2011,p. 3.
22. *Central Bureau of Statistics,* Kathmandu, Nepal, 2014, pp.1-3
23. Amaresh Kumar Singh, *Madhesi Identity and Its Impact on Nation Building Process* New Delhi : JNU, Dissertation, 2009, p. 159.
24. Krishna Hachchethu, " Political Parties of Nepal," Baha Occasional Paper I, *Social Science Baha* Nepal, 2006, p. 5.
25. Prakash Upadhayay , " Reforms and Changes in Nepal, Political Sociological Perspectives on State Reconstructing process in the post democratic period," *Crossing the Border: International Journal of Interdisciplinary Studies,* Vol. 3 No. 1 , 15 Jan, 2015.
26. Rishikesh Saha, *Nepali Politics Retrospect and Prospect*, Oxford University Press London 1975, p. Subdheer Sharma, *The Ethnic Dimension of the Maoist Insurgency,* Unpublished report prepared for the DFID, Kathmandu, May, 2002.
27. Amaresh Kumar Singh, *Madheshi Identity and Its Impact on Nation Building Process, op. cit.* pp. 113-114.
28. David N Geller, " Caste , Ethnicity and Inequality in Nepal," *Economic and Political Weekly ,* Vol. 42, No. 20 ( May 19-25, 2007) pp. 1823-28.
29. Gerald Toffin, " The Janajati / Adivasi Movement in Nepal: Myths and Realities of Indigeneity," *op. cit.* pp. 25-52.
30. Amaresh Kumar Singh, *Madhesi Identity and Its Impact on Nation Building Process, op. cit.* pp. 113-114.
31. Gerald Toffin, " The Janajati / Adivasi Movement in Nepal: Myths and Realities of Indigeneity," *op. cit.* pp. 25-52. Subdheer Sharma, *The Ethnic Dimension of the Maoist Insurgency,* Unpublished report prepared for the DFID, Kathmandu, May, 2002.
32. Amaresh Kumar Singh, *Madheshi Identity and Its Impact on Nation Building Process, op. cit.* pp. 113-114.

33. David N Geller, “ Caste , Ethnicity and Inequality in Nepal,” *Economic and Political Weekly ,* Vol. 42, No. 20 ( May 19-25, 2007) pp. 1823-28.
34. Gerald Toffin, “ The Janajati / Adivasi Movement in Nepal: Myths and Realities of Indigeneity,” *op. cit.* pp. 25-52.
35. Kalpana Jha , “ Contested idea of Nation , Madhesi Upsurge in Nepal,” *op. cit.* p. 1-11.

# A COMPARATIVE STUDY ON THE FEATURES OF "NATIONAL POLICY ON EDUCATION" (NPE-1986) AND "NATIONAL EDUCATION POLICY" (NEP-2020)

Sk Parvej Ahammed
M.ed Student,
Ramakrishna Mission Sikshanamandira
Belur Math, Howrah, West Bengal

Lalkrishna Khanra
Assistant Professor
Dept.of Education
Mahishadal Girls' College
Purba Medinipur, West Bengal

**Abstract:**
Education is the backbone of a Nation. Any Country or nation or society cannot move forward with out proper education so every country needs proper education policy to properly deliver education to the whole country. Therefore, if there is no proper policy of education in the country, then every person of the society cannot be brought in the light of education properly. Therefore, since the independence of India, various educational programs have been organized to spread education and bring every Indian in the light of education. Since independence, various committees and commissions have been set up to promote education in India, especially on the basis of 1986 education policies. The education system in India has been gradually run all over India. After a long 34 years of 1986 National educational policy, various efforts are being made to implement the 2020 National Education Policy in the present context. In this paper highlights recommendation of National Educational Policy 2020 and to find out the comparison between NPE-1986 and NEP-2020. It is hoped that this 2020 education policy, like the 1986 education policy, will enable every India to show the direction for timely and on-demand education.
**Keywords:** Highlights NEP 2020, Compare NPE1986 & NEP 2020.

**Introduction:**

Each country needs specific policies to achieve a specific goal. In the same way, every country has an education policy to improve the education sector, which determines the future education system of the

country. In any country, a national education policy is prepared to determine the direction of education in that country. It is clear from the education policy that the government of any country is showing the way for the progress of its people. In the same way , the present government of India , through the adaption of the National education policy of 2020 has clearly presented the right path to every people in every field of the country, Dr. K. Kasturirangan Commission as National Educational Policy 2020. Indian higher education Secretary Amit khara has said that a new education policy has been introduced in India after 34 years. At present, the education system in India is being run on the basis of the National Educational Policy of 1986, so after this long 34 years, the emphasis has been placed on this education policy to keep pace with the ever-changing education system. Education Minister Government of India stated that the Kasturirangan Commission has drafted the National Educational Policy 2020 after Consulting more than 2.5 lakh Panchayats , 6600 block 6000 Municipalities in 667 districts of India over a period of 5 years , The union cabinet approved this education policy in the year 2020 and it is hoped that this education policy will help in establishing environment friendly equitable grants and intelligent society in our country through good education. The implementation of this policy has set a target of 2035, which is somewhere in the allocation of 6% of total GDP of India.

**Objective of the Study:**

1.To study and highlights National Education Policy 2020.

2.To Compare Special features of NPE 1986 and NEP 2020.

**Methodology of the Study:**

This study purely theoretical based. Content analysis of the available documents, mainly the investigators were collected data from different type of books and e-journal written by the author.

**A. Highlights of National Education Policy 2020**

The national education policy 2020 will help in establishing and eco-friendly fair and intelligent society in our country. The present Government of India formed a committee in June 2017 under the leadership of eminent Scientist Padma Vibhushan Dr.K. Kasturirangan. The Kasturirangan committee Submits it's report to the union Minister for Human resource Development on May 31 , 2019 after the Education Commission has analyzed over two lakh view

froms various site all over country. The union cabinet approved this education policy in the year 2020.The National Education Policy 2020 envisions an India centered education system by considering its tradition, culture, values and ethos to contribute directly to transform the country into an equitable, sustainable, and vibrant knowledge society (as cited in Aithal & Atihal, 2020). Three National Education Policy 2020 aims to increase school enrollment 50% by 2035. NEP draft (2020) discuss the many following points give emphasis in study. Following highlights of National Educational Policy are :-

1. Quality early childhood education available for all children between 3-6 years by 2025.

2. Expansion and strengthening of facilities with multipronged approach based on local needs geography and existing infrastructure.

3. Ensuring Foundational Literacy & Numeracy: National Education Policy proposed by 2025, every student in Grade 5 and beyond must achieve foundational literacy and numeracy.

4. Higher Education: i. Consolidation of current 800 universities and 40,000 colleges into about 15,000 large, well-resourced, vibrant multidisciplinary institutions.

ii. All higher education institutions to become multidisciplinary institutions, with teaching programmes across disciplines and fields.

5. Teacher Education: The National Education Policy Propose a 4year integrated B.Ed. programs for Minimum Teaching qualification.

6. Professional Education: National Education Policy Propose that Stand-alone technical universities, health science universities, legal and agricultural universities, or institutions in these or other fields, will be discontinued.

7. Vocational Education: This education will become an integral part of all education. this policy will provide vocational education to at least 50% of the student by 2025.

8. National Research Foundation: This Policy has a strong emphasis on catalyzing and energizing research and innovation across the country in all academic disciplines.

9. Adult Education: This Policy aims to achieve 100 youth and adult literacy by 2030 and significantly expand adult and continuing education programmes.

10. Promotion of India Language: It is critical to preserve the truly rich languages and literatures of India the Policy will ensure the preservation, growth, and vibrancy of all Indian languages.

11. Financing Education: The Government will invest enough to expand and enliven the education of the people.
12. Rashtriya Shikkha ayog: Rashtriya Shikkha ayog will be formed under the leadership of the Prime Minister of India. It will be in the forefront of India's education policy.

**B. Compare the National Policy on Education 1986 and National Education policy 2020**

National Education Policy was first introduced in India in 1968 then the largest form in 1986 the Education policy was introduced in the whole country. More attention was given to restructuring teacher education, early childhood care, women's empowerment, and adult literacy. It also proposed that the autonomy of universities and colleges will improve the quality of education services (as cited in Aithal & Aithal, 2020). The education system of the country has been governed for 34 long years on the basis of the national education policy of 1986. Efforts have been made to develop the education infrastructure of the entire country and make education accessibility to all through the education policy of 1986 in the same way the New education policy 2020 proposed in number of chapters in linked with the 1986 education policy to keep pace with the entire society. Following the Comparison of National policy on Education1986 and National Education policy 2020 are: -

| National Policy on Education1986 | National Education Policy 2020 |
|---|---|
| The main objective of the 1986 national education policy is universal access and enrollment. | the main objective set up by new education policy 2020 is multidisciplinary and interdisciplinary liberal education. |
| 1986 new education policy have been implemented under the ministry of human resource development. | new education policy 2020 under the ministry of education. |
| The gross enrollment ratio in the current education system is 26.3 %. | The new education policy has set a gross enrollment ratio 50% target by 2035. |
| According to the current | The New Education policy |

| | |
|---|---|
| Education policy the education structure of the country is being run 5+3+2+2+3+2 | 2020 propose an education structure of 5 + 3 + 3 + 4 + 4 + 1. |
| in the current education system preliminary education starts from age of 6. | Indian new education policy the proposal to start preliminary education has been kept from the age of 3. |
| according to the current education system after the completing the syllabus of each class the annual exam is available upto class 12. | The New Education policy (2020) propose exam after completing of class 3, 5, 8 and 12. |
| The current system of education provide annual descriptive examination once of a year up to class 12. | dhanyvad ka San policy propose to conduct objective and describe to examination pattern twice a year. |
| According to the current Education policy 1986 the education system is divided into three forms of science arts and commerce. | no separation was provided in the new education policy 2020. |
| There is no curriculum reduction system as per the current Education policy 1986. | The new education policy propose to reduce the the curriculum according to the essentials. |
| There is no provision for bagless day in the current Education policy 1986. | The New Education Policy propose bangless day on a week in the school. |
| Health card and supplementary programmes are introduced in the current Education policy 1986. | New education policy 2020 propose schools for health card and checkup. |
| Progress report card are the maintain in the current education systems. | The New Education policy propose 360degree hall stick report card on the school students. |
| Current education policy does not | New Education policy |

| | |
|---|---|
| offer the specific classes for teaching coding. | propose to teach coding from class 6. |
| The current education system is based on the three languages formula. | New Education policy 2020 propose to have the three languages selection power such as the state and region wise. |
| The undergraduate program is the three years under the current education structure. | The New Education policy will propose 4 years with a provision to exit after one year with the diploma after 2 years within a advanced diploma after 3 years with a pass degree after 4 year with the project best complete degree. |
| The postgraduate programme is two years under the current education system. | The new Education policy 2022 to focus on one or two years postgraduate programme with a specialization and research based. |
| The current Education policy included the introduction of entrance exam for admission in colleges and universities. | The New Education policy offers common entrance test through the NTA for admission all the undergraduate and postgraduate programmes. |
| According to the current Education policy the student has to choose the subject from the area of the study. | According to the New Education policy emphasize is on the outside and cross given area of the study in the subject choice of the student. |

| | |
|---|---|
| The Current Education sector is spending 4.5 of GDP. | The New Education policy 2020 are proposed to spend 6% of the GDP by 2035. |
| At present there is a minimum qualification for teaching through a 2 year B.ed course. | The New Education Policy propose a 4year integrated B.Ed. programme for minimum teaching qualification. |
| At present education system net set is the essential qualification to be a assistant professor for any college University recruitment. | In the new education policy 2020 along with the net or set and PhD degree has been made essential for recruitment of assistant professor in college or university. |
| the current education system is based on the choice- based credit system. | The new education policy proposed a competency-based credit system. |
| There is no system of multiple entry in the current education system. | The new education policy proposed multiple entry in education system. |
| in the current education system, no foreign University is allowed to have direct function. | Hundred top rank for foreign University will allowed to function in the Indian proposed national education policy 2020. |
| In the present education system, no systematic and authentic funding research purpose. | The new education policy proposed the creation of a NRF for expatriates who are interested in research all disciplines. |

**Conclusion:**

Education policy is preparing to determine the direction of education in a country.it is clear from the education policy that the government

of a country will show the way for the progress of the people. in line with the current education Policy 1986 it is proposed to make some changes to shirt the needs of the student's new direction policy 2020. New education policy aims to propose increase the enrollment ratio 50%. Present education systems Preliminary education start from 6 year but new education policy2020 that propose Preliminary education start from 3 years. the current education system progress report from the Student evaluation area in class similarly the new division policy proposes 360-degree holistic report card with an emphasis on evaluation of the students. Although there is a slide different in the new Education policy from the 1986 education policy in many respects the New Education policy will became as relevant in the field of education as relevant in the field of as in the 1986 education policy to meet the demand of students for modern education to adapt to the changing environment.

**Reference:**


1. Aithal, S. P & Aithal, S. (2020). Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards Achieving its Objectives. International journal of Management Technology and Social science, (5) 2, 20-41 retrive from www.researchgate.net
2. Aithal, P. S. & Aithal, S. (2019). Analysis of Higher Education in Indian National Education Policy Proposal 2019 and its Implementation Challenges. International Journal of Applied Engineering and Management Letters (IJAEML), 3(2), 1-35 retrieved from -www.srinivaspublication.com
3. Draft National Education Policy 2019, retrieved from - www.innovate.mygovt.in
4. National Education Policy 2020, Retrieved from- https://www.mhrd.gov.in
5. NCTE (2009): National Curriculum Framework for Teacher Education- Towards Preparing Professional and Human Teachers- New Delhi, India.
6. National policy on Education 1986, Retrieved from- www.education.gov.in
7. Srivastava, P. & Maddipatla, B. (2020).Reflections on the Challenges and Suggestion for Teachers from NEP 2019.Educational Resurgence Journal,(2) 3. 65-70 retrieved from - www.coed.dypvp.edu.in

8. Shajimon, P.P.(2018).The Concept of “Marginalized” In the National Policy on Education (NPE)-1986.Journal Of Humanities And Social Science ,(23) 8, 26-29 Retrieved from- www.iosrjournals.org
9. Sing, P.(2019). Sing, P.(2019). A Comparative study on Teacher Education in "National Policy on Education"(NPE-1986) and "National Education policy"(NPE-2019), (8) 12, 20757-20759, Retrieved from- www.journalijcar.org

# Online Learning: The Cure-all in the Time of Covid-19 Pandemic

Sujan Sarkar
B.Ed, Ramakrishna Mission Sikshanamandira
Belur Math, Howrah, West Bengal

Laxmi Sarkar
B.Ed., Department of Education, Vinaya Bhavana
Visva Bharati University
Santiniketan, West Bengal

**Abstract**

Education is the most powerful instrument for improving any society, nation and the world accordance with changing time.Suddenly a lethal disease called Covid-19 caused by a Corona Virus (SARS-CoV-2) shook the entire world. The WHO declared it as a “pandemic”. Every sector all over the world is badly affected by this pandemic. World-wide lockdown making avery bad effect on the students’ life. Around 32 crore learners stopped to move educational institution and all educational activities are halted in India. This paper highlights the various initiative for online educational platforms taken by the Govt. of India, conducted a SWOC analysis of online learning during this pandemic time, and, also discussed some positive and negative impact of covid-19 on education. In this paper, the researcher has adopted Descriptive research for qualitative analysis of the various national, international reports, journals, papers, articles, websites and important document of covid-19 on education.

**Key words**: online learning, pandemic, education, Cure-all, covid-19.

**Introduction:**

The deadly and infectious disease Corona Virus also known as Covid-19 has deeply impacted on the economy, public life and also shaken up the various educational sector globally. The Covid-19 pandemic outbreak forced many schools and colleges to remain closed temporarily. Traditional classes have been stopped this time in the various educational institutions. It is also uncertain when the various educational institutions (school, colleges, universities) will be reopened. Government of India has announced that the regular classes will be continued through online mode.In this situation the ICT

and internet are playing a big role in education. In different stages of education, many students are facing various problems to access the online classes. Lack of economical problem, internet server problem, data and electricity problem creating a very big barrier to the students. Educational units are struggling to find options to deal with this challenging situation. Several arguments have been arising related to e-learning, accessibility, affordability, flexibility in teaching and learning pedagogy. It is said that online mode of teaching learning is easily accessible and can be reached to the remote areas. Flipped classroom, google forum, blended learningsare being used by online mode of learning. Students are getting moretime flexibility and making them more interesting. This type of learning environment can increase the learning potentiality of the students. The government also recognizes the growing importance of online learning in this dynamic world.

**Objectives of the Study**

1. To enlighten variousdigitalinitiatives taken by Govt. of India for educational sector that helpingin pandemic time.
2. To conduct a Strengths, Weaknesses, Opportunities, & Challenges (SWOC) analysis of online learning during the Covid-19 pandemic time.
3. To highlight some positive and negative impacts of covid-19 on education.

**Research Methodology**

The present study is descriptive research and tries to understand the importance of online learning in the period of covid-19 pandemic situation. This paper is completely qualitative analysis based on various secondary data such as national, international reports, journals, scholarly articles, research paper and websites.

**Digital Initiatives of Govt. of India on education during Covid-19 pandemic**

Govt. of India has declared one day nationwide Janata-curfew on March 22 and implemented lockdown from March 25, 2020 onwards in different phases. This lockdown phases have been extended time to time and Govt. of India adopting different strategies to fight with the pandemic but educational institutions remained closed continuously. The lockdown has accelerated adoption of digital technology. It has offered a chance to develop new and enhance professional skills/knowledge through online learning in more effective and

profitable way. The Ministry of Human Resource Development (MHRD) has made several arrangements, including online portals and educational channels through Direct to Home TV, Radios for students to continue learning. Some digital initiatives for school and higher education in India which are helping in this pandemic situation for students learning are:

- **Diksha** portal contains e-Learning content for students, teachers, and parents aligned to the curriculum, including video lessons, textbooks, worksheets and assessments. Under the guidance of its national boards of education (CBSE) and NCERT. It has more than 80,000 e-Books for classes 1 to 12 created by CBSE, NCERT's more than 250 teachers in multiple languages.The app is available to use offline.Website: https://diksha.qov.in or https://seshaqun.qov.in/shaqun
- **e-Pathshala**is an e-Learning app developed by NCERT for classes 1 to 12 and provide 1886 audios, 2000 videos, 696 e-Books and 504 Flip Books in multiple languages. Mobile Apps is available. Website: http://epathshala.nic.in orhttp://epathshala.qov.in.
- **National Repository of Open Educational Resources (NROER)** portal provides a host of resources forstudents and teachers for classes 1-12. It has total of 14527 files including 401collections, 2779 documents, 1345 interactive, 1664audios, 2586 images and 6153 videos and STEM-based games on differentlanguages. Website: http://nroer.qov.in/welcome
- **National Digital Library of India (NDLI)** The National Digital Library (NDLI) developed by the Ministry of Education through NME-ICT.Itis a virtual repository consisting of academic contents in multiple disciplines from school to post graduation level. It is an all-purpose platform designed for students of all ages, teachers, learners, researchers, librarians, professionals, and other users. The online platform is available 24x7 in more than 70 Indian languages. A wide variety of learning resources are available including eBooks, videos, thesis, manuscripts, documents, and many more. Website: **https://ndl.iitkgp.ac.in/**

- **E-Shodhsindhu:** e-ShodhSindhu is jointly planned by the Ministry of Education and the Government of India is a digital library providing access to e-resources like, eBooks, journals, bibliographies, factual, citations, etc. for higher education. Website: **https://ess.inflibnet.ac.in/oes**
- **e-PG Pathshala**postgraduate students can access this platform for e-books, online courses and study materials during this pandemic period. The importance of this platform is that students can access these facilities without having internet for the whole day. Website: https://epgp.inflibnet.ac.in/
- **Swayam** SWAYAM is a programme initiated by Government of India and designed to achieve the three cardinal principles of Education Policy viz., access, equity and quality. The objective of this effort is to take the best teaching learning resources to all, including the most disadvantaged. SWAYAM seeks to bridge the digital divide for students who have hitherto remained untouched by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of the knowledge economy. Website: https://swayam.gov.in/about
- **Swayam Prabha** The SWAYAM PRABHA is a group of 34 DTH channels devoted to telecasting of high-quality educational programmes on 24X7 basis using the GSAT-15 satellite. Every day, there will be new content for at least (4) hours which would be repeated 5 more times in a day, allowing the students to choose the time of their convenience. The channels are uplinked from BISAG, Gandhinagar. The contents are provided by NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT and NIOS. The INFLIBNET Centre maintains the web portal. Website: https://www.swayamprabha.gov.in/
- **Massive Open Online Course (MOOC)** is an online course aimed at unlimited participation and open access via the web. First introduced in 2008, provide various courses including distance education.
- **National Programme on Technology Enhanced Learning (NPTEL):** NPTEL is another project funded by the Government of India and Ministry of Education. It is a collective plantation taken by the Institute of Science, Bangalore, and 7 other IIT institutes (Delhi, Bombay, Kanpur, Kharagpur, Guwahati, Roorkee, Madras).

Thisplatformgrantsdifferent courses in engineering, science, social sciences, and humanities. Website: **http://nptel.ac.in**

- **Virtual Labs:** Virtual Labs is a digital consortium founded by the Government of India in association with the Ministry of Education under the NME-ICT initiation.

**SWOC Analysis of Online Learning: During Covid-19 Pandemic Time**

Covid-19 is spreading like a forest fire around the world. All of the educational institutions are facing lockdowns in the most affected areas to defence further expansion of the Corona Virus. In order to fulfil the needs of the students in every field of education through

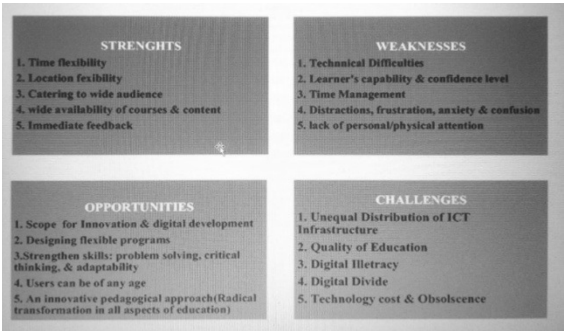


online mode.Many positive and negative issues have to befaced both by teachers and the students.The researcher is being trying to show here the total scenario of this issue by the diagram chart through SWOC Analysis.

**Figure 1.** The SWOC Analysis of Online Learning During Covid-19 pandemic. *Note*. SWOC = Strengths, Weaknesses, Opportunities, & Challenges.

❖ **Strengths**

E-learning is the modern trending innovative platform which is giving the different kind of flexibility to the students. Basically, this is student centric platform. They can choose the various subjects and time according to their needs. There are various online tools and options that are available for effective learning environment. In this covid-19 pandemic time, it is playing a big role. Students can participate the classes from the different locations. There is no needed to come to same place for all students to take class. Social distancing is being maintained well this time crisis. This can create a collaborative and

interactional session with students, and they can give and take immediate feedback to any query. So, online learning is helping us to stop the spreading of corona virus and we can continue our study smoothly.

❖ **Weaknesses**

Online learning is currently the new and only mode in teaching learning system in this covid-19 pandemic time. There are many positive aspects and many weaknesses in this process. That's why, it can hamper the communication between the learner and faculty of different educational sectors. The users are facing many technical difficulties when they are communicating each other and it can slow-down the teaching learning process. All learners are not same in their degree of capabilities and confident level. Out of all learners, some of them feel better, some are feeling confused towards the online learning.

❖ **Opportunities**

Online platforms are generally creating a lot of opportunities for the teacher and students. There is no barrier to access the online platforms at any stages and any ages. A huge number of students can participate in online platform of learning at a same time, irrespective of their different location. Group discussion, co-operation and interaction with each member in educational faculty are being communicated at a platform over the internet. Many innovative ideas are rising and everyone can get immediate feedback of any problem. The technical skills are strengthening of the learners as well as the faculties. Online learning is saving our times and giving us different kind of flexibility in this pandemic crisis.

❖ **Challenges**

Online learning is facing many challenges right now in the academic atmosphere. Atfirst, the different technicalequipment's are very expensive. Everyone in the society cannot afford and access the ICTs and its various parts such as android mobile, computer, laptop, TV etc. This is a very big problem for thosewho cannot afford these. So, a digital- divide is being created in the society. Again, the internet data is not always available to the all learners. Many people, learners and faculty of educational sector are facing a big challenge when they are conducting the online learning environment by their digital backwardness.

**Positive impact of COVID-19 on education**

Covid-19 is being created many problems for public life, private sectors and educational system. Even after lockdown, educational institutions are still closed, traditional face-to-face classroom teaching has been stopped and students are blocked at their home. Thus, Indian education system has gotten the opportunity for transmission from the traditional system to a new era trough online mode. The following points may be considered as the positive impact on education:

- **Move towards Blended Learning:** COVID-19 has quickly forced us foradopting digital technologies to run the teaching learning system in education. It has encouraged all teachers and learners to develop a positive attitude towards the ICT. The new way of online learning openscountless opportunities for developing curriculum and pedagogy. In this pandemic crisis in India, educational institutions are moving towards blended mode of learning.
- **Rise in use of Learning Management Systems:** Use of learning management systems by educational institution is now in great demand. It has opened great opportunities for the companies those have been developing and strengthening learning management systems for use educational institutions (Misra, 2020**).**
- **Enhance the use of soft copy of learning material:** In lockdown situation students are not able to collect the hard copies of study materials from the educational institution and coaching centre.Therefore, most of thestudents using soft copy materials for reference.
- **Improvement the collaborative work:**There is a newopportunity to all teachers and students in the online platform where everyone can participate at a time wherever, they are located at different places.
- **Rise in online meetings**: The pandemic has created amassive rise in teleconferencing, virtual meetings,webinars and e-conferencing opportunities through online platforms to all the students and faculties of educational sectors.

- **Enhanced Digital Literacy**: The pandemic situationinduced people to learn and use digital technology that increases the digital literacy.
- **Improved the use of electronic media for sharing information**: Teaching learning materials are now sharing among thestudents and teachers easily. The queries are solving through e-mail, SMS, phone calls and using differentsocial Medias like WhatsApp or Facebook etc.
- **Worldwide exposure**: Educators and learners are getting opportunities to interact with each other all over theworld. They are adapted to an international community.
- **Better time management**: Students and teachers are able to manage their time flexibility more effectively in online education this pandemic.
- **Demand for Open and Distance Learning (ODL):** During this covid-19 pandemic situation most of the **s**tudents arepreferred to choose the ODL mode. It encourages self-learningto the studentslearning as per their needs.

**Negative impact of COVID-19 on education**

Education sector has been suffering a lot of challenges due to the outbreak of COVID-19 pandemic. It has created many negative impacts on education. Some of them are as pointed below:

- ✓ **Hampered of Educational activities:** Duringthis lockdown situation all traditionalClasses have been suspended and exams at different levels has been postponed. Admission process in academic year of 2020-2021 and all educational activities has been delayed. Students will face much more difficulties when the school will be reopened after a huge gap.
- ✓ **Impact on employment:** The covid-19 pandemic has badly effect on different sectors in the world. Most of recruitment has been postponed. Unemployment rate has increased unexpectedly during this pandemic. The Centre for Monitoring Indian Economy's estimates on unemployment shot up from 8.4% in mid-March to 23% in early April and the urban unemployment rate to 30.9% (Educationasia.in).
- ✓ **Difficulties of unprepared teachers/students for online education:** Everybody is not same in the world by their physical, mental, intellectual perspectives. In this pandemic

time all are not ready to accept sudden transmission from face-to-face to online mode of teaching learning. This unpreparedness is creating many problems in education.

- ✓ **Reduced the global employment opportunities:**Many peoplelose their jobs and returned at home from other countries due to the restrictions caused by COVID-19.Therefore, the fresh candidates are facing difficulties for getting the suitable jobs outside the India.
- ✓ **Increase the responsibilities of parents to educate their children:** During this lockdown situation, the responsibilities have been increased for parents towards educating their children at home. Some educate parents are able to guide their child and some are not.
- ✓ **Loss of nutrition due to lockdown:**During the lockdown phases all educational institutions are remain closed. Mid-day-meal is a Govt. of India's initiative programme for providing better nutritional food to the school children all over the country. It can create a major problem for all the school children.
- ✓ **Access to digital world:**All students are not able to afford the ICTs, different parts (smart phone, TV, laptop) for online learning. Many of them have limited or no internet data and connection for accessing the online platforms and it creates a digital divide among the students. Covid-19 has badly hit the poor students; thus, the online education may enhance the gap between rich/poor and urban/rural students.
- ✓ **Payment of Schools, Colleges fee got delayed:** During this pandemic lockdown most of the poor parentsare facing unemployment situation and they are unable to fulfilthe demand of food for the family members. Therefore, they may not be able to pay the school, colleges, universities fees for the particular time periods,which may affect the different educational institutions to continue their academic session.

**Conclusion:**

Covid-19 is spreading like a wildfire around the world. This tragic time of pandemic teaches us that, everything is unpredictable and we should be ready to face any challenge. We should have the various alternative plans for everything. Use of ICTs and online learning

platforms in this covid-19 pandemic time is much powerful technique to overcome from the interactionalcommunication barrier among the people globally. Nowadays,the use of ICT and the various online educational platforms helping in communicating to each other and continuing the educational process. This pandemic always giving us the lesson that the students must occupy certain skills of problem solving, critical thinking and adaptability to survive in the crisis situation.

**Reference:**

1. Ayebi-Arthur, K. (2017). E-learning, resilience, and change in higher education: Helping a university cope after a natural disaster. E-Learning and Digital Media, 14(5), 259–274. https://doi.org/10.1177/2042753017751712
2. Affouneh, S., Salha, S., N., Khlaif, Z. (2020). Designing quality e-learning environments for emergency remote teaching in coronavirus crisis. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 11(2), 1–3.
3. Basilaia, G. Dgebuadze, M., Kantaria, M., &Chokhonelidze, G. (2020). Replacing the classic learning form at universities as an immediate response to the COVID-19 virus infection in Georgia. *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology*, *8*(III).
4. Cojocariu, V.-M., Lazar, I., Nedeff, V., Lazar, G. (2014). SWOT analysis of e-learning educational services from the perspective of their beneficiaries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 1999–2003.
5. Favale, T., Soro, F., Trevisan, M., Drago, I., Mellia, M. (2020). Campus traffic and e-Learning during COVID-19 pandemic. Computer Networks, 176, 107290.
6. Kebritchi, M., Lipschuetz, A., Santiague, L. (2017). Issues and challenges for teaching successful online courses in higher education. Journal of Educational Technology Systems, 46(1), 4–29.7.
7. Liguori, E. W., Winkler, C. (2020). From offline to online: Challenges and opportunities for entrepreneurship education following the COVID-19 pandemic. *Entrepreneurship Education and Pedagogy*. https://doi.org/10.1177/2515127420916738

8. Littlefield, J. (2018). *The difference between synchronous and asynchronous distance learning*. https://www.thoughtco.com/synchronous-distance-learning-asynchronous-distance-learning-1097959
9. Martin, A. (2020). *How to optimize online learning in the age of coronavirus (COVID-19): A 5-point guide foreducators*. https://www.researchgate.net/publication/339944395_How_to_Optimize_Online_Learning_in_the_Age_of_Coronavirus_COVID-19_A_5-Point_Guide_for_Educators
10. Partlow, K. M., Gibbs, W. J. (2003). Indicators of constructivist principles in internet-based courses. Journal of Computing in Higher Education, 14(2), 68–97.
11. Pandey v.c. (editor), 2004, Information and communication technology, Delhi, Isha.
12. Rieley, J. B. (2020). Corona Virus and its impact on higher education. *Research Gate*.
13. Saxena, K. (2020). *Coronavirus accelerates pace of digital education in India*. EDII Institutional Repository.
14. SaxenaJyostna, saxenaManojkumar, Gihar, Sandhya (2009), ICT in professional Education, New Delhi,A.P.H. Publishing corporation books.

# ATTITUDE OF TEACHERS TOWARDS TEACHING PROFESSION

Sanghamitra Roy
Associate Professor
Eastern Dooars B.Ed Training College
Bhatibari, Alipurduar

**ABSTRACT**

Attitude is an important human behavioral factor which may be defined as a complex state of human mind endowed with various beliefs. To know attitude is to know an important factor of human behavior. Teaching is dynamic activity and it requires a favourable attitude of the teacher along with certain specific competencies. The proficiency of a teacher largely depends on the attitude he or she possess for the profession. The positive attitude helps a teacher to develop a conductive learner friendly environment in the class room. This type of classroom casts a fruitful effect on the learning of the students. Attitude being a social construct, it is influenced by many factors like gender, stream of education, social strata, age and previous experience of the job. Studies on attitude reveals that the gender of teacher, academic achievement and job satisfaction are the very important factors which influence the attitude of the teachers towards teaching profession to a large extent.

**KEY WORDS: -** Attitude, behavior, Teaching Proficiency, Competencies

**INTRODUCTION**

The teaching profession has undergone a sea of change from the Gurukul system to the present day system of education; however, the perception of the society on teachers does seem to change. Teaching is now a profession rather than a passion and thus there is a paradigm shift in the perception of teachers. Whatever be the advancement in technology, till now, the teacher is not replaceable. From ages the teachers are expected to be ideal role models who can train the young minds so as to shape the society. This is the reason why teachers command good respect from the society. It is worth mentioning that the education system needs a special and strong hand to make the whole system kiss the brim of

success. And, this can only be done by the teachers who can be considered to be skillful and adept in this art. Teaching may be carried out both formally and informally where informally teaching may mean both within the family or the wider community. Formal teaching, on the other hand, may carried out by paid professionals. The professional duties of the teachers may get extended beyond the formal teaching. This points at the fact that the teachers may accompany their students on field trips, supervise study halls, help with the organization of school function and serve as supervisors for the extra-curricular activities.

The most significant difference between the primary school and the secondary school teaching is perhaps the relationship between the teachers and children. In the primary schools, each class has a teacher who stays with the whole class for most of the week and is supposed to teach them the whole curriculum. On the other hand, in secondary schools, the students are taught by different subjects specialists each session during the week and thus, the secondary schools may need ten or more teaching staffs. It is therefore obvious that the relationship between children and their teachers in the primary school tends to be closure than that of the relationship between the teachers and their students in the secondary school level. In the primary schools, the teachers act as form tutors, specialist teachers and surrogate parents during the course of the day.

This whole process of teaching and learning is directly related to the enthusiasm of the teaching professionals. Since teachers can affect how students perceive the course material, it had been found that teachers who showed enthusiasm towards the course material and students can affect a positive learning experience towards the course materials. Recent researches have a correlation between teacher enthusiasm and students' intrinsic motivation to learn and vitality in the classroom.

Attitude is an important human behavioral factor which may be defined as a complex state of human mind endowed with various beliefs. To know attitude is to know an important factor of human behavior. It is actually the complexity of the mental state comprising of feelings and beliefs. Attitude may also

be defined as a tendency to react in a certain way towards a design class of stimuli. Anastasi says that attitude is mental and neutral state of readiness which exerts a directive or dynamic influence upon the individual's response to all objects and situation with which it is related. This mental and neutral state of readiness is actually organized through experience. Attitude is responsible for behaving in a particular and a definite way. If one keeps a positive and favorable attitude towards an object, he will be attracted towards it, he will admire it and try to achieve it. On the other hand, if one has negative or unfavorable attitude towards an object, he will try to avoid it and even feel hostile towards it (Travers, 1973). Attitude takes into account all the concepts, beliefs, habits and motives associated with the object. The concepts and beliefs associated with an attitude are often referred to as the cognitive component, and attitude, the habit as the action component, and the motive as the affective components (Meckeachie and Doyle, 1966). Always the attitude of an individual has got a total reflection and effect on their performance. The teaching profession, too, is a no way different from this in this matter. The quality of education is directly related to the quality and the way of instruction. Since, the teacher plays the key role in the teaching profession as he has got the responsibility of moulding his peoples, he is expected to use the best forms of strategy so that the challenging demand of his carrier such as imparting knowledge and developing essential skills in the students, could be fulfilled. A good teacher is expected to be committed to his work and have the ability to take the initiative (Sparks, 1979).

An attitude should meet the following six criteria (Mangal, 2009):-

**I. ATTITUDES HAVE A SUBJECT-OBJECT RELATIONSHIP**

Attitude always involves the relation of an individual with specific objects, persons, groups, institutions and votes or norms related to his environment.

**II. ATTITUDES ARE LEARNED.**

Attitudes are learned and acquired dispositions. They are not innate and inherent in an individual. Consequently, they may be differentiated from physiological motives. Hunger, for example, is an unlearned physiological motive, while preference for a

particular food, an acquired tendency, is classified as an attitude. Again, while almost any suitable member of the opposite sex may satisfy a man's sexual need, when the need becomes attached to a particular person, the attachment (acquired) becomes and attitude.

**III. ATTITUDES ARE RE-ACTIVELY ENDURING STATES OF READINESS.**

Attitudes represent the state of readiness to respond to a certain stimulus. Physiological motives also do the same. But in the cases of and hunger and sexual tension, the states of readiness disappear for a period when they are gratified. Attitudes, on the other hand, are relatively enduring states of readiness. Consequently, a wife may hold effective attraction to her husband even after the sexual tension has been resolved.

**IV. ATTITUDES HAVE MOTIVATIONAL-AFFECTIVE CHARACTERISTICS.**

Attitudes have definite motivational characteristics. Other dispositions like habit of writing with right hand do not have any motivational of affective quality but attitudes towards one's family, nation, religion or other sacred and hallowed institutions have definite motivational affective characteristics.

**V. ATTITUDES ARE AS NUMEROUS AND VARIED AS THE STIMULI TO WHICH THEY RESPOND.**

We may have a number of attitudes depending upon the number of stimuli to which we respond. Attitude is an implicit response. Therefore, it stands to be varied with the number and variety of the responses which the individual makes. The change in environment and the situations further bring variety in the expression of these attitudes. Therefore, it is correct to say that attitudes are as numerous as the objects towards which they are directed and the situations to which they are expressed.

**VI. ATTITUDES RANGE FROM STRONGLY POSITIVE TO STRONGLY NEGATIVE.**

Attitude involves direction as well as magnitude. When a person shows some tendency to approach an object, he is said to have positive attitude towards is but when he shows tendency to avoid the object, his attitude is described as

negative. These positive or negative attitudes may involve intense feeling and vary from the large negative values to increasingly positive.

**FACTORS INFLUENCING ATTITUDE**

There are many factors influencing such attitude. As mentioned by Bradley (1995) inadequate funds of schools, lack of parent and community support, and insufficient salaries are examples of those factors. A good teacher possess the potentials to create the learning environment for the studies (Vermunt & Verschaffel, 2000). Teaching is complex and demanding profession and to sustain their energy and enthusiasm for teaching, teachers need to maintain personal commitment to the job (Day, 2000)

Both the personal characteristic and disposition seem to be very deeply related to each other when arises the question of the teacher's attitude towards profession. This is a profession, which undoubtedly requires certain dominant behaviours which show teacher's intellect, desire to excel, extended professionalism and teaching as a life concern. This a profession, which exalts service above the personal gains (Goodings et. al., 1995). Teaching involves human nurturance, connectedness, warmth and love (Hargreaves, 1994) and the teacher's beliefs about his role in caring for the students plays a crucial part in developing the personality of the students (Kelchtermans & Ballet, 2002).

Attitude of teachers have also been determined to be influenced by gender (Dodeen, et. al., 2003). They found that female teachers have more positive attitude towards teaching profession when it is compared to the attitude of male teachers. After exploring from newly graduated teachers, Flores (2001) found out the fact that affects their attitude towards teaching profession. He found that the social and the political control existing over teachers and their professions as well as the economic problem, all have their parts in affecting their attitude towards the teaching profession. Moreover, the findings of Flores put forth another important aspect that affects the teacher's attitude towards teaching profession. This aspect is the work place where the teacher stays for a long period of time during the school hour. This aspect is directly related to the behavior

of the principal and the nature of communication with in the school.

Barrows and Elia (2008) described that professional and social status; school infrastructure, poor libraries and laboratories, safety conditions etc., create new variables that define or redefine the attitudes of even most devoted and well prepared teachers (http://www.physics.ohio.state.edu/~jossem/CPE/D2.html).

According to Marchant (1992), the role of experience too, is of much importance in influencing the teachers' attitude for their profession. There is a direct link between the attitude and expectation of society in general and of the family of the learner in particular. All these affect how learning is viewed and how teaching is organized. These attitudes and expectations vary from society to society and attempting to copy learning and teaching strategy from one society into another without trying to adapt into the local conditions may not be successful (Derebssa, 2006).

The attitude of the teachers is also by the use of language that they use in teaching. Consciously or unconsciously, their attitudes play a crucial role in language's "growth of decay, restoration or destruction" (Baker, 1988).

According to Shameen (2004), the attitude of the teachers, too, as part of their cultural orientation, influence heavily their younger students. No one can deny the fact that the attitude of the teachers towards teaching profession is significantly correlated with teaching success. Thus, it can be concluded that there are indication that teachers' attitudes have a positive relation with success in teaching. As is identified by many researchers, there are various factors and situations that influence the development of attitudes of which some are type of schooling, parental attitudes, the attitude of friends, teachers, siblings, attitude or belief towards the subject etc.

Callahan and Clark (1988) indicate that one can facilitate development of attitude by providing a conductive atmosphere and models. Development of understanding may enhance the development of attitudes just as value clarification, role playing

and discussion of dilemmas may enhance the development of values and morals.

The general attitudes of the teachers towards their students, too, can be the factors influencing the attitude of the teachers towards the teaching profession. According to Brophy (1974), general attitudes stem from the teachers' personality and definition of their roles as teachers. Many attitudes are the results of deliberately planned education and religious streaming and influences as well as propaganda. The teachers who are neither introvert nor withdrawn are likely to enjoy their contacts with students and to hold generally favourable attitude towards them. To the contrary, the introvert teachers may prefer to minimize social contacts with students and more likely to develop neutral or relatively negative attitudes towards them.

Smith (1990) has claimed that teachers' personality in the attitudinal sense is a significant factor in teachers' behavior and it has great impact on students' achievement. The teachers must know the art of communication, understanding others and the ability to learn from the experiences. They should be able to facilitate learning effectively (Reddy, 1992). Thus, attitudes have the potential for affecting students and for functioning as self-fulfilling prophecies.

Teacher is expected not only to master the subject and various methods of teaching but also to show that he is capable of selecting the various study materials according the teaching goals and varied group of peoples. He also possess the potentials to create a learning environment for the students (Vermunt & Verschaffel, 2000)

Attitude is unquestionably an acquired disposition and therefore, it is conditioned by learning or the acquisition of experiences. Hereditary factor does not play any role in the formation or development of attitudes. An attitude, at any stage, is essentially a product of the interaction of one's self with one's environment. Therefore, the factors influencing the formation and development of attitudes can be divided into two parts which are as follows (Mangal, 2009)

**i. FACTORS WITHIN THE INDIVIDUALS**

All individuals do not respond similarly to the same situation. The effect of environmental stimuli in acquiring some

predispositions is very much conditioned by the growth and development pattern of an individual child. Let us try to emphasize these development factors.

**A. PHYSICAL GROWTH AND DEVELOPMENT**

In the development of attitude, physical growth and development play a significant role. Poor physical health, low validity and undeveloped somatic structure are responsible for poor emotional and social adjustment. Poor social adjustment inevitably exercises an important effect on the formation of attitudes in many different directions. A crippled and undersized girl of fifteen years is likely to form the same attitudes as those formed by another girl of fifteen who is tall, well-proportioned and charming of her age. Even the colour of the skin, weight of the body or biochemical changes in the body tissues and fluids, for example, sex hormones, have a vital effect on the development of attitudes through its connection with social adjustment.

**B. INTELLECTUAL DEVELOPMENT**

Development of attitudes is conditioned by the growth of intelligence. The components of intelligence like memory, understanding, thinking and reasoning plays a significant part in attitude formation as they help in gaining perceptual experience. Due to his limited intellectual capacities, a young child is incapable of forming attitudes about remote or complex abstract things. His attitudes are always of a particular kind that are related to his own immediate problems and experiences. With the growth of intellectual capacities, an intelligent adult is capable of having more abstract and generalized attitudes.

**C. EMOTIONAL DEVELOPMENT**

Emotional development also affects the formation of attitudes. Emotions play a dominant role in overt and covert behavior manifestation and behavior is related to attitudes. As the child develops with age and growth, the capacity varied emotional experiences and attitudes is gradually developed. Emotional maturity helps in social adjustment and in seeking social approval. In turn, it makes an individual to develop numerous attitudes through his direct or indirect experiences.

**D. SOCIAL DEVELOPMENT**

Attitudes are rarely individual affairs. Social interaction and group processes are the key to attitude formation at any stage of human development. Children having poor social adjustment are more likely to have antisocial attitudes and are less likely to be influenced by groups which form attitudes. Children with health social adjustment easily pickup social attitudes from their respective groups.

**E. ETHICAL AND MORAL DEVELOPMENT**

Each individual develops certain ideals, values and concept of the self in which he takes pride. For enhancing his feelings of self-esteem, one tries to develop those attitudes that suit his values and ideals. A student who values historical events or objects, will have a favourable towards the subject of History. A man who thinks that God is one will not have unfavourable attitude towards the persons belonging to the religion other than his own.

**ii FACTORS WITHIN THE INDIVIDUALS ENVIRONMENT**

Besides the individual variations shown by their various personality, characters on account of the pattern of their growth and development, attitudes are largely borrowed from the groups within one's environment to which one owes one's stronger allegiance. It has now been firmly established that environmental forces, in the shape of the social groups, institutions and community, cast a strong influence in shaping the beliefs and attitudes of an individual. Let us discuss a few important environmental factors:-

**A. HOME AND FAMILY**

In attitude formation, home and family environment plays a leading role. A child by identifying himself with his parents and other members of the family picks up their attitudes. The family more or less defines for the child the expected roles which he must play in various situation and thus initiates the formation of specific attitudes. A health family environment and positive attitudes of the parents and other family members bring desirable impact on children in picking up desirable attitudes while negative parental attitudes, for example hostility and rejection, lead them to imbibe ascendant and aggressive attitude. Similarly, many anti-social attitude are said to be the

product of the faulty upbringing and uncongenial environment at home and in the family.

**B. SOCIAL ENVIRONMENT**

While the family and the home environment plays its role in the formation of early attitude, contact with the people in neighborhood, school, community and society to which one belongs, cast strong influence in reshaping early attitudes and acquisitions of many more new attitudes. As a child grows older and with his wider social contacts, he is influenced by many social institutions and groups and as a result he tries to pick up attitudes of those groups for which he has stronger allegiance or that suits his own nature and motives.

In schools, factors like teachers and their behavior, classmates or school mates and their behavior, the teaching methods, curriculum, general tone and discipline of the institution, all contribute toward attitude formation.

The religious groups, social clubs of constitution where one learns or earns has a definite set of emotional and intellectual environment as a result of which members of the group pick up characteristic of the group and in this way, the society plays a leading in attitude formation.

Mass media in the form of newspapers, radio and television, moving pictures, propaganda literature and advertisement also play a key role in shaping and reshaping the attitudes. Individuals tend to identify themselves with the views expressed through these agencies. Thus the heroes and heroines on the screens and radio programme, attractive figure shows in various advertisements or the slogans of a popular leader prove potent sources in the formation of attitudes.

**TEACHING AS A PROFESSION**

Teaching is one of the noblest professions on earth. The teachers are the pillars of society for they educate and mould the future citizens of a country. Teaching is a revered profession in India also. A secure career, great monetary compensation and regular annual vacations are enticing hordes of promising young men and women to join this teaching profession. Teaching requires, apart from the requisite education and degree, a flair for interacting with the students and the

capability of explaining things in clear lucid terms to the students. Rousing the students from their apathetical slumber and watching their interest grow in studies is the greatest reward for a teacher. For being a good teacher, one not only needs to be wise but also be patient and understanding. Teachers not only augment a students' intellect but also contribute to the well rounded development of his or her personality.

In India, a career in teaching continues to be regarded as a noble profession. The satisfaction of having spreading the light of knowledge and dispelled the clouds of ignorance in another human being, old or young, is unrivalled. In order to make teaching a true profession, we must establish high standards for entry into teacher training programmes and deliver high-quality pre-service education to prospective practitioners. We must set and maintain high and rigorous standards for entry into the profession and evaluate practitioners according to those standards.

Teaching is to research out the peoples to make them enrich. Teachers' responsibility does not seize when he has satisfied the average individual in the class though they are more in numbers. To quench the thirst of the gifted individual, the teacher should keep himself abreast with new techniques and novel strategy which is not an easy job and it is a hard task to successfully achieve. To successfully shoulder all the responsibilities of a teacher, the teacher should be creative and competent. Modern teacher is expected to shoulder the multi-dimensional responsibility to initiate desired learning and outcomes. To suit the needs of people in this rapid scientific and technological era, the teaching learning transaction should be sensitive and sophisticated.

**ATTITUDE OF TEACHER AND TEACHING PROFESSION**

It has been noticed that till mid 70's the teachers used to exercise full authority and autonomy on teaching methods. However, there is considerable change in the recent times. There is seen erosion in the values, responsibilities, commitment of the teaching profession. This erosion has taken place due to the complex structure of the society, socio-economic growth, the enterprising nature of education and the pressure of work. There

may be considered many more factors, both direct and indirect, responsible for this erosion. Today's teacher is as busy as professional as a software professional.

Today, teaching has transformed from passion to profession. The consumerism has pervaded into every walk of life and money seems to rule the 'comforts'. The salaries of teachers, though given a priority in the Government thinking, still the emoluments lack the societal demands; thus the profession does not seem to attract the right talent.

Various recent events in India show that the traditional respect and prestige enjoyed by the teachers in the society have been eroded quiet considerably and indeed, loss of interest and attraction to the teaching profession has taken place. Teachers' attitude are important variable in classroom applications because of the relationship between attitude and action. Teacher attitudes are often translated into specific classroom and instructional practices which in turn affect student behavioral and learning outcomes (Cook, 2002).

Teacher's attitude is an important variable in classroom application of new ideas and novel approaches to instruction (Reinke & Moseley, 2002). Currently there is discussion and exploration of the relationship between teachers' attitude and the instruction of students of ethnic diversity, the educational implementation of technology, the role of school in the prevention of violence and the place of popular culture in the curriculum (Johnson & Andrew, 2005).

In this regard it is worth mentioning that teachers' education aims to produce highly motivated, conscientious and efficient classroom teachers for all levels of our educational system and to help teachers fit into social life of the community and society as well. Today the teaching profession is no longer attractive to many people as it did in the past. This fever may be catching up with perspective university students many of whom rather study other subject or courses in the university than enroll in teacher programme (S.E.Aduwa & Raymond, 2005).

## CONCLUSION

Teachers are the key factors in education system. It is a well-known fact that their subject learning in the classroom setting in addition to the issues belonging to the teachers' personalities and behavior are significant contributions to the teaching and learning process in any discipline in addition to teachers' attitude towards the teaching profession have an effect on the classroom performance. Smith (1993) schematized this cause and effect relationship between teachers attitude and teaching which is as follows:-

Teacher's attitude towards teaching profession → Teaching practice → Student's attitude and achievement

Fig.: No. 1 :- The cycle of the relationship between attitude and teaching practice (Smith, 1993)

**References:-**


1. Anastasi, A. (1957). *Attitude of in-service and pre-service primary school teachers* Journal of Education Psychology *Principles of Psychological Testing*. McMillan Co., New York, USA, 36, 3, 1-5, July.
2. Brophy, J. E. (1974). *Teacher-student Relationships: Causes and Consequences*. Holt, Rinehart and Winston, New York.
3. Sparks, D.C. (1979). *A Biased Look at Teacher's Job Satisfaction*. University of Chicago Press. Chicago. USA.
4. Mathur, S. (1982). *Attitude of teachers towards creative learning and teaching*. Buch, M. B. (1991), Fourth survey of Research in Education, vol.-II, NCERT, New Delhi.
5. Som, P. (1984). *Teacher personality pattern and their attitude towards teaching and related areas.* PhD., Education, Calcayya University, Buch, M. B. (1991), Fourth survey of Research in Education, vol-II, NCERT, New Delhi.

# AGHOREKAMINI ROY---- A " GRIHASTHA BRAMHACHARINI" AND EDUCATIONAL REFORMER OF THE 19th C. BENGAL

Oindrila Mitra
Assistant Teacher, Department of History
Gokhale Memorial Girls' School

**Introduction**

The 19thc Bengal witnessed an efflorescence of cultural and educational endeavors,some spearheaded by noteworthy reform organizations and numerous under the efficient guidance of scholarly individuals, notably by some eminent Bhadramahilas.

This paper attempts to explore the contributions and achievements of Aghore Kamini Roy who was much ahead of her time and also a product of itand aims to elucidate the contestations and tribunals of the then contemporary milieu.

**THE SPIRITUAL MARRIAGE**

Aghore Kamini Roy( born in 1856), the eldest daughter of philanthropist BipanchandraBasu of village Sripur( south 24 parganas),was married to Prokashchandra Roy( who later became the Senior Deputy Magistrate and Collector of Patna) at the tender age often.1 Acting in accordance with the social compulsions of the age ,when the status accorded to the wife was elevated and assigned as an intellectual companion of her husband, Prokashchandra took upon himself the mantle of imparting the basic literary education to his unlettered wife. In his words as , " …I wanted to teach you to read and write. There was no time for this during the day. When all had retired for the night and you came to sleep, I would begin to teach you, I sat apart, as your teacher and you remained at a respectable distance as a pupil.".2 It was this over-encompassing companionship which led her to adhere and accept the Brahmo dharma following the footsteps of her husband disregarding social contempt and abject humiliation..After a blissful married life of a decade, at the naming ceremony of her youngest son, Bidhan( afterwards the great physician and Chief Minister of Weat Bengal)in order to dedicate themselves whole heartedly to the service of humanity without any inhibitions, they solemnized their bond into spiritual union and thereafter embraced celibacy unto death.3 To justify the uniqueness of this newfound notion of conjugality which negotiated the dichotomy

of accommodation of the antahpu ( the inner space of home, synonymous with the woman's arena) with the call of the bahir( the space outside the home or the male domain)it is apt to quote the following utterances of Prakashchandra Roy from his seminal " AghoreProkash,"( the biography of his wife) '…" That life could no longer be confined to the house. I realised that without serving society the household life will not be perfect…You too realised this and hence both of us tried how our life, especially yours ,could expand beyond the bounds of the family and cover the outside world.4Another remarkably the reformist husband,…" you no longer belonged to me alone. I did not wish to confine you for my sake. I did not complain at making you fly,or at seeing you fly. You also did not complain…".5

**REFORM & TRIALS**

The year 1877 was marked by a dreadful cyclone in south eastern Bengal causing huge causalities and this momentous yet undesired incident led Aghore Kamini Roy to donate all her ornaments to Keshav Chandra Sen (the Bramho Leader) to accentuate the relief measures undertaken by the Samaj.6 It was the transfer of her husband to Bankipur( in Bihar ) that ushered in a new phase in her life. Her assumption of the work of the women's branch of the Brahmo Samaj (BrahmikaSamaj) from 1887 widened her outlook. In the religious proceedings conducted by her people belonging to Brahmo and non Brahmo creed freely participated without any inhibitions.7The new found intent of prioritizing others over the self found its subtle expression in her foremost yet unsuccessful attempt at imparting education to a handful of girls for whom her residence was transformed into a boarding house. This failure fuelled her grit and determination to effectively learn English and the art of school administration and thus with the support of her husband and Amrita Lal Basu ( brahmosamaj member) in 1891,inspite of being a mother of 5 children, along with her two daughters, she got herself enrolled at the well known Isabelle Thoburn (Christian) College at Lucknow and stayed in the hostel as a boarder for one complete session.8 At the college in the absolutely alien environment which was dominated mainly by young Christian and Anglo-Indian girls, she not only gained proficiency in speaking and writing in English and Hindi but also acquainted considerable knowledge in Kindergarden system.9 It was after her return to Bankipurin1892 that she took over the charge of a nearly closed down girls' school on the request of Gurupada Sen ( a leading lawyer)and thus Bankipur Girls' School with only ten girls was

re-established in a new vigour. Even these girls had to be brought from their homes. As the initial local response was of complete indifference, the natives detested sending their daughters or sisters, as they were unwilling to expose their faces to public gaze, Aghorekamini Roy opened a hostel inside her house –" Chhatri Niwas"—so that the girls would not give up their education. And even befriended the guardians, specifically the mothers, by enthusiastically visiting their houses and convincing them of the need for girls' education.10This house visit and work of persuasion was one of constants in her daily schedule.11 Not only the guardians even her illustrious husband falling prey to social conservatism proposed for the greater utility of learning culinary skills. Being unfazed to the age old traditionalism, she invariably argued as recorded with utmost sincerity by her husband in AghoreProkash," What is there in cooking? I can teach the girls cooking in fifteen days. But what is needed more is the knowledge of arithmetic, geography and hygiene which would enlighten them and free them from permanent habitation in the kitchen". Apathy towards the liberal tenants of Brahmoism led to the irregularities of donations and thus resulted in the shortage of teachers, so much so that AghoreKamini although unfamiliar with the study of Geography as it did not form a part of her college curriculum, had to take up the onus of teaching it to the students. For the further enrichment of and to be better equipped in to discharge of her duty as a teacher she devoted in pursuit of knowledge diligently.12As education implied a wide connotation to her, she believed that true education must include physical training, an exemplary lesson she learnt from her illustrious tutor Miss Thoburn. Not only did she teach the students but even used to forego her one time meal in order to feed them and also played with them during tiffin break. Propelled by the emerging nationalist fervour of the time, her students were made to sing the patriotic song of BandeMataram in chorus as a school prayer. Her love and motherly affection earned her the epithet of "Maeji ". She attended the school and took classes even when she was ill. And set such a good example of regularity and punctuality that other teachers also rarely remained absent and worked with full devotion in spite of the poor salary.13 She fondly referred the Boarding House as her family or" paribar". 14The following incident as narrated by Prakashchandra Roy in Aghore Prakash validates this statement: " Once a person came to sell Benares Sari. My brother's daughter said " Aunt, will you not purchase a Sari? If you do not wear

it yourself you can buy for Sarojini. You examined all the Saris: but you returned them all…you replied," It is not enough if I buy one. I have ten daughters and I will have to purchase ten."Infact , you regarded all the girls of the family as your own daughters. Hence you could not provide fine clothes or ornaments for your own daughters, as you had not sufficient means to buy for all".15Although she was assisted by her husband Prakashchandra Roy ( who humorously called himself her " Pradhan Mantri"),16Guruprasad Sen ( an eminent lawyer of Bankipur) and two very sincere Brahmo missionaries Amritalal Bose and Brajagopal Niyogi , it was Aghorekamini's inexhaustible energy that enabled her to not only to efficiently balance her dual role of a homemaker and able administrator and even every evening of hers were devoted to the study of the records and files of school management and in accomplishing multifarious activities related to the students for example, stitching their clothes or helping them in the preparation of lessons.17

The school gained immense popularity as is evident from the report of The Indian Spectator, the leading newspaper of Calcutta dated 2nd April 1893: " By far the most notable institution, however, at Bankipore, is an unpretentious Boarding House, managed by a Brahmo lady and her two daughters….Mrs. Ray speaks English fluently,and is well read... Early in the morning the children in her home after their prayers in their own simple way for no set prayers are used,and no compulsion is put upon their tender conscience.. Each of the elder boarders is in charge of one or two of the younger and each keeps a small diary in which she notes down her failing and blacks hidings , if any. The boarders attend the female school conducted under Mrs. Ray's supervision, and are helped in their studies at home by her and her daughters. The whole cost of education and boarding amounts to Rs.7/- and odd per month. The children look bright and lively and the lesson of purity, self-help and self sacrifice, taught to them by example and percept, are likely to have an enduring influence on their afterlife. The Boarding is not kept for profit: indeed, the amount charged to the boarders is much less than the actual cost. The deficit is made up by Mr. Ray who takes the deepest interest in the work of his wife and daughters."18The school became a premier institution and it was the undaunted and hard labour of AghoreKamini Roy that not only prompted many natives who were previously scornful to the rational Bramho dictums to sent their wards but even renowned personalities like Hiranand ( Soukiram Advani Of

Hyderabad Sindh) living in various parts of India to sent their daughters to Bankipur for a formidable and intensive educational experience. 19 By 1896 the untiring efforts of AghoreKamini Roy bore fruits and the number of students enrolled amounted to 40. It was in the same year that the Chief Secretary, William Bolton visited the school and expressing his delight remarked to AghoreKamini Ray," I am very pleased to see the school. In England this sort of work is generally done by unmarried or widowed women. How could you manage to do this with family and children?". Not only he sanctioned grants but also proposed government takeover of the school, subject to the approval of the Managing Committee. This marked the end of the tremendous financial crisis that the school was facing from its inception,since rupees 48 was the monthly income of the institution .20Her zeal for the emancipation of women made it obligatory to confront opposition of the orthodox religious elites, even for trivial matters. Once for example a storm of protest was raised when a girl appeared on the stage and presented a recitation. However, she remained unperturbed and evinced the Brahmo notion of struggling against the rigid and conventional norms. She wrote in her diary," However strong the oppositions I am not going to give up my struggle. This is my pledge."21

**THE REBEL & HER TRIUMPS**

A firm believer of equal rights for men and women she organised a women's association which was later known as the AghorekaminiNariSamiti,with the sole purpose of making women self-dependent through the dissemination of education and to serve the sick and distressed. It was through this welfare organization she not only campaigned against the tea planters ill -treatment of women workers in Assam also persuaded barrister Monomohan Ghosh to support the venture and even wrote to Mrs. Elliot,the wife of the Lt. Governor of Bengal, to enquire into the cause of grievances and it was due to her earnest efforts that punishment was meted out to the offenders.22On another occasion She raised donations for an Indian( Sannyasi Charan Roy) who was falsely implicated in a theft case by the planters', aiding to his release23.

A die hard crusader against conservatism, she openly advocated widow remarriage and even inter caste marriage. Even defied the conventions of the caste ridden society when she arranged the marriage of her eldest daughter Suharbasini with a young school teacher Brindavan Sur who belonged to a lower caste. The orthodox

Hindu opinion reacted sharply and criticized them. Infact this event provoked some Brahmos to renounce Brahmoism but she remained firm in her decision. A sympathizer even threatened to " horse-whip" Prakashchandra Roy for having dared to marry off his daughter to a man of a different caste. Even his mother left his house in protest.24 But none of these deterred Aghorekamini Roy.

A defiant critic of purdah she decided to discard it and sought to sitalong with men folks during the Brahmo prayers.25Even ignoring social ridicule, travelled from Patna to Hilsa in an open carriage without covering her face. On another occasion to attend the Lucknow Utsav,she without taking any male member, travelled by train to Fyzabad along with her two teenage daughters thus sparking unabated social furore.26Even she regularly led groups of Brahmos both male and female to Rajgir and other places where along with other ladies she sang Brahmo hymns in chorus in the market places and when even communicated with the disdained mob in chaste Hindi. 27Although at one point some detractor compared her conduct with that of "women of the street", she did not budge from her stand and even celebrated the auspicious Brahmo ceremony of Maghotsav with a drama performance by the students of her esteemed school.28

Her nine months stay at Thoburns college( Lucknow) not only made her familiar with the inalienable virtues and the need of practical philanthropical work where sacrifice of possessions for the sake of service to the distressed was highly acclaimed but she also grew critical of the then traditional methods of dressing. In the words of her spiritualcompanion, "By association with Miss Thoburn, you came to the settled conclusion that we have to dress decently when we go out. The edge of the Sari falls away from the head easily. It is impossible for those who have to do outside work for the service of others to draw on this veil frequently on their head and face. You had a veil like that of nuns,made for you to cover your head……Inspired by the example of Miss Thoburn, you had a gown made for you which fell from the neck to the foot…From this time you learnt to use shoes and stockings…..You had now no trace of the slow and sluggish movements of the ordinary Bengali women…".29 Later in her lifethe ideals of self-sacrifice and renunciation became so deeply rooted in her outlook and soul that she would often dress up herself in plain unbordered coarse clothes as were worn by the local Bihari Mutiya ( labourers) and even went to meet the ladies of rich families in that attire. To quote her sagacious remark," What does the dress matter?

Can it make one person a widow or the reverse?"30 On another occasion she unresistingly opined," For the last 30 years I have myself given up the marking with the vermillion. I have taken to the widow's dress and manners. If even after this, I am taken to be superstitious, I shall not any longer discuss the matter. But my mind still feels insulted on account of the insult to the women. If it were an European lady,such a treatment would not have been possible". She even forsook her hair and ornaments31. Once when Prokashchandra Roy remarked," Everything has been done. Now you can grow your hair again…" she valiantly replied "I cannot grow my hair hereafter. It seems a heavy burden.."32Disregarding the hue and cry of humiliation and social ostracism she strove ahead defying the unnumbered the constraints and thus initiated reforms not only in educational spheres but also seek to implement the long desired social freedom .

Her relentless courage and apathy towards superstitious traditions and obligations and the desire to place the subjugated womenfolk hitherto uncared and disrespected earned her accolades and reverence from many of her contemporaries. She was referred as" Maittreyi"33 (the great learned lady of ancient India) by PratapChandra Majumdar( notable Brahmo personality) 34. This" Grihastha Bairagini" as lovingly described by her husband in Aghore Prakash departed from this mundane world on 12th June 1896 only at the mere age of forty years but left behind the trail of reform for women education ablaze.

**CONCLUSION**

Since apart from the biography which is an ode by her husband and very few articles no systematic research nor any serious attempt has been made in recent years to assess her pioneering contribution to the women's movement despite her prominence during her lifetime. My paper is a humble attempt to offer my heartfelt gratitude and tribute to this fascinating personality due to whose unparalleled efforts we the present generation of womenfolk have been the fortunate receiver of the invaluable fruits of her toil.

**References**

1. Dr.Chakraborty,Usha.( 1963 ). *Condition Of Bengal Women Around The 2nd Half of the 19th C.*.Calcutta: Bardhan Press .p. 123

2. Roy,Prakashchandra.( Translated into English by Sri P. Seshadri Ayyar) ( 1955). *Aghore –Prakash* .Calcutta :Premier Printing Works. p.12
3. Op. Cit.1 .p 123
4. Op. Cit.2 .pp.35-36
5. Ibid1 .p. 91
6. Op. Cit.1 .p.123
7. Op. Cit.2. p.63
8. Niyogi, Sumanta. ( 1986) .*The Brahmo Samaj Movement and Development of Education .* Patna : Janaki Prakashan. p.36
9. Op. cit.1 p. 124
10. Ibid 2.P. 124
11. Roy ,Prakashchandra ,( Translated into English by Sri P. Seshadri Ayyar), op. cit.,p.148
12. Ibid1. p. 147
13. Ibid 2. p. 148
14. Ibid 3. p. 162
15. Ibid 4. p. 178
16. Ibid 5. p. 147
17. Ibid 6. p. 148
18. Ibid 7. pp. 162 – 163
19. Ibid 8. p. 161
20. Ibid 9. p. 205
21. Ibid 10. p. 206
22. Kumar, Radha. ( 1993). The History of Doing : An Illustrated Account of Movements for Womens' Rights and Feminism in India, 1800 – 1990. New Delhi :Zubaan.,p. 48
23. Op. cit. 1.p. 125
24. Op. cit.2.pp. 50-51
25. Ibid 1. p. 65
26. Ibid 2. p. 138
27. Op. cit.1.p. 125
28. Op. cit. 2. pp 205-206
29. Ibid 1. p. 139
30. Ibid 2. p.180
31. Ibid 3. p. 209
32. Ibid 4. p. 203
33. Ibid 5.p. 63
34. Op. cit. 1. p. 126

# A study on The East Kolkata Wetlands : Ecology, Sustainable development and People's resistance-1990s onwards

Mohammad Masud Akhtar
Assistant Teacher, Polerhat High School (H.S.)

**Abstract :**
Wetlands are recognised as environment-friendly, less energy intensive and cost effective natural resources. Wetlands are complex and integrated ecosystem in which flora, fauna and the environmental factors interact with each other. Local people in and around the East Kolkata Wetlands is exclusively dependent of this sewage-fed fisheries which contributes a substantial portion of fish demand of the city of Kolkata. City sewage was used for fish farming, agriculture and horticulture in the adjoining areas. The mechanism of desolation process of the canals carrying sewage can be considered as an important method of conservation of East Kolkata Wetlands. The wetlands save Kolkata, India's seventh most popular city, a staggering Rs 4680 million a year in sewage treatment costs. About 1000 million liters of wastewater each day is funnelled into the wetlands that filter it and discharge it in the Bay of Bangal. Kolkata has remained an 'ecologically subsidised city' since the British Raj as the government doesn't need to invest in wastewater treatment for the city. But over four decades (between 1972 and 2011) about 38.6 square km of wetlands were converted to built-up areas. The ecologist balance is under threat due to encroachment and other reasons. There is a big question that why did no such resistance build up or either the resistance were suppressed to be farmed?
**Keywords** : Wetlands, Wise use, Wastewater, Ecology, Encroachment

In the year 2002 East Kolkata Wetlands has been recognised as a wetland of International Signification (Ramsar convention) to understand the concept of 'wise use'. In the past it was a rich abode of wilderness and was well known for its rich floral and faunal diversity. Today this valuable natural asset is highly threatened due to the phenomenon of urbanization. The present article aims to discuss about the ecology, sustainable development and people's resistance related to the East Kolkata Wetlands.

Wetlands are renewable and cost-effective complex nature of integrated natural biological resources. The wise use of aquaculture in the form of sewage-fed fishery provides a multitude of ecological

functions such as flood reduction, ground water recharge, habitat and biodiversity restoration. The East Kolkata Wetland located on the eastern fringes of the Kolkata city. It is a complex of natural and human-made wetlands. From the satellite images it shown that between 22° 30'N-22° 40'N latitude and 88° 25'E-88° 30'E longitude, 80% of area considered as wetlands. The East Kolkata Wetlands include salt marshes and salt meadows, as well as farms and settling ponds.

In the early 1990s, the city real-estate industry had began eyeing the wetlands. Encroachment is the single largest threat that East Kolkata Wetlands face. Why did no such resistance build up or either the resistance were suppressed to be formed? The unfinished Singur project of Tata estimated only 997 acres (4.03square km) had to face a organized resistance but East Kolkata Wetlands which covered 125 square km lost its vast area without almost any kind of resistance.

The bustling mega-polis of Kolkata produces almost 750 million litres of wastewater and sewage everyday. Strangely, the core area of the city does not have a single sewage-treatment plant. So, where does so much sewage go? The answer is East Kolkata Wetlands, the world's only fully functional organic sewage management system.

'The wetlands acts as a carbon sink and clean up the city's air. The carbon is sequestered in soil and biota (plant and animal life) of the East Kolkata Wetlands ecosystem. If this 60% carbon is not stored by the EKW then it would have dissipated into the atmosphere' said study author Sudin Pal, Department of Chemical Engineering, Jadavpur University, Kolkata. In the wake of urbanization and vocation change observed among the East Kolkata Wetlands farming and fishing community, Pal and colleagues sought to flesh out the carbon storing efficiency of the water body and map its role in mitigating global warming and accumulation of greenhouse gas emissions.

The researchers crunched data on organic and inorganic carbon content of wastewater and wastewater-fed fish ponds across seven sampling sites along a 40km stretch of the wetlands. According to Sudin Pal, 'the study sites include some of the most polluted stretches of the city such as tannery conglomerates linked to China Town, a tannery effluent-fed fish pond, a composite wastewater-fed fish pond and a site where tannery effluent was mixed with municipal wastewater and other small-scale industrial effluents'.

Major William Tolly, chief engineer was engaged in excavate Tolly's Nala for transportation of goods for commerc. It was finished in the year 1776, connecting Vidyadhari at Shamukpota and the river Hoogly near Hastings. In 1810 Beleghata canal was excavated and in 1829 Circular canal was done. This canal were mainly excavated for commercial use but the waste and rain water of Kolkata drained through it.

In 1860 a Health officer of the Kolkata Corporation started sewage system. In the time of East India Company, major portion of fisheries were in the hands of influential and powerful local families. In 1930 regulated proportion of sewage water used in fisheries. These fisheries were mainly located at Tiljala, Rajarhat, Sonarpur, Bhangar areas. In 1940 Bantala sedimentation project was setup for the filtration of wastewater. But this sedimentation system in now out of order and the whole process is ruined.

Nowadays environmental problem is a big issue. Each and everyone have to concern about it. Problems like pollution, global warming, crisis of water are rapidly increasing. Urban local bodies (ULB) were warned of punishment by the National Green Tribunal (NGT) for failing to comply with its order over waste disposal at the East Kolkata Wetlands. They were accused of illegally dumping waste and contaminating water bodies in the area. West Bengal's environment department and the ULBs in the eastern fringe of Kolkata were told by the court their officials could receive imprisonment, withholding salaries and payment of penalties.

The East Kolkata Wetlands are an unappealing mixture of poverty, sunshine and wastewater. The people here have patiently and wisely transformed this ecosystem purified water for free! How did this happen and what can we learn from it? A book titled 'Ecology and Traditional Wetland Practice: Lessons from wastewater utilization in East Kolkata Wetlands' by Dhrubajyoti Ghosh, attempts to answer these very questions. A newspaper article published in The Telegraph dated 28.08.18 titled 'Activists sound East Kolkata Wetlands alarm bell' where Subhajay Ray said that the wetlands is of 'immense importance' to the city's existence. Dipayan Dey, President of South Asian Forum for Environment (SAFE) told that India produces 29K million litres wastewater everyday, 20% of this produces in Kolkata. To save Kolkata it is very much essential to preserve the East Kolkata Wetlands.

According to environment activists opinion and survey report in 2018, 56% of wetlands encroached by developer and real estate business. Apart from this, there is rampant construction, which is only

harming the fragile ecosystem. Recently illegal land fills are on the rise and unprecedented land development and urbanization have been creating concerns about the impact on East Kolkata Wetlands environment. The establishment of the posh satellite township Salt Lake city in the north-eastern fringes of the city reclaimed a part of the wetlands in 1960s, while two decades later, construction of Eastern Metropolitan Bypass, which enhanced the connectivity of the area whit the city made the wetland more accessible and made it an attractive site for real estate speculation.

After the decision of extend Salt Lake city by converting more wetlands in the area, a Public Interest Litigation (PIL) which saved the wetlands by a landmark judgement of justice Umesh Chandra Banerjee of Culcutta High Court ordered that the wetlands would be preserved for fishing and farming. It was the first major legal battle in India where the environment emerged victorious.

Hidco accused of illegal filling water bodies. About 33 water bodies in the Ramsar protected East Kolkata Wetlands were filed for the construction of Rajarhat New Township. The first one and half decade of this century has seen the situation turning only worse for East Kolkata Wetlands. In 2016 a survey report says that Bhagwanpur, one of the 32 mouzas, local word for settlement revealed that the water cover had got reduced from 88% in 2002 to 19% in 2016.

In February 2017 a study reiterated that the East Kolkata Wetlands may soon be history if more and more buildings keep coming around it. It is also revealed that the rapid conversion of land used has hobbled the fisheries and vegetable farms in the area and led to a crash in local economy. Thus, ultimately creating distress among fisher folks and farmers dependent on East Kolkata Wetlands.

The resistance did not form due to different types of interest group, local political interference, people's unawareness and lack of proper Government initiatives. But the East Kolkata Wetlands nurture the world's largest wastewater-fed aquaculture system. Research suggests that the wetlands provide a very cheap, efficient and eco-friendly system of solid waste and sewage treatment system for Kolkata and the city's periphery.

Patrick Barkham in his article titled 'The miracle of Kolkata's wetlands and one man's struggle to save them' point out the role of Dhrubajyoti Ghosh an engineer turned ecologist turned anthropologist. Ghosh was asked in 1981 to conduct an investigation into what happened to Kolkata's wastewater. East Kolkata Wetlands save the city through it's sewage management system. 'The only

word that suits is serendipity' says Ghosh. According to Ghosh, West Bengal Government displays no desire to enforce the 1992 High Court ruling. Illegal developments are going up all over the wetlands and staying up. 'People have more confidence in a lack of law than in the law itself' Ghosh says. And why is the Government silent? 'They also understand what real estate means to their election campaign. Wetlands are real estate in waiting'.

East Kolkata Wetlands considered as the kidney of Kolkata. The process of dialysis and rejuvenation of the bad blood of the City of Joy which was intended planned and executed almost a century before seems to be chocked and toxicated resulting into a gangrene to the city itself. If the process of encroachment of the wetlands is not stopped immediately and the purification procedure not been upgraded and sustained the city will surely be under a serious threat. The only way to overcome this situation is resistance and awareness.

**References:**

1. Jana, B. B. Wastewater management through agriculture, Springer. 2018 . pp. 285-303.
2. Basu, J. East Kolkata Wetlands: NGT warns officials for violating waste dumping norms, Kolkata: Down to Earth. 2020
3. Bankram, P. The miracle of Kolkata's wetlands and one man's struggle to save these, Kolkata: The Guardian. 2016
4. Ghosh, D. Ecology and traditional wetlands practice: Lesson from wastewater utilization in the East Kolkata Wetlands, Kolkata: Worldview. 2005.
5. Edward, P. Environmental Management Manual: East Kolkata Wetlands, Delhi: Manak Publications. 2006.
6. Dey, P. Bhoomi Sanskarer Hal-Hakikat, Kolkata: Nagarik Mancha. 2001. pp. 1-39.
7. Dey, P. Rajarhat: Sarkar Jokhon Lootera, Kolkata Nagarik Mancha, 2001. pp. 1-24.
8. Ghosh, S. Jolabhumir Jibon Darshan: Prasanga Paschimbanga, Kolkata: Lokosahitya. 2003.
9. Kumar, D. Uttar 24 Parganar Jolabhoomir Somossa, Kolkata: Lokosahitya. 2013.
10. Sengupta, B. Laban Hroder Kromo-Bibartan, Kolkata: Lokosahitya. 2003
11. Roy, B. Kolkatar Nikashi Bebostha, Kolkata: Nagarik Mancha. 2000.

Ebong Prantik is an International Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Journal Published Thrice a Year

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Ebong Prantik

2582 3841

Ebong Prantik

2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102
Ph : 9804923182
Email : ashis.jibonda.roy@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

₹ 450/-